বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের নাট্যকলা বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

৭ম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা জানুয়ারি - জুন ২০১৩

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৪ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়

স্থায়ীমূল্য সৃষ্টি করা গেলে যুগের বিচারে অন্যান্য শিল্পের মতো নাটকও কালজয়ী হয় আর স্থায়ীমূল্য সৃষ্টির জন্য দরকার হয় নন্দন বা সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। মানবীয় এই সম্পর্ক কখনো রাজনীতির প্রতিপক্ষ নয়; সহগামী। বরং রাজনীতি-ই নির্ধারণ করে এই সম্পর্ক অন্যান্য শিল্পের মতো নাটকে কীভাবে স্বীকার্য হবে।

বাংলাদেশে শিল্পের সংকট নিয়ে কথা বলতে গেলে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রশিল্প, সংগীতের মতো নাটকের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। দুঃখজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশে শুরু থেকেই 'রাজনৈতিক নাটক' আর 'প্রেমের নাটক' বলে অন্য শিল্পের মতো নাটকেও বিভাজন করতে দেখা যায়। আরও অবাক-করা ব্যাপার হল, রাজনৈতিক নাটক বলতে মুক্তিযুদ্ধের নাটকের নামে যুদ্ধের অতিপ্রচলিত বর্ণনাসর্বস্ব এবং সামাজিক দু-একটা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে গৎবাঁধা কিছু বিষয়কেই বোঝান হয়; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত এবং জাতীয়তাবাদ যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ওপর নির্ভরশীল– সে-বিষয়ে প্রায় পুরো নাট্যকলা জগৎ-ই উদাসীন এবং অজ্ঞ। এই উদাসীনতা ও অজ্ঞতা আমাদের নাট্যকলার জগৎ-কে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীও করেছে। আরও ভয়াবহ ব্যাপার হল, মুখে রাজনৈতিক দাবি করলেও সাধারণ ও শ্রমিক-শ্রেণির পক্ষে অবস্থান নিতে বাংলাদেশের নাটক একেবারেই দ্বিধান্বিত ও অনাগ্রহী। এর একটা বড় কারণ, কর্পোরেট-অর্থের বদৌলতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নাট্য-জগৎ টিকে আছে; এই টিকে থাকার বিষয়টি সাধারণ ও শ্রমিক-শ্রেণির অর্থকড়ির বিনিময়ে ঘটছে না। আসলে সে-কারণেই এখানকার নাটকে প্রেম ও মানবীয় বিবিধ সম্পর্কগুলোকে রাজনীতি থেকে যেমন আলাদা করে দেখার প্রয়াস চালানো হয়েছে; একইভাবে রাজনীতি-কে সাধারণ ও শ্রমিক-শ্রেণির স্বার্থসংশ্লিষ্টতা থেকে দূরে রাখার কারসাজি করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের নাটকের প্রকৃত উন্নতি না-হলেও, নাট্যকলা জগতের অনেক কর্তা-ব্যক্তিরই আর্থিক উন্নতি 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ গড়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের নাটকের এক বিশেষ ভিত্তিভূমি। কিন্তু সেই ভিত্তিতে ইট-বালু-সিমেন্ট থাকলেও রড ছিল না; অর্থাৎ শ্রেণি-চেতনা ছিল না। ফলে শ্রেণিচেতনাহীন এমনকি সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধিতাহীন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ বিফল হতে বসেছে।

অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণির চেতনা ধারণ করতে চায় এমন রাজনৈতিক দলগুলোর মতো নাট্যসংগঠনগুলোর ইতিহাসও কেবল বিভক্তির ইতিহাস। সারাদেশের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'ও এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য দলগুলোর কর্মকাণ্ড এবং তাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্য, অধিকাংশ নাট্যকর্মীর কাছেই পরিষ্কার ছিল না।

বাংলাদেশে নাট্যমঞ্চ বেড়েছে, টেলিভিশন চ্যানেল বেড়েছে কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যব্যক্তিত্বের সংখ্যা হাতে-গোনা রয়ে গেছে। যাঁরা ছিলেন তাঁরাও একে একে চিরবিদায় নিচ্ছেন পৃথিবী থেকে; অথচ সেই খালিস্থান পূরণের জন্য দায়বদ্ধতার জায়গায় প্রতিশ্রুতিশীল নতুন নাট্য-ব্যক্তিত্ব আমরা পাচ্ছি না। ভবিষ্যৎ নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই শূন্যতা আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে– আজ সেটি এক বড় প্রশ্ন।

'বাংলাদেশের নাট্যকলা' একটি বিশাল জগৎ। সাধ্যে যতটা কুলিয়েছে তার প্রায় পুরোটা দিয়েই পাঠকের সামনে চলতি সংখ্যাটি তুলে ধরল 'হালখাতা'। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'থিয়েটার' এবং হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত 'থিয়েটারওয়ালা' পত্রিকা দুটি থেকে বেশ কিছু লেখা এ-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করা হল। পত্রিকা দুটিকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
১৫. ০৬. ২০১৩

সূচি

প্রবন্ধ

রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক

রাহমান চৌধুরী ০৭

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে রাজনীতি : একটি বিশ্লেষণ

তানভীর আহমেদ সিডনী ১৩

প্রবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও আমাদের নাটক

আবদুল্লাহ আল-মামুন ২৩

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক

আলী যাকের ২৬

স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা

শাহরিয়ার কবির ৩২

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা

আতাউর রহমান ৩৬

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-নাট্যের প্রাসঙ্গিকতা

বিপ্লব বালা ৪২

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও বাংলাদেশের থিয়েটার

অনন্ত হিরা ৫২

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে নাটক রচনা : ধারা ও বিবর্তন

আবদুল্লাহ আল-মামুন ৬৩

বাংলাদেশের নাটকের বিষয় : রূপ ও রূপান্তর

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন ৭৪

বাংলাদেশের নাটক : সমস্যা ও প্রবণতা

আলী আনোয়ার ৯১

প্রবন্ধ
দুই বাংলার প্রতিবাদী চেতনাসমৃদ্ধ নাটকের তুলনামূলক মূল্যায়ন
মো. জাকিরুল হক ১০৬

প্রবন্ধ
আমাদের লোকনাট্যের বর্তমান সংকট
কাজী সাইদ হোসেন দুলাল ১১৫
ঢাকা শহরে যাত্রাচর্চা
তপন বাগচী ১২১

প্রবন্ধ
মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা সম্পর্কে
রণেশ দাশ গুপ্ত ১২৯

আড্ডা
লিয়াকত আলী লাকী, তারিক আনাম খান, বিপ্লব বালা, মান্নান হীরা
সঞ্চালক : আজাদ আবুল কালাম ও হাসান শাহরিয়ার ১৩৪

প্রবন্ধ
সেলিম আল দীন-ডিসপ্লে ও একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সুখ-দুঃখ
মামুন হুসাইন ১৭২

মুখোমুখি
ঢাকার থিয়েটার : দর্শকের মুখোমুখি কলাকুশলীগণ
অনুলিখন : সাইফ সুমন ১৮৩

নিবন্ধ
বাংলাদেশের প্রথম সচল ‘স্টুডিও থিয়েটার’
বিপ্লব বালা ২২০

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত
মমতাজ উদ্দীন আহমদ ২২৮

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের নাটক : অন্তর্গত উপলব্ধি
অসীম সাহা ২৫৭

প্রবন্ধ
আজকের নাটক এবং দর্শক-সমস্যা
নূরুল করিম নাসিম ২৬২

প্রবন্ধ
বিষয় মুনীর চৌধুরী
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২৬৬

আড্ডা
কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক
সঞ্চালক: হাসান শাহরিয়ার **২৬৯**

প্রবন্ধ
সেলিম আল দীন চরিতমানস
বদরুজ্জামান আলমগীর ২৮৬

প্র ব ন্ধ

রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক

রা হ মা ন চৌ ধু রী

বিভিন্ন অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা বলতে যা বোঝায় তার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকের নাট্যচর্চার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনই এখানকার নাট্যরচনা ও প্রযোজনায় সচেতন রাজনৈতিক ধারার প্রবর্তন করেছে যদিও তা সকল দল বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটেনি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তা কখনই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি হয়ে উঠতে পারেনি। রাষ্ট্রের সাথে বিরোধের প্রশ্নে তা রাজনৈতিক এবং ক্ষোভ প্রকাশ বা প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণেই তা রাজনৈতিক। কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতি থেকে তা ছিল বহু দূরে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহল এই প্রচেষ্টা বা আন্দোলন কখনো স্থির থাকেনি। বারবার ধারা পাল্টেছে, বক্তব্য পাল্টেছে। অস্থিরভাবে দিকবিদিক ছোটাছুটি করেছে। নাটক শুরু হয়েছিল নিয়মিত প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পুরনো নাট্যরীতির বিরুদ্ধতা করে। পরে নাটককে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলেছে, আরো পরে তাকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছে। নাট্যচর্চা শেষপর্যন্ত এখানেও থেমে থাকেনি। শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে তারা নাটককে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষে গড়ে তুলতে চেয়েছে, পাশপাশি তারা শ্লোগান তুলেছে শেকড় সন্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাটককে করে তুলতে চেয়েছে পেশাদার; জীবন-জীবিকার উপায়।

বহু ধরনের শ্লোগান তুললেও প্রকৃত অর্থে নাট্যআন্দোলন কোথাও এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সব প্রচেষ্টা, সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। উদ্যোগ যেমন ছিল অনেক, ব্যর্থতাও তেমনি বিশাল। নাট্যআন্দোলনের ক্ষেত্রে এই যে বারবার উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হয়ে যাওয়া এর প্রধান কারণ হচ্ছে নাট্যকর্মীদের চিন্তার বিভ্রান্তি, আন্তরিকতার অভাব এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার হাতছানি। পুঁজিবাদী সমাজে সকলেই সচ্ছলভাবে, সুন্দরভাবে বাঁচার তাগিদে আত্মপ্রতিষ্ঠার

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বাংলাদেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যদলের মধ্যেও তা লক্ষ করা গেছে। নাট্যকর্মীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও নাট্যদলগুলোর পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা বারবার তাদেরকে দিকভ্রষ্ট করেছে। নিজেদের ঘোষিত লক্ষের পক্ষে কখনো তারা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন আবার শেকড়ের সন্ধান চলছে। শেকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে তারা প্রসেনিয়ামের বিরোধিতা করেছে প্রসেনিয়ামের মধ্যে আটকে থেকেই। এই ধরনের নানা স্ববিরোধিতার মধ্যেই বাংলাদেশের নাটক বেড়ে উঠেছে। স্ববিরোধিতার জন্যই কোনো একটি নাট্যধারাকেও তারা চূড়ান্ত সাফল্যের জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি।

নানা বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা কখনো শ্রেণীসংগ্রাম বা সমাজবদলের রাজনীতি হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রমিকশ্রেণীর সাথে কিংবা দেশের অধিকাংশ জনগণের সাথেও এ নাট্যচর্চার কোনো সম্পর্ক ছিল না। শ্রেণীসংগ্রামের নাট্যচর্চার প্রথম ধাপ এ্যাজিটপ্রপ, যা শ্রমিকদের-শোষিতদের মধ্যে জাগরণ তৈরির জন্য রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশে বিগত বিশ-ত্রিশ-চল্লিশের দশকে মঞ্চস্থ হতে দেখেছিলাম। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় তেমন কোনো এ্যাজিটপ্রপ ধারাও লক্ষ করা গেল না। বিভিন্ন দেশে এ্যাজিটপ্রপ ধারা সাধারণত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে মঞ্চস্থ হত। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের কোনো নাটকই আমরা শ্রমিক-কৃষকদের জন্য মঞ্চস্থ হতে দেখি না। শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে কোনো নাট্যআন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয় না। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো যেমন কোনো মার্কসবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, নাট্যকর্মীদের মধ্যেও তেমনি মার্কসবাদের বিশ্বাসকে লালন করতে দেখা যায় না। বিভিন্ন দলগুলোর দেয়া সমাজ পরিবর্তন বা শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগানগুলো ছিল শ্লোগান মাত্রই, কোনো নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যে বা দলের নাটক মঞ্চায়নে সে বিশ্বাসের ধারাবাহিক প্রতিফলন ঘটে না। বরং বহু ক্ষেত্রেই তাদের মঞ্চায়িত নাটকে মার্কসবাদ-বিরোধী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। স্তালিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র তিনটি ঝোঁকে বিভক্ত; সংস্কারবাদ, নৈরাজ্যবাদ এবং মার্কসবাদ। বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় সমাজতন্ত্র কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের নামে নৈরাজ্যবাদেরই দেখা মিলেছে। নাট্যদলগুলোর দেয়া দীর্ঘদিনের শ্রেণীসংগ্রামের ঘোষণা ছিল যে ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত তা বিভিন্ন দশকেই ধরা পড়তে থাকে। ঘটনাবলি প্রমাণ করে শ্রেণীসংগ্রামে মূলত তাদের বিশ্বাস ছিল না, বিশ্বাস ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারে। নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের লক্ষ্যেই তারা শ্রেণীসংগ্রামের মতো মতবাদটিকে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে ব্যবহার করেছিল। দরকারমতো আবার সে অবস্থান থেকে সরেও দাঁড়িয়েছিল।

বিভিন্ন নাট্যদলগুলো শ্রমিকশ্রেণীর কথা বললেও তারা শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়ায়নি বরং দাঁড়িয়েছে বিপরীত পক্ষে। বারবার তারা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সাথে, শোষকশ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়েছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো বক্তব্য ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা সবসময় প্রগতিশীল ধারার উন্মেষকে রোধ করার জন্য, পথভ্রষ্ট করার জন্য সব দেশেই তৎপর। বাংলাদেশে নাট্যআন্দোলনে যে-টুকু প্রগতিশীল কার্যক্রম লক্ষ করা গিয়েছিল, মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা উন্মেষের যে সম্ভাবনা ছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই তাকে পথভ্রষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দু-একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলকে নাটক মঞ্চায়ন করবার জন্য টাকা দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে, যা অন্য দলগুলোকে নাটকের খরচ জোগাড়ের জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে, বা তাদের অনুদানের প্রতি লালায়িত করে। দেশের নাট্যআন্দোলন তাই দেশের ব্যাপক জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শ্রমিক-কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বহুজাতিক এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা বিদেশি দাতা সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা আশা করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীরা আরো নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। সে ষড়যন্ত্র তারা চালিয়েছিল শুধু দেশীয়ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল বিশ্বজুড়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধে জাতীয় নাট্যঐতিহ্য লালন বা শেকড়ের সন্ধানে নাট্যদলগুলোকে প্ররোচিত করা। সভা-সেমিনারের নামে টাকাপয়সা দিয়ে, নাট্যব্যক্তিত্বদের বিদেশে যাবার সুযোগ করে দিয়ে নানাভাবে এই বক্তব্যকে তারা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়েছিল। নাট্যদলগুলোর কিছু কিছু সচেতনভাবে, অনেকে আবার না-বুঝেও সে ষড়যন্ত্রে পা দেয়। মধ্যবিত্তদের মানসিকতার মধ্যেই বাস করে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ, সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা খুব সহজে তাদের পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে পারে। প্রগতিশীল নাট্যকর্মীরাও মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও স্বচ্ছ মার্কসবাদী ধারণার অভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের সত্যিকার পরিচয় বুঝে উঠতে পারে না। নাটক সম্পর্কে নিজেদের স্বচ্ছ ধারণার অভাবে তারা প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর সাথে সুর মেলায়।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গা থেকে, মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে। শ্রমিকশ্রেণী বা বৃহত্তর শোষিতশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করে নয়। সুবিধাজনক পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। দরকারমতো তারা সরকার-বিরোধী কিংবা সরকার পক্ষ দুটি ভূমিকাই পালন করেছে। বিশেষ করে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত হাসিনা সরকারের আমলে তারা সরকার-বিরোধী কোনো ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করেনি। নাটকে সরকার-বিরোধী কোনো বক্তব্য রাখেনি। সরকারের সাথে নাট্যদলগুলো সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং মিলিতভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সরকারের সাথে এভাবে আপোষ করতে গিয়ে নাট্যআন্দোলনে যতটুকু প্রগতিশীলতার ধারা বজায় ছিল তা ফিকে হতে হতে অন্তঃসারশূন্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শোষণব্যবস্থায় মূল শত্রু কারা– নাট্যকর্মীরা তা আর চিহ্নিত করতে পারে না। রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার প্রধান একটি কাজ জনগণের

শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করা, বাংলাদেশের নাটক মূলগতভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। নাট্যকর্মীরা সমাজের ভিতরের শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁদের নিজেদের ভূমিকা কী হবে তা যেমন কখনো সুনির্দিষ্ট করতে পারেননি, তেমনি নাটকে শোষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন অর্থনৈতিক বন্ধনগুলো তারা পরিস্ফুট করেননি। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে নাটককে তাঁরা শেষপর্যন্ত শোষকশ্রেণীর লুণ্ঠন বজায় রাখবার হাতিয়ার করে তোলেন। আশির দশকে তাঁরা যে শ্লোগান তুলেছিলেন তার ঠিক বিপরীত অবস্থানই তাঁরা নেন। বিশেষ করে আশির দশকের শেষদিক থেকে লোকনাট্য চর্চার নামে নাট্য প্রযোজনায় নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। ভূমিকাতে আমরা তিন প্রকারের নাট্যচর্চার উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম। সে বিচারে দ্বিতীয় দলেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে স্থান দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নাট্যচর্চার নামে যে ধারা আরম্ভ হয়েছিল সেখানে তাহলে আমরা কী দেখতে পাই? গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শুরু থেকেই বিমূর্ত বা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার আবির্ভাব, নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে শ্রেণীচেতনার অভাব, গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চায় শ্রমিক-কৃষক তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অনুপস্থিতি, নাট্যকর্মীদের মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী অবস্থান ও সমগ্র আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরনের একটি নাট্যচর্চাকে কোনোভাবেই মার্কসীয় রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। পূর্বেই আমরা বলেছি সকল শিল্প-সাহিত্য বা নাটকই রাজনৈতিক। সে রকম মূল্যায়নে যারা মার্কসীয় রাজনীতি করেন না তারাও এক ধরনের রাজনীতিতে জড়িত। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের নাট্যদলগুলোর একটি রাজনৈতিক চরিত্র অবশ্যই আছে। সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সুবিধাবাদী রাজনীতি; যারা নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন রাজনীতিতে অংশ নেয় কিন্তু কোনো রাজনৈতিক আদর্শে অনড় থাকে না। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো বিভিন্ন সময় সুবিধাবাদী রাজনীতিরই লেজুড়বৃত্তি করেছে। বাংলাদেশে নাট্যআন্দোলন তাই ব্যাপকতা না পেলেও, সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছুতে না পারলেও প্রথম সারির নাট্যকর্মীরা পৃথিবীর দরিদ্রতম এই দেশে বাস করেও দামী গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছে। সরকারি শিল্পমাধ্যমগুলোতেও তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। ধনিকশ্রেণীর মতোই তাঁদের জীবনযাত্রার মান। নাট্য-আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও নিজেদেরকে তাঁরা ঠিকই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সারাদেশের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য দলগুলোর কাছে, অধিকাংশ নাট্যকর্মীর কাছেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্য পরিষ্কার ছিল না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি বরং ফেডারেশনের নেতৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থমতোই ফেডারেশনকে পরিচালিত করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার পক্ষে তারা কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি বা তা করার আগ্রহ দেখায়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়গানই শুধু গেয়েছিল তারা। আর এ ধরনের গণতন্ত্রের মতবাদ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের, সুবিধাভোগীদের মতবাদ। নাট্যকর্মীদের চিন্তা ছিল সেই সুবিধাভোগীদের মতবাদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের রাজনীতিও ছিল তাই সমাজতন্ত্র বা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণীসংগ্রামের কথা মুখে বলা হলেও সকলেই আসলে সংসদীয় রাজনীতির চারিদিকেই ঘুরপাক খেয়েছে। নানা উপায়ে তারা জনসাধারণকে শুধু নিজেদের সংসদীয় রাজনীতির স্বার্থের অনুকূলে সামিল করতে চেয়েছে।

মধ্যবিত্তরা এ ধরনের একটি নাট্যআন্দোলনে যতখানি প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশে নাট্যকর্মীরা তা-ও পারেননি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তদের দ্বারাই ব্যাপক রাজনৈতিক নাট্যআন্দোলনের সূচনা হয়, সে নাট্যআন্দোলন গড়ে উঠেছিল শ্রমিক-কৃষকদের নিয়েই। পশ্চিমবঙ্গের সে নাট্যআন্দোলন শুরুতে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সাথে এখানেই পার্থক্য আমাদের গ্রুপ থিয়েটারগুলোর। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারগুলোর অনেকেই সরাসরি মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী আবার কেউ কেউ আছেন যারা মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হলেও বিশ্লেষণাত্মক নাটক মঞ্চায়নে আগ্রহী। কিছু গ্রুপ থিয়েটার আছে যারা উগ্র রাজনীতি প্রচারে বিশ্বাসী, যাদের কাছে নাটক আর শ্লোগানে পার্থক্য নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য ধারাটি প্রধানত কাজ করেছে শ্রমিকশ্রেণীর একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় বারবার শ্রেণীসংগ্রামের শ্লোগান দেয়া সত্ত্বেও সেই ধারাটি দেখতে পাই না। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাট্যআন্দোলনের একটি অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল, স্বাধীনতার পূর্বে তা-ও দেখা যায়নি বাস্তব কারণেই। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সেই রাজনৈতিক নাট্যচর্চার অঙ্কুরটি আর বেড়ে উঠতে পারল না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, এ আন্দোলন এরকম হতে বাধ্য ছিল; কারণ এ আন্দোলন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত যুবসমাজের গড়ে তোলা আন্দোলন। এই মানুষগুলো যে সামাজিক ব্যবস্থা থেকে এসেছে, তাদের মানসিকতাও সেরকম হয়েছে। এই মানসিকতার দ্বারা তারা এমন নাট্যআন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না যা মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতাকে পার হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে সকলেই যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আটকে থাকতে চেয়েছেন তা নয়। বহুজনেই নাটককে মধ্যবিত্তের বৃত্ত ভেঙে গণমানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে সময় প্রমাণ করেছে কেউ বৃত্ত অতিক্রম করতে পারেননি। ব্যষ্টিক পর্যায়ে কোনো নাট্যকার বা নাট্যদল কখনও কখনও সে বৃত্ত অতিক্রম করলেও সামগ্রিক নাট্যচর্চা সেই বৃত্তকে অতিক্রম করতে পারেনি। রাজধানী ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরে এবং বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে কিংবা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও

নাটক গিয়েছে কিন্তু মৌল বাস্তবতার কোনো হেরফের হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তরা যা পেরেছিল বাংলাদেশ তা পারেনি শুধুমাত্র স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় মার্কসবাদী চিন্তার অভাবে। মূল কথা হল, নাট্যকর্মীদের শ্রেণীচরিত্র ও সমাজবিজ্ঞান-চেতনার অভাব থেকেই এসব হয়েছে। নাট্যকর্মীরা যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে বড় হয়েছেন, তার থেকে মুক্ত না হয়ে তাদের পক্ষে কোনো সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি করা সম্ভব ছিল না। মার্কসবাদী চিন্তাই মধ্যবিত্তের নানা দুর্বলতা, নানা ক্ষোভ-আক্ষেপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী চিন্তার অভাবেই বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে তা ঘটেনি। মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে তারা নাটককে মধ্যবিত্ত সীমানার ভিতরেই আটকে রাখলেন। মধ্যবিত্ত মন-মানসিকতা যদি সামনে আগোতে না পারে তাহলে সে শুধু পিছিয়েই পড়ে। বাংলাদেশের নাটক তাই সামনে আগাতে পারল না বলেই পিছিয়ে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সাথে মিশে গেল। সত্তরের দশকে যেখানে প্রেমসর্বস্ব নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল, দু দশকের মাথায় নাটক আবার সেখানেই ফিরে গেল এবং অবশেষে মুখ থুবড়ে পড়ল। বহুল আলোচিত ও উচ্চকিত বাংলাদেশের নাটক বা নাট্য-আন্দোলনের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি এমন এক চেহারা নিয়েছে যে, একবাক্যে বলা সম্ভব পুরো উদ্যোগটিই মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এই বৃত্তেই পুরো নাট্য কর্মকাণ্ড'র শেষ পরিচয় যা দাঁড়াল তা হচ্ছে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধুরাম সর্দার।

উৎস : বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক' গ্রন্থ।

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব , নাট্য-গবেষক। পেশা: ফ্রিল্যান্সার ।]

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে রাজনীতি : একটি বিশ্লেষণ

তা ন ভী র আ হ মে দ সি ড নী

বাঙালির দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি। ভৌগোলিক এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বেও নয় মাস ব্যাপী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে বাঙালি। একই সঙ্গে দেখা গেছে একটি পরাক্রমশালী সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। প্রশিক্ষণের বিবেচনায় সবলের বিপক্ষে দুর্বলের লড়াই। এই প্রসঙ্গে লিখে রাখা যায়, বাঙালির হাতে স্বল্প অস্ত্র ছিল। অনেকক্ষেত্রে তারা শত্রুর অস্ত্র কেড়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছিল প্রবল। এই প্রবলের শক্তিতেই মুক্তিযোদ্ধারা দাঁড়িয়েছে, লড়াই করেছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালির দৃশ্যমান সম্পদ তথা স্থাপনা, অর্থ ইত্যাদি বিনষ্ট করেছে। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষতিসাধনের মানসে বাঙালির চিন্তনের একটা বড় অংশকে হত্যা করেছে। ফলে ধ্বংসস্তূপের মাঝে নতুন দেশটির যাত্রা শুরু ; সন্দেহ ছাড়াই লেখা যায়, শূন্য হাতে নতুন স্বপ্ন বপনের পথগামী বাঙালি। শিল্প-সাহিত্য বিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্মুখে রেখে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হবে এই নিবন্ধে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিষয় ও আঙ্গিক বিবেচনায় নাটক বাঙালির ঐতিহ্য -অন্বিষ্ট চিন্তা বহন করেছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শিল্পচিন্তার বিপ্রতীপে স্বাধীন দেশে স্বতন্ত্র পরিচয়ে নাট্য দাঁড়িয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প সহ নানা আঙ্গিকের বিচারে নাট্য পাণ্ডুলিপি ও এর প্রয়োগ বাঙালিকে আত্মপরিচয়-সন্ধানী করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে রাজনীতি ও সমাজভাবনা উপস্থাপনের ধারণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন দেশের নাটকসমূহকে বিবেচনায় রাখা যায়। এক্ষেত্রে প্রধান কয়েকজন নাট্যকারের কয়েকটি নাটক আলোচ্যসূচিতে থাকবে, একই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবেচনায় নাটকসমূহের সাধারণ প্রবণতা নিয়েও আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশের নাটকের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে মমতাজ উদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক ছত্রিশজন

নাট্যকারের ঊনপঞ্চাশটি নাটকের সন্ধান পেয়েছি। এসব নাটক বাহাত্তর, তেহাত্তরে রচিত।"

[সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*] ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সঙ্গে বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অন্বয় ছিল। বাংলাদেশের এ সময়ের নাট্যচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত যুদ্ধফেরত একদল মুক্তিযোদ্ধা যারা লড়াইয়ের ভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছে মঞ্চকে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাংলাদেশের মঞ্চে উদ্ভাসিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতিসমূহ। আর্ন্তজাতিক রাজনীতির হিসাব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব রেখেছে। বাজার অর্থনীতির দেশসমূহ পাকিস্তানের পাশে, অন্যপক্ষে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বড় অংশ বাংলাদেশের পক্ষে। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধার লড়াই শুধুমাত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়। একই সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির বিবেচনায় মার্কিন-চীন ব্লকের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইয়ে মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে ছিল ভারত, রাশিয়া, ইরাক সহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রাম, এই লড়াই সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা আর কাউকে পাশে নেয়নি। মস্কোপন্থী, বামপন্থী, চীনপন্থী স্বল্পসংখ্যক বামপন্থী মূলধারা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে যুদ্ধে ছিল। এদের একটা বড় অংশ ২নং সেক্টরে খালেদ মোশারফের অধীনে লড়াই করেছে। ৭০-এর নির্বাচনে বামপন্থী রাজনীতিবিদদের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকার জন্য আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। দেশ স্বাধীনের লড়াইয়ে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ যুক্ত থাকলেও রাজনীতির হিসাব-নিকেশে সর্বদলীয় লড়াইয়ে পরিণত হয়নি মুক্তিযুদ্ধ। হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি মুক্তিসংগ্রামের বিপক্ষে নেমেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে। মুজিব-বিরোধিতার প্রশ্নে তাদের এমন অবস্থান ছিল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছিলেন, এই প্রথম নিজেকে স্বাধীন মনে করছেন। অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার সময় নিজেকে স্বাধীন মনে করছেন না। এই অতিবাম রাজনৈতিক নেতা দেশে সামরিক শাসন আগমনের মধ্য দিয়ে মুক্তি সন্ধান করেছেন। যা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের চিহ্ন ধারণ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক দলসমূহ পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে লড়াই করেছে। এমনি এক রাজনৈতিক বাস্তবতায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধের এই দলগত সংকট স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রবলরূপে ছিল। যার প্রভাব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট। স্বাধীনতার পর পরই মওলানা ভাসানী নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ করতে চান। যেখানে আঘাত করা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। এ বিষয়ে মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় রচনা করেন,

> : ভাসানী ওসময় 'হক কথা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। যার প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকত আওয়ামী-বিরোধিতা এবং রুশ-ভারত

সম্পর্কে বিষোদগারমূলক লেখা। এছাড়াও এক পর্যায়ে ভাসানী এ মর্মে ঘোষণাও দিয়ে বসেন যে, "যারা মুসলিম বাংলার জন্য কাজ করছে তাদের আমি দোয়া করি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।" [*বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*]

পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক দল ক্ষমতাবান হতে থাকে ৭৫-পরবর্তীকালের সামরিক শাসকদের হাতে। এ সময়ের শাসকেরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ কষে নতুন হিসাব তৈরি করেন। তারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতার সূত্রে পাকিস্তানপন্থিদের নিকটবর্তী করার প্রয়াস নেন। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদের ভাষ্য– "১৯৭৬ সালের মধ্যে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা, ৮ জন বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ১৮ জন শিল্পপতি ও ৩১ জন দলছুট রাজনীতিবিদ। এই ৩১ জনের মধ্যে ১৯ জনই ছিলেন বাংলাদেশ-বিরোধী।" [মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*] মুজিবহত্যার পর আইন সংশোধন করে পাকিস্তানি দালালদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা মূলনীতি থেকে অপসারিত হয়। ফলে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পথে হাঁটতে থাকেন সে সময়ের সামরিক শাসক। তাঁর পাকিস্তানপন্থি রাজনীতির চিহ্ন হল পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক নেতা গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে আনা। পরবর্তী সামরিক শাসকও এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নেতার পথ অনুসরণ করেন। ফলে পাকিস্তানবাদী চিন্তনের প্রসার ঘটে।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দেশ স্বাধীনের সশস্ত্র লড়াইয়ের কালে উপ্ত সংকট পরবর্তীকালেও বহমান ছিল। সেই সংকটের সুযোগে এদেশে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমান্বয়ে ভুলুণ্ঠিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ব্যতিরেকে ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস নেয়। যার ফলে জনশক্তি রপ্তানির একটা বড় কেন্দ্র হয় বাংলাদেশ। একই সঙ্গে সমবায়, ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প এবং আত্মনির্ভর হতে সাধারণ জনগণ প্রয়াস নেয়। এখানে রাষ্ট্র কোথাও কোথাও স্বল্প সহায়তা প্রদান করে। তৃণমূল পর্যায়ে এই উন্নয়ন সাধিত হলেও গণতন্ত্র সোনার হরিণ হয়ে যায়। গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যকর সংসদ, সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক রীতি ও চেতনার অনুসরণ- এ সবই দূরে অবস্থান করে। এই সংকটের মুখেও দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখে কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সর্বস্তরের শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিক। ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষক ঋণের টাকা লোপাট করে দেয় না।

উল্লিখিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলা বাংলাদেশের নাট্যচর্চা প্রবহমান। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ধারা অনুসন্ধানে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) নাট্যচর্চা পর্যবেক্ষণ করা যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পর ইসলামি জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারের মানসে নাটক রচিত হতে থাকে। এ সময়ের বেশির ভাগ নাট্যকার ধর্মীয় কারণে ভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়েছেন। তাঁদের প্রচারণার কেন্দ্রে ছিল মুসলমানদের রাষ্ট্র ও বিশ্বমুসলিমের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নতুন চিন্তন তৈরি করে। এই সময় নাট্যধারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগে পাকিস্তানের আদর্শবাদী নাট্যকার যারা মুসলিম জাতীয়তায় নাট্যরচনা করেন। অন্যপক্ষে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নাট্যকার। যারা শোষণ-নিপীড়ন ও রাষ্ট্রক্ষমতায় নির্যাতনকে উপজীব্য করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটান পূর্ববর্তী দ্রোহের ঘটনাকে অবলম্বন করে। তারা আঙ্গিক বিবেচনায় পাশ্চাত্য নাট্যধারার সংযোগ ঘটান। রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেন এ সময়ের নাট্যকাররা। স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে এর প্রভাব নাট্যপাণ্ডুলিপিতে লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মঞ্চস্থ নাটকসমূহে স্বাধীনতার বাসনা প্রবল হয়। একই সঙ্গে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। যুদ্ধ চলাকালে নয় নং সেক্টরে নাটক মঞ্চায়িত হয়। এর মূল অভিপ্রায় সম্মুখসমরে লড়াইয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা।

দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশে মঞ্চায়িত নাটকের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। এখানে দার্শনিক বিশ্লেষণ নয়, আবেগের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। এই নাটকসমূহ কালের অতলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। স্বাধীনতার পর পরই মমতাজউদ্দীন আহমদ রচনা করেন ‘বর্ণচোরা’। তাঁর এই নাটকে স্বাধীনতাবিরোধীদের চিন্তন লভ্য। যেখানে রাজাকার গোলাম সাদেক খান বলেন, “কাউকে বাঁচতে দিও না যদি কায়েদে আজমের এই পাকভূমি পাকিস্তানকে বাঁচাতে চাও।” বাঙালিদের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী রাজাকার-আলবদর আলশামসদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর পরই দৃঢ় চেতনা জেগে ছিল। এ সময়ের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘাতক-দালালদের বিষয়ে স্পষ্টই বলেছিলেন, “যারা গণহত্যা করেছে তাদের এর পরিণতি থেকে রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এবং বিশ্বসমাজ আমাকে ক্ষমা করবে না।” [দৈনিক বাংলা, ৩০ এপ্রিল, ১৯৭২] অর্থাৎ একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় চেতনা জেগে ছিল। সেই চেতনায় শংকিত বর্ণচোরা নাটকের স্বাধীনতাবিরোধী। তাইতো সে বলে, “আমি আর বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমি পোশাক খুলে বদলে ফেলছি। বাঙালি পোশাক পরব। আমাকে শেষবারের মতো আর একবার ক্ষমা করে দে।” পরবর্তীকালে রাজনৈতিক হিসাব-নিকেশে স্বাধীনতাবিরোধীরা শক্তিশালী হয়। আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত ‘দ্যাশের মানুষ’ নাটকটি এর চিহ্ন বহন করে। এই নাটকে স্বাধীনতাবিরোধী আর কে মুক্তিযোদ্ধা-মন্ত্রীর চেয়েও ক্ষমতাবান। উল্লেখ্য স্বাধীন দেশে রাজাকারদের গাড়িতে

জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও এর বিরোধিতাকারী শক্তি সম্পর্কে নাট্যকাররা সচেতন ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকের প্রবণতা নিম্নরূপ :

ক) পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র। এ ধারার নাটকসমূহের মাঝে রয়েছে– 'নিঃশব্দ যাত্রা', 'নরকে লাল গোলাপ', 'কী চাহ শঙ্খচিল' ইত্যাদি।

খ) বীরাঙ্গনাদের ভাষ্য নিয়ে রচিত হয়েছে নাটক। উদাহরণত 'যে অরণ্যে আলো নেই'।

গ) স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রকাশ। এ ধারার নাটক 'ফেরী আসছে'।

ঘ) স্বাধীন রাষ্ট্রে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে পর্যুদস্ত মুক্তিযোদ্ধার যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'কিংশুক যে মরুতে', 'হে জনতা আর একবার' ইত্যাদি এ ধারার নাটক।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকজন নাট্যকারের উল্লেখযোগ্য নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নাটকের প্রবণতা অনুসন্ধান করা যায়। মমতাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ, পুরাণ ও রাজনৈতিক সংকটকে সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত 'রাজ অনুস্বারের পালা' একটি রূপকাশ্রয়ী নাটক। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শংকিত রাজা ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে এক রেখায় স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যার মধ্য দিয়ে গণমুখী রাজনীতির বিনষ্টি ঘটান হয়। নাটকে জনবিচ্ছিন্ন রাজার পাশে ক্ষমতালোভী স্বজন আর নির্বোধ মন্ত্রী। কিন্তু নাটকটির অসামান্য শক্তি মিলে পাদটীকা চরিত্রে। পাদটীকা যেন সরকারের বিশেষ প্রশাসনযন্ত্র, যে রাজাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার প্রয়োজনে হত্যা করে, বন্দি করে। বাংলাদেশে গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়ে সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টি সকলের জ্ঞাত। পরবর্তীকালে নির্বাচিত সরকারসমূহের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে গোয়েন্দা সংস্থা বিরোধীদলের ওপর দমনপীড়নে ব্যবহৃত হয়। পাদটীকা চরিত্রের ব্যবহারে নাট্যকার সচেতন ছিলেন, এর মাধ্যমে রাজনীতিতে গোয়েন্দা সংস্থার ব্যবহারের বিষয়টিকে সংযুক্ত করেছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর নাটকে রাজনীতি ও সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর কাব্যনাটকসমূহ বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজকে উপস্থাপন করে। তিনি সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধ, দ্রোহ ও রাজনীতির সংকটকে নাট্যবিষয়রূপে উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও তিনি রাজনীতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। উত্তরাঞ্চলের কৃষকবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন 'নূরলদীনের সারাজীবন'।

নাট্যকার জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিষয় হিসেবে এনেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এক কৃষক জাগিয়ে তুলেছিলেন সাধারণ মানুষকে। অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আপস কোনো সমাধান আনবে না। নূরুলদীন সেই রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেয়। উল্লেখ্য, নাটক রচনাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের অধীন ছিল। ফলে নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিল সাধারণের মননে নতুন চেতনা জাগিয়ে তোলা। যেখানে তার সংগ্রামী ঐতিহ্য জেগে থাকে। নাটকে মৃত নূরুলদীন রক্তাক্ত চাদর গায়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। মৃতকে মর্তলোকে শরীরীভাবনায় ফিরিয়ে আনা নয়, দার্শনিক চিন্তনের প্রেক্ষিতে ফিরে আসেন নূরুলদীন। যা পাঠক-দর্শককে অন্বিষ্ট করে দ্রোহের চিন্তনের সঙ্গে। নাট্যকারের মূল অভিপ্রায় বাঙালির প্রতিবাদী চিন্তনকে বহন করা। যার ফলে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোচনের সম্ভাবনা পাওয়া যাবে। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *ঈর্ষা*, *গণনায়ক*, *নারীগণ*, *উত্তর বংশ*, *এখানে এখন* প্রভৃতি নাটকে বাংলাদেশ ও তার রাজনীতিকে পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ, মানবিক সম্পর্ক, রাজনীতি, পরাধীন দেশে শাসকদের নারীদের বিপর্যয় ইত্যাদিকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' নাটকটিতে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিনষ্টি ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান অনুপুঙ্খ চিত্রিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাকে কেন্দ্র করে শেখ আকরাম আলী রচনা করেন 'লাশ ৭৪'। অর্থ ও বিত্তের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুত্ব করে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ পণ্যে পরিণত হয়, দেশ ও জাতি বিষয়ে ভাবনার চেয়ে ব্যক্তিগত লাভই প্রাধান্য পায়। যে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে পরিচয় হয় তাতে স্বাধীন দেশের বিনষ্টি দেখেন তিনি। ফলে শোক ও ক্রোধ জাগে তাঁর মননে। পণ্যে পরিণত হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবহৃত হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। সেই সঙ্গে থাকে রাজাকারের সঙ্গে আত্মীয়তা। যার বিষময় ফল ফলতে দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি নাট্যশিল্পের প্রতিটি মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিশীলতার চিহ্ন রেখেছেন। তাঁর নাট্যভাবনা অনুসন্ধানের নিমিত্ত 'এখনও ক্রীতদাস' নাটকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। নাটকে বাক্কা মিয়ার সংলাপ থেকেই অনুধাবন করা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নয় এর সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। দেশ স্বাধীনের পর পরই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিনষ্টি হতে থাকে। যার ফলে ক্ষরণ হয় সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার। বাক্কা মিয়া সেই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি যে মানবেতর জীবন-যাপন করলেও দ্রোহের চিন্তন বহন করে। শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণকে জাগিয়ে তুলতে চায়, এটাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার স্থান। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুধুমাত্র ভৌগোলিক মুক্তি কিংবা একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এর গভীরে প্রোথিত রয়েছে সাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি। বাক্কা মিয়া তাই একাত্তরের

মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে পরবর্তী লড়াই-সংগ্রামকে অন্বিষ্ট করেন। তাঁর সংলাপে পাওয়া যায়– "বারে বারে কি আমিই গুলিখামুরে? একবার ঠ্যাং-এ, একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে?" সমাজবাস্তবতার সঙ্গে অন্বয় তৈরি করেন নাট্যকার। এখানে রাষ্ট্র শোষকের সুহৃদ, শোষিতকে দূরে ফেলে দেয়। এর বিপ্রতীপে শোষিতের প্রতিবাদ সুপরিকল্পিত কিংবা যূথবদ্ধ নয় বরং বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত। শোষিতের প্রতিবাদকে উপস্থাপন করতে যেয়ে নাট্যকার বাক্কা মিয়ার মৃত্যুকেই সম্মুখে নিয়ে আসেন। একে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়–

প্রথমত : প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্রশক্তি ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণের দ্রোহ।

দ্বিতীয়ত : মৃত্যু জেনেও বাক্কা মিয়ারা প্রতিবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হন না।

আবদুল্লাহ আল-মামুন সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যকে তাঁর নাটকে উপজীব্য করেননি। বরং সমাজবাস্তবতার আলোকে পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। তিনি যে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্র রূপায়ণ করেন তাতে ক্ষমতা পরিবর্তন নয় মানসিকতার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেন। এই পরিবর্তন যদিও রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর নাটকের সমাজ বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের রূপ। তাঁর নাটকের সংলাপ পাঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লভ্য। এই চেতনায় জেগে থাকবার আহ্বান জানান, "রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। এই ফাঁকটা লুফে নিচ্ছে স্বাধীনতার শত্রুরা, অদৃশ্য শক্তি যাদেরকে পুনর্বাসিত করছে একের পর এক। এই নতুন চক্রান্তকে অঙ্কুরেই বিনাশ করুন।" ফলে এ কথা নিশ্চিতরূপেই উল্লেখ করা যায়, তিনি সমাজের অভ্যন্তরে রাজনীতিকে উপজীব্য করেছেন। যা তৎকালীন বাংলাদেশের নাটকের ধারা।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম মামুনুর রশীদ। তাঁর মতে নাটক শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার। তাঁর নাটকে ব্যক্তির প্রতিবাদ একটি গণ্ডিতে আবদ্ধ দ্রোহ নয়, সমষ্টিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংগ্রাম। তাঁর নাটকের ঘটনা আর কোনো বিশেষ ঘটনা থাকে না, একটি জাতিগোষ্ঠীর জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে অন্বিষ্ট সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসচেতনতা সৃজন তাঁর নাট্যরচনার অভিপ্রায়। 'ওরা কদম আলী' নাটকে নাগরিক নিম্নবিত্তের গল্পকথন লক্ষ করা যায়। এখানে সর্বহারা শ্রেণির মানুষের জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। শ্রমই তাঁদের একমাত্র সম্পদ, বেঁচে থাকার পথ। রাবেয়ার ইজ্জত বাঁচানোর কৌশল আর বোবা কদমের আশ্রয়ে তাজুর থাকা সবই যেন শ্রমজীবী সর্বহারার ঐক্য সৃজনের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে। তিনি নাটককে শিল্পের জন্য শিল্প হিসেবে বিবেচনা করেননি। মানুষের জন্য শিল্পনির্মিতির ভাবনায় গণমানুষের সংগ্রামকে উপজীব্য করে নাটক রচনা করেছেন।

ব্রিটিশ আদলে গঠিত বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রকে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'গিনিপিগ' নাটকে। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি যে আমলাতন্ত্র তৈরি করেছেন সেই আমলাতন্ত্রের কাঁধে চেপেই স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। ফলে

আমলাতন্ত্রের ক্রিয়া বা মননে জাতীয়তাবাদী চিন্তনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। উল্লেখ্য সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতাহীন হয়। একই সময়ে আমলাতন্ত্র শক্তিশালী হয়। আমলারা নিজেদের জনগণের সেবক নয় শাসক হিসেবে ভাবেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে নাট্যকার বিচ্যুত হন না। তাই আমলাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই আমলা যুদ্ধের পুরোটা সময় পাকিস্তানে অবস্থান করে। সে জানিয়ে দেয় তখন তাঁর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। আমলাতন্ত্রে প্রোথিত পাকিস্তানতন্ত্রের ভূত পাওয়া গেল। একে তুষ্ট করার জন্য ব্যবসায়ী পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। ঔপনিবেশিক আমলের শাসককে সম্মুখবর্তী করার প্রয়াস নেয় ব্যবসায়ী। এতসবের মুখ্য উদ্দেশ্য শোষকের জয়। গণশক্তির কাছে পরাভূত হয় শাসক-শোষক। শ্রেণিভাবনা যেহেতু তার মননে বসবাস করে তাই শ্রেণিসংগ্রাম ও সর্বহারা শ্রেণির জয়কে তিনি নাটকে উপজীব্য করতে চেয়েছেন। শ্রমজীবী ও কৃষকের ঐক্য তৈরি করতে চান। এই ঐক্যের জোয়ারে ভেসে যাবে শোষকের তখ্‌ত। তিনি জানেন সর্বহারা শ্রেণির জয় ছাড়া মুক্তি আসবে না। সম্ভবত এ জন্যেই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতকে জাগিয়ে তুলতে চান। অর্জিত হবে বাঙালির বিজয়, মুক্ত চেতনায় তিনি নবতর কালের চিহ্ন বহন করেন। সে কালে শোষকের কৃপাণে ক্ষতাক্ত হবে না শোষিত। তিনি উদ্দেশ্যের বৃত্তে বন্দি হয়ে যান। এই বৃত্তে অবস্থানের কারণে ঘটনা-পরম্পরায় নয়, রচয়িতার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে শোষিত জয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।

আবদুল্লাহ-আল মামুন সামাজিক সঙ্কটকে রাজনীতিমুখি করেন। তাঁর নাটকে রাজনৈতিক স্লোগান নেই, এমনকি শ্রেণিবিভাজন চিত্রায়নেও তিনি সচেতনতার পরিচয় দেননি। বরং শ্রেণিবিভাজনের হিসাবকে তিনি ভেঙেছেন। অন্যপক্ষে মামুনুর রশীদ নাটককে রাজনৈতিক প্রচারপত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর নাটকে সমাজ-সংস্কৃতি রাজনীতির মোড়কে উপস্থাপিত হয়। তিনি একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রচারকের ভূমিকা পালন করেন।

সেলিম আল দীন পূর্ববর্তী নাট্যকারদের তুলনায় অনুজ। তাঁর নাটকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই। তবে কাহিনীতে না থাকলেও এর অন্তঃস্রোতে রাজনীতি প্রবাহিত। এই অন্তঃপ্রবাহের গুণে তাঁর নাটকের রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ পায় না। অথচ রাষ্ট্র ও সমাজ তাঁর নাট্যভাবনায় প্রবাহিত। এই রাষ্ট্র রাজনীতিহীন নয়, একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছেন। সেলিম আল দীনের প্রথম পর্বের নাটকে রাজনীতি প্রবল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা প্রচ্ছন্ন হয়। 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' নাটকে পুঁজিবাদের ক্ষত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রের ভঙ্গুর অর্থনীতি চিত্রায়িত হয়েছে। পাঠককে মনে করিয়ে দেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে গণহত্যা চালাচ্ছে। গণমানুষের উপর মার্কিনিদের এই বোমাবর্ষণে বিশ্বরাজনীতিতে পুঁজিবাদী শোষকের

প্রবণতা মিলে। স্মতর্ব্য সেলিম আল দীনের ভাবনায় আর্থ-সামাজিক দার্শনিক কাঠামো থেকে দূরবর্তী দ্বীপ- রাজনীতি নয়। তিনি মনে করেন রাজনীতি সমাজবাস্তবতা থেকে দূরবর্তী নয়, তাই রাজনীতি-সচেতন হলেও রাজনীতিকে উপজীব্য করেই নাটক রচনা করেননি। ১৯৭৩ সালে তিনি রচনা করেন 'সর্প বিষয়ক গল্প', বাংলাদেশের ইতিহাসে সংগঠিত সবচেয়ে ট্রাজিক রাজনৈতিক হত্যার ছায়া। ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রায় ২ বছর আগে এই হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী এদেশের মানুষের চিন্তনকে তুলে আনেন। নেতার হত্যার পর সংলাপ, "লোকটা যখন মিছিলে যেত– পেছনে হাজার হাজার লোক অথচ জানাজায় তো ছ'জনের বেশি যায়নি"। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো তিনি বর্ণনা করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা-পরবর্তী দৃশ্য। এখানে রাজনীতির প্রবল প্রভাব থাকলেও পরবর্তী নাটকসমূহ রাজনৈতিক প্রচারসর্বস্ব নয়। তবে প্রতিটি নাটকেই বাংলাদেশের রাজনীতির চিত্র দেখা যায়। সেলিম আল দীনের 'শকুন্তলা' নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংগ্রাম মিথের অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। 'কেরামতমঙ্গল' নাটকে দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ, গণমানুষের সংগ্রাম ও ভ্রূণখসা একই রেখায় দাঁড়ায়। কলাকৈবল্যবাদ নয়, গণসংগ্রামের চেতনায় স্নাত হয় তাঁর নাটক। তাঁর 'চাকা', 'হরগজ', 'যৈবতী কন্যার মন' ইত্যাদি নাটকে তিনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেশজ নাট্যরীতি সন্ধান করেছেন অনুরূপ রাজনৈতিক ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'চাকা' নাটকে গণআন্দোলনে শহিদের অনামা মৃতদেহের পথচলা। অন্যদিকে 'হরগজ' নাটকের উপজীব্য টর্নেডো হলেও রাষ্ট্র পরিবেশ বিপর্যয়ে কতটা অসহায় ও অগোছালো থাকে তার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তন সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ নব্য নৃগোষ্ঠী নাট্যসমূহ। পার্বত্য অঞ্চল নেত্রকোণা, রাজশাহী ও দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উন্মূল করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এই জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামকে বিষয় বিবেচনা করেন। ফলে তাঁর রচিত 'একটি মারমা রূপকথা' বাঙালির সঙ্গে মারমা জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কের সেতু। একই রূপ পাওয়া যায় 'বনপাংশুল' নাটকে। এখানে শুধুই আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম নয় একই সঙ্গে দুর্নীতি, জাতিগত বিবেচনায় নির্যাতন ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। 'নিমজ্জন' বিশ্বগণহত্যার দলিল। সারা পৃথিবীতে সংগঠিত গণহত্যার নির্বাচিত অংশকে নাটকের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন তিনি।

এই ধারার পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকাররাও পূর্বজদের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁরা স্বৈরতন্ত্রের বিপ্রতীপে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে বাংলা নাটকের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। মান্নান হীরা, মাসুম রেজা, আবদুল্লাহ হেল মাহমুদ, সুলতান মোহাম্মদ রাজ্জাক, অলোক বসু, শুভাশিস সিনহা প্রমুখ নাট্যকার বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ঐতিহ্য ও দ্রোহের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। উত্তরকালে তাদের নাট্যবিষয় ও কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায় নাট্যসাহিত্যের আলোকে রাজনীতি বিশ্লেষণ। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যআন্দোলনের উল্লেখ করা যায় যা নাট্যসাহিত্যে প্রভাব রেখেছে।

'পথনাটক আন্দোলন' নামে বাংলাদেশে যে আন্দোলনটি গড়ে উঠেছে তাতে রাজনৈতিক সংগ্রামের নাটকই উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত পথের মানুষকে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাড়িত করাই এই আন্দোলনের মূল অভিপ্রায়। পথনাটকসমূহে স্বৈরাচার, জোতদার ও ধর্মীয় নিপীড়ন ইত্যাদিকে উপজীব্য করা হয়েছে। পথনাটকে শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টিও প্রবলরূপে লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নাট্যকাররা পথনাটক রচনা করেছেন। একই সঙ্গে একদল তরুণ নাট্যকারকে এ ধারার নাটক রচনা ও নির্দেশনায় অংশ নিতে দেখা যায়। পথনাটকসমূহের স্লোগানসর্বস্বতা নিয়ে সমালোচনা থাকার পরও দর্শকসমাজের কাছে এর একটা আবেদন রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের নাট্যপাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হলেও পথনাটকসমূহের পাণ্ডুলিপি উল্লেখযোগ্য হারে প্রকাশিত হয়নি। পথনাটক চর্চারত নাট্যদলসমূহের ফেডারেশন এমনি একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার ফল পাওয়া যায়নি।

'গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন' নামে যে আন্দোলনটি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল, সেটি বর্তমানে ক্ষীয়মাণ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বেশ কয়েকজন নাট্যকার তৈরি করেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ দেশজ চেতনার বিকাশ ঘটে। এর সঙ্গে সরাসরি রাজনীতির সম্পর্ক নেই। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, যা আসলে জাতীয় শিল্পআঙ্গিক নির্মিতির পথ তৈরি করবে। গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন নিয়ে নানা সমালোচনা থাকলেও বাংলা নাটকের আঙ্গিক ও দেশজ বিষয় নির্বাচনের বিচারে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এই আন্দোলনকে পুনর্বার শক্তিশালী করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাটক বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ফললাভ করবে নিঃসন্দেহে।

আরণ্যক পরিচালিত 'মুক্তনাটক', বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনে একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। তবে আন্দোলনটি রাজনৈতিক ভাবনাজাত হয়ে সূচিত হলেও কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একইসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই আন্দোলনের জন্য অনুকূল ছিল না। 'মুক্তনাটক' জোতদার, মহাজন তথা গ্রামীণ জনপদের শোষকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে। এ সময় উপস্থাপিত নাটকসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হবে সন্দেহ নেই।

সমকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক অভিঘাত বাংলাদেশের নাটকের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক তৈরি করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অসহযোগ আন্দোলনের পর্যায়ে বাংলা নাটক দ্রোহের শব্দাবলি উচ্চারণ করেছিল। এই প্রতিবাদ ও দ্রোহের পথে

বাংলাদেশের নাটক সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে সঙ্গী করেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের নাটকের প্রবণতাসমূহ হল– মুক্তিসংগ্রাম, মানবতাবিরোধী অপরাধ, সামরিক শাসন, সাধারণের উপর শোষণ ও নির্যাতন, সুবিধাভোগী শ্রেণির আবির্ভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে রাজনীতি বিষয় হিসেবে প্রধান, এখানে উল্লেখ করা যায় মঞ্চনাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এর মাধ্যমে গণসচেতনতার নতুন ভূগোল নির্মাণ করতে চেয়েছেন। নাটকসমূহ বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে কতটুকু প্রভাব রেখেছে তা পরবর্তীকালের গবেষকদের চিন্তনের উপাদান। এ কালের ভাবনায় সন্দেহ ছাড়াই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের বিপুলবিস্তারী প্রভাবে বাংলাদেশের নাটকের যে পথচলা তাতে রাজনীতি প্রোথিত।

[লেখক: নাট্য-গবেষক। পেশা: বাংলা একাডেমিতে চাকরি।]

প্র ব ন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও আমাদের নাটক

আ ব দু ল্লা হ আ ল - মা মু ন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার লোকের অভাব নেই। অনেকে এ ধরনের কথাবার্তা বলে দারুণ সুখ পান। এরা খোলামেলাভাবেই বলাবলি করেন, পাকিস্তানই নাকি ভালো ছিল। কিসে পাকিস্তান ভালো ছিল তা তারা বলতে পারেন না। কিসে বাংলাদেশ খারাপ হল সেটাও বলতে পারেন না কিন্তু এরা মুক্তিযুদ্ধের গিবত নিয়ে ভীষণ আনন্দ পান। এদের মধ্যে প্রগতিবাদী বলে পরিচিত লোকজনও আছেন। একটা ব্যাপার এরা উপলব্ধি করেন না যে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এদের অস্তিত্বই থাকত না। পারতেন এরা পাকিস্তানি ধান্দাবাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে? এদের

কাছে অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা এই সব রক্তঝরা পরিস্থিতিগুলো কোনো পৃথক গুরুত্ব বহন করে না। এরা মুক্তির তাৎপর্যই বোঝেন না। এরা স্বাধীনতা বলতে বোঝেন, নিজেদের আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছেগুলোর ষোলআনার পরিতৃপ্তি।

এ বছর মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। পঁচিশটা বছর পার হয়ে গেল। একটা জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসে পঁচিশ বছর খুব বেশি সময় নয়। ১৯৭১-এ যে ছেলেটি বা মেয়েটির বয়স ছিল এক সে এখন দুর্দান্ত এক বাঙালি যুবক বা যুবতী। এরা জন্মেই পেয়ে গেছে স্বাধীন মানচিত্র। গত পঁচিশ বছরে এই মানচিত্র কতবার খাবলে ধরেছে পচা শকুন তা এরা যথেষ্ট পরিমাণে জানে না। এই সেদিন যৌবনের সিঁড়িতে পা রেখে তবেই এরা পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেয়েছে। এদের যৌবনটাও নির্বিঘ্নে আসেনি। সেখানেও নানান চক্রান্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেহারাটা বারবার বিকৃত করা হয়েছে। জাতির পিতার পরিচয়টা পর্যন্ত গোপন করার নগ্ন অপচেষ্টা এরা লক্ষ করেছে। এই প্রজন্ম জাতির পিতাকে দেখেনি। যখন এরা দুগ্ধপোষ্য তখনই ঘাতকেরা তাঁকে হত্যা করেছে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি নরপশুরা। তারা মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র দেহে পদাঘাত করেছে। স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তোলার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছে। এরা বাঙালি জাতিকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে, একদিন এই ভূখণ্ডে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চক্রান্ত চলেছে। লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার রক্ত ঝরেছে। হাজার হাজার বাঙালি রমণী সম্ভ্রম হারিয়েছে।

আমাদের সৌভাগ্য, এই নরঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। আজ, এই ১৯৯৬-এর অন্তিম পর্যায়ে এসে বাঙালি জাতি বিশ্বকে জানান দিচ্ছে, পিতা এবং পিতৃসমদের হত্যার বিচার হয়ে যাবে এই বাংলার মাটিতেই। বাংলার মাটি কতিপয় মানুষ- শিকারি পশুর জমানো পাপের ভার আর সহ্য করতে রাজি নয়।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এই ঐতিহাসিক লগ্নে আমরা আরেকবার তাকাতে চাই আমাদের নিজেদের আয়নায়। সেখানে আমরা কী দেখি? দেখি জাতি হিসেবে আমাদের অর্জন। গত পঁচিশ বছরে আমাদের অর্জনের পরিমাণ খুব কম নয়। পৃথক জাতিসত্তাম,স্বাধীন বাসভূমি, নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চা এসবই আমাদের প্রধান অর্জন। পাকিস্তানি শাসকদের নানারকম লুটপাটের ডামাডোলে যখন বাঙালির জাতিসত্তাই বিলীন হয়ে যেতে বসেছিল তখনই বাঙালি আঘাত হেনেছে। তখনই পিতা ঘোষণা দিয়েছেন, ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।’ মুক্তির লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আমাদেরকে দিয়েছে স্বাধীন একটি বাসভূমি। আর স্বাধীন বাসভূমি দিয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চার অধিকার। বাঙালিসংস্কৃতির শেকড় যে গভীর এবং গভীরতর ভূমিস্তরে সুপ্রোথিত এটা তো একটা ঐতিহাসিক সত্য। সে কারণে এই সংস্কৃতির অবয়বও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই সংস্কৃতির রয়েছে চর্চিত হওয়ার নিজস্ব চাহিদা এবং প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা এসেই ঝলসে দিল আমাদের সংস্কৃতিকে। যেন-বা বজ্রপাত হল।

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে স্বাধীনতার এই বজ্র-ঝলক রীতিমতো বৈপ্লবিক পর্যায়ে চলে গেল। মুক্তিযুদ্ধের আঁচটা দারুণভাবে লাগল নাটকের গায়ে। রণাঙ্গনফেরত মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীরা যেন-বা আরেকটা যুদ্ধই শুরু করে দিলেন। আসলে এটা একটা যুদ্ধের মতোই ব্যাপার। পাকিস্তানি শাসকদের যাঁতাকল থেকে বাংলার নাটককে বের করে আনাবার জন্য ঐরকম যুদ্ধংদেহি মনোভাবেরই তো প্রয়োজন ছিল। শুরু হল বাংলা নাটক বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, নতুন প্রতিশ্রুতিতে। বাংলাদেশের তারুণ্য অভিবাদন জানাল নাট্যপ্রেমী দর্শকদের।

গত পঁচিশ বছরে নাটকে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা বারেবারেই এসেছে এবং এখনও আসছে। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিগুলো গত পঁচিশ বছরে যত্রতত্র মাথাচাড়া দিয়েছে। তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে বাংলাদেশের শরীরে আঁচড় কেটেছে। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে এই অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দেয়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এরা আমাদের নাটককে কলুষিত করতে পারেনি। নাট্যকর্মীরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রকমারি বলিষ্ঠ প্রযোজনা। কুখ্যাত গোলাম আযম যখন তস্করের মতো বাংলাদেশে ঢুকে ঘাপটি মারলেন, বাংলার নাটক তখনই তাকে খুঁজে বের করেছে। যেইমাত্র সে জামাতের আমির হয়ে বাংলাদেশে তার অবৈধ অবস্থানকে পোক্ত করতে লেগেছে আমাদের নাট্যকর্মীরা তখনই শহিদজননী জাহানারা ইমামের সমর্থনে নাটক নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড , ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, খুনিদের সসম্মানে পুনর্বাসন এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নানাভাবে আমাদের নাটকে উঠে এসেছে। নাট্যকর্মীরা আশ্চর্যজনকভাবে কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে একতাবদ্ধ ছিলেন এবং সুখের কথা এখনও আছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তেমনিভাবে নাট্যকর্মীদের একতাবদ্ধ করে রেখেছে।

বাংলাদেশের নাটক এখন বাঙালির প্রাণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাঙালি নাটক দেখাকে তার স্বভাব এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারাই এখন নাটকের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নাটককে প্রাণ দিয়েছে। নাট্যকর্মীদের শত বাধা অতিক্রমে উদ্দীপিত করেছে। আজ মুক্তিযুদ্ধে ও বিজয়ের এই রজতজয়ন্তীতে আমরা নাট্যকর্মীরা তাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিশালতা ও ঐতিহাসিকতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এমন একটা বিশাল কর্মকাণ্ডের উত্তরাধিকার আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেব নাটকের মাধ্যমে। আজ এই হোক আমাদের সুস্পষ্ট প্রত্যয়।

উৎস : থিয়েটার, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব।]

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক

আ লী যা কে র

আমরা আছি! আমরা থাকব!!

সময়ের রথ মসৃণ পথে বাধাহীন গতিতে এগিয়ে যাবে আমরা আছি। সাত বছর পূর্বে সংঘটিত পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী আমরা থাকব। যে আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য লক্ষ প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যে আদর্শ লক্ষ মূক ওষ্ঠে এনেছিল ভাষা, সমবেত করেছিল একটি পতাকা-তলে, একটি স্লোগানের আহ্বানে, একটি সুরের সঞ্জীবনে, মৃত্যুর আঁধারকে পরম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে জীবনের আলোর দিকে বলিষ্ঠ পদচারণায় করেছি অনুপ্রাণিত, সেই আদর্শের নিঃসংকোচ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও আমরা আছি আমরা থাকব।

আজ এমন একটি দিন যে, সংস্কৃতির যে কোনো ইতিহাস-নির্ভর তথ্য বা তত্ত্বগত আলোচনার চেষ্টাকে ম্লান করে দেয় সব বুদ্ধিমত্তারও শীর্ষে উপবিষ্ট মানবিক আবেগ। কিন্তু তবুও তো আমরা আছি। একটি জাতি হিসেবে আছি। একটি ভাষাভাষী হিসেবে আছি। একটি সংস্কৃতির বাহক হিসেবে আছি। আর তাই এই মহান দিনেও আমাদের আবেগকে সংযত করতে হবে কতকগুলো হিসেব-নিকেশের আপাতঃনীরস পর্যালোচনার স্বার্থে। এর প্রয়োজন আছে। এই পর্যালোচনার অবতারণা করতে হবে কতগুলো কথা বলবার জন্য। কতগুলো কথা যা এই মুহূর্তেই না বললে নয়। এই আলোচনার প্রয়োজন আছে কতগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য। যে প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো এই মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন না করলেই নয়।

যে প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলোর প্রসঙ্গ আমি এখানে উত্থাপন করলাম তার মধ্যে বলিষ্ঠতম যেটি তা সংযোজিত হয়েছে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যের পেছনে। আর তা হচ্ছে, 'স্বাধীনতা আমাদের কী দিয়েছে?' স্বাধীনতা আমাদের কী দিয়েছে বা স্বাধীনতা একটি জাতিকে কী দেয় এই প্রশ্নটি এত মৌল এবং অভিধা এত ব্যাপক যে সে সম্বন্ধে বিশদালোচনায় একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা সম্ভব। আমি কেবল আমার বিচরণক্ষেত্র মঞ্চ-নাটক সম্বন্ধে কিছু বলব।

স্বদেশ পরিক্রমা শুরু করবার আগে যুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের জন্ম, অতঃপর ভাষা এবং বুদ্ধিমত্তার স্ফুরণ যখন থেকে হয়েছে তখন থেকেই সে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। আর এই অধিকারকে খর্ব করবার প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে প্রতিরোধের, যুদ্ধের এবং অতঃপর মুক্তির। তাই যুদ্ধ সভ্যতার মতোই প্রাচীন একটি কর্মকাণ্ড। এ সত্যটি অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে বিভিন্নভাবে এবং কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সব যুদ্ধের পেছনেই রয়েছে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতা যার অনুপ্রেরণা নিহিত আছে বিভিন্ন জাগতিক স্বার্থের মাঝে।

আর তাই ইতিহাসে সাক্ষাৎ মেলে গ্রেকো-পার্শিয়ান যুদ্ধের, সিজর-এর মিশরাভিযানের, ফরাসি বিপ্লবের, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মার্কিনদের স্বাধীনতা যুদ্ধের, প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, সোভিয়েত বিপ্লবের, চীন বিপ্লবের, আলজেরিয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের, ভিয়েতনাম যুদ্ধের, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং অসংখ্য অসংখ্য যুদ্ধের, যা মানুষের শাশ্বত অধিকারকে পদদলিত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী যুদ্ধবাজ মহানায়কদের আপন খেয়ালখুশির জন্য সংঘটিত হয়েছিল। আর এই অধিকার খর্ব করবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধচেতনা, স্বাধীনতা মানুষকে উজ্জীবিত করেছে তা ভাষা পেয়েছে রুশো, ভল্টেয়ার, গোর্কি, লু-স্যুন, ব্রেখ্ট্, কাম্যু, বোরিস ভায়ান, জর্জেস শেহাদে, পাবলো নেরুদা এবং আরো অসংখ্য স্রষ্টার সৃষ্ট শিল্পকর্মে।

আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ফ্রান্স যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই দেখব মানুষ মৌলিক অধিকারের হাতিয়ার হাতে সৃষ্ট হচ্ছে সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য অথবা নাটক। ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়েই নাটক অভিনীত হয়েছে গ্রামে, গঞ্জে, জনপদে।

মানুষ, বিশেষ করে এই যুক্তিবাদী বিশ্বের মানুষ জন্মসূত্রে তার প্রাপ্য মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন। তাই কেবল সংগ্রামেই নয় সংগ্রামোত্তর সময়েও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুনোর সুখানুভূতি, আবেগ এবং স্পৃহার সঞ্চারে নিঃসৃত হয় সৃজনশীল শিল্পকর্ম যা একটি গোটা জাতির সংস্কৃতির চেহারা পাল্টে দিতে পারে। মানুষের অন্তরে সুপ্ত বাসনা, জন্ম-জন্মান্তর ধরে লালিত তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নির্বিঘ্ন সম্প্রচার হয় এমন এক মুখরতায় যা তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থায় হতে দেখা যায় না। এর কোনো ব্যাখা দেয়া সম্ভব নয়। ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও আমি মনে করি না। কারণ, আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, আমি মানুষের মৌলিক অধিকারের গতিময়তায় বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসী সত্যের অ-নির্ধারিত, অ-নির্দেশিত এবং সংজ্ঞাবিহীন অগ্রাভিযানে। সত্য সুন্দর, সত্য শাশ্বত।

পঁচিশে মার্চ ৭১-এর কাল-রাত্রিতে যখন উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসকরা তাদের ভাড়াটে সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিল একটি জাতিকে, তার মূল্যবোধকে, তার সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করতে, তখনও সংঘটিত হয়েছিল ক্ষমতালোভী একদল

মানুষের আরেকদল নির্বিবাদী মানুষের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রচেষ্টা। যা এই নির্বিবাদী বাঙালি জাতিকে পরিণত করেছিল এক দৃঢ় প্রতিরোধকামী সত্তায়। যার জবাব ছিল অস্ত্রের বদলে অস্ত্র, বুলেটের বদলে বুলেট, অবজ্ঞার বদলে অবজ্ঞায়। আজ মনে পড়ে সেই কালজয়ী পোস্টারের আমোঘ আহ্বান 'পাকিস্তানি পশুরা মানুষ হত্যা করছে আসুন আমরা পশু হত্যা করি।' মনে পড়ে *স্টপ জেনোসাইড*। মনে পড়ে স্বাধীন বাঙলা বেতার কর্তৃক সম্প্রচারিত নাটক *মৃত্যুহীন প্রাণ*, *মুক্তির ডাইরি*। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গান 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়া।'

যুদ্ধ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট শিল্পকর্ম, যাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় আমরা War literature, War theather, War art হিসেবে জানি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সীমিত নয় মাসে তার কোনো বলিষ্ঠ স্বাক্ষর নেই একথা অনস্বীকার্য। সৌভাগ্যবশত তিরিশ বছর এই যুদ্ধ ব্যাপ্তি লাভ করেনি বলে মাঠে অস্ত্র হাতে আমাদের নাটকাভিনয়ের প্রয়োজন পড়েনি। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল সুদৃঢ়ভাবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এখানে নাটক হত। নাটক হয়েছে। এবং এমন অনেক নাটক ৭১-এর আগে এখানে মঞ্চায়িত হয়েছে যা মানগত দিক দিয়ে আজকের অনেক নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তবু আজকের এই তাৎপর্যপূর্ণ জাতীয় দিবসে জাতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, ধারক এবং বাহক এই সরকারি শিল্পকলা একাডেমির চত্বরে আলোচনার্থে মঞ্চনাটক যে স্থান পেয়েছে এতেই প্রমাণিত হয় স্বাধীনতার পরে মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে এমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা পরাধীন পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল অদৃষ্ট। এবং যা স্বাধীনতারই প্রত্যক্ষ অবদান। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে নাটক মঞ্চায়িত হত মূলত দুটি উদ্দেশ্যে। এক, বছরের কোনো একটি বিশেষ দিনে বিনোদনের জন্য। দুই, আন্তর্জাতিক নাট্যধারার সাথে পরিচিত কিছু নাট্যরসিক নিতান্তই এাকাডেমিক আগ্রহে নাটক মঞ্চায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তারই ফল হিসেবে।

পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে নিয়মিত শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাটককে প্রতিষ্ঠিত করবার যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় স্বাধীনতার পরই। এর কারণ এই নয় যে স্বাধীনতার আগে এদেশে বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি ছিল, ছিল সংস্কৃতিচর্চার অর্থের কোনো বিশেষ অস্বাভাবিক অপ্রতুলতা। এর কারণ এই নয় যে স্বাধীনতার পরপরই কোনো অলৌকিক কারণে এদেশের নাট্যানুরাগীদের বৈদগ্ধ্যে কোনো বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে অথবা নাট্যাঙ্গনে অর্থের বান ডেকেছে। এর একমাত্র কারণ একটি ঔপনিবেশিক সমাজে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতে বিচরণকারী একদল মানুষ এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের দ্বারা দীক্ষা পেয়েছে তাঁদের অন্তরে আবদ্ধ অভিব্যক্তির সরব, অবাধ এবং প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশের। ঢাকায় নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে ব্যাপৃত শীর্ষস্থানীয় একটি সম্প্রদায়ের তো স্লোগানই ছিল 'অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি।' এর পরের কথাগুলো বলে দিতে হয় না। এই দেশের

অস্তিত্বের প্রশ্নে যাঁরা জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়েছেন পাঞ্জা তাঁদের একাগ্রতা, তাঁদের তিতিক্ষা, তাঁদের মনোবল এবং সর্বোপরি তাঁদের প্রাণবন্ততা এই দেশের মঞ্চকে স্বাধীন সত্তার মুক্ত অভিব্যক্তির স্ফুরণে এক জঙ্গম ক্ষেত্রে পরিণত করবে এই তো স্বাভাবিক। ফলে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার পর কেবল এই ঢাকা শহরেই নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নকারী অগ্রণী সম্প্রদায়গুলো দ্বারা নাটক অভিনীত হয়েছে ন্যূনপক্ষে ৮৪০ বার। অর্থাৎ '৭৩ থেকে '৭৮ এই ছয় বছরে প্রতি ২.৬০ দিনে ঢাকায় কোনো না কোনো মঞ্চে একটি দলের কোনো একটি নাটক নিয়মিত ভিত্তিতে মঞ্চায়িত হয়েছে। নাটক এখন আর কালে-ভদ্রের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর যে কোনো নাট্যকেন্দ্রের মতোই ঢাকাতেও সপ্তাহে কোনো একটি দিনে এবং এমনকি যে কোনো একটি দিনে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা যায়। অথচ, মঞ্চ হিসেবে আমাদের আছে মহিলা সমিতি যা আগেও ছিল (তবে মিলনায়তনটির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছিল না বলে একে রোলটার স্কেটিং রিং-এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তৎকালীন নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির যুব শাখা। এখন ঐ মঞ্চে প্রতি সন্ধ্যায় নাটক অভিনীত হয়)। আছে ব্রিটিশ কাউন্সিল যা স্বাধীনতার পূর্বেও ছিল। আছে লালকুঠি বা মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট যার অস্তিত্ব ব্রিটিশ শাসনামলেও ছিল। নাট্যকর্মী হিসেবে আছে একদল তরুণ নাট্যকর্মী যারা স্বাধীনতার পূর্বেও ছিল। দর্শক হিসেবে আছেন বর্তমানের বাংলাদেশের নাট্যদর্শক এক সময়ে যাদের পূর্ব পাকিস্তানে ছিল অধিবাস। তবে আজকের নাট্যদর্শক এবং নাট্যকর্মী পরাধীন দেশে ছিল নিজ বাসভূমে পরবাসী। প্রতি মুহূর্তেই তাকে বলা হত রাষ্ট্রদোহী, বেঈমান, দুষ্কৃতিকারী। স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে বৃহত্তর শিল্পবোধ ও জীবনবোধ যে বোধ-এর বাস্তবায়ন আমরা দেখি আজকের মঞ্চপ্রক্রিয়ায়।

নাটক দ্বিজ শিল্পকর্ম। রচনায় যার শুরু, অভিনয়ে যার সম্পূর্ণতা। মঞ্চপ্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে নাট্যকার পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবীর সর্বত্রই মঞ্চের অঙ্গন থেকেই বেরিয়ে এসেছে সব সফল নাট্যকার। স্বাধীনতার পূর্বে এখানে নিয়মিত মঞ্চাভিনয়ের অপ্রতুলতাহেতু নাট্যকারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। স্বাধীনতার পর নাট্যচর্চা শুরু হবার সাথে সাথে আমরা নাট্যকার হিসেবে পেলাম মমতাজউদ্‌দীন আহ্‌মদ, আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, সেলিম-আল-দীন, রশীদ হায়দার, আল মনসুর, হাবিবুল হাসান, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক, কাজী জাকির হাসান প্রমুখ নাট্যকারকে যাঁরা একটি স্বাধীন সমাজের সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রে ফলালেন *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*, *শকুন্তলা*, *হিরণ-চিতা-চিল*, *কি চাহ শঙ্খ চিল*, *তৈল সংকট*, *এখন দুঃসময়*, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ*। নাট্যরচনার গতি মঞ্চাভিনয়ের দুর্বার গতির সাথে তাল মেলাতে হল উন্মুখ।

যে কোনো উপনিবেশবাদী সরকারের শাসনামলে কোনো শিল্পকর্মই তার সহজাত গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী চলতে পারে না। নাটক তো নয়ই। কারণ, মঞ্চ থেকে সমাজ-

সচেতন স্রষ্টাদ্বারা এমন অনেক আহ্বান উৎসারিত হতে পারে যা গণবিরোধী চক্রের জন্য খুব সুখকর নয়। এই প্রসঙ্গে আমি ইতিহাসের দ্বারগ্রস্ত হচ্ছি যার দ্বারা আমার বক্তব্যের সারবত্তা সম্বন্ধে ব্যাখা প্রদান সহজতর হবে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মঞ্চস্থ হয় *নীলদর্পণ* নাটক যাতে অসমসাহসী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকরের মুখোশ উন্মোচিত করেন। ১৮৭৬ সালে *গজদাননন্দ ও যুবরাজ* এবং *The Police of Pig & Sheep* প্রহসন মঞ্চায়িত হয় কলকাতা শহরে যাতে ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের পুঙ্গবদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। এই বেয়াদবি কোনো উপনিবেশবাদী সরকারের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। কাজেই নাট্যকর্মীদের ওপর নেমে আসে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের খড়গ। ১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জারিকৃত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন শীর্ষক এই কালা-কানুনের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন আরেক উপনিবেশবাদী পাকিস্তান সরকার। এরপর এল স্বাধীনতা। শুরু হল নিয়মিত নাটকাভিনয়। এবং বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকর্মীদের এক-নিষ্ঠতায় সাধিত হল আরেক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনার গুরুত্ব যথাযথ অনুধাবনের স্বার্থে আমি এখানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত দুটি নির্দেশ-এর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক. ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত একটি নির্দেশ:

“দেশে জাতীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাট্যভিনয়ের ওপর থেকে প্রমোদকর রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদানুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালের The Bengal Amusement Tax Act 1922 (Bengal Act V of 1922) সংশোধন করেছেন।”

এই নির্দেশের ভিত্তি হচ্ছে ১৪ জুন ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ সরকারে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত একটি নির্দেশ যা নিম্নরূপ :

“In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Amusement Tex Act, 1922, the Government is pleased exempt all dramatic programmes organised by the Amateur Drama Clubs or groups from liability to the enter-tainment tax leviable under the said act.

দুই. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮ জুন ১৯৭৫-এ জারিকৃত আরেকটি নির্দেশ:

“অভিনয়ে অনুমতি দেবার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় অহেতুক হয়রানি এড়াবার জন্যে এই পরীক্ষা-প্রণালী সহজ করবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহিত পরমর্শক্রমে ১৮৭৬ সালের Act. no 29 of 1876 (16^{th} December 1876)

An act for the better control of dramatic performances আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অর্থাৎ যতদিন না এই সংশোধিত আইন কার্যকরী হয় সেই সময়ের জন্য ঢাকা নগর এলাকায় পাণ্ডুলিপি তড়িৎ পরীক্ষা করে নাট্যাভিনয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী সমন্বয়ে একটি সেন্সরশিপ কমিটি গঠিত হবে। ঢাকা নগর এলাকার বাইরে প্রতিটি মহকুমা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি মহকুমা কমিটি অবিলম্বে গঠন করবার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন।"

স্বাধীনতা আমাদের কী দিয়েছে? স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছে মঞ্চনাটকের প্রতি অনুগত একগুচ্ছ ঋজু মেরুদণ্ডনির্ভর কর্মী। স্বাধীনতা দিয়েছে নিয়মিত নাটকাভিনয়। স্বাধীনতা দিয়েছে ১৮৭৬-এর কালাকানুনে ধাক্কা। স্বাধীনতা দিয়েছে এই কথাগুলো বলবার একটি দিন। তবুও কথা থেকে যায়। তবুও যখন ঐ রক্তক্ষয়ী ন'টি মাসের দিকে পেছন ফিরে তাকাই তখন কেন যেন মনটা ভার হয়ে আসে। মনে হয় ওঁরা যাঁরা নিঃশেষে প্রাণদান করে হয়েছেন অমৃতের সন্তান তাঁদের আত্মার প্রতি আমরা কি সম্মান প্রদর্শন করতে পেরেছি?

এখনও কি এমন কথা ওঠে না যে, যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে আর কথা কেন? যারা গেছে তারা তো গেছেই। এখনও কেন ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১-এর রক্তে-মাখা সংস্কৃতি বিষয়ক নির্ধারিত প্রশ্নগুলো বৃত্তাবদ্ধ অমঙ্গলের ন্যায় আমাদের ঘুরে ঘুরে উত্যক্ত করবে? এখনও কেন অনেক কথা দ্বিধাযুক্ত কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে হবে? এখনও কেন স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রুদের কথা উন্মুক্ত কণ্ঠে মঞ্চ থেকে বলা যাবে না? এখনও কেন...?

উৎস : থিয়েটার, জুলাই ১৯৭৯ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব।]

স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা

শা হ রি য়া র ক বি র

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধীনতা আজ অবধি এতটুকু ছায়া ফেলেনি। অথচ এই স্বাধীনতার ইতিহাসে সাংস্কৃতিক অবরোধের কারণটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়। যে সাংস্কৃতিক অবরোধ ক্রমশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধে রূপ নিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে যা প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল, যার পরিণতি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা নামের এক সীমাহীন আবেগের জন্ম– আমাদের জীবনে তার
উপলব্ধি ও ভূমিকা অত্যন্তনগণ্য।

সত্তরের পৃথিবীর জটিলতর রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি বিস্ময়কর ঘটনা যা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করেছে, যার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে গভীরভাবে জড়িত। তাকে আমরা কিভাবে অনুভব করছি– যে কোনো সচেতন মানুষই এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। তিনি এর প্রতিফলন দেখতে চাইবেন আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখন ভয়াবহ স্থবিরতা বিরাজ
করছে।

সাংস্কৃতিক বিকাশ অবশ্যই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে। তবে আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার তথা সংস্কৃতির বাহকরা যদি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কটকে কোনো অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চান, তাহলে সেটা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর হবে। একাত্তরের নয় মাসের ঘটনাবলিকে যিনি যেভাবেই ব্যাখা করুন-না কেন, এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, এই ঘটনাবলি আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রচলিত মূল্যবোধের ভিত্তি যদি নড়ে যায় তাহলে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচলিত উপরিসৌধেরও পরিবর্তন ঘটে। ’৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটালেও ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের কাছে এখনও অস্বচ্ছতার গভীরে অবস্থান করছে। সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন ঘটেনি বলে বিপর্যস্ত মূল্যবোধ নিয়ে আমরা ক্রমশ এক হতাশা ও বিভ্রান্তিময় গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

’৭১-এর ডিসেম্বরের পর শুধু দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে দুটো বছর কেটে গেছে। কয়েকটি কবিতা আর ছোটগল্পে কিছু খণ্ড চিত্র হয়তো ধরা পড়েছে। কিন্তু আজ অবধি একখানা উপন্যাস, চলচ্চিত্র, নাটক রচিত হয়নি, যাতে বোধের গভীর প্রদেশ থেকে বিশ্লেষণ করা যায় আমাদের প্রকৃত দর্শনকে। এটা ঠিক যে, একজন কবির পক্ষে এই কাজটি যত সহজ, একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা চলচ্চিত্রনির্মাতার পক্ষে ততখানি সহজ নয়। তাই উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্রে যা সম্ভব, কবিতায় তা ও চলচ্চিত্রে, যেখানে স্বাধীনতার প্রকৃত অবয়ব প্রতিফলিত হবে।

নাটকের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা সহনশীল হতে পারি এজন্য যে, ’৭১-এর আগে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার কোনো ঘটনাই পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চের অভাবে বিক্ষিপ্তভাবে রচিত কয়েকটি নাটক শুধু সাহিত্যেরই অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, মঞ্চায়নের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেনি। নাটক সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই আমাদের দর্শকরা সচেতন ছিলেন না বরং চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল। বাংলাদেশে বেতার ও টেলিভিশনে নাটকের কিছুটা প্রচার হলেও এসব মাধ্যম নাটকের উদ্দেশ্যকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি বা করতে পারে না। চলচ্চিত্রে জহির রায়হানের অনুপস্থিতি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়েও কয়েকজন জীবনবোধসম্পন্ন চিত্রনির্মাতা আমাদের দেশে ছিলেন, যারা এ দু’বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু নির্মাণ করতে সক্ষম হননি। নাটক তবু আমাদের সহানুভূতি অর্জন করবে এ কারণে যে, স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশে নাটকের অস্তিত্ব প্রথমবারের মতো অনুভূত হচ্ছে। ব্যাপকভাবে না হলেও ঢাকা শহরের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নাট্যপ্রয়াস এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে শিল্পকলায় রূপায়িত করার বিষয়ে একাধিক মতবাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় এই নিবন্ধকারকে বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে তাৎক্ষণিকতার কোনো মূল্য নেই। ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রবাহের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক এত বেশি যে, একজন শিল্পীর পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবি করার ইচ্ছে আছে, তবে এখন নয়, আরও পরে। যেমন তিনি ’৪২-এর মন্বন্তর নিয়ে ছবি করেছেন ত্রিশ বছর পরে। তাঁর শিল্পবোধের সঙ্গে যারা দ্বিমত পোষণ করেন, তাঁদের বক্তব্য হল, ’৪২-এর পটভূমিতেই ‘নবান্নের’ মতো নাটক রচিত হয়েছিল। জয়নুল আবেদিনের মর্মস্পর্শী চিত্রাবলি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ছোটগল্পগুলো তাৎক্ষণিকতার কারণেই অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও গতিময় হতে পেরেছিল, যা পরবর্তী সময়ে ’৪২-এর দলিল ছাড়াও মহৎ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

রুশ বিপ্লবের পর সের্গেই আইজেনস্টাইন, পুদভকিন ও ডোভঝেঙ্কো বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহকে যেভাবে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন, তা রুশ বিপ্লবের দলিল হিসেবে

কালোত্তীর্ণ শিল্পনীতি হিসেবে আজ অবধি অম্লান ও প্রশংসিত। চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে আইজেনস্টাইন রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে কিছু অসাধারণ নাটকও রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল নাট্যকর্মীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। সমসাময়িক নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখট ও আরউইন পিসকাটরও একই উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যা তাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনও তীক্ষ্ণ স্যাটায়ারের আঙ্গিকে, কখনও গভীর রূপক ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আধুনিক নাটকে যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করেছে।

ত্রিশ বছর পরে নির্মিত হলেও সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' সফল চিত্রকর্মের স্বীকৃতি পেয়েছে, তবে 'অশনি সংকেত' দেখে একজন দর্শকের চেতনায় রেনোয়ার স্নিগ্ধ রোমান্টিকতাই ছায়া ফেলে। এ ছবি দলাক্রোয়ার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের রঙে রঞ্জিত হয়নি, যা ছবির আবেদনকে আরও তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ করতে পারত। তবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধের নিরিখে নিঃসন্দেহে সফল ও সুপরিণত।

সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ এখানে অবতারণার কারণ, আমাদের দেশের কিছু কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকও তাঁর মতো এই তাৎক্ষণিকতার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এখনও সময় হয়নি। শুধু তাই নয়, বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়েকটি প্রচেষ্টা চলছে, তাকেও তাৎক্ষণিক বলে উড়িয়ে দেন। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে *ওয়ার অ্যান্ড পিসের* মতো কোনো মহৎ শিল্পকর্ম রচিত হবে। কিন্তু সেই কাল্পনিক সম্ভাবনায় আমাদের শিল্পীরা যদি বর্তমানের প্রয়োজনকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন, তাহলে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে।

আগেই বলেছি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নাটকের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার অভ্যাস গড়ে উঠছে। গত দু'বছরে ঢাকায় উল্লেখ করার মতো অন্তত দশটি নাটকের মঞ্চায়ন হয়েছে। নাটকে ঐতিহ্যহীনতা ও বর্তমানবিমুখতা– আমাদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ঘটনা কোনভাবেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

৭১-এর পর এদেশের নাট্যপ্রবাহের কিছু বলিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ নাট্যকর্মী পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই কিছু নাটক রচনা ও মঞ্চায়িত করেছেন, যা দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেলিম আল দীনের 'এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা', 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন,' আল মনসুরের 'রেভ্যুলেশন ও খ্রিস্টাব্দ সন্ধান', 'রোলার ও নিহত এলএমজি', সালাউদ্দিন জাকির 'অস্থির সুস্থিতি', হাবিবুল হাসানের 'সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ' এবং শাহনূর খানের 'সভাপতি বলবেন' নাটক হিসেবে একাধিক কারণে গুরুত্ব অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ফরহাদ মজহারের 'প্রজাপতির লীলালাস্য', মামুনুর রশীদের 'পশ্চিমের সিঁড়ি' এবং রশীদ হায়দারের 'তৈল সঙ্কট' (ছোটগল্পের নাট্যরূপ) প্রশংসিত হয়েছে।

বৃহত্তর নাট্য আন্দোলনের প্রাগ-প্রস্তুতি হিসেবে এই নাটকগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকগুলো ৭১-এর যুদ্ধ এবং পরবর্তী সমস্যাবলিকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও স্যাটায়ারের মাধ্যমে, কখনও রূপক অথবা প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। যুদ্ধের ঘটনাবলির চেয়ে যুদ্ধোত্তর সঙ্কটকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মনে হয় একজন মুক্তিযোদ্ধার গৌরবময় যুদ্ধের চেয়ে, পরবর্তীকালের অগৌরবের হতাশা আমাদের তরুণ নাট্যকারদের বেশি আলোড়িত করেছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে যুদ্ধোত্তর হতাশা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে– এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই হতাশা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার অনগ্রসর জাতিসমূহের মতোই ব্যাপক। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত ৭১-এর সংগ্রাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে যে মর্যাদা দান করেছে তাকে উপেক্ষা করে কেউ যদি শুধুমাত্র হতাশার চিত্রায়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তার শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যা শুধু হতাশারই জন্ম দেবে, নবতর জীবনবোধে দীক্ষিত করবে না এবং বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়বে।

নাটকে কিছু চেষ্টা চলছে এবং এই সম্ভাবনা উপেক্ষা করার মতো নয় বলেই বলা যেতে পারে, এই মুহূর্তে আমাদের আরও নাটক প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতায় অসংখ্য ঘটনা শুধু নাটকীয়তার কারণে নয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কারণেও নাটকের উপাদান হতে পারে। '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম যে দ্বন্দ্বসমূহের সৃষ্টি করেছে, যা আমাদের একসময় নির্মমভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। প্রামাণ্য দলিলের প্রয়োজনে হলেও তাকে ধরে রাখা দরকার, যা সুষ্ঠুভাবে শুধুমাত্র নাটকেই সম্ভব। একটি নাটক যখন সার্থকভাবে এই দ্বন্দ্বগুলো তুলে ধরতে পারবে এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় পৌঁছুতে সাহায্য করবে, তখন সে নাটক নিছক শিল্পের প্রয়োজন ছাড়াও সামাজিক বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আমাদের সূচনাপর্ব রচিত হচ্ছে ৭১-এর পটভূমিতে। ইতিমধ্যে বিশ্বের নাট্য-আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক শিল্পআন্দোলন বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। অনেক বেশি পরিণত অবয়ব ধারণ করেছে। আমাদের বিভ্রান্ত না হয়ে মনে রাখতে হবে, সূচনাপর্বের ধারাগুলোকে যদি সঠিক পথে প্রবাহিত করা যায়, শুধু তাহলেই আমরা সেই বিশাল আন্দোলনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারব। যে অভিজ্ঞতায় আমাদের জীবনবোধ সমৃদ্ধ হয়েছে, সূচনাপর্বের জন্য তার মূল্য অপরিসীম।

উৎস : থিয়েটার, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৭৪

[লেখক: নাট্য-গবেষক, সংগঠক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।]

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা

আতাউর রহমান

রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় ছিলেন বৈচিত্র্যসন্ধানী এবং সেই কারণে তাঁর নাটকে পাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মনোলোকের সন্ধান। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো রবীন্দ্রনাট্য চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত, আলোচিত এবং অভিনীত 'রক্তকরবী' নাটক দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। ধারণা করি, এই নাটকটি সমাজ ও রাজনীতিলগ্ন। 'রক্তকরবী'র নিম্নোক্ত সংলাপে এর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

'রাজা ॥ নন্দিনী, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভেতরে ভেতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম।'

স্বৈরাচারী নিষ্পেষণশক্তি যে নিজের ভারে নিজেই পতিত হয় এই সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার জন্যে সাধারণ দর্শকদের বিশেষ কোনো ধরনের মননের প্রয়োজন হয় না। নাট্যচরিত্র গোঁসাইর জপমালার রশি ও কুকুর পেটাবার চাবুক যে একই বস্তুতে তৈরি সেটাও বুঝতে সাধারণ দর্শকের কষ্ট হয় না। রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং দুঃশাসনের সত্যিকার স্বরূপ এই সংলাপের মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়। নাট্য-চরিত্র বিশু যখন বলে 'না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠে, যে পিঠে আলো পড়ে না আমি অমাবস্যা', তখন দর্শকেরা বুঝেই হেসে ওঠেন। বিশু যখন সর্দারকে বলে 'খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায় সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কি, না করলেই কি', তখনও দর্শকেরা বুঝেই হেসে ওঠেন। আমি শুধু 'রক্তকরবী'র প্রত্যক্ষ সংলাপগুলোর মধ্যে নিহিত রাজনীতিলগ্ন রসিকতার বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করলাম। 'রক্তকরবী' নাটকের রূপকলঙ্কার আশ্রিত সংলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না, সেইসব

সংলাপ আমাদের চেতন ও অবচেতন মনের মর্মমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়। 'রক্তকরবী' নাটকটি রাজনৈতিক ও সমাজ-লগ্ন বক্তব্যে চিরকালের নাটক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বিশ্বপরিস্থিতির রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তাল হাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'রক্তকরবী'কে এই সময়ের অতি প্রাসঙ্গিক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আমি রবীন্দ্রনাথের তিনটি 'কাব্যনাট্য', ভিন্ন অভিধায় 'নাট্যকাব্য', একসঙ্গে 'নাট্যত্রয়ী' শিরোনামে মঞ্চায়ন করেছি। তিনটি নাট্যকাব্যই ক্ষুদ্রায়তনের, মঞ্চায়ন-সময় ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের মতো। আমি এই তিনটি নাট্যকাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হই; এই তিনটি নাটকের চিরপ্রাসঙ্গিক সংলাপ পাঠ করে। এই নাটক তিনটি হল 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায়-অভিশাপ' ও 'গান্ধারীর আবেদন'। প্রথম নাটক 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণের অন্তিম সংলাপ আমার কাছে যথার্থ মনে হয়, বিশেষ করে এই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। সংলাপের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল 'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যাজিতে মোরে কোরো না আহ্বান/ জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান/ আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে'। নাটকের পরিসমাপ্তিতে শুনি, 'শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে/ জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি, বীরের সদ্‌গতি হতে নষ্ট নাহি হই'। বর্তমানে বিশ্বে যখন আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটাচ্ছি এমনকি বিশ্বাস ও আনুগত্যকে নিজ-স্বার্থে বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করছি না তখন মহাবীর কর্ণের উদ্ধৃত সংলাপ নিজেদেরকে আত্মধিক্কারে নিমজ্জিত করে। 'যে বিদ্যার তরে মোরে করো অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ; শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ', 'বিদায় অভিশাপে'র এই চিরায়ত বক্তব্যে আমি বারংবার আকৃষ্ট হয়েছি। 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই গান্ধারীর ঋজু চরিত্রের জন্যে, শ্রেয়ঃবোধের পক্ষে নারীর এমন দার্ঢ্য ও শক্তিরূপ দর্শন ইতিহাসে ও সাহিত্যে বিরল। দু'টি ছোট সংলাপ উদ্ধৃত হল যেখানে গান্ধারী পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করার জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

'ধৃতরাষ্ট্র ॥ কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী ॥ ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র ॥ কী দিবে তোমারে ধর্ম?

গান্ধারী ॥ দুঃখ নব নব/ পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে/ জিনি লয়ে চিরদিন রহিব কেমনে/ দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া'। বলাবাহুল্য রাজমহিষী গান্ধারী ধর্ম বলতে এখানে চিরায়ত ধর্মকে বুঝিয়েছেন। আমাদের দেশের একাধিক দৈনিক পত্রিকায় আমি পড়েছি যে, দুর্বৃত্ত পুত্রকে মা নিজে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আর তখনই আমার শ্রেয়ঃবোধের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন'-এর কথা মনে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' আমার খুব প্রিয় নাটক। রূপকথার রূপকের মোড়কে আমি সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এমন দ্রোহবাদী নাটক আর

পড়িনি। নাটকটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যিনি ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার ব্রত নিয়েছিলেন। নিচে উৎসর্গপত্রটি উদ্ধৃত হল :

'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করলুম'। এই নাটকের দুই চরিত্র, হরতনী ও রুইতনের যুগ্মঅভিনয়ে নৃত্যের রূপকল্পের মধ্য দিয়ে বিশ্বচরাচরে মানব-স্বভাবের আবহমানকালের পরম্পরাকে অপূর্ব শৈল্পিক দ্যোতনায় মূর্ত করা হয়েছে। আমি মনে করি 'তাসের দেশ' বর্তমান সময়ের একটি অতি প্রাসঙ্গিক একটি নাটক।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্য-সাহিত্যজুড়ে বিরাজ করছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ক্ষুদ্রতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সোচ্চার উচ্চারণ। আমার ধারণায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পলিটিক্যাল নাট্যকার, যে ভাবে বের্টল্ট ব্রেশ্‌টকে জার্মানির সেরা 'পলিটিক্যাল' নাট্যকার বলা হয়। রবীন্দ্রনাটক হয়তো ব্রেশ্‌টের নাটকের মতো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ নয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতীকের আবরণে মোড়া ও ইঙ্গিতবহ এবং পাশাপাশি এক অনিন্দ্যসুন্দর নান্দনিক সৃজনও বটে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক 'সতী'তে আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্ভাস দেখতে পাই। 'সতী' নাটকের কাহিনীভাগে আছে যে, বিনায়ক রাও ও রমাবাইয়ের কন্যা অমাবাইয়ের বিয়ে স্থির হয়েছিল জীবাজির সাথে। কন্যাপক্ষ দেরি দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে পাত্র জীবাজির জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু দেখা গেল জীবাজির পালকিতে চড়ে বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ এসে উপস্থিত হলেন। হতবুদ্ধি সভাস্থল থেকে তিনি অমাবাইকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বন্ধনমুক্ত জীবাজি এসে উপস্থিত হলেন। তখন জীবাজি, বিনায়ক ও সভাস্থ সবাই হোমাগ্নি স্পর্শ করে শপথ নিলেন যে, দস্যুকে বধ করে তাঁরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। ইতোমধ্যে অমাবাই বিধর্মী স্বামীকে ভালোবেসে বিয়ে করে ফেলেছে, তাঁদের সন্তানও পৃথিবীতে এসেছে। 'সতী' নাটকের নায়িকা অমাবাইয়ের কণ্ঠ-নিঃসৃত সংলাপ নিচে উদ্ধৃত হল :

হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেখানে সমান দোঁহে।
অমাবাই আরও বলেন
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী

পরিতাপে অপমানে অবনত শিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম ।

ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' কাব্য-নাটক একটি উজ্জ্বল রচনা । রাজমহিষীর ধর্মমত গতানুগতিক কিন্তু কন্যাস্নেহ মিশ্রিত হয়ে দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে দোদুল্যমান । তিনি নবধর্ম পছন্দ করেন না আবার হিন্দুধর্মের জ্ঞানমার্গীয় অনুষ্ঠানকেও পছন্দ করেন না । আসলে তাঁর ধর্ম নারীর ধর্ম, কন্যার ধর্ম, মাতৃধর্ম এবং সে হিসেবে চিরন্তন মানবিক ধর্ম । তাই তিনি সহজে বলতে পারেন

ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়,
চিরকাল আছে ।

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সুপ্রিয়ের কণ্ঠে আমরা এই উচ্চারণের প্রতিধ্বনি শুনি পাই নাই

কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে । আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর হৃদয়ের বড় কাছাকাছি ।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে ।

সুপ্রিয় স্বভাবত আবেগপ্রবণ, কাজেই ধর্মকে সে হৃদয় নিয়ে অনুভব করতে চায়; শাস্ত্র তার হৃদয়কে নাড়া দেয় না; হৃদয়কে নাড়া দিল কিনা এটাই সুপ্রিয়ের কাছে ধর্মের সত্যিকার পরীক্ষা । রবীন্দ্রনাথের কথাও তাই । শাস্ত্রসম্বল, অসার কঠোর ধর্মচর্চা মৌলবাদী মানুষের সাজে, হৃদয়বান মানুষকে মানায় না, হৃদয়বান রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের মানবিক ধর্মই বড়, একথাই রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী'তে বলার প্রায়স পেয়েছেন । শাস্ত্রীয় ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তা দিয়ে মানবহৃদয় জয় করা যায় না ।

'রথের রশি' কাব্যনাটক রবীন্দ্রনাথের একটি শক্তিশালী রচনা । 'রথের রশি'র কবি চরিত্রের কণ্ঠে আমরা শুনি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি ।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে ।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা,
দেহে প্রাণে-প্রাণে ।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল ।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের মূল ভাব হল, ইতিহাসের রথ একদিন ব্রাহ্মণের টানে চলেছে, তারপরে একে একে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের টানে চলেছে, এবার টানের প্রয়োজন। হলও তাই, ম্লেচ্ছ শূদ্রের টানে রথ চলল। এই নাটকের অন্যতম চরিত্র কবির কথা শোনা যাক

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন
নইলে ছন্দ মেলে না।
এক দিকটা উঁচু হয়ে ছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটাকে দিলেন কাত ক'রে।
সমান করে দিলেন তাঁর আসনটা।

আজ শূদ্রের টানে, ক্ষুদ্রের টানে, অবজ্ঞতের টানে ইতিহাসের রথ নড়ে উঠল, ছোট-বড়'র মধ্যে বিভেদ ঘুচে যায় বুঝি–রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা তাই ছিল। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায়, গল্পে ও প্রবন্ধে ছোট-বড়'র বিভেদ ঘুচাবার ইচ্ছা বার বার ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বিশ্বমানবেরও অভিপ্রায়, তবুও এই লক্ষ্যে আমাদের অর্জন অকিঞ্চিৎকর, ছোট-বড়'র তফাৎ বাড়াবার কাজে পৃথিবীর মানুষ কি নিরন্তর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত নয়? রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। মানব-সম্বন্ধ যদি অন্তরের বস্তু হয়ে ওঠে, তবেই মানবসমাজ ছন্দভ্রষ্টতার অপরাধ হতে মুক্তি পাবে, ইতিহাসের রথ ছোট-বড় সব শ্রেণির মানুষের মিলিত প্রয়াসে ছন্দময় গতিতে চলবে। মানবসম্বন্ধেরই প্রতীক রথের রশি, যেই রশির ওপর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে অর্থহীন ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে অচলায়তনের বেপরোয়া ছাত্র পঞ্চক এবং উপাধ্যায়ের কিছু উক্তি উদ্ধৃত হল

সুভদ্র : উপাধ্যায় মশায়!
উপাধ্যায় : কী বলছিলে?
সুভদ্র : আমি পাপ করেছি।
উপাধ্যায় : পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।
সুভদ্র : আমি অচলায়তনের উত্তর দিকের
উপাধ্যায় : বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?
সুভদ্র : না, আমি উত্তর দিকের জানালায়
উপাধ্যায় : বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলো যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানালা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতিতে 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নাটক, আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তো বটেই। এই নাটকে অহেতুক প্রাণ-বলির বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার উচ্চারণ শুনতে পাই। পরিবেশে ধর্মীয় অনুশাসনের লৌহজাল ছিন্ন করে মানবধর্মেরই জয় হয়, তবে তার জন্যে অনেক বড় মূল্য দিতে হয়; জয়সিংহের মতো শুদ্ধ মানুষের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে আমরা এমন একজন মানুষকে দেখি যিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় The Saviour Through Death। 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী এবং 'মুক্তধারা' নাটকের কুমার অভিজিৎ নিজ নিজ প্রাণ বিজর্সন দিয়ে মানবতা ও শ্রেয়ঃবোধের ধ্বজাকে চির-উন্নত করে রেখে যান পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। তাঁরা মৃত্যুর নিথর জগতে প্রবেশ করে মৃত্যুঞ্জয় হন। তাঁরা আমাদেরকে বলতে অনুপ্রাণিত করেন যে, জীবন এক অন্তহীন ও অনিঃশেষ অভিযাত্রা। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তবে ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব'। ব্যক্তির লয় আছে, জীবনের মরণ নেই।

আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর জীবনবোধের কয়েকটি নাটক নিয়ে সামান্য আলোচনা করলাম কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনধর্মী নাটকগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা উপস্থাপন করলাম না। আমি মনে করি তাঁর আপাত হাল্কা রসের নাটকগুলোও জীবনলগ্ন এবং নিত্যকার দেখা মানুষগুলোর দেখা পাই আমরা এইসব নাট্যে। আমি আরও মনে করি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চিরকুমার সভা', 'শেষ রক্ষা', 'শোধবোধ' 'বৈকুণ্ঠের খাতা', হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক ইত্যাদি নাটক পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। একইভাবে তাঁর লেখা ঋতুনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যসমূহ আলাদাভাবে আলোচিত হতে পারে।

জীবনের গভীর দর্শন সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের দুইটি অনন্য নাট্যরচনা 'ডাকঘর' ও 'রাজা'কে আমি সজ্ঞানে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি, কারণ আমি মনে করি এই দুইটি নাটক আলাদাভাবে আলোচিত হবার যোগ্য।

আমার বিশ্বাস, গীতাঞ্জলি'র 'দুঃখ যেন করিতে পারি জয়', তাঁর সমগ্র লেখনী-সত্তার মূলমন্ত্র ছিল এবং তাঁর নাট্য রচনায় এই জীবনদর্শনের ব্যত্যয় ঘটেনি। এই লেখনীর উপসংহারে যুক্ত করতে চাই রবীন্দ্রনাথই বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার, শুধু তাই নয়, তিনি সমগ্র বিশ্বের অন্যতম সেরা নাট্যকার, চিরনতুন এবং চিরপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্র-নাট্যচর্চার মধ্যেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চার মোক্ষ ও সারাৎসার নিহিত।

উৎস : থিয়েটার, সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব।]

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-নাট্যের প্রাসঙ্গিকতা

বিপ্লব বালা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড়ই মুশকিল আমাদের। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান দুই বাঙালিই হিসাব মেলাতে পারি না নাগাল পাই না যেন কোনোই গজফিতার মাপেই। এ এক মহাবিড়ম্বনা আমাদের। অথচ তাঁকে বাদ দিতেও তো পারি না। কোনো না কোনোভাবে তার হাত ধরা যে দিতেও হয়। যদিও তাতেও স্বস্তি মেলে না কিছুতেই। তাই বুঝি অন্ধের হস্তিদর্শন হয় নিয়তি আমাদের। যার যতটুকু বেড় তাই দিয়ে তাঁকে ধরে-বেঁধে বাগ মানিয়ে রাখতে চাই। আর বারে বারে তিনি হয়ে পড়েন যে অধরাই। এমনই এক অনিবারণীয় দশা আমাদের।

তিনি যে জন্মেছেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে। যেন একমেবাদ্বিতীয়ম এক অভিজাত পরিবারে। ব্রাত্য পতিত পিরালি বংশের এঁরা নতুন এক ধর্মমত প্রবর্তন প্রচারণের অংশীদার, প্রবক্তা। খ্রিস্টান কেতায় একেশ্বরবাদের ভজনা করেন। সনাতন হিন্দুধর্মের গৃহশত্রু বিভীষণ যেন তাঁরা। যদিও উপনিষদের বুলি মুখে সর্বদা। ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে শিক্ষিত। আবার মুসলমানি পোশাক-আশাক কাব্যদর্শনেও রঞ্জিত, মোহিত। হাবভাব, চালচলন পোশাকে ভিরমি খাওয়ান। নারী স্বাধীনতা-শিক্ষার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, একত্রে গানবাজনা-সাহিত্য-নাটক করা, ছবি আঁকা। অথচ জাতীয় ভাব-ভাষা-সংস্কৃতির চর্চাও করেন। জাতীয় মেলা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এহেন এক সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত পরিবারের একজন হয়েও রবীন্দ্রনাথ যেন আর কয়েক কাঠি সরেস। কীসব বাকবাকুম কাব্য করেন কিছু বোঝাই যায় না মাথামুণ্ডু তার। কাব্যে ইংরেজি অশ্লীলতাও সমানে আমদানি করেন। অভ্যস্ত নাগরিক ভদ্রলোকের শিক্ষা-সংস্কার-চর্চায় জোর আঘাত করে চলেন কেবলই। গীতিনাট্যনৃত্যগুলো তবু অনুষ্ঠানের মান বাড়ায় যদিও তার আখ্যান-ভাব-চরিত্র এমন ভাষা বলে, গায় তার সব ঠিক বোঝা না বোঝায় যেন লুকোচুরি খেলে, দোল খাওয়ায়। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' তবু যেন ধরাছোঁয়া যায় যদিও প্রথমটির রাজা কী যে এক ভাবের কথা বলে আর 'বিসর্জন'-এ কালীমূর্তি ছুড়ে ফেলা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না ব্রাহ্ম তো তাই! 'চিত্রাঙ্গদা'য় পৌরাণিক চরিত্রের এমন কদর্য কামার্তি, ভাষাও অশ্লীল। হাস্যকৌতুকগুলো তবু চলে তাই থিয়েটারে তার অভিনয় একদা জমত ভালোই। 'মালিনী'-তে আবার নাস্তিক বৌদ্ধের জয়কার, সনাতনীদের নিন্দাবাদ।

‘শারোদোৎসব’ থেকে কী যে এক অচেনা-অজানা ভাব-ভাষা-আখ্যান রচনা করেন এমন অধ্যাত্ম-প্রকৃতির মিলন তাতে পরিচিত, প্রচলিত সাহিত্যে তার কোনো হদিস মেলে না ঠিক যেন ভারতীয় ভাবদর্শনও নয় তা। ‘রাজা’ নাটকে নিশ্চয় ভগবানের সঙ্গে মিলনের কথা তবে সে রাজা যে ঠিক কী বলে, ঠাকুরদার কথা-গান কেমন যেন বাউল। সুরঙ্গমার ভক্তি-সমর্পণ তবু কিছু চেনা যায় যদিও বড়ই ভাবে ভরা তার কথা-গান। ‘ডাকঘর’ তো ছোটদের নাটক, অসীমের মাঝে সীমার মিলন। ‘অচলায়তন’-এ আবার সনাতন ধর্মীয় আচার-আচারণের নিন্দা, গুরু বা দাদাঠাকুর নতুন কীসব ভাবের কথা বলে! ‘মুক্তধারা’ তো যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির অভিশাপ। তিনি কি তাহলে প্রগতিবিরোধী? প্রতিক্রিয়াশীল?

‘রক্তকরবী’র রাজা কে, কেন তিনি জালের মধ্যে বন্দি? সে কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি? না হলে কে তিনি? একেক নাটকে তাঁর রাজারা কি তবে একেক রকম? নন্দিনী বা রঞ্জনই-বা কে, কিসের রূপক বা প্রতীক? রক্তমাংসের বাস্তব কেউ তো আর নয় তারা অমন কবিতার মতো কথা কয় যারা, যদিও তা গদ্যে। ‘রথের রশি’-তে কবি সাধারণ শূদ্র-জনতার জাগরণের কথা বলেছেন নিশ্চয় রাশিয়া ভ্রমণের পরে। তবে নাটকের শেষদিকে উল্টোরথ কথাটার মানে কী? ‘চণ্ডালিকা’ গান্ধীজির হরিজন-প্রেমের অনুসারী, যদিও বৌদ্ধভিক্ষু তাকে মানব-পরিচয় দেয়।

সবমিলে, সাধারণ রঙ্গালয়ের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক-প্রহসনের সঙ্গে এসবের যোজন-পরিমাণ দূরত্ব না কি? গণনাট্য-কমুনিস্টদেরও কম বিপত্তিতে পড়তে হয়নি তাঁকে নিয়ে। ভাববাদী এই মহাজনেরে কী করে যে জনতার কাতারে আনা যায়! ভাব-ভাষা-আখ্যান সব তার এমন কল্পলোকবাসী কী করেই-বা তা জনসাধারণের পাতে দেওয়া যাবে, নিজেরাই যার তেমন হদিস করতে পারি না। নাটকে সকলেই তাঁরই মতো ভাবের ভাষায় কথা বলে কথ্য বাস্তবসম্মত নয় যা মোটেও। চাষা-ভুষো-মধ্যবিত্তের মুখের বুলি ছাড়া মঞ্চে চলে? তাঁর রঙ্গব্যঙ্গনাট্যের কথা তবু খানিক বোধ্য তা-ও বড়জোড় শিক্ষিত ভদ্রজনের কাছে। কিন্তু জনগণ, জনসাধারণ তাদের কী হবে? গণনাট্য তো তাদের জীবন ও বাস্তব নিয়েই করতে হয়। না কি? উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর তাঁর রাজাদেরই-বা ঠাঁই কোথায় মাটির এ পৃথিবীতে, বাস্তব দুনিয়ার লড়াইয়ে? এছাড়া, আধুনিকদেরও বিপত্তি কম না। দুঃখ-শোক-হতাশা-ক্ষোভ-অবক্ষয় কোথায় তাঁর লেখনীতে? আধুনিক পরিমিতি ও ফর্মই-বা কী পাই! যুক্তিবুদ্ধির সূক্ষ্ম-জটিল অন্তর্বাস্তবতা কি বাস্তবোত্তরের নান্দনিকতাও মেলে না। বড় বেশি ভাবালু আবেগের বাহুল্য বিস্তার, প্রাবল্য–ঊনবিংশ শতকীয় আধুনিক কালোপযোগী নয়। অনেক কাটছাঁট করে তা গ্রাহ্য করতে হয়। গান আর ছবিই কেবল আধুনিক মান-সম্পন্ন কিন্তু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ?

এ-ছাড়া তাঁর এত যে সাময়িকপত্রে লিখিত বিচিত্র প্রবন্ধ; যাতে ইংরেজ শাসন, তার সাম্রাজ্য ব্যবস্থাপনা, শাসন-শোষণ-আইন-শিক্ষাপদ্ধতি তার এমন লাগাতার

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমালোচনা; শিক্ষিত ভদ্রজনের দেশ সমাজ মানুষ বিচ্ছিন্ন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি-দেশহিতৈষণা, ইংরেজি বুলি-ভাষণ নিয়ে বিদ্রূপ; আধুনিক রাষ্ট্র ও ভারতীয় গ্রাম-সমাজের বিরোধ-বৈপরীত্যের অনিবার ব্যাখ্যা; হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ইতিহাস, বাস্তব কার্যকারণ ও তার নিরাময়পন্থা সন্ধান; স্বদেশভাবনা ও সামাজিক প্রয়োগমূলক সমবায়, কৃষি, চাষ, ব্যাংক, গ্রামসমাজের পুনর্জাগরণব্রত; বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনে নাগরিক এবং গ্রামসমাজের বিনিময় শিক্ষা-সংস্কৃতি-নন্দনকলা আর কৃষি-কারিগরি কুটির-শিল্পের; অভিজাত জমিদারের সৌখিন বিলাস মাত্র এসব? বিশ্ব ও ভারতীয় তাবৎ জ্ঞান-শিল্প-চর্চার মেলবন্ধনে জীবনব্যাপী তার প্রয়োগ-নিরীক্ষা-অনুশীলন; দেশে দেশে ভারতীয়তার পরিচয় প্রদান এবং একই সঙ্গে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা-রণতাণ্ডবের বিরুদ্ধাচরণ, হুঁশিয়ারি এক বিশ্বমানবের অভ্যুদয়ে পূর্বাচলের দিকে অন্তিম প্রতীক্ষা, ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-আধুনিকতা-শিক্ষাসংস্কৃতির ওপর এতকালের মোহ-বিশ্বাস-আনুগত্যের অবসান-রিক্ত তার মহামানবীয় অভ্যুত্থানে আমাদের অমন বামন সত্তা-হীনমন্যতা বোধের গ্লানিতে পর্যবসিত করে দেয় যেন।

তাঁর সাহিত্যকর্মের এমন নিরন্তর নব-নিরীক্ষণ, বিকাশও আমাদের হকচকিয়ে দেয়। ছোটগল্পে এই যে প্রথম দেশ-সমাজ সংসার বিচিত্র আখ্যানে উঠে এল তা আমরা একরকম মেনে নেই। তবে কবিতায় কেউ গীতাঞ্জলি-পর্ব, কেউ-বা বলাকা পর্যন্ত, আবার কেউ শেষপর্বের গুণগানের মুখর কোনো সমগ্রতা যদিও তাতে মেলে না। উপন্যাস বিচারেও আমরা নানা দলে বিভক্ত। *নৌকাডুবি-বৌঠাকুরানীর হাট-চোখের বালির* একদল, আবার *গোরা-ঘরে বাইরে, যোগাযোগের* কেউ কেউ; *চার অধ্যায়, চতুরঙ্গ, মালঞ্চ* আরেক দলের পছন্দ; হালে উত্তরাধুনিক বিবেচনায় সে-*খাপছাড়া, তিন সঙ্গী* জায়গা পেয়েছে। তাঁর গানের গায়কী আর স্বরলিপি-মান্যতা নিয়ে তো বিতর্ক চলছে চলবে। সৃষ্টিছাড়া ছবির উৎসসন্ধান নিয়ে নানামত হলেও তাঁর ইউরোপীয় স্বীকৃতি না মেনে উপায় কী!

বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের চোখে এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিপরীত-বিরোধী কত যে বিতণ্ডা তারও অন্ত নেই বুঝি।

পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে পাড়ি দিতে হয়েছিল তো পাকিস্তানি এক মারের-সাগর। ধর্ম-পরিচয়ে ব্রাহ্ম হলেও তিনি তো ছিলেন হিন্দুই। তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হয়েছিল ইকবাল আর নজরুলকে। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-সূত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ফিরছিল তো স্বদেশে, স্বভূমে জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির আদি পরিচয়ে। আত্মানুসন্ধানের গরিমা ছিল তাতে। অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন তার মহানায়ক। রাজনীতি-নায়ক শেখ মুজিব বাঙালি জাতীয়তা আর স্বাধিকারের অভিযানে ব্রতপালনের মতোই যেন সভায়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে রবীন্দ্র-কবিতা অবিরাম আবৃত্তি করে ফিরতেন। রাজনীতি ও সংস্কৃতির এই মাহেন্দ্র-যোগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের

সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। মিলিত বাঙালির শ্রেয়োতর অর্জন বলা যায় একে। তারই পরিণতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-গরিমা। মরিয়া পাকিস্তান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও রবীন্দ্র রচনা-গান-নাম, পার পায়নি। তাতে বরং পালে লেগেছিল বাতাস। রবীন্দ্র শতবর্ষ পালিত হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা অমান্যের গেরিলা তৎপরতায়। গানে গানে আর নৃত্যে-নাট্যে মুখর হয়েছিল নগর-জনপদ। আর রমনা বটমূলে প্রভাতকালে নববর্ষ উদযাপন, প্রবর্তনা তো বাংলা সংস্কৃতির তুঙ্গতম রাজনৈতিক নান্দনিক নাগরিক উদ্‌ভাবনা 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠানের অবিস্মরণীয় কীর্তিকর্ম। নাগরিক বাঙালির প্রাণের পরে, সত্তামূলে ছোঁয়া লাগে যেন জিয়নকাঠির। জেগে ওঠে পাকিস্তানি মরণকাঠির অভিশাপ থেকে ঘুমন্ত বাংলা রাজকন্যা বুঝি নবপুরাণ কি অপরূপকথার সৃষ্টির এমন মহিমা আর কখনো ঘটেনি যেন বাঙালি জীবনে, ইতিহাসে। রাজনীতি-সংস্কৃতির এহেন অর্ধনারীশ্বর মিলনের মহাঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ। যেমন প্রধান সেনাপতি, সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাট্যের প্রাসঙ্গিকতা।

১৯৫০-এর দাঙ্গার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন ভাদুরীর পরিচালনায় অভিনীত হয় 'চিরকুমার সভা'। এই রবীন্দ্রনাটকটি কলকাতা সাধারণ রঙ্গালয়সহ নানা সৌখিন আয়োজনে দুই বাংলা মিলিয়েই হয়েছে। কলকাতা ও ঢাকার গ্রুপ থিয়েটারেও। জেলা শহরে শহরেও। এর আখ্যান, সংলাপ-বাচন ও নাটকীয় পরিস্থিতির অনাবিল রম্যতা সকলকেই আকৃষ্ট করে। নাগরিক বাচনের এহেন নান্দনিক কৌতুক-রঙ্গ উপভোগ্য বটে। শিশিরকুমার রবীন্দ্র-নাটক করতে চান বলেই নাকি রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' (১৯০৮) উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অহীন্দ্র চৌধুরী এটি মঞ্চস্থ করেন। বলা হয়, বিবেকানন্দ উদ্বোধিত সন্ন্যাসপন্থা নিয়ে কৌতুক করেই নাকি এ লেখা। তবে আজকের রসকষহীন নাগরিক বাচনের বিভঙ্গ বাজারদশায় বাংলা-কথনের স্মৃতি হিসেবে এ নাটকের আবেদন কোথাও তবু রয়েই যায়। কথোপকথনের চাপান-উতোর উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে আখ্যান-পরিস্থিতির কৌতুক-রঙ্গতায়। পঞ্চাশের দাঙ্গার কারণে উপর্যুক্ত বিশ্বরঞ্জন ভাদুরী পরিকল্পিত 'শেষরক্ষা' অভিনীত হয়নি তিনি দেশত্যাগ করেন। এটিও আরেক সুলভ-অভিনীত কমেডি।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত সংস্কৃতি সংসদ ষাটের দশকে 'তাসের দেশ' করে। আয়ুবি সামরিক শাসনের বাস্তবতায় এটি নিশ্চয় রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাই অর্জন করেছিল। নিয়ম-কানুন রেজিমেন্টেশনের বিপরীতে ইচ্ছার এক স্বাধীন উল্লাস এ নাটকে রঙ্গব্যঙ্গে রূপায়িত। গানের বিচিত্রভঙ্গ ফর্মই যেন কনটেন্ট হয়ে ওঠে। নৃত্যনাট্যের বহিরাঙ্গিক আয়োজনে অনেক সময় যদিও তা ঢাকা পড়ে। সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গিত এ নাটক কবির অভিপ্রায়কে স্পষ্টও করে। আজ তো এটি আরও বিবিধ কারণে গভীর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চবিত্ত 'ট্যাস' শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে রবীন্দ্র-নাট্যের অত্যুৎসাহী

নির্দেশক, আতাউর রহমান করিয়েছেন। যিনি তাঁর দল 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়'-এ 'রক্তকরবী' যথাসাধ্য করেছেন।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে গঠিত একমাত্র গ্রুপ 'ড্রামা সার্কেল' বজলুল করিম ও মাকসুদ সালেহীনের যৌথ নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' আর মাসুদ আলী খানের পরিচালনায় 'তাসের দেশ' করে। এই দল বাংলাদেশের বর্তমান গ্রুপ থিয়েটারের পূর্বসূরি। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় কলকাতার বহুরূপী 'রক্তকরবী' আর 'ছেঁড়াতার' করেছিল। সেটা গভীর অভিঘাত সঞ্চার করেছিল নাট্যজনমনে। নাট্যশিক্ষণ ও চর্চার নানা উদ্যোগ আয়োজন তাতে হলেও সামরিক বাস্তবতায় তার প্রয়োগ অবশ্য সম্ভব হয়নি। সেই স্মৃতি আজও অনেকের মনে জাগরূক। রবীন্দ্র-নাট্যের অমন মহিমাময় সৃজন রূপায়ণ আর শম্ভু মিত্রের ভবন-কথন উদ্বোধিত করেছিল নাট্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানা জনকেই। একটা দিশা কোথাও মিলেছিল যার প্রয়োগ কেবল স্বাধীন বাংলাদেশেই সম্ভবপর হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি-সংসদ ১৯৭০-এর ৩ জানুয়ারি 'রক্তকরবী'র ঐতিহাসিক এক মঞ্চায়ন করে। বাংলা একাডেমীর খোলা মাঠে হাজার দশেক দর্শক সমাগমে ঘটনাটি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালে যেন সামরিক মহড়ার একাগ্রতায়। তাতে অবশ্য নাটকের শেষ পর্বে রাজার রূপান্তর বিপত্তি ঘটায়। জালবন্দি রাজাকেই আক্রমণের জনদাবি যে তখন। নিয়ন্ত্রক সর্দারবাহিনী তাই আড়ালে পড়ে যায়। স্পষ্ট এক লক্ষ্যবস্তু চাই তো। রাজনীতির সঙ্গে শিল্প-রূপায়ণের এক জটিলতা এতে ধরা পড়ে। সময়ের চাপ ও চাহিদা কতটা আর কী করে মেটাতে পারে নির্দিষ্ট কোনো এক শিল্পকর্ম? রূপান্তরণের সৃজন-সীমা বাঁধা যায় না কি কোথাও? তাতে সময়ের তাৎক্ষণিক দাবি, প্রয়োগকর্তাদের নির্দিষ্ট মতপথের ব্যাখ্যানের সঙ্গে রচয়িতার অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্য কোথাও চাই না কি? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের মৌল বিপত্তি এখানেই। ক্ষমতা আর উপনিবেশের তোতা বুলিতে শিক্ষা-দীক্ষা-ব্যাখ্যানের অভ্যস্ততার সঙ্গে তাঁর যে পদে পদে বিরোধ। কোনো চলতি হাওয়ার পন্থী তিনি যে সেই কিশোরবেলা থেকেই নন। ক্রমে তা বিরাট এই সৃজনকর্তার স্বাধীন স্বয়ংভর নন্দনমনন বিশ্বের মৌলিক রূপ রূপান্তরে অনেকান্ত, ক্রমসৃজ্যমান হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে তাল মেলানো সত্যিই কঠিন অথচ আমাদের যে তর সয় না। চটজলদি কর্মসূচিতে তাকে কেবল কাজেই লাগাতে হবে তার নিজস্ব অভিপ্রায়ের বাচন বুঝে নেওয়ার দায় বা গরজ আমাদের নেই যে। তাই তো 'রক্তকরবী'র রাজা আমাদের সাদা চোখে কেবলই যে কোনো রাজা, শাসক, তাকে আক্রমণ করে মঞ্চেই পরাস্ত করা চাই। সর্দার আর তার বিরাট বাহিনীর নেটওয়ার্ক, রাজা যার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কর্মকর্তা মাত্র তা আমরা দেখতে বুঝতে, ভাবতে যাই না। সর্দার যে অন্যদেরকে রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে আজকের রাজনীতির কূটভাষায়: 'রাজাকে বাঁচাতেই তাকে ঠেকাতে হয়' যখন কিনা রাজা মিলতে যাচ্ছে নন্দিনী-রঞ্জনের দলে। ক্ষমতাকাঠামোর এহেন জটিল চরিত্র আজও আমরা বুঝতে শিখিনি রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই তা ধরে ফেলেছিলেন। আমরা কি রাক্ষস-খোক্ষসের প্রতিপক্ষ এক

রাজপুত্রই বুঝি কেবল শাসক আর শোষিতের সরল সমীকরণে তৃপ্ত তুষ্ট আজও তাই? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বামপন্থী 'সংস্কৃতি সংসদ' আর মহাপণ্ডিত ও বিপ্লবী উৎপল দত্তেরও এ বিষয়ে ভেদ নেই তাই কি? ঐকমত্যে একাকার তারা। পরে অবশ্য শ্রী দত্ত তাঁর পরিণত রবীন্দ্র-বিবেচনা জানান 'জপেন দা জপেন যা'-তে। শম্ভু মিত্রই বুঝি প্রাণপণে রবীন্দ্র নন্দন-মনন অভিপ্রায় আয়ত্ত করে চলেছিলেন তার বহুস্তরমাত্রার জটিলতা যেমন কিনা থাকে আমাদের রাষ্ট্র-সমাজের বিবিধ বিচিত্র ক্ষমতাকাঠামো ও মানবসম্পর্কের বেলা। তারই এক সমগ্রতাই তো শিল্পে রূপায়ণ অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কথা।

বাংলাদেশে 'রক্তকরবী' আর 'ডাকঘর' নানা দল নানা সময়ে করেছে, এর পরে নাম করতে হয় 'রাজা' ও 'বিসর্জন'-এর। তবে দেশকালে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কথা ভাবলে সবার আগে নাম করতে হয় নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের 'অচলায়তন' প্রযোজনাটির। গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে সামরিক আর মৌলবাদিতা দেশটিকে পাকিস্তানের অধিক পাকিস্তান করে তোলে। মানুষজনও যেন ভূতের মতোই অন্ধ কবন্ধ হয়ে উঠতে থাকে। রাজনীতি ও সংস্কৃতি রক্ষায় দিশেহারা, পাকিস্তানি মনের দোদর্ণ্ড প্রতাপ ও তার পুনর্জন্মের মুখোমুখি হয়ে। ঘনায়মান এহেন অন্ধতামসকালে 'অচলায়তন' হয়ে ওঠে যথা এক নাট্যরূপকল্প-সমাজ রাষ্ট্রীয় অচলায়তনের বাস্তবতায়। শোনপ্রাংশুদেরকে সাঁওতালি রূপায়ণ আর তার সঙ্গে পঞ্চকের সম্মিলন প্রতিরোধযোগ্য আয়তন তৈরি করে। দাদাঠাকুর আর মহাপঞ্চকের অদ্বৈতে রাবীন্দ্রিক তাবৎ ক্ষমতা-সংস্কারের বিরুদ্ধ-বাচনের ভাববাচ্যও প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। শিল্পের এক নিজস্ব নন্দন-ভাষা ইঙ্গিত-ইশারা-প্রতীকের গূঢ়তা সমেত জীবন্ত, জঙ্গম হতে পারে যে তারই এক প্রত্যক্ষতা ঘটে মঞ্চে। কেবলি ছকবাঁধা বাস্তবানুগ চলতি মত-পথ-তত্ত্বের সরল ইচ্ছাপূরণকামী তথাকথিত বিপ্লবী নাট্যেরও প্রয়াস সে অর্জন ঘটে না। প্রত্যক্ষবাচন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মুখ থুবড়েই পড়ে শিল্পনন্দন, আখ্যান-টেকনিকের সৃজন-রূপায়ণ বিনা। 'নাগরিক' তার মুদ্রিত স্যুভেনিরে তৎকালীন বাস্তবদশার বিপরীতে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে রবীন্দ্রবচনে: 'আমার অস্ত্রে হল গড়া/ আমার মর্ম হল পড়া/ এবার ছুটবে ঘোড়া পরম বেগে/ করবে ভুবনে জয়।' বর্ম-অস্ত্র হাতিয়ারের বড়ই আভিধানিক বাস্ত বানুগ একমাত্র অর্থই কেবল মানি আমরা তার অনন্ত রকমফেরের খোঁজ না নিয়ে। তাই বুঝি নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে তাবৎ বিপ্লবীপনা আমাদের।

তবে সবচেয়ে চমকে দেয় ২০০৯-এ প্রাচ্যনাট প্রযোজিত 'রাজা' তাদের নামকরণে 'রাজা ও অন্যান্য'। মডেলিংয়ের র‍্যাম্প হল মূল মঞ্চ, কাঞ্চীর রাজারা হয়ে ওঠে ইরাকযুদ্ধে মার্কিন-জোট জি-৭। মাল্টিমিডিয়ায় যুদ্ধের চলচ্চিত্রাবলি। আজকের করপোরেট সংস্কৃতিতে মানুষ তো সর্বদাই, সর্বত্র নিজেকে দেখানোর ম্যানিয়ায় আক্রান্ত। নাটকের শুরুতেই তাই পাত্রপাত্রীরা পরিচিত হন সেই ভঙ্গিতেই র‍্যাম্পে।

‘রানী সুদর্শনা পৃথিবীতে বিদ্যমান রূপের শক্তিতে মোহিত হবার, আলোর ঝলকানিতে প্রাচুর্যে উজ্জ্বল হবার বাসনাকারী মানুষের প্রতিনিধি।’ ‘সারা বিশ্বের অর্থনীতি জিম্মি করে যে ধনতান্ত্রিক পরাক্রমশালী রাষ্ট্র আমাদের অর্থনৈতিক সুখযাত্রার স্বপ্ন দেখায়। তাদের বিমানযাত্রায় আমাদের নাটকও যাত্রা করে।’ তারপরে সুদর্শনার অরূপ রাজাকে চাক্ষুষ করার তীব্র কামনা এবং তা পূরণের পথে যাত্রাও সমান তালে আরম্ভ হয়। বসন্ত উৎসবে কাঞ্চীরাজাদের সুদর্শনাকে পাবার বাসনা বিশ্ব-আধিপত্যকামী জি-৭-এর জোটনেতাদের চেহারা নেয়। বিস্ময়কর হল, রাজারা আরোপিত নাম ও পোশাক-আশাকেই হুবহু রাবীন্দ্রিক সংলাপ নানাভাষী স্পন্দে বলে আশ্চর্য জীবন্ত বাচনে। বিপত্তিকর হল, ঠাকুরদার দল র‍্যাম্পেই ব্যান্ডবাজনানৃত্য যোগে বসন্ত উৎসব করে তারা নিশ্চয় বিশ্ববাজারের মানুষজন নয়। তাতে করে কোনো Point counter Point তৈরি হয় না। রানি সুদর্শনা যদিও একালের কোনো মক্ষীরানি হয়ে ওঠে না তার লোভ আর বাসনা-বিকারে। তাতে নাট্যের অন্যান্যের সঙ্গে তার এক বিরোধ তৈরি হয়। সমন্বয় ঠিক হয় না। অভিনেত্রীও চরিত্রটির ক্রমরূপান্তর নাট্যবিকাশে ব্যর্থ হয়। অপরিবর্তিত এক স্মার্টনেসের ব্যক্তিগত টাইপই থেকে যান। তবু সব মিলে ‘রাজা ও অন্যান্য’-প্রবল এক সৃজনস্পর্ধা বটে সময়ের এই উর্ধ্বতন তাণ্ডবকালে। শুনেছিলাম শম্ভু মিত্র তাঁর সর্বশেষ পঞ্চমবৈদিক-এর ‘রাজা’ প্রযোজনায় রাজাদের তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির তুমুল ক্ষমতাদখলদারির মুদ্রায় ধরেছিলেন যা সমালোচিত হয়েছিল।

‘মুক্তধারা’ স্বাধীনতার পর পরই ঢাকার বিশাল রেসকোর্স ময়দানে ১৪০ হতে ১০০ হাত মঞ্চে করা হয়। বাঁধভাঙার দৃশ্য দেখাতে দমকল বাহিনীর ৬টি জলগাড়ি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্ররাজের মঞ্চ ছিল ৪ তলার সমান উচ্চতার। বাংলাদেশের অসামান্য এক সৃজনকার মুস্তফা মনোয়ার নির্দেশিত এ নাটক হাজার হাজার দর্শক খোলা বিশাল উদ্যানে দেখে। পরে তিনি টেলিভিশনে ‘রক্তকরবী’র এক অভিনব দৃশ্যরূপ সৃজন রূপায়ণ করেন। নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় প্রযোজিত খালেদ খান নির্দেশিত ‘মুক্তধারা’ তত উত্তীর্ণমান পায়নি। তবে সত্তরের দশক থেকেই বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধের বিরোধী বাস্তবতায় ‘মুক্তধারা’ লাগসই প্রাসঙ্গিক হতে পারত। যেমন কিনা শঙ্খ ঘোষ লক্ষ করেন পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কা-সংলগ্ন এলাকায় ‘মুক্তধারা’ প্রযোজনায়। অবশ্য ‘তোতাকাহিনী’-র তিনটি ভিন্ন মঞ্চভাষ্য বাংলাদেশে হয়েছে একটি সিরাজগঞ্জ কলেজ থিয়েটারে, অন্যটি ফরিদপুরে ছোটদের দল ‘ফুলকি’তে। আর একটি ঢাকার নালন্দা বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা সেখানে ছবি এঁকে ব্যক্ত করে তাদের বুঝ। প্রথমটি ইংরেজি তোতাশিক্ষা প্রচলনের, শিক্ষানীতিবিধির তথ্যাবলির দৃশ্যকল্পের নাট্য রূপায়ণে, দ্বিতীয়টি শিশুশিক্ষার হাল আমলের ক্রিয়াক্রমাবলির দৃশ্যরূপ সহযোগে নিখাদ রবীন্দ্রবাচনেই। দর্শকসাধারণ তিনটি প্রযোজনাই সঙ্গত যাথার্থ্যে গ্রহণ করেছেন ছদ্ম-রাবীন্দ্রিক অভিনয়ের কৃত্রিমতার বিপরীতে জীবন্ত এই নাট্যভাষ্যত্রয়কে। ‘রথযাত্রা’ বা ‘রথের রশি’-এর নানান প্রযোজনা হয়ে চলেছে দেশে, তার সঙ্গত কারণ তো

সহজবোধ্যই–নাটকে সমাজ-রাজনীতির ব্যাখ্যা আমাদের পরিচিতই লাগে। তবে সবশেষে কবির উচ্চারণ 'তারপরে কোনো একদিন আসবে/উল্টোরথের পালা/ তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া/ এই বেলা থেকে বাঁধনাটাতে দাও মন...' সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক ধসের পরেই আমাদের চমকে দেয় কবি তাহলে এমনই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন? এই হল মুশকিল, আমরা কেবলি তো বর্তমানকার খণ্ড খর্ব দৃষ্টি দিয়ে সব বুঝতে চাই, কেবল তার ওপর প্রচল-বাস্তবতা তার ভেতর আর বাইরে ধরতে পারি না, কি চাই না অথচ যে কোনো সৃজনকর্ম শিল্পপদবাচ্য হয় তো তখনই যদি তা আমাদের গভীর গূঢ় কোনো সমগ্রতার বোধ দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম এক রচয়িতার বেলায় তা তো আরোই অঙ্গাঙ্গী সাধর্ম এটুকু কাণ্ডজ্ঞান কবে যে হবে আমাদের। শম্ভু মিত্র আর শঙ্খ ঘোষ মহাশয়েরা এ নিয়ে এত করে বলে বলেও তো আমাদের অসার আর অসাড় মনে বুদ্ধিতে কোনো হুঁশ ফেরাতে পারেন না দেখি। পাঠকভবনের শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রথমে ইংরেজিতে লেখা, পরে যার বাংলা করা হয় 'রাজা ও বিদ্রোহীগণ' বাংলাদেশের কোনো কোনো নাট্যদল পথনাটক হিসেবে করে। যুদ্ধ-বিরোধী এমন লাগসই নাটক কি পথনাটক আমাদের কোনো বিপ্লবী নাট্যকার লিখেছেন? সবই তাহলে ওই ভাববাদী মহাজনই করে গেছেন?

'ঘরে বাইরে', 'দুইবোন' বা 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপায়ণ কেবল নয়, বাংলাদেশে নানা শহরেই 'স্ত্রীর পত্র' অভিনীত হয়েছে, হচ্ছে। কোথাও একই নিখাদ রবীন্দ্রবাচনে একালের কথকের আত্মপ্রকাশের অনিবার্যতায়। কোথাও-বা নাট্যকৃত সংলাপ-চরিত্রে রূপান্তর করে। তাতে নারীচেতনায় উপমান-আখ্যান সম্পন্ন ও এ রচনাটির অমোঘ দাপট বোঝা যায়। ইবসেনের নাটকটি ছাড়া আর কোনটিই-বা সে ভার যথাবহনে সমর্থ বলা যায়। এমনকি 'শিশুতীর্থ'র মতো মহাকাব্য সদৃশ কবিতাও একটি দল শরীরবাচনে ধারণ করেছে প্রচলিত নাট্যরূপায়ণ ব্যতিরেকেই এবং তা দেশের নানা শহরের গ্রামের মঞ্চে ও খোলা আসরে পরিবেশন করেছে হাজার দর্শক সমাগমে। অমন ধ্রুপদী গম্ভীর ভাব-ভাষাও তো অন্তরায় হয়নি দেখেছি। কী করে তা হল? আমাদের ধারণা তো দর্শকসাধারণ মুখের চলতি বুলির প্রত্যক্ষ বাস্তবিক বাচন ভিন্ন কিছু ধরতে পারে না। এটা যে শিক্ষিত নাগরিক রুচি-অভ্যাসের খর্বতা আমরাই কেবল আর সবার ওপর আরোপ করি উচ্চমন্য হাস্যকর বিজ্ঞতায় তা ঠিক ভেবে দেখি না। গ্রামদেশের যত উপস্থাপনরীতি, তার বড় একটি অংশ তো ভারী গম্ভীর ভাষায় ভাবসম্পন্ন কবিগান, যাত্রা, দেহতত্ত্বের নানা তরিকার ভাবগানের কথা তো একনিশ্বাসে বলা যায়। আমরা নাগরিকজন সে ভাব-ভাষার আখ্যান রীতিতে অশিক্ষিত বলেই তো রিয়ালিস্টিক গদ্যভাষা ছাড়া অন্য নানা বহুস্তরিত আঙ্গিক-বাচনের নাগাল পাই না। রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই নাগরিক রঙ্গমঞ্চের ইউরোপ-বাহিত এই ওপর-বাস্তবিক আখ্যান-সংলাপের বাইরে স্বদেশীয় ভাবের নানা বাচনরীতির সন্ধান প্রয়োগ করেছেন। ইংরেজি রীতির নাট্যরচনাতেও। তারপর ক্রমান্বয়ে একালের স্বদেশীয় নানান ধারা-পদ্ধতি মাধ্যমে,

যোগে নবসৃজন রূপায়ণ করেছেন নাগরিকজন যেন জাতীয় মানসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই বিচিত্র সব ভাব-রস আয়ত্তে পায় বর্তমান বিশ্ববাস্তবে দাঁড়িয়েই নন্দন-মনন অনুধ্যান করতে পারে। পশ্চিমা তোতাবুলির রুচি-অভ্যাসের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন মুক্তির আস্বাদ পায় যেন। এই অসম্ভব সাধন আর তার নানা রূপরীতির রূপায়ণ প্রয়োগ আমৃত্যু করেছেন রবীন্দ্রনাথ তার বহু বিচিত্র দায়পালনেরই ঐক্যসূত্রে। মহাবিচিত্রবীর্য এই অতিমানবিক স্রষ্টারও সাধ্য কি নাগরিক শিক্ষিতজনের বিলুপ্তসত্তা পুনরুদ্ধার করেন শিল্পনন্দন যতই কেন অসাধ্য সাধনক্ষম হয় তবু তারও তো সীমা আছে, অসীম তো আর নয় তা।

তাই বুঝি দেখা যায়, আমরা দিনে দিনে ক্রমে তার নাগাল যেন পাচ্ছি। তাঁর জীবিতকালে এক গল্প ছাড়া আর-সকল কিছু শিক্ষিত সমাজের অধরাই ছিল। অমন আকুল করা গানও তো ষাটের দশক থেকেই দুই বাংলায় শোনা-গাওয়া বাড়তে থাকে। নাটকের বেলাও, পঞ্চাশের দশক থেকে, বহুরূপী ও শম্ভু মিত্রের কল্যাণে, তার অভিনয়যোগ্যতার কুণ্ঠিত স্বীকৃতি জুটতে থাকে। তাঁর বিবিধ বিচিত্র প্রবন্ধসকল সেইভাবে পড়া বুঝি শুরুই হয়নি। শিক্ষা-সমাজকর্মের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সে সব তো অবসরভোগী কবির কল্পবিলাস মাত্র আমাদের কাছে অবাস্তব তাই অনুসরণযোগ্য ঠিক নয়। সব কেমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, মহা রাজনৈতিক বাস্ত ববাদিতায় যা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে চলি। নানা উৎসবে না হয় বেড়াতে যাওয়া চলে শান্তিনিকেতনে। টাকা থাকলে জমি কিনে বাড়িও করা যায় তীর্থভূমি বলে। একালের আধুনিক বিশ্ব বাজার-বাস্তবতায় আর কীই-বা হতে পারে? তবে তাঁর পরিবেশ-ভাবনা নাকি বিশ্বজুড়েই আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, তা শুনে ঠিক কেমন কী মনে হয় আমাদের? বা শিক্ষা ভাবনা-প্রয়োগ তাঁর আগে নাকি অতটা সমগ্রতায় ইউরোপেও শুরু হয়নি। আমাদের এখানেই কিনা সব কেবল অবসিত হল? তার দায় নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথেরই কেন তিনি ওসব অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা প্রয়োগ রূপায়ণ করে গেলেন তাঁর সমবায়ভাবনা, গ্রামসমাজ পুনর্গঠনকর্ম কি কৃষিব্যাংক প্রবর্তনা? গত শতকের বিশের দশকেই পুরুষের নৃত্যশিক্ষা, অনুষ্ঠান বা নারীদের জুডো কারাতে শেখাতে জাপান থেকে গুরু নিয়ে আসা এতসব কল্পস্বর্গ-ক্রিয়াদি কতদিন পরে কবে থেকে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে শিখতে শুরু হয়েছে কলকাতায়, ঢাকায়?

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাট্য রূপায়ণে কতক অভ্যস্ত মুদ্রাদোষ আছে। অবচেতনে আমরা কিছুতেই তার ধর্মপরিচয় ভুলতে পারি না যেন এবং তিনি যে প্রাচীন প্রবীণ, প্রণম্যজন সেটা কাজ করে নাট্যপ্রয়োগ রূপায়ণে। এক কাল্পনিক অতীত দেশকালে তাঁকে উচ্চবেদিতে স্থাপন করে ফেলি। তার যে কোনো নাটকে তাই গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবি বা উত্তরভারতীয় পোশাক-আশাকে সাজাই রাজা কি পুরোহিতকে। কথা বলি সুরেলা গভীর মধুর ধীরগতির সুর-ছন্দে রাবীন্দ্রিক চরিত্র বলে কথা! 'শিশুতীর্থ' পরিবেশনায় নানাদেশীয় পোশাকের অভিযাত্রী দল, আর গাউন-ধরনের পোশাকে এক নারীর

দলনেতৃত্ব অনেককে হকচকিয়ে দেয়। কেউ কেউ আবার তার জন্যই তারিফ করে রাবীন্দ্রিকতা থেকে সরে আসায়। আখ্যানে জান্তব হিংস্রতা, জিঘাংসাও 'অরাবীন্দ্রিক' বাস্তবসম্মতভাবে করা হয়।

তবে দশকখানেক ধরে শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃজন-রূপায়ণ বর্তমানকালের তাবৎ স্পন্দ, গতি-বাচন-চারিত্র্য ধারণ রূপান্তরণে যেন একালের জীবন্ত নাট্য হতে পারে তারই প্রয়াস চলছে। তাতে নানা অতিরেক আরোপণ, নানা পরিচিত রবীন্দ্র-গানের ভুল অনাবশ্যক ব্যবহার, নাচ কোরিওগ্রাফির চমক, আখ্যান সম্পাদন, ভাঙন-গ্রহণ-বর্জনে অমিতাচারও ঘটে। সেটা অনিবার্যই, সুষম কোনো পুনঃনব ছন্দ অনায়াস-আয়ত্ত নয়, আর নানা নিরীক্ষায় সকলেই উত্তীর্ণ হবে তা তো কখনোই ঘটে না। তবে পূর্ববর্তী ছদ্ম নিরক্ত রবীন্দ্রনাট্যের গয়ংগচ্ছতা থেকে এই নিষ্ক্রমণ অধিক স্বাস্থ্যকর।

সব মিলে বলা যায়, কোনো বড় লেখকেরই সব লেখা সমান টেকে না, লেখারও থাকে মানের হেরফের। আবার একেক দেশ-কালে লেখা অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া নাটক তো আর বেশি করে বর্তমান-নির্ভর। বর্তমানে তাকে জীবন্ত হয়ে উঠতে হয় মঞ্চে। সে বিবেচনায় রবীন্দ্র-নাট্যও বিশেষ দেশ-কালেই গৃহীত-বর্জিত হবে; তার কোনো কোনোটি পুনঃনবায়িত হবে মঞ্চে, রূপান্তরিত হবে নাট্যের নবতর প্রকরণে। জনমনের আত্মপ্রকাশের গরজে, অঙ্গাঙ্গিকতায়। বাংলাদেশের মঞ্চেও সেই ঘটনাই ঘটছে। রবীন্দ্রনাথের কতক নাটকই পুনর্সৃজিত হয়ে চলেছে। কালের বিশিষ্ট বাচনে নাট্যের বিচিত্র ভাষায়, আত্ম-সনাক্তিকরণে, আবিষ্কারে। তারই যাথার্থ্যে প্রযোজনার মান, দর্শকের সম্বন্ধপাত। একটি কোনো রীতির অনুসরণে সে সিদ্ধি ঘটে না। তাই তো বহুরূপী রূপায়িত 'রক্তকরবী', 'রাজা' থেকে কলকাতার পথসেনার খোলা মঞ্চের 'রক্তকরবী' বা প্রাচ্যনাট্যের 'রাজা ও অন্যান্য' কতই ভিন্ন ভাষ্যে উদ্‌ভাবনায় রূপায়িত হয় দর্শক তাতে অন্যতর নাট্যের আস্বাদ পায়। বহুরূপে বিচিত্র প্রকরণেই ঘটে একেক নাট্যের সৃজন-মাহাত্ম্য। 'হ্যামলেট' যেমন নানা দেশ-কালে বিশিষ্ট ভাষ্যে রূপায়ণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কালের মাত্রায় ঘটে তার কালোত্তীর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকই এমত সম্ভাবনা-সম্পন্ন। সব তার যথাপ্রয়োগ আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় বীজকম্প্র। নিজেদেরই গরজে তার রূপায়ণ ঘটতে থাকবে অভ্যস্ত স্তুতি-নিন্দার বাধা ডিঙিয়ে।

বাংলা থিয়েটারের সাবালকত্ব অর্জনে রবীন্দ্রনাট্য বড় এক অবলম্বন এ বিবেচনা সৃজন-সামর্থ্যেই কেবল সাধ্য।

উৎস : থিয়েটার, সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্য-গবেষক, সংগঠক ।]

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও বাংলাদেশের থিয়েটার

অ ন ন্ত হি রা

সদ্যপ্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট ও প্রবীণ নাট্যজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাঈদ আহম্মেদ-এর ভাষ্য থেকে জানা যায় ১৯৫০ সালে সংগঠিত দাঙ্গার আগে অবিভক্ত পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী মহাশয়ের উদ্যোগে ও পরিচালনায় 'চিরকুমার সভা' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। তিনি তারপর রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ 'শেষরক্ষা' মঞ্চায়নের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন কিন্তু দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে ভাদুড়ী মহাশয় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার কারণে 'শেষরক্ষা' নাটকটি হয়নি। ঐ নাটকের একটি প্রধান চরিত্রে প্রয়াত সাঈদ আহাম্মেদ সাহেব অভিনয় করার জন্য তৈরি হয়েছিলেন।

শুরুতেই একটা কথা বলা খুবই প্রয়োজন বাংলা মঞ্চে শম্ভু মিত্রের হাতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিপুল মঞ্চসাফল্যের পূর্ব পর্যন্ত একটি অপবাদ রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে খুব প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ছিল আর সেটা হল 'রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়যোগ্য নয়'। এককভাবে শম্ভু মিত্র এবং তাঁর দল 'বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়' রবীন্দ্রনাথের নাটককে 'অভিনয়যোগ্য নয়'-জাতীয় অপবাদ থেকে মুক্ত করেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করে 'বহুরূপী' ও শম্ভু মিত্র দর্শকমনে রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্থায়ী আসন গড়লেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র এবং 'বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়'-এর প্রথম ও যুগান্তকারী প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়, উপন্যাস থেকে শম্ভু মিত্রের নিজের নাট্যরূপ দেয়া নাটক 'চার অধ্যায়'। ঐ 'চার অধ্যায়' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫১ সালের ২১ আগস্ট 'শ্রীরঙ্গম'-এ। বলা হয়ে থাকে 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় 'রক্তকরবী'র প্রথম সফল মঞ্চায়ন ১৯৫৪ সালের ১০ মে। ১৯৫৪ সালেই ভারতীয় সংগীত নাটক আকাদেমীর উদ্যোগে দিল্লি নাট্য সংঘ যে প্রথম সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করে সেখানে ২১ ডিসেম্বর 'বহুরূপী' তার সফলতম প্রযোজনা 'রক্তকরবী' অভিনয়ের সুযোগ পায়। ঐ প্রতিযোগিতায় 'রক্তকরবী' শ্রেষ্ঠতম প্রযোজনার সম্মানটিও অর্জন করে।

ঐ সময় উৎপল দত্ত ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন “বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটি ধরেছেন। এই ঐতিহ্যে আছে দুইটি ধারার মিলন। প্রথমটা দেশজ যাত্রার ও দ্বিতীয়টি য়ুরোপীয় মঞ্চের। কোথায় যেন ‘বহুরূপী’ খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছে। বিশেষ করে বাচিক অভিনয়ে। এখানেই বিশেষ করে তাঁরা খাঁটি বাঙালি’। ‘বহুরূপী’ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রক্তকরবী’র দৃশ্যপটে যেমন রং আছে তেমনি রেখাও আছে। এই সবকিছু এক সুরে এক রংয়ে এক রেখায় এক ছন্দে গাঁথাই আধুনিক য়ুরোপীয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শম্ভুবাবু দৃঢ়তার সংগে সে দিকে পা বাড়িয়েছেন”।

১৯৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বরের পর আবারও ১৯৫৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আবারও ‘রক্তকরবী’ এবং আবারও দিল্লি। মাঝখানের সময়টাতেও ‘রক্তকরবী’ সফলভাবে মঞ্চায়িত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অন্যান্য স্থানে। মডার্ন স্কুল কাব্যকলা সংঘের আমন্ত্রণে দিল্লিতে যে ‘রক্তকরবী’ অভিনীত হয় সে নাটক দেখতে দর্শক হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, সুধীর রঞ্জন দাস, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, দেব কান্ত বড়ুয়া ও পৃথীরাজ কাপুর। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে প্রথম বিশ্বনাট্য সম্মেলনে ‘বহুরূপী’ তাদের ‘রক্তকরবী’র অভিনয় করে। একই সময় ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদলের সম্মানে দিল্লির আই প্যাক্স মঞ্চে ‘রক্তকরবী’র অভিনয় হয়। এসব মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্র, অভিনেত্রী হিসেবে তৃপ্তি মিত্র ও নাটকের দল হিসেবে ‘বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়’ দেশব্যাপী এবং আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিতি ও সম্মানের স্থান লাভ করে। ১৯৫৭ সালের ২০ ও ২১ মার্চ বাংলাদেশে বুলবুল চারুকলা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে ঢাকায় নিউ পিকচার্স হলে ‘বহুরূপী’র ঐ নন্দিত প্রযোজনা বাংলাদেশের দর্শকদের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

পঞ্চাশ থেকে ষাট। পুরো একটা দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চায়নের যত সফল ও ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ করা যায় তেমনটা পূর্ববঙ্গে ঘটেনি। তবুও যে সকল প্রচেষ্টার খবর বিভিন্নভাবে পাওয়া গেছে এবার তার একটি চিত্র ক্যানভাসে আঁকার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী’র চেষ্টার পর পূর্ববঙ্গে ১৯৬৪ বা ১৯৬৫ সালে সংস্কৃতি সংসদ-এর হয়ে সৈয়দ হাসান ইমাম ও মাসুদ আলী খান যৌথ পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’ মঞ্চে আনেন। ঐ সময় প্রযোজনাটি বিপুলভাবে দর্শকনন্দিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের থিয়েটারের অনেক কীর্তিমান মানুষই ঐ প্রযোজনার সংগে যুক্ত ছিলেন। ‘তাসের দেশ’ প্রযোজনার সংগে গায়ক ও গায়িকা হিসেবে যুক্ত ছিলেন প্রয়াত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী জাহেদুর রহিম ও ফাহমিদা খাতুন। এছাড়াও স্বাধীনতার পূর্বকালে ড্রামা সার্কেল বজলুল করিম ও মকসুদ সালেহীন

দু’জনের যৌথ নির্দেশনায় ‘রক্তকরবী’ এবং মাসুদ আলী খান-এর পরিচালনায় ‘তাসের দেশ’ নাটকের মঞ্চায়ন করেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক কারণে রবীন্দ্রনাটক, রবীন্দ্রসংগীত, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের পরই পাক সরকারের খড়গ নেমে এসেছিল। তাই ঐ সময়টাতে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটক করার তেমন একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। তবুও স্বাধীনতার পূর্ব বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চায়নের যে সকল প্রচেষ্টার কথা জানা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে সফলতম প্রয়াস ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন-এর সংস্কৃতি সংসদ প্রযোজনা ও সৈয়দ হাসান ইমাম-এর পরিচালনায় ১৯৭০ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার বর্তমান বাংলা একাডেমী মাঠে আনুমানিক দশ হাজার দর্শকের সামনে ‘রক্তকরবী’ নাটকের মঞ্চায়ন। খোলা মাঠে খোলা আকাশের নিচে দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে উপস্থিত দর্শকরা নাকি সেদিন ‘রক্তকরবী’ নাটকটি উপভোগ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে তখন পাকিস্তান-বিরোধী বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর তখন যে পাক সরকারের খড়গ নেমে এসেছিল সে-সময়কালে সংস্কৃতি সংসদের ‘রক্তকরবী’ মঞ্চায়ন একটি সফল প্রতিবাদ হিসেবেই গণ্য করা হয় এবং পরবর্তীকালের বিবেচনায়ও।

১৯৭০ সালের ঐ ‘রক্তকরবী’ মঞ্চায়নের সংগে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন– প্রয়াত অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা (রাজা), কাজী তামান্না (নন্দিনী), আবুল হায়াত (অধ্যাপক), মতিউর রহমান (বর্তমান *প্রথম আলো* সম্পাদক), মালেকা বেগম (নারী আন্দোলনের নেত্রী), আসাদুজ্জামান নূর (অভিনেতা, রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য), মাহফুজ আনাম (সম্পাদক, *ডেইলি স্টার*), মফিদুল হক (সংস্কৃতিসেবী ও পুস্তক প্রকাশক), আবুল হাসনাত (সাংবাদিক), বাবু (পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন-পুত্র), বেবী (পরবর্তীতে বাবু’র স্ত্রী), গোলাম রব্বানী (প্রকৌশলী), ডা. ইনামুল হক (অভিনেতা ও শিক্ষক), দিলীপ চক্রবর্তী (প্রয়াত সাংবাদিক), ফকরুল ইসলাম, প্রয়াত আব্দুল মতিন (পালোয়ান), প্রয়াত আলতাফ হোসেন (মোড়ল), মাহমুদুল কবীর (ছোট সর্দার), কাজী টুলু (চিকিৎসক) প্রমুখ। ঐ সময় সংস্কৃতি সংসদ রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’ ও ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ নাটক দুটিও মঞ্চায়ন করেছিল। যদিও ‘রক্তকরবী’ নাটকের মতো ঐ দুটি প্রযোজনা তেমন সফল বা আলোচিত হয়নি।

এছাড়াও অভিনয় করেছিলেন– শাহাবুদ্দিন সিদ্দিকী, জুবাইর সাঈদ, নাজমুল বারী, জামান প্রমুখ।

ঐ প্রযোজনাতে মঞ্চের নেপথ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন :

কণ্ঠশিল্পী	:(বিশুর গান) ইকবাল আহম্মেদ, (নন্দিনীর গান) ফ্লোরা আহম্মেদ, মিলিয়া গনি, সাকেরা খান।	
কোরাস কণ্ঠ	:	স্বপন চৌধুরী
সেট ডিজাইনার	:	এমদাদ হোসেন
সেট নির্মাণ	:	বিশু মুখোপাধ্যায়
আলোক নির্দেশনা	:	রাজিউল্লাহ ও মানিক
রূপসজ্জা	:	সুরেশ দত্ত
আবহসংগীত	:	খুরশীদ খান

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ছায়াতলে সারা বছর ধরে গোপনে 'রক্তকরবী' নাটকের রিহার্সেল চলে কখনো ড. ইনামুল হকের বুয়েটের স্টাফ কোয়ার্টারের বাসায় আবার কখনো-বা তৎকালীন জিন্না এভিনিউতে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির দপ্তরে। ঐ সময় পাকিস্তান-বিরোধী স্বাধীনতার স্বপক্ষের ছাত্র আন্দোলনের কারণে বারবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে একাধিকবার 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চায়নচেষ্টা ব্যাহত হবার পর বাঙালির রক্ত, ঘাম, শ্রম ও সম্ভ্রমহানির পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তার পরেই ১৯৭৩ সালের ৩ জানুয়ারি ঐ নাট্যচেষ্টা পরিণতি লাভ করে।

সমসাময়িক কালে বা সময়ে ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বিরাট মঞ্চ বেঁধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুস্তাফা মনোয়ারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ ও ছাত্র-জনতা, শিক্ষক ঐ নাটক উপভোগ করেছিলেন। মঞ্চের সাইজ ছিল ১৪০ হাত এবং ১০০ হাত। ঐ 'মুক্তধারা' নাটকের বাঁধ ভাঙার দৃশ্য দেখাবার জন্য সে সময় দমকল বাহিনীর ৬টি পানিবাহী গাড়ি এনে ব্যবহার করা হয়। ঐ প্রযোজনায় 'মুক্তধারা' নাটকের একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র যন্ত্ররাজ বিভূতি'র মঞ্চ ছিল চার-তলা বিল্ডিং-এর সমান উচু, নাটকটির মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা, পোশাক পরিকল্পনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার নিজে। নাটকটিতে বিভূতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাট্যজন আতাউর রহমান।

তাছাড়াও মুস্তাফা মনোয়ারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি চারুকলা ইনস্টিটিউট-এর ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে এখন নাটমণ্ডল হলটি ঐ একই স্থানে খোলা মাঠে স্টেজ বেঁধে করা হয়েছিল। সেট নির্মাণ করেছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার নিজে দড়ির সাহায্যে। তখন ঐ মঞ্চসজ্জাটি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। নাটকটিতে কেরামত মাওলা, মহিউদ্দিন ফারুক, টেলি সামাদ, শামসুল ইসলাম নান্নু ও বাবলী আনোয়ারসহ আরো অনেকে অভিনয় করেছিলেন।

তারপর বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় সর্বাধিক রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনাকারী দল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। 'নাগরিক'-এর প্রথম রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা জনাব আলী

যাকের-এর পরিচালনায় 'অচলায়তন', এটা ছিল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের ১৪ তম প্রযোজনা। নাটকটি ১৯৮০ সালে মঞ্চে আসে। ২০০০ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত 'অচলায়তন' নাটকের ৭০টি প্রদর্শনী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ নাটকটির তেমন মঞ্চসাফল্যের কথা আমরা জানতে পারিনি দুই বাংলা মিলিয়েই। কিন্তু আলী যাকের-এর নির্দেশনায় এই নাটকটি হয়ে ওঠে বাংলাদেশের প্রথম সফল ও দর্শক-নন্দিত রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনা। যেমন ভারতে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চসফল হয় 'চার অধ্যায়' 'রক্তকরবী', 'রাজা', ইত্যাদি প্রযোজনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন শম্ভু মিত্র 'অচলায়তন'-এর মঞ্চায়ন করেননি। উৎপল দত্ত করেছিলেন বটে তবে সেটাও তেমন মঞ্চসফল হয়নি। এরপর নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের হয়ে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বিসর্জন' করেন ১৯৮৫ সালে পরিচালক আবুল হায়াত। এই নাটকটির ৩২টি প্রদর্শনী হয়। ঐ একই দল থেকে তৃতীয়বার রবীন্দ্রনাথের নাটক করেন নির্দেশক খালেদ খান। যেটা ছিল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের ২৪তম প্রযোজনা, ১৯৮৯ সালে। নাটকটির ২২টি প্রদর্শনী হয়েছিল। নিদের্শক খালেদ খান নাটকটি করেছিলেন দলের সব নবীন সদস্যদের নিয়ে। শুধুমাত্র দুটি চরিত্রে ঐ নাটকে প্রবীণদের মধ্যে আসাদুজ্জামান নূর ও আতাউর রহমান অভিনয় করেছিলেন। চতুর্থবারের মতো নির্দেশক আতাউর রহমান রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নিয়ে একটি কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা করেছিলেন যে নাটকের মাত্র ২টি প্রদর্শনী হয়েছিল। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাটকে অভিনয় করেন শাহিন খান, টনি ডায়াস, অনন্ত হিরা, শর্মিষ্ঠা রহমান, (আতাউর রহমান তনয়া) কাজী রুমা ও আফসানা মিমি।

এরপর নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়-এর রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ বিরতি লক্ষ করা যায়। ঐ দলের ৩১তম প্রযোজনা হিসেবে দ্বিতীয়বার ১৯৯৯ সালে নির্দেশক আবুল হায়াত 'রথের রশি' মঞ্চায়ন করেন। প্রযোজনাটি মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৬টি প্রদর্শনী হয়েছিল। ঐ একই দলের হয়ে নির্দেশক আতাউর রহমান দ্বিতীয়বার মঞ্চে আনেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে আলোচিত নাটক 'রক্তকরবী' ২০০১ সালে। আতাউর রহমান নির্দেশিত এ নাটকটি দর্শক-নন্দিত হয়েছিল বলতেই হবে কারণ নাটকটি শততম মঞ্চায়নের পূর্বে মূলত বিশু পাগল চরিত্রের অভিনেতা খালেদ খান-এর শারীরিক অসুস্থতা ও সম্ভবত নন্দিনী চরিত্রের অভিনেত্রী মূলত টেলিভিশন মাধ্যমের অভিনেত্রী অপি করিম-এর ব্যস্ততার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর নন্দিনী ও বিশু পাগলের চরিত্র দুটো দুজন নবীন অভিনেতাকে দিয়ে করিয়ে পুনরায় মঞ্চে আনে নাগরিক এবং শততম মঞ্চায়ন পূর্ণ করে। নির্দেশক জনাব আতাউর রহমান গ্রুপ থিয়েটার-এর বাইরে নর্থ সাউথ ইউনিভারসিটির হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটির নির্দেশনা দেন।

স্বাধীনতার পর বিচ্ছিন্নভাবে আরো হয়তো রবীন্দ্রনাথের নাটক করার চেষ্টা করা হয়েছিল তবে তার কোনোটাই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয় তাই সেসব প্রচেষ্টার কোনো তথ্যও আজ আর পাওয়া যায় না।

'ঢাকা নান্দনিক' রবীন্দ্রনাথের ২টি নাটক ও ছোটগল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে আনেন। নাটক দুটি 'রক্তকরবী' ও 'শেষরক্ষা'। রক্তকরবী'র ২০টি এবং শেষরক্ষা'র ১২টি প্রদর্শনী হয়। এ ছাড়াও তারা 'বিনি পয়সার ভোজ' নাটকের ৭টি এবং 'শাস্তি' নাটকের ২০টি প্রদর্শনী করে। 'শাস্তি' নাটকের নির্দেশনা দেন জনাব এম এ জহুর।

নাট্যপরিচালক গোলাম সারোয়ার ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু'র ব্যবস্থাপনায় আন্তঃহল নাট্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' ছোটগল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে আনেন। নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকীর ব্যবস্থাপনায় এই নাটকের মঞ্চায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। নাটকটির ১টিই মাত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। পরববর্তীতে গোলাম সারোয়ার ১৯৯৪ সালে নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায়ের হয়ে 'রাজা' নাটকটি মঞ্চে আনেন। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে এবং নাটকটির সর্বমোট ১৪টি প্রদর্শনী হয়। সি এ টি বাংলাদেশ লায়লা আজাদ নূপুর-এর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' মঞ্চে আনে। নাটকটি মঞ্চসফল বা দর্শকনন্দিতও হয়নি এবং সম্ভবত ৫টির অধিক প্রদর্শনীও হয়নি। বাংলাদেশ উদীচি শিল্পী গোষ্ঠী ডা. ইনামুল হক-এর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চে আনেন। এই নাটকটিরও খুব বেশি প্রদর্শনী হয়নি। ঢাকার রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার খতিয়ানে আমরা আবারও ফিরে আসব। এবার ঢাকার বাইরের কিছু রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার খবর জানাতে চাই। গাইবান্ধার 'পদক্ষেপ নাট্য দল'-এর হয়ে সেলিম রেজা সেন্টু 'মুক্তধারা' নাটকটি পরিচালনা করেন। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয় ২০০৩ সালের ১৫ ও ১৬ মার্চ গাইবান্ধা নাট্য সংস্থার মুক্ত মঞ্চে। ঐ সেলিম রেজা সেন্টুই 'বগুড়া থিয়েটার'-এ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' পরিচালনা করেন ১৯৯৬ সালে। ঐ একই দলে রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে বীরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ থেকে মঞ্চে 'শাস্তি' নিয়ে আসে তৌফিক হাসান ময়না'র নির্দেশনায়।

'রংপুর নাট্য কেন্দ্র' ২০০৩ সালে রশীদ হারুন-এর নির্দেশনায় 'মুক্তধারা' মঞ্চে আনে। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয় রংপুর টাউন হলে ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ। কুষ্টিয়ার 'বোধন' থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাট্যরূপ 'জুতা আবিষ্কার' মঞ্চায়ন করে। চুয়াডাঙ্গার অনির্বাণ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রথযাত্রা' মঞ্চায়ন করে। 'সংশপ্তক থিয়েটার' বগুড়া শফিকুল ইসলাম বিপুল-এর পরিচালনায় 'রথের রশি' মঞ্চায়ন করে।

সিরাজগঞ্জের দুর্বার নাট্য গোষ্ঠী 'শাস্তি' ও ঠাকুরগাঁও-এর শাপলা নাট্য গোষ্ঠী 'ডাকঘর' মঞ্চায়ন করে। যাত্রিক নাট্য গোষ্ঠী কুমিল্লা বীরু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাট্যরূপ দেয়া 'শাস্তি' নাটকটি করে। রবীন্দ্রনাথের 'দৃই বোন' উপন্যাসের নাট্যরূপ করে ফেনীর

সংলাপ থিয়েটার। ফরিদপুর সাংস্কৃতিক চক্র 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' ও 'অবাক জলপান' মঞ্চায়ন করে। চুয়াডাঙ্গার 'অরিন্দম নাট্য দল' মঞ্চায়ন করে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।

বরিশালে খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার মিন্টু বসু'র নির্দেশনায় 'বিসর্জন' নাটকটি করে ১৯৮০ সালে। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয় বরিশাল অশ্বিনীকুমার টাউন হল মঞ্চে। ঢাকার বাইরে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা হয় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে সর্বাধিক রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে আনে তির্যক নাট্য দল। তারা আহমেদ ইকবাল হায়দার-এর নির্দেশনায় 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী' ও রবীন্দ্রকবিতার নাট্যরূপ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' মঞ্চায়ন করে। তির্যক নাট্য দল প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক করে ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে আহমেদ ইকবাল হায়দার-এর নির্দেশনায় 'রথযাত্রা'। এরপর ১৯৯৩ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামের মুসলিম হলে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'টাপুর টুপুর' (ছন্দ নাটক)। ঐ প্রযোজনাটির ১৭টি প্রদর্শনী হয়েছিল। তির্যক এরপর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে তির্যক নাট্য দল আবারও মুসলিম হলে আহমেদ ইকবাল হায়দার-এর নির্দেশনায় 'ডাকঘর' মঞ্চায়ন করে। নাটকটির ৩৫টি প্রদর্শনী হয়। একই বছর ১৯৯৫ সালেই একই দল একই নির্দেশকের নির্দেশনায় মঞ্চে আনে 'বিসর্জন' নাটকটি। এ নাটকের ১৯৭টি প্রদর্শনী হয়। তির্যক নাট্য দল-এর প্রযোজনায় এবং আহমেদ ইকবাল হায়দার-এর নির্দেশনায় ১৯৯৬ সালে স্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় 'রক্তকরবী'। নাটকটির ৯১টি প্রদর্শনী হয়। এই তির্যক নাট্য দলই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে উৎসব-এর আয়োজন করে ১৯৯৫ সালের ৬ থেকে ৯ আগস্ট। এই উৎসব পর পর তিন বছর আয়োজন করা হয়। ৮ থেকে ১২ অক্টোবর ১৯৯৬ ও ৩ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে উক্ত উৎসব ৩টি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবে তির্যক নাট্য দল-এর 'রথযাত্রা', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' ছাড়াও চট্টগ্রামের নান্দীকার মঞ্চায়ন করে 'গোড়ায় গলদ' ও কথক নাট্য সম্প্রদায় মঞ্চায়ন করে 'শাস্তি' নাটক। এছাড়াও চট্টগ্রামের 'নান্দীকার 'গোড়ায় গলদ' কথক নাট্য সম্প্রদায় গোপাল চক্রবর্তীর নাট্যরূপ 'শাস্তি,' গণায়ন চট্টগ্রাম 'শেষের রাত্রি' ও শব্দ নাট্য চর্চা কেন্দ্র মোসলেম উদ্দিন সিকদার-এর নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' মঞ্চে আনে ১৯৯৭ সালের ১৮ ও ১৯ আগস্ট। ঐ নাটকটির সর্বমোট ১৯ টি প্রদর্শনী হয়। 'স্ত্রী'র পত্র' অবলম্বনে শান্তনু বিশ্বাস মঞ্চে আনেন 'মৃণালের চিঠি'।

ঢাকার বাইরে গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় এবং তার বাইরেও রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চায়নের যে প্রয়াসগুলোর কথা জানা যায় তার একটি তালিকা আমি দিতে চেষ্টা করেছি। আমি দাবি করছি না যে এ খতিয়ানটিই সম্পূর্ণ, এর বাইরেও হয়তো কেউ কেউ বা কোনো কোনো দল রবীন্দ্রনাথের নাটক করবার চেষ্টা করেছেন। সেগুলো আমার জানা নেই বলেই এ লেখায় অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। আমার না-জানার সে অক্ষমতা আশা করি পাঠক মার্জনা করবেন। এবার আমি আবারও ঢাকার থিয়েটার

অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের নাটকের চর্চার দিকে মনোনিবেশ করব। ঢাকার পুরাতন দলগুলোর অন্যতম 'থিয়েটার' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে 'দুইবোন' ও 'ঘরে বাইরে' মঞ্চে আনে। জনাব মমতাজ উদ্দীন আহম্মেদ-এর নাট্যরূপ ও ফেরদৌসী মজুমদার-এর পরিচালনায় 'দুই বোন' নাটকটি ১৯৭৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নাটক সরণি'র মহিলা সমিতি মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক প্রথম মঞ্চায়নের সাত বছর পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যজন আবদুল্লাহ আল মামুন-এর নাট্যরূপ ও পরিচালনায় 'থিয়েটার' নাট্যদল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' মঞ্চে আনে ১৯৮৫ সালে। 'ঘরে বাইরে' নাটকটি দর্শকনন্দিত হয় এবং নাটকটির ৫২টি প্রদর্শনী হয়। ঢাকার আবদুল্লাহ আল মামুন থিয়েটার স্কুলের ১ম ব্যাচের সমাপনীতে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' নাটকটির মঞ্চায়ন হয়। নিয়মিত প্রদর্শনী না হলেও নাটকটি দর্শক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ঢাকার 'লোকনাট্য দল' লিয়াকত আলী লাকী'র নির্দেশনায় 'রাজা ও রাজদ্রোহী' , 'রথযাত্রা' ও 'তাসের দেশ' মঞ্চে আনেন। 'তাসের দেশ' বাংলাদেশের বাইরেও জার্মানির হ্যানোভারে এক্সপোতে ৩টি প্রদর্শনী এবং বার্লিনে ডাহলেন মিউজিয়াম উডসিডার সিটিতে ১টি প্রদর্শনী করে এবং ২০০০ সালে ভারতের দিল্লিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-এর আন্তর্জাতিক উৎসবে ২টি প্রদর্শনী করে। লোকনাট্য দল 'রথযাত্রা' নাটকটির তুরস্কের টার্কি তেনিসলি ডিনাইজলিতে ২টি, কোরিয়ার চুনচুন ২০০০ আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে ১টি প্রদর্শনী করে।

২০০৩ সালে ৬ মে বাংলাদেশে প্রথম 'প্রাঙ্গনেমোর' নামের একটি দল আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকের চর্চা করবার ঘোষণা দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ঐ দলের প্রথম প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অবলম্বনে অনন্ত হিরা'র নির্দেশনায় 'শ্যামাপ্রেম' ২০০৫ সালের ১৫ মে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়। প্রথম প্রযোজনা দিয়েই দলটি দর্শক, সমালোচক ও নাট্যকর্মী, নাট্যজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'শ্যামাপ্রেম' নাটকটির সাফল্যের মাত্র ৮ মাসের ব্যবধানে ঐ দলটি মঞ্চে আনে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস অবলম্বনে 'স্বদেশী'। 'স্বদেশী' নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দেন নূনা আফরোজ, নাটকটি ২০০৫ সালের ২ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে প্রথম প্রদর্শনী হয়। একই সময়কালে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় আতাউর রহমান-এর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর তিনটি কবিতা যথাক্রমে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ' ও 'গান্ধারী'র আবেদন, নিয়ে 'নাট্যত্রয়ী' নামে একটি প্রযোজনা মঞ্চে আনে। প্রযোজনাটি মঞ্চসফল ও দর্শক-নন্দিত হয়নি। সে কারণে অল্প কয়েকটি প্রদর্শনীর পর বন্ধ হয়ে যায় নাটকটি। সুবচন নাট্য সম্প্রদায় খালেদ খান-এর নির্দেশনায় মঞ্চে আনে গল্প থেকে নাটক 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

একঝাঁক তরুণের তারুণ্যে উদ্দীপ্ত দল 'পালাকার' তাদের স্টুডিও থিয়েটার-এ 'ডাকঘর' করে ২৩ নভেম্বর ২০০৬-এ। নাটকটির সর্বমোট ৮২টি প্রদর্শনী হয়েছে। নাটকটির প্রদর্শনী এখনও চলছে। ঢাকার মিরপুর-এর দল সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার 'দেবতার গ্রাস' কবিতা থেকে মজুমদার বিপ্লব-এর নাট্যরূপ-এ 'দেবতার গ্রাস' নামেই নাটক করেন। নির্দেশনা দেন মোস্তফা হীরা। 'প্রাচ্যনাট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' অবলম্বনে 'রাজা এবং অন্যান্য' নামে একটি প্রযোজনা মঞ্চে আনে আজাদ আবুল কালাম-এর নির্দেশনায়।

নাট্যজন বিপ্লব বালা'র নির্দেশনায় ও 'জিয়নকাঠি'র প্রযোজনায় 'স্ত্রীর পত্র' মঞ্চে আসে। নাটকটিতে একক অভিনয় করেন ফেরদৌসী আবেদীন লীনা। বিপ্লব বালা 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিও নাটকরূপে মঞ্চে আনেন।

'স্ত্রীর পত্র' গল্প অবলম্বনে হবিগঞ্জের নাটকের দল 'মৃণালের চিঠি' মঞ্চে আনে সুদীপ চক্রবর্তীর নির্দেশনায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকেরও নির্দেশনা দেন। নাট্যকলা বিভাগের প্রযোজনা হবার ফলেই নাটকটির নিয়মিত বা বেশি প্রদর্শনী করা সম্ভব হয়নি। ঢাকার 'স্বপ্নদল' জাহিদ রিপন-এর নির্দেশনায় 'ডাকঘর' মঞ্চে আনে। 'দশরূপক রেপাটরী থিয়েটার' রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি মঞ্চে আনে ২০১০ সালে লায়লা আজাদ-এর নির্দেশনায়।

সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার ২০০৯ সালের ১৮ থেকে ২৪ জুন ঢাকার জাতীয় নাট্যশালায় 'সংলাপ রবীন্দ্র নাট্য উৎসব' শিরোনামে একটি উৎসব করে। উৎসবে প্রাঙ্গনেমোর নূনা আফরোজ-এর নির্দেশনায় 'রক্তকরবী', সুবচন নাট্য সংসদ খালেদ খান নির্দেশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ', নাট্যলোক সিলেট বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ ও বাবুল আহমদ-এর নির্দেশনায় 'শাস্তি', 'স্বপ্নদল' ঢাকার প্রযোজনা ও জাহিদ রিপন-এর নির্দেশনায় 'ডাকঘর', তির্যক নাট্য দল চট্টগ্রামের আহমেদ ইকবাল হায়দার নির্দেশিত 'বিসর্জন' ও সংলাপ-এর 'দেবতার গ্রাস' মঞ্চায়িত হয়।

'প্রাঙ্গনেমোর' তাঁদের দলের চতুর্থ রবীন্দ্র প্রযোজনা হিসেবে ২০০৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মঞ্চে আনে 'রক্তকরবী'। নির্দেশনা দেন নূনা আফরোজ। প্রাঙ্গনেমোর-এর এই প্রযোজনাটিও দেশে এবং দেশের বাইরে দর্শক-আনুকূল্য পেয়ে আসছে। নাটকটির ৩৯টি প্রদর্শনী হয়েছে এবং এখনো নিয়মিত প্রদর্শনী চলছে। ২০০৯ সালে 'প্রাঙ্গনেমোর' শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাট্য উৎসব-এর আয়োজন করে যে নাট্য উৎসবের স্লোগান ছিল 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' এবং উৎসবের শিরোনাম ছিল 'দুই বাংলার রবীন্দ্রনাট্য মেলা' ২০০৯। উৎসবটি হয়েছিল ২ থেকে ৯ মে ঢাকার জাতীয় নাট্যশালায়। ঐ উৎসবে বাংলাদেশের চারটি ও ভারতের ৩টি রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রদর্শিত হয়। উৎসবে প্রাঙ্গনেমোর ছাড়াও ঢাকার 'সুবচন' ও ভারত থেকে 'ঋত্বিক' ও

অন্য থিয়েটার অংশগ্রহণ করে। উৎসবে ভারতের ‘ঋত্বিক’ গৌতম রায় চৌধুরী’র নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ‘চতুরঙ্গ’ নাটকটি করে ১ মে-২০০৯ এবং ২ মে রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রী-র পত্র’ গল্প অবলম্বনে গৌতম রায় চৌধুরী’র নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় করে ‘অন্তর অন্দর’ নামের নাটকটি। একই নাট্যমেলায় ৬ মে ভারতের অন্য থিয়েটার বিভাস চক্রবর্তী’র নির্দেশনায় ‘শোধবোধ’ নাটকটির প্রদর্শনী করে। উক্ত নাট্যমেলায় ‘বাঙালির নাট্যচর্চা ও রবীন্দ্রনাথের নাটক’ শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় ঢাকার জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে। ঐ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্তনু কায়সার। আলোচনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, মামুনুর রশীদ, মুস্তাফা মনোয়ার ও নৃপেন্দ্র সাহা এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অনন্ত হিরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে প্রাঙ্গণেমোর দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালায় ১২ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ দিন ব্যাপী ‘দুই বাংলার রবীন্দ্র নাট্যমেলা-২০১১’। ঢাকার ৫টি, ঢাকার বাইরে ৩টি এবং ভারতের ৩টিসহ মোট ১১টি নাট্যদলের ১৪টি নাটক মঞ্চায়ন হয় এই নাট্যমেলায়। আয়োজক দল প্রাঙ্গণেমোরের ‘রক্তকরবী’ ও ‘শ্যামাপ্রেম’, প্রাচ্যনাটের ‘রাজা এবং অন্যান্য’, থিয়েটার আর্ট ইউনিটের ‘মগজ সমাচার’, লোক নাট্যদলের (সিদ্ধেশ্বরী) ‘চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ’, চট্টগ্রামের ফেইম স্কুল অফ ড্রামার ‘রক্তকরবী’, বরিশাল শব্দাবলী থিয়েটারের ‘এবং বীরপুরুষ’, হবিগঞ্জের জীবন সংকেত থিয়েটারের ‘স্ত্রীর পত্র’, ভারতের কলকাতার গৌতম হালদারের নির্দেশনায় নয়ে নাটুয়ার ‘নানা রঙে রবি’, রঙ্গকর্মীর উষা গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় ‘চণ্ডালিকা’ ও ‘মানসী’ এবং বহরমপুরের ঋত্বিকের গৌতম রায় চৌধুরী নির্দেশনায় ‘ডাকঘর’ নাটক মঞ্চায়িত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি নাট্যমেলা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের বর্তমান সময়ের তরুণ ও সৃজনশীল ১৮ জন নাট্যনির্দেশক।

২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেয়। যে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ (২,০০,০০০/-) দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ঐ সরকারি অনুদানের আওতায় ১৪টি নতুন প্রযোজনা মঞ্চে আসে ২০১১ সালে। যদিও দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অনুদানপ্রাপ্ত অধিকাংশ নাটকই মানসম্পন্ন না হবার কারণে দর্শক আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয় এবং ঐ নাটকগুলোর নিয়মিত প্রর্দশনীও হয়নি। অধিকাংশ দলই অনুদানের টাকা হালাল করবার মানসে নাটকগুলোর দু’টি চারটি প্রদর্শনী করেই রণেভঙ্গ দিয়েছে।

অনুদানের আওতায় ২০১১ সালে ৫ মে জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম মঞ্চে আসে লায়লা আজাদ নূপুরের নির্দেশনায় ‘থিয়েটার’ নাট্য দলের ‘মুক্তধারা’ নাটকটি। নাটকটি মানসম্পন্ন ও দর্শকনন্দিত হয়নি। ২ জুন ২০১১-তে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজিত নাট্যউৎসবে মঞ্চে আসে লোকনাট্যদল (বনানী)-র কামরুল নূর

চৌধুরী নির্দেশিত ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’। এই নাটকটিরও তেমন মঞ্চসাফল্যের কথা শোনা যায়নি। ৬ জুন মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ আশ্রিত নাটক ‘নিশিমন বিসর্জন’ মঞ্চে আনে জাতীয় নাট্যশালায়। অনুদানপ্রাপ্ত নাটকগুলোর মধ্যে এই নাটকটির সর্বাধিক প্রদর্শনী এবং দর্শকনন্দিত হয়েছে। আনন জামানের নাট্যরূপে নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছে আশিকুর রহমান লিয়ন। মনিপুরী থিয়েটার প্রযোজিত মনিপুরী ভাষার নাট্যরূপ শুভাশিষ সিনহা নির্দেশিত ‘দেবতার গ্রাস’ মঞ্চে আসে ১৩ জুন। দ্যাশ-ব্যাংলা থিয়েটার প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয় ১৪ জুন। প্রযোজনাটি নির্দেশনা দিয়েছেন বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী। ১৫ জুন রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ মঞ্চে আনে চট্টগ্রামের নাট্যদল তির্যক। এ প্রযোজনাটি নির্দেশনা দিয়েছেন দলপ্রধান আহমেদ ইকবাল হায়দার। একই দিনে ঢাকার মঞ্চে ‘রথের রশি’ নাটক নিয়ে আসে পালাকার নাট্যদল। তরুণ নাট্যনির্দেশক শামীম সাগরের নির্দেশনায় নির্মিত হয় নাটকটি। চট্টগ্রামের অন্য একটি পুরনো দল ‘গণায়ন’ ম. সাইফুল আলম চৌধুরীর নির্দেশনায় একই দিনে মঞ্চে আনে ‘মুক্তধারা’ নাটকটি। ১৫ জুন রবীন্দ্রনাথের আলোচিত দুই নাটক ‘রথের রশি’ এবং ‘রথযাত্রার’ সমন্বয়ে নির্মিত গোলাম সারোয়ারের নির্দেশনায় ‘কালের যাত্রা’ মঞ্চে আনে পদাতিক নাট্য সংসদ। ১৬ জুন ঢাকা থিয়েটার ৩৫তম প্রযোজনা ‘নষ্টনীড়’ মঞ্চে আসে। নাট্যজন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এর নাট্যরূপ দেন রুবাইয়াৎ আহমেদ। একই দিনে জাহিদ রিপন নির্দেশিত ‘চিত্রাঙ্গদা’ মঞ্চে আনে স্বপ্নদল। ২০১১-তে ২১ জুন উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয় নাগরিক নাট্যাঙ্গন প্রযোজিত ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটির। নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় লাকি ইনাম। ‘নাট্যধারা’ নামের নাটকের দলটির ‘রথের রশি’ প্রথম প্রদর্শিত হয় ২৪ জুন। আশীষ খন্দকারের নির্দেশনায় মঞ্চে আসে নাটকটি। রবিঠাকুরের নাটক ও তাঁর সাহিত্যসম্ভার নিয়ে নির্মিত চৌদ্দ নাটকের শেষ নাটকটি মঞ্চে আসে ২৫ জুন। নাট্যজন মাসুম আজিজের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চে আনে ঢাকা পদাতিক। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ‘আপদে’র নাট্যরূপ এটি। অনুদানের বাইরে ‘প্রাঙ্গণেমোর’ নাট্যদল-এর প্রযোজনায় ‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাটকটি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। অনন্ত হিরার নাট্যরূপে এর নির্দেশনা দিয়েছেন নূনা আফরোজ। ২৬ আগস্ট নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয় ভারতের কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে নাট্যদল পূর্ব-পশ্চিম আয়োজিত আর্ন্তজাতিক রবীন্দ্রনাট্য উৎসবে। পরের দিন ২৭ আগস্ট আরেকটি প্রদর্শনী হয় শান্তিনিকেতনে।

বাংলাদেশের কোনো নাট্যদলের শান্তিনিকেতনে এটিই ছিল প্রথম রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চায়ন। ইতিমধ্যে নাটকটির ১২টি প্রদর্শনী হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে ছিল উপচেপড়া দর্শকের ভিড়। নাটকটিকে বর্তমানে ঢাকার মঞ্চের সবচেয়ে মঞ্চসফল ও দর্শকপ্রিয় নাটকে পরিণত করেছে। ২৪ ডিসেম্বর থিয়েটার আর্ট ইউনিট মঞ্চে আনে

মোহাম্মদ বারীর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' নাটক। উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয় জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে।

এ আলোচনায় উঠে আসা তথ্যে একটি বিষয় পরিষ্কার বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের থিয়েটার চর্চায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের ব্যাপক মঞ্চায়ন হয়তো হয়নি কিন্তু আবার খুব কম হয়েছে এমনও বলা যাবে না। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের থিয়েটার চর্চায় ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রতি নাট্যকর্মী ও নাট্যজনদের আগ্রহ বাড়ছে। এই বাড়তি আগ্রহের ধারাবাহিকতায় হয়তো একসময় বাঙালির শুদ্ধ নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠবে প্রধান অবলম্বন।

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে নাটক রচনা : ধারা ও বিবর্তন

আ ব দু ল্লা হ আ ল - মা মু ন

বাংলায় যারা কথা বলেন, ভাবের আদান-প্রদান করেন, বাংলা সংস্কৃতিচর্চা করেন, পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বলয়গুলো যাদের বাংলা রীতিনীতি দ্বারা আনন্দিত এবং জর্জরিত, তাদের জীবনে বাংলা নাট্যচর্চা সঠিক অর্থে দানা বাঁধে বাংলা ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনের পর। রক্তক্ষয়ী এক মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই ভূখণ্ড, বাংলাদেশ, বাঙালিদের শুধু স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বই প্রদান করেনি, এককথায় পুনর্বাসিত করেছে, পূর্ণোদ্যমে জাগরিত করেছে বাঙালির আত্মা। বাঙালির শিল্প এবং সংস্কৃতি পাকিস্তান নামক এক বিভীষিকার হাত থেকে সগৌরবে মুক্তিলাভ করেই

বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে সামনে এগিয়ে চলে। যেন-বা 'শুয়ে বসে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে হে, আর নয়। এবার বনবাদাড় ভেঙে ছোটা যাক', ভাবটা ছিল এইরকম। এ একেবারে শুরুর কথা- পরবর্তীকালে অবশ্য বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা অর্জন এইসব মৌলিক প্রশ্নেই নোংরা টানাটানি শুরু হয়ে যায়। টানাটানি এখনও চলছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির মাঝিমাল্লাদের বৈঠা মারা, গুণ টানা এইসব মূল কাজ বাদ দিয়ে আসল নদীটাকেই পুনর্সংস্কারের কাজে নেমে পড়তে হচ্ছে বারেবারে। বর্তমান পরিস্থিতিটা আলোচনায় আনলাম এই জন্য যে, তাতে করে ঐতিহ্য নির্মাণের ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষা করা যায়। মুনীর চৌধুরীর 'রাজার জন্মদিনে' থেকে মামনুর রশীদের 'জয়জয়ন্তী' কিংবা সেলিম আল দীনের 'যৈবতী কন্যার মন' পর্যন্ত আসাটা স্বপ্নের মাঝখান দিয়ে হয়নি। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো আমাদের নাটক কখনোই রাতের বিছানা পরিত্যাগ করে মহিলা সমিতি পর্যন্ত আসেনি। নিজস্ব ঐতিহ্য নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ভুলপথে এগিয়েছি। ফিরে এসেছি। আবারও বিভ্রান্ত হয়ে আরেকটা ভুলপথে পা রেখেছি। অবশ্য একথাও সত্যি যে, এগিয়ে চলার পথটা বেশি মাত্রায় মসৃণ ছিল না, বাধাহীন ছিল না একথা তো বলাই বাহুল্য। বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। উনিশ' সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টটাকেই যাত্রারম্ভের আনুষ্ঠানিক দিনক্ষণ ধরে এগোনো যাক। তার আগের ইতিহাস এতটাই দূরের এবং এতটাই জটিল যে তা দু'কথায় শেষ হওয়ার মতো নয়। এটা গবেষকদের কাজ এবং কঠিন কাজ। এই স্বল্প পরিসরে ওদিকে না যাওয়াই ভালো।

একথা তো জানা যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মলাভ করার সময় রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে পাকিস্তানের এই অংশে একটা বড়রকম সাংস্কৃতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই সাংস্কৃতিক শূন্যতার সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের স্রষ্টা এবং শাসকেরা। সুযোগ গ্রহণ করার কথাই ছিল। কেননা তারা তো পাকিস্তানি তৈরি করার সময়ই পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের প্রাপ্তিযোগটাকে ফাও হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। অনেকে এটাকে উটকো ঝামেলাও ভেবেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নামক উটকো ঝামেলা বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্ত ানিদের মহাঝামেলায় ফেলে দেয়। পাকিস্তানের মানচিত্রটাই পাল্টে যায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণ এবং সংরক্ষণের প্রশ্নটা যখন পাকিস্তানি শাসকরা হাতে নিলেন, তখন লক্ষণীয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভাষারীতি এবং জীবনযাপনরীতির প্রতি তারা বিন্দুমাত্র গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনও বোধ করলেন না। পাকিস্তানের জনক জিন্নাহ সাহেব তো ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়েই বলে দিলেন, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পরের ইতিহাস সবার জানা। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানিরা যখন বাঙালির বুকের ওপর বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছেন, তখন ঢাকায় বসবাসকারী এক পাকিস্তানি মন্ত্রী ফস করে বলে দিলেন, রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানবিরোধী। সুতরাং বেতার-টেলিভিশনে নিষিদ্ধ। এর পরের ইতিহাসও আমাদের জানা। এরকম একটা

গোলমেলে পরিস্থিতিতে নাট্যচর্চা যা হয়েছে তা একেবারেই অনুল্লেখ্য বলা যায়। যতদূর জানা যায়, সে সময়ে ভারতীয় নাট্যকারদের নাটকই ছিটেফোঁটা অভিনীত হয়েছে। বাঙালি নাট্যকাররা তখনও ঠিক সামলে উঠতে পারেনি। যদিও সুকুমার বিশ্বাস জানান, ১৯৪৬ সালের ২১ জুলাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে মুনীর চৌধুরীর ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'রাজার জন্মদিনে' নাট্যকারের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকে ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি নাট্যকারদের অনুরাগ লক্ষ করা যায়। এ সময়ের নেতৃস্থানীয় নাট্যকারের মধ্যে ছিলেন আকবর উদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, শাহাদৎ হোসেন, ইব্রাহীম খলিল প্রমুখ। পাশাপাশি একটা ভিন্নধারার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। জীবন-ঘনিষ্ঠ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন শওকত ওসমান, আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখ। ঐতিহাসিক নাটক রচনার পেছনে সে সময়ের নাট্যকারদের যে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা নিঃসন্দেহে পাকিস্তান সৃষ্টি। পাকিস্তানকেই তারা তাদের পরম পাওয়া বিবেচনা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, পাকিস্তান-সৃষ্টির পেছনে ধর্মকে ব্যবহারের যে দুরভিসন্ধি সক্রিয় ছিল আমাদের এই শ্রদ্ধেয় নাট্যকারেরা সে বিষয়ে যে একেবারেই অচেতন, অমনোযোগী ছিলেন, তা বলা যায় না। ফলে আকবর উদ্দীনের 'সিন্ধু বিজয়', 'আজান' শাহাদৎ হোসেনের 'সরফরাজ খাঁ', 'মসনদের মোহ', ইব্রাহীম খাঁর 'কামাল পাশা', ইব্রাহীম খলিলের 'স্পেন বিজয়ী মুসা' এসব নাটক বাংলা ভূখণ্ডের বাঙালি নাট্যঐতিহ্য রচনায় খুব একটা কাজে লাগেনি। এ যেন 'ওরাও নাটক লিখছে, তাই আমরাও লিখি' এ ধরনের মনমানসিকতার প্রকাশ। আজ এতকাল পরে একথা বলা অন্যায় হয় না যে, কেবল গবেষণাসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার ছাড়া এই নাটকগুলোকে ব্যবহারের আর কোনো সুযোগ নেই। নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট দুর্বলতা এবং ক্ষণে অতিনাটকীয়তা এগুলোকে ন্যূনতম শিক্ষাসামগ্রী হিসেবে ব্যবহারেও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে না।

পক্ষান্তরে যে সময়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ অপরাপর নাট্যকারদের হাতেগোনা কতিপয় নাট্যসৃষ্টি আমাদের কৌতূহলী করে।

বুঝিবা এ ভূখণ্ডের নাট্যঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধানের কাজটা এখান থেকেই শুরু করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে শওকত ওসমানের সামাজিক নাটক 'তস্কর ও লস্কর', 'কাঁকরমনি', 'আমলার মামলা' প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখে। তীব্র সমাজসচেতন, প্রগতিশীল এবং কুশলী নাট্যকার শওকত ওসমান বাংলাদেশে সার্থক প্রহসন রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম।

নাট্যচর্চার সবচাইতে বেগবান শাখা অভিনয়। এ শাখায় বৈচিত্র্য উপস্থাপন নাটককে মনোগ্রাহী ও জনপ্রিয় করে তোলে। অভিনয়ের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একক অভিনয় আজ পরীক্ষিতভাবে সফল ও জনপ্রিয় একটা উপস্থাপনা। বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চে একক অভিনয় অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। 'নেমোসিস' এমনি একটি নাটক। রচয়িতা নুরুল মোমেন। একটিমাত্র চরিত্র এবং একটাই দৃশ্য এই নাটকে। জানা যায়

যে, নাটকটি অভিনীত হওয়ামাত্র দর্শকদের শুধু চমৎকৃত করেনি, নাট্যকার নুরুল মোমেনের একটি সাহসী ও সার্থক সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতিও লাভ করে। নুরুল মোমেন একটা দীর্ঘসময় আমাদের নাট্যাঙ্গনে একজন কর্মঠ নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে বিরাজ করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে নাম করা যায় *রূপান্তর*, *যদি এমন* হত, *আলোছায়া*, *নয়া খান্দান*, *আইনের অন্তরালে* প্রভৃতি। নুরুল মোমেন নাটকের সংলাপ রচনায় বেশি মনোযোগী ছিলেন। প্রহসনধর্মী সংলাপ রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার সামান্যতম সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি।

পক্ষান্তরে তাঁরই প্রায় সমসাময়িক আরেকজন বিশিষ্ট নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ নাটকের শরীর নির্মাণেই বেশি মনোযোগী ছিলেন তাঁর নাট্যরচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে। যদিও তাঁর প্রথম নাটক 'বিরোধ', যা তিনি স্কুলজীবনে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, নাটক হিসেবে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে না। কিন্তু পরের নাটক পদক্ষেপেই তিনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। প্রশংসনীয় সমাজমনস্কতা এবং নাট্যরীতিতে আধুনিকতার প্রবর্তন আসকার ইবনে শাইখকে সহসাই একজন প্রয়োজনীয় নাট্যকার করে তোলে। তাঁর 'বিদ্রোহী পদ্মা' আমাদের একটি প্রধান জনপদে পদ্মাপারের মানুষদের জীবনসংগ্রামকে মূর্ত করে। নাট্যকার এই নাটকে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের অনিবার্য সংঘর্ষ এবং পরিণতিতে অত্যাচারিতের বিজয়ের কথা বলেছেন। এ ধরনের মনস্কমনা আমাদের নাট্যকারদের প্রধান অংশের মধ্যে আজও বর্তমান। মনে হয়, নাট্যকাররা যেন নাটকের পরিণতিতে মার খাওয়া মানুষ এবং তাদের ঘৃণাবোধকে সমুন্নত রাখার একটা বিশেষ দায়িত্ব সর্বকালেই বোধ করেন। পরবর্তীকালের নাট্যকারদের এই মনস্কমনা নানারকম মঞ্চ প্রয়োগরীতির কল্যাণে এবং ধ্রুপদী অভিনয় ভঙ্গির প্রলেপে বহুল পরিমাণে পরিশীলিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য। আজকের নাট্যকার জানেন, তিনি অগ্রসর দর্শকের সামনে উপস্থিত। এই অগ্রসর দর্শককে বলে দিতে হয় না না কে কী। কিন্তু কয়েক যুগ আগের কথা ভাবা যাক তো। তখনকার দিনে নাট্যকারকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও আদর্শবাদী, প্রচার বা স্লোগানধর্মী, এসব অপবাদ মেনে নিতেই হত। আসকার ইবনে শাইখ তাঁর দীর্ঘ নাট্যজীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ধ্যানধারণা ও মনমানসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হননি। আধুনিকতার সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই তিনি পিছিয়ে এসেছেন মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায়। 'অনুবর্তন' কিংবা 'প্রচ্ছদপটে'র মতো আধুনিক রীতির নাট্যরচনার পাশাপাশি 'অগ্নিগিরি' কিংবা 'রক্তপদ্ম' রচনা করে তিনি পরবর্তী বংশধরদের তাঁর নাট্যঐতিহ্য অনুসরণে বারবার বিভ্রান্ত করেছেন। আমার ধারণা, অনুসরণ করার মতো যথেষ্ট গুণাগুণ তাঁর নাটকের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এই একটি কারণেই আসকার ইবনে শাইখ পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছেন। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

এই উপেক্ষার জন্য পরবর্তী বংশধরদের পুরাপুরি দায়ী করা চলে কি চলে না তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু একথা তো সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, লেখকের কোন রচনাটি কালকে অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হবে সেটা তো কালই নির্ধারণ করবে। কালোত্তীর্ণ রচনা যে সময় রচিত হয় কাল তো সে সময় শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে, পরে, অনেক পরে একেকটি রচনা কালকে অতিক্রম করে যায়। যেমন মুনীর চৌধুরীর নাটক 'কবর'। দীর্ঘকাল এই ভূখণ্ডের দর্শকদের কাছে শুধু বিনোদন হিসেবে পরিগণিত নাটক মুনীর চৌধুরীর এই অমর সৃষ্টি পরিণতিতে নতুন মাত্রা পায়। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পেছনে অন্যতম শক্তিশালী সহায়ক শক্তি যে ভাষা আন্দোলন সেই পটভূমিতে রচিত 'কবর' এ দেশে প্রতিবাদী নাটকের শুভসূচনা করে। বস্তুত স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার যে একটি স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের নাটকগুলোতে, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' পরোক্ষভাবে হলেও সেখানে ভাব-সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে। 'কবর' পরবর্তীকালে বারবার অভিনীত হয়ে প্রমাণ করে এ নাটক কখনোই অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার নয়। মুনীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত বাকপটুতা তার সংলাপকে সমৃদ্ধ করেছে। সহজ সংলাপ, কম কথার সংলাপ, তির্যক সংলাপ নাটককে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলে, এ সত্যটি প্রমাণিত হয় তাঁর অন্যান্য নাটকেও। *চিঠি*, *দণ্ড* , *দণ্ডধর*, *মানুষ*, *মর্মান্তিক*, মুনীর চৌধুরীর প্রতিটি নাটকে তিনি যে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, সমাজমনস্কতা ও সমসাময়িকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা পরবর্তীকালের নাট্যকারদের কাছে মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীকে অনুসরণ করার কাজ চলতেই থাকবে।

আমার একটা ব্যক্তিগত খেদ আছে। অনেক কাজের কাজি, সব্যসাচী লেখকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি, সব কাজ শেষ করে বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাটক ধরেন। অর্থাৎ নাট্যরচনা তাঁদের প্রাথমিক বা প্রধান কাজ হয় না। অথচ তাঁরা যখন নাটকের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেন, তখন তারা এমন চমক লাগান, এমনভাবে ঝলসে উঠেন যে, পরিতাপই হয় এই মর্মে যে, আহা তাঁরা কেন শুধুই নাটক লিখলেন না? রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখকে আমি পরিতাপের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাট্যরচনা তাঁকে অসাধারণত্ব প্রদান করেছে। তিনি যদি ছোটগল্প এবং উপন্যাস আদৌ রচনা না করে শুধুই নাটক লিখতেন তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়তো না। শিল্প-রীতি নির্মাণে এবং নির্ধারণে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা তাঁর প্রতিটি নাটককে পৃথকভাবে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। *বহিপীর*, *তরঙ্গভঙ্গ*, *সুড়ঙ্গ*, *উজানে মৃত্যু*, সব নাটকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি চমকপ্রদ মঞ্চআঙ্গিকও নির্মাণ করেছেন। নাট্যকার যখন নাটকের গোটা শরীরটা নিয়ে ভাবেন তখনই তিনি আপাদমস্তক নাট্যকার হয়ে যান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মঞ্চ উপস্থাপনা

সম্পর্কে যেসব দিক-নির্দেশনা তাঁর নাটকের সর্বত্রই বক্ষ্যমাণ করে দিয়েছেন তাতে এ-ও প্রতীয়মান হয় নাট্যকার হিসেবে তিনি এ বিষয়ে কতটা উদ্বিগ্ন, কতটা উৎকণ্ঠিত। নাট্যকারের এ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা এই শিল্পমাধ্যমটির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাই প্রমাণ করে।

লেখকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে নানারকম মতামত আছে। দায়বদ্ধতার সংজ্ঞাও সুনির্দিষ্ট নয়। একেকজনের কাছে দায়বদ্ধতার অর্থ একেক রকম। সবচেয়ে সহজ যে সংজ্ঞাটি এবং যেটা যে কেউ চট করে লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন সেটা হল, লেখক যেহেতু তিনি তাবৎ জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ। অর্থাৎ তিনি লিখবেন আর জনগোষ্ঠীর উপকার করবেন। শুধু উপকার, অপকার একবিন্দু নয়। এই সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম সারির শিকার হতে দেখা যায় নাটকের লেখকদের। নাটক যেহেতু পারফরমিং আর্ট, মঞ্চে একটা কিছু হয়, যা দেখা যায় এবং দেখেই মতামত দেয়া যায়, সেহেতু নাট্যকারদের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় হরহামেশাই। নানারকম মজাদার স্লোগান নিয়েই প্রধানত নাট্যকর্মীরা দর্শকদের দরবারে হাজির হন। নাটক সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার, নাটক সমাজের দর্পণ, নাটক মানেই প্রতিবাদ, এই ধরনের সুগ্রথিত স্লোগানে সবার আগে ধরাশায়ী হন নাট্যকার। দর্শক নাট্যকর্মের চারসীমানার মধ্যে নাট্যকারদেরকেই প্রথম শনাক্ত করেন। তাই দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার একটা বাসনা সিংহভাগ নাট্যকারের মনেই জেগে থাকে, কম আর বেশি। নাটককে দর্শকপ্রিয়তা পেতে হবে এ কথাটা যেমন একদিকে খাঁটি তেমনি নাট্যকার স্বাধীনভাবে নাটক লিখবেন, এটাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সৌভাগ্য, একেবারে স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করতে চান এমন নাট্যকারও আমাদের মাঝে আছেন। এঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে চরিত্র গঠন, সংলাপ বিন্যাসে এবং ঘটনা পরম্পরা নির্ধারণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন। *কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়* এসব ব্যতিক্রমী নাট্যপ্রয়াসের জনক সাঈদ আহমদ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই অপ্রচলিত ধারায় চলছেন। এবং বলা যায়, বেশ ভালোমতোই চলেছেন। আমাদের নাট্যঐতিহ্য নির্মাণে তাঁর নাট্যপ্রয়াস কখনোই দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, absurd বা abstract ধর্মী এসব নাটকে সাঈদ আহমদ আমাদের দেশজ মালমসলাই ব্যবহার করেছেন। শিয়াল ও কুমিরছানা গল্পের ব্যবহার, দুর্ভিক্ষের চিত্রায়ণ তাঁর নাটকগুলোকে কমবেশি দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও সামগ্রিক নাট্যধারায় মূল্যবান সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সাঈদ আহমদ তাঁর নাট্যকর্মের জন্য দেশে যতটা-না সমাদৃত হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন বিদেশে। অনেকে এই প্রবণতার সমালোচনা করেন। কিন্তু আমার ধারণা, এতে আমাদের উপকারই হয়েছে। বাংলাদেশের নাটক বিদেশি নাট্যমনস্ক ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তবে সাঈদ আহমদ আমাদের মঞ্চের জন্য আরো কিছু কাজ করলে বেশ হত।

একাত্তরের আগে আরো অনেকেই নাটক লিখেছেন, কোনোরকম ধারাবাহিকতা ছাড়াই। যাকে বলা যায় ছুটকাছাটকা প্রয়াস। এসব নাট্যকারের নাটকের উল্লেখ প্রধানত গবেষণাপত্র কিংবা বিভিন্ন বারোয়ারি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কোনো কোনো নাটক পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে, কিন্তু অভিনীত হয়নি। কোনো কোনোটি আবার দু'একবার অভিনীত হয়েই গবেষকদের খোরাক হয়ে গেছে। তবে আমরা যেহেতু ঐতিহ্য সন্ধান করছি, আমাদের নাটকের বিবর্তনের কথা বলছি সেহেতু, কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই বলি *মানচিত্র* ও *অ্যালবাম* নাটক দুটির কথা। নাট্যকার আনিস চৌধুরী। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিফলন আছে দুটো নাটকেই। কাহিনী অনেকটা ছিঁচকাঁদুনে বাংলা সিনেমার মতো হলেও চরিত্র-চিত্রণ বাস্তবানুগ, সংলাপ খুবই সহজ-সরল এবং সর্বোপরি নাটক দুটো একটা সময়কে ধরে রেখেছে। সিকান্দার আবু জাফর মূলত একজন কবি ও গীতিকার হয়েও অন্তত তিনটি ভালো নাটক আমাদের দিয়েছেন। তাঁর প্রধান রচনা 'সিরাজ-উদ-দৌলা' নাটকে তিনি যতটা-না একজন সফল নাট্যকার তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি একজন সাহসী নাট্যকার। কেননা অক্ষয়কুমার মৈত্র, গিরিশ ঘোষ, শচীন সেনগুপ্তের জনপ্রিয় রচনাগুলোকে পাশ কাটিয়ে সিকান্দার আবু জাফর সম্পূর্ণ নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সিরাজ-উদ-দৌলাকে আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রয়াস সর্বাংশে সফল হয়েছে একথা বলা যাবে না। তবে বহুল ব্যবহৃত একটি অতিচেনা চরিত্রকে নতুনভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব আছে বৈ কি। সিকান্দার আবু জাফরের অন্য নাটকগুলোর নাম 'মহাকবি আলাওল', 'মাকড়সা' ও 'শকুন্ত উপাখ্যান'। মূলত নাট্যমুহূর্ত সর্বাংশে নাটক করে তোলেনি।

এই পর্যায়ে আরেকটি ভিন্নধর্মী নাটকের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাস অবলম্বনে স্বয়ং শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদার রচনা করেন নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি'। এই নাটকের খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমল এবং বর্তমান কালকে একসূত্রে গেঁথে দেশ ও কালকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে প্রতীকাশ্রয়ী করা হয়েছে। নাটকে প্রতীকের ব্যবহার নতুন নয়। কিন্তু সার্থক ব্যবহার প্রায়শ হয় না। এদিক থেকে এই নাটকটি ব্যতিক্রম।

আমাদের নাট্যাঙ্গনে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব জিয়া হায়দায় রচিত নাটক 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' প্রতীকাশ্রয়ী নাটকের ক্ষেত্রে এমনই একটা ব্যতিক্রমী প্রয়াস যে এতে দাঁত ফোটানো মুশকিল। সমালোচকেরা যথার্থই বলেছেন, 'সুলিখিত সাহিত্য পাঠের অনাবিল স্বাদ ও আনন্দ এ নাটকে উপস্থিত।'

১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত এই ছিল মোটামুটি আমাদের নাটক রচনার হাল-হকিকত। সুচতুর পাকিস্তানি শাসকদের ঘনঘন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং নানাপ্রকার গণতন্ত্রের নিষ্পেষণ, নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে আমাদের পূর্বসূরিগণের কৃতিত্ব খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। প্রচণ্ড জেদ এবং সামনে রক্তিম সুদিনের অনিবার্যতায় দৃঢ়প্রত্যয়ী এই নাট্যকারগণ সংঘবদ্ধ নাট্যচর্চার অনুপস্থিতিতেই নাটক লিখেছেন, একথাটা

বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে নাটক অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ নেই, নাট্যদল নেই অর্থাৎ কোনো প্রেরণাই উপস্থিত নেই সে নাটক লেখার কাজটি মোটেই সহজ নয়। তবুও তাঁরা নাটক লিখেছেন, পরবর্তীকালের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের নাট্যধারা, যা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের নাট্য-ঐতিহ্য নির্মাণের কাজটা সহজ করে দিয়েছে।

১৯৭১ সালে সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবনধারাটাই বদলে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ এবং অর্জন এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জাতিসত্তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জাগিয়ে তোলে। এই ধাক্কা নাটকের গায়েও লাগে। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশের নাটক নতুনভাবে পাখা মেলতে শুরু করে। নতুন যে ব্যাপারটি এই পর্যায়ে অবশ্য লক্ষণীয় তা হল, যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীরা একেবারে গোড়াতেই প্রচলিত ধারার নাট্যচর্চার বাইরে অবস্থান নিলেন। বোঝা গেল তাঁরা নতুন একটা কিছু করতে চান। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই কিন্তু তাঁরা মুনীর চৌধুরী কিংবা আসকার ইবনে শাইখ কিংবা নুরুল মোমেনের নাটক হাতে নিলেন না। নতুন নাটক লিখলেন তাঁরা। সেলিম আল দীন লিখলেন ‘জন্ডিস এবং বিবিধ বেলুন’, ‘সংবাদ কার্টুন’, আল-মনসুর লিখলেন ‘বিদায় মোনালিসা’, ‘হে জনতা আরেকবার’, মামুনুর রশীদ লিখলেন ‘পশ্চিমের সিঁড়ি’। এভাবে শুরু হল। একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর এরকমই হয়। হঠাৎ করে সব একসাথে শুরু হয়ে যায়। নিয়মনীতির বালাই থাকে না। নতুন কিছু করা দরকার, সেটাই আসল কথা। তরুণ নাট্যকর্মীদের প্রাথমিক অস্থিরতা একসময় সুস্থির হয়ে আসে। সারাদেশেও ধ্বংসের পর গঠনের কাজ শুরু হয়। নাট্যকর্মীরা নতুন নাটক, নতুন মঞ্চ এসব বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। ১৯৭২-৭৩-এ বাংলাদেশে দর্শনীয় বিনিময়ে নাট্যাভিনয়ের মতো অকল্পনীয় ব্যাপারটি ঘটে যায়। নতুন যে নাট্যচর্চা দর্শকদের আশীর্বাদ পেয়ে জোরেশোরে শুরু হয়ে যায় সেটাই একসময় গ্রুপ থিয়েটার অভিধা পায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারভিত্তিক নাট্যচর্চা অব্যাহত আছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নাট্যরচনার ধারায় ছোটখাটো বিপ্লবই ঘটে যায়। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকারদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। হওয়ার কথাই। যুদ্ধ তো কোনো সামান্য ঘটনা নয়। আর মুক্তিযুদ্ধ তো যে-কোনো জাতির জন্যই এক পরম পাওয়া। এই পর্যায়ে বিশেষ করে তরুণ নাট্যকারদেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সেলিদ আল-দীন, আল-মনসুর, হাবিবুল হাসান, কবীর আনোয়ার, মামুনুর রশীদ প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বেশকিছু নাটক রচনা করেন। লক্ষণীয় যে, এই নাটকগুলো রচনাকালেই অভিনীত হওয়ার আগাম প্রতিশ্রুতি পেয়ে যায়। অর্থাৎ অভিনীত হওয়ার জন্যই রচিত হয় এই নাটক। স্বাধীনতার আগের নাট্যরচনার সাথে পরের নাট্যরচনার এটা এক মৌলিক পার্থক্য। এখন বাংলাদেশের নাট্যকারকে তার রচিত নাটকের মঞ্চরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য

অনিশ্চয়তায় অপেক্ষমান থাকতে হয় না। এখন তাঁর নাটক মঞ্চে যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়েই থাকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সিংহভাগ নাট্যকার তাই নাট্যরচনা করছেন মূলত মঞ্চায়িত হওয়ার লক্ষ্যেই। স্বাধীনতা অর্জনের পর গত চব্বিশ-পঁচিশ বছরে মৌলিক নাটক রচনার পাশাপাশি রূপান্তরিত নাটকের কাজও হয়েছে। মৌলিক নাটকের সংখ্যাই বেশি। যদিও এই সংখ্যাকে কোনো অবস্থাতেই যথেষ্ট বলা যাবে না।

বাংলাদেশে নাটক রচনার মালমসলা সন্ধানের জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। বলা যায়, নাট্যকার হাতের কাছেই সব পেয়ে যান। চূড়ান্ত বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারটি নির্ভর করে নাট্যকারের মনমানসিকতার ওপর। কোনো কোনো বিষয় কারো কারো কাছে সহসাই অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। সৈয়দ শামসুল হক তার নাট্যকার জীবনের প্রথম নাটকটিই লিখেন স্বাধীনতা নিয়ে। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' আমাদের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নতুন মাত্রাটি যোগ করে তা হল নাট্যকার এই নাটকটি লিখেছেন কাব্যরীতিতে। একটি সফল কাব্যনাটক হিসেবে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' আমাদের নাট্যঐতিহ্যে পাকা আসন করে নিয়েছে। একই লেখকের নাটক 'নূরুলদীনের সারাজীবন', 'এখানে এখন', 'ঈর্ষা' ও 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ', আমাদের নাট্যরচনার ক্ষেত্রটিকে বেগবান করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ঝলসে ওঠা নাটক লিখেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকার মমতাজউদ্‌দীন আহমদ। প্রবল আবেগ এবং তীব্র নাটকীয়তায় উচ্চকিত নাটক লিখতে তিনি ভালোবাসেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, হরিণ চিতা চিল, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, রাজা অনুস্বারের পালা, ফলাফল নিম্নচাপ* প্রভৃতি। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'ফলাফল নিম্নচাপ'। এই নাটকের অন্তত একটি সংলাপটি ছিল ইংরেজি ভাষায়, 'I am proud of you, my son', তথাপি আমার মনে হয়েছে ঐ নাট্যমুহূর্ত নাট্যকার যথার্থভাবেই ভিন্নভাষা প্রয়োগ করেছেন। এই নাট্যকারের আরেকটি নাটক 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' আমাদের জাতীয় জীবনের একটা দুঃসময়কে ধরে রেখেছে এবং অত্যন্ত মনোগ্রাহী ভঙ্গিতে ঐ দুঃসময়ের নায়ককে একেবারে দিগম্বর করে ছেড়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তরকালে সমাসাময়িক জীবন, সামাজিক অসঙ্গতি, পারিবারিক অবিচার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা নিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন লিখেছেন নাটক *সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, সেনাপতি, এখনও ক্রীতদাস, তোমরাই, কোকিলারা, স্পর্ধা, মেরাজ ফকিরের মা।*

মামুনুর রশীদের নাম আগেও উল্লিখিত হয়েছে একাধিকবার। মামুনুর রশীদ শ্রেণীসংগ্রাম, সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ, মধ্যস্বত্বভোগী টাউট-দালাল, লিখেছেন সফল এবং জনপ্রিয় নাটক *ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, ইবলিশ, গিনিপিগ,*

সমতট, মানুষ, এখানে নোঙর, জয়জয়ন্তী। তাঁর নাটকে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষমতাপ্রত্যাশী এবং গণবিরোধী রাজনীতির চেহারাটা অনেকখানি উচ্চকিত।

সেলিম আল দীন 'জন্ডিস এবং বিবিধ বেলুন' থেকে শুরু করে 'সংবাদ কার্টুন', 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি', 'শকুন্তলা', 'কীর্তন খোলা', 'কেরামত মঙ্গল' হয়ে 'যৈবতী কন্যার মন' পর্যন্ত ইতোমধ্যে এসে গেছেন। তাঁর প্রতিটি নাট্যরচনায় তিনি মঞ্চ প্রয়োগরীতি নিয়ে অসাধারণ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেন। এটা তাঁর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মঞ্চমনস্কতা একজন নাট্যকারকে কতখানি বহুমাত্রিক করে তোলে সেটা তাঁর যে-কোনো নাটকের অভিনয় দেখলেই বোঝা যায়। সেলিম আল দীনের নাট্যরচনায় লোকজ ঐতিহ্যের নিরন্তর অনুসন্ধান এবং যথাযথ প্রয়োগ আমাদের নাট্যঐতিহ্য নির্মাণে আমাদের অনেকখানি এগিয়ে দেয়। নাট্য প্রয়োগরীতিতে নবউদ্ভাবন একজন নাট্যকারকে একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকের নাট্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করতেই পারে। বিশেষ করে নাট্যকার স্বয়ং যদি তার নিজের নাটকের প্রয়োগ প্রধান হন। ঠিক এমনটাই ঘটেছে নাট্যকার এসএম সোলায়মানের ক্ষেত্রে। এসএম সোলায়মান সামাজিক অসঙ্গতি, ধর্মীয় অনাচার এবং রাজনৈতিক শোষণ, এইসব বিষয়কে উপজীব্য করে লিখেছেন নাটক 'ইঙ্গিত', 'ক্ষ্যাপা পাগলের প্যাঁচাল'। সোলায়মান তাঁর নাটকগুলোতে নৃত্যগীতের ব্যবহার করেন অকৃপণভাবে। এটা তাঁর নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্যও বটে।

অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠদের ঠিক পাশাপাশি না হলেও, দু'এক পা পেছনে থেকে আরো যাঁরা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, *দিক চিহ্নহীন, জনৈকের মহাপ্রয়াণ, প্রেক্ষিত : শাহজাহান ও একাল* নাটকের রচয়িতা কাজী জাকির হাসান, গাজী কালু চম্পাবতী, *বিবর্তনের শেষ সনদ ও সুখী রমণী গুণাইবিবির কিচ্ছার* রচয়িতা নামজুল হাসান, *সাতপুরুষের ঋণ, নানকার পালার* রচয়িতা আবদুল্লাহিল মাহমুদ এবং *পাথর, খেলা খেলা, ইঁদারা* নাটকের রচয়িতা মান্নান হীরা।

সত্তরের দশকে একের পর এক অনেক নাটক লিখেছেন কল্যাণ মিত্র। বাংলাদেশের সর্বত্র রাতের পর রাত অভিনীত হয়েছে কল্যাণ মিত্রের নাটক। কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের যে, তাঁর নাটকগুলো কালের ধোপে টেকেনি। বলা যায় নাটকগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অন্যের মডেল সামনে রেখে শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন গৎবাঁধা কোনো রচনাই প্রজন্মের আনুকূল্য লাভ করে না। শেখ আকরাম আলী এবং আবদুল মতিন খান সত্তরের দশকে বেশ কিছু ভালো নাটক লিখেছেন।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে মঞ্চোপযোগী নতুন নতুন নাটকের দুর্ভিক্ষ চলছে। হাতেগোনা নাট্যকারের মধ্যে প্রায় সবাই কোনো না কোনো গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িত। তাঁরা নিজের দলের নাট্যচাহিদা মেটাতেই গলদঘর্ম হচ্ছেন। ওদিকে আশকারা পাওয়া দর্শকদের ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। Demand এবং Supply-এর মাঝখানে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের জন্য দলগুলো রূপান্তর

নাটকের শরীর খামচে ধরছেন। রূপান্তর নাটক কোনো খারাপ বস্তু নয়। বরং বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরগুলোর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এগুলো পাওয়াও গেছে অত্যন্ত পোক্ত হাত থেকে। এই পোক্ত হাতের মালিকদের মধ্যে আছেন কবীর চৌধুরী, আবুল ফজল, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, আতাউর রহমান, আবদার রশীদ, জামিল আহমেদ, তারিক আনাম খান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনিসুজ্জামান, নরেন বিশ্বাস প্রমুখ। আমার আপত্তি এঁদের কাজ নিয়ে নয়। এঁদের আমি তাঁদের অনুপম সৃষ্টির জন্য অভিনন্দন জানাই। আমার আপত্তি সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু নাট্যদলের ক্রমবর্ধমান মলিয়ের-প্রীতি। ঢাকার বিভিন্ন মঞ্চে রূপান্তরিত মলিয়ের এতটাই নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছেন যে, যে কেউ ভাবতে পারেন ভদ্রলোক বুঝি বাংলাদেশেরই পুত্র কিংবা জামাতা। মলিয়ের-প্রীতিতেও আমার আপত্তি নেই। যদি সেটা যথার্থ আন্তরিক এবং কপটতাশূন্য হয়। অর্থাৎ মঞ্চায়িত নাটকগুলো যদি মলিয়েরের যথাযথ রূপান্তর হয়। কিন্তু দেখেছি এবং শুনেছি মুষ্টিমেয় কয়েকটি রূপান্তর ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মলিয়ের যথার্থভাবে রূপান্তরিত হচ্ছেন না। যেনতেন প্রকারে শুধুই ভাঁড়ামি এবং ফচকেমির মাধ্যমে নাট্যায়িত হচ্ছেন। কখনো কখনো চূড়ান্ত অশ্লীলতাও করা হচ্ছে। এইসব রূপান্তরের ব্যাপারটি ভয়াবহ দুটো কারণে। এক, বিশ্বখ্যাত একজন নাট্যকার বাংলাদেশের মঞ্চে বিকৃত তথা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, যা আমাদের জন্য খুবই গ্লানিকর। দুই, বক্সঅফিসের আনুকূল্য লাভের লক্ষ্যে দর্শকদের অযথাই হাসাহাসির আফিম গেলানো হচ্ছে, যা সিরিয়াস নাট্যাভিনয়ের প্রচুর ক্ষতি করছে।

বহুদিন আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খেদভরে বলেছিলেন 'অলীক কুনাট্যে মজি' ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাদেশের নাট্যধারাতেও দুষ্ট ক্ষতের মতো কিছু অপপ্রয়াস অলীক কুনাট্যের যোগান দিচ্ছে দেখতে পাই। সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে রাজাকারেরাও নাটক ধরেছে। এরা নাটক করছে 'অজেয় বসনিয়া'। দুঃখ হয়, ক্রোধ হয় প্রয়াত প্রখ্যাত চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন লক্ষ্মীটারীর মতো বাংলাদেশের অগণিত অর্ধসভ্য, ক্ষুধার্ত-অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনপদের দুঃসংবাদে যখন বাংলাদেশের বিবেককে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন, তখন এই সব রাজাকারেরা বসনিয়া নিয়ে দাপাদাপি করছে। এদের বাধা দেয়া দরকার। বাংলাদেশের মঞ্চ এক মহান মুক্তিযুদ্ধের ফসল, স্বাধীনতার টগবগে উপহার। এই পবিত্র মঞ্চে এইসব নাটক আমাদের নাট্যধারাকেই কলুষিত করে চলেছে। সুতরাং এই রাজাকারদের আমাদের মঞ্চ থেকে অবিলম্বে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা আবশ্যক।

উৎস : থিয়েটার, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা।

বাংলাদেশের নাটকের বিষয়: রূপ ও রূপান্তর

মো হা ম্ম দ জ য় নু দ্দী ন

যুদ্ধ করে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে নাট্যজন মমতাজউদদীন আহমদ বলেন, 'নাটক এলো, রক্ত মেখে, সংলাপ এলো করিম বাওয়ালীর মুখে। এদেশে থিয়েটারে পায়ের আওয়াজ গেল মহররমের ধুলার লাহান।' এটা নিছক আবেগ বা উচ্ছ্বাসের কথা নয়, স্বাধীন দেশে নাট্যচর্চার উর্বর পরিবেশ ও স্বরূপসম্পর্কিত আশাবাদ। এই আশায় ভর করে এবং নিরন্তর নাট্যকর্মসাধনার সুষ্ঠু সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের নাটক। বিষয়বৈচিত্র্য, বহুমাত্রিক রূপ ও শিল্পিত রূপান্তরে বাংলাদেশের নাট্যভুবনে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে পিছিয়ে নেই, বরং বহুলাংশে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে।

নাটক সমবায়ী শিল্পকর্ম। সব পর্যায়ের শিল্পীর মনন ও শ্রমনিষ্ঠ প্রয়োগ-প্রকৌশলই সফল নাট্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এমনটি সবসময় হয় না বলে নাটক সাহিত্যের অপর শ্রেণীবিন্যাস থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে; যদিও কোনো কোনো দেশে এর নির্মাণ-আড়ম্বর চোখ ধাঁধানোর মতো। বাংলা ভাষায় রাম নারায়ণ থেকে শুরু করে বাদল সরকার, মুনীর চৌধুরী, উৎপল দত্ত হয়ে আজকের মমতাজউদদীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন পর্যন্ত নাট্যচর্চার যে পথ; তা অপ্রশস্ত নয় বরং মাইকেলের হাতে নাটক পেয়েছে আধুনিকতার প্রথম আলো। তাঁর নাটকের চরিত্র উচ্চ কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। দীনবন্ধু নেমে এসেছেন নিম্নবিত্তের কাছাকাছি। গিরিশ ঘোষ তুলে ধরেছেন কলকাতার সমাজজীবনকে। আর রবীন্দ্রনাথ রূপক-সাংকেতিকের মাধ্যমে এক অদ্ভুত আবহের সৃষ্টি করেন তাঁর নাটকে। মাইকেল থেকে নাট্যসাফল্যের যে সূচনা, তার পূর্ণতা আসে সাতচল্লিশ-পূর্ব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞায়।

১৯৪৭-এ 'বঙ্গদেশ' ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববাংলা নাম ধারণ করে। পূর্ববাংলাই আজকের বাংলাদেশ। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান। নাট্যচর্চায় তাদের খানিকটা পিছিয়ে পড়ার কারণ জাতীয় জীবনের সর্ববিধ পশ্চাৎপদতা, সমাজের রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাব এবং নাট্যশালা সৃষ্টির প্রয়াসহীনতা। এ মন্তব্যের

সত্যতা স্বীকার করেও বলতে হয়, নাট্যচর্চা একেবারে থেমে থাকেনি। পাকিস্তানি আমলেও নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আনিস চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ প্রমুখ নাট্যরচনা করেন মঞ্চায়নের বাধা কিংবা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও। তাই বাংলাদেশের নাটক বলতে আমরা স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাউত্তর নাট্যকর্মকেই বোঝাব।

শিল্পসার্থকতার সর্বস্তর স্পর্শ না করলেও বাঙালির ঐতিহ্যনির্ভর একাধিক নাটক রচনার জন্যে আসকার ইবনে শাইখের অবদান অনস্বীকার্য। নুরুল মোমেন ও আনিস চৌধুরী যথাক্রমে *নেমেসিস* ও *মানচিত্র* লিখে যে সুনাম সঞ্চয় করেন, পরবর্তীকালে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সাঈদ আহমদ প্রতিভাবান নাট্যকার হিসেবে এদেশের জীবনভিত্তিক, পাশ্চাত্যচেতনাশ্রয়ী ও নিরীক্ষাধর্মী যেসব নাটক রচনা করেন; একাত্তর-পরবর্তী সময়ে একদল নবীন নাট্যকার তাকে বহুমুখীন ও ভিন্নমাত্রিক সাফল্য দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর এদেশে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, এটাই ছিল জনগণের ঐকান্তিক কাম্য। কার্যত তা হয়নি। জীবনযাপনে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাম বাড়তে বাড়তে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। শুরু হয় দুর্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন, কালোবাজারি। পাশাপাশি নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা-অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি। এমনি অবস্থার মধ্যে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। চিত্রকলা, কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং তাতে উপর্যুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিফলনও ঘটে প্রবলভাবে। নাটক মঞ্চায়নের ফলে সমাজজীবনের ঘটনাচিত্র দর্শকদের সজাগ করে, শাসকের টনক নড়ে, কার্যকর হয় নাট্যায়নের প্রচলিত বিধি-নিষেধ আইন। এতে নাট্যকারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়, জীবনধর্মী নাটক রচনার পথে সৃষ্টি হয় অন্তরালে। দেখা গেছে : কিছুসংখ্যক নাট্যামোদী মিলে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের অভিপ্রায়ে একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠন করলেন। কাজে নেমে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অর্থ নেই, মহড়া দেবার জায়গা নেই, পর্যাপ্ত মঞ্চ নেই, দর্শনীয় বিনিময়ে নাটক দেখার রুচিশীল দর্শক নেই, প্রশাসনের সুদৃশ্য নেই শেষে একদিন দেখা গেল তাঁরা নিজেরাও নেই। এমনি অবস্থার মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশের নাট্যশিল্পকে এগোতে হয়েছে। এবং আশার কথা; নিরন্তর সংগ্রাম-প্রচেষ্টায় নাট্যদলগুলো এখন সম্মানজনক অবস্থানে এসেছে। নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচিত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছেন প্রতিভাবান শিল্পী, নির্মিত হয়েছে নাট্যমঞ্চ, মঞ্চায়িত হচ্ছে ব্যয়বহুল নাটক এবং দর্শক উচ্চমূল্যে টিকেট কেটে দেখছেন সেসব নাটক। গঠিত হয়েছে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। আন্তর্জাতিক থিয়েটার গ্রুপের কার্যক্রমের সাথেও তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে স্বমহিমায়।

বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনের পেছনে রয়েছে ড্রামা সার্কেল, নাগরিক, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, নাট্যচক্র, আরণ্যক, পদাতিক, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী, তির্যক প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর কার্যক্রম। খুলনা নাট্য নিকেতন [১৯০০], পটুয়াখালী ড্রামাটিক ক্লাব

[১৯০১], দিনাজপুর নাট্য সমিতি [১৯১৩] প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড স্মরণ রেখেও বলতে হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ড্রামা সার্কেলই এদেশে প্রথম গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সূচনা করে। দেশি-বিদেশি নিরীক্ষাধর্মী নাটক মঞ্চায়ন করলেও এক পর্যায়ে এদেশের সাংগঠনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন দেশে তারা পুনরায় নবচেতনায় নাট্যায়নে মনোনিবেশ করে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে বিশ্বাসী নাট্যকর্মীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। প্রাসঙ্গিক প্রতিকূলতার কারণে স্বাধীনতার আগে এরা কোনো নাটক মঞ্চে আনতে পারেনি। 'দর্শনীয় বিনিময়ে নাটক দেখুন'-এ স্লোগান নিয়ে ১৯৭৩ থেকে তারা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করে। আসলে ১৯৭৩-ই বাংলাদেশের নাটকের জন্যে উজ্জ্বল বছর। এ-বছরই ঢাকা থিয়েটার গোষ্ঠীরও প্রতিষ্ঠা। অবশ্য এর আগের বছর থিয়েটার গোষ্ঠী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক মঞ্চায়ন ও নাট্যত্রৈমাসিক *থিয়েটার* পত্রিকা প্রকাশ করে সুনাম অর্জন করে। উপর্যুক্ত গোষ্ঠীসমূহের সমাজজীবনঘনিষ্ঠ ও নিরীক্ষাপ্রিয় নাট্যকার এবং তাঁদের নাট্যকর্মের ফলে শহরের মঞ্চ থেকে সরে যেতে হয় কল্যাণ মিত্র, প্রসাদ বিশ্বাসদের। এসব মঞ্চ অভিনেতাদের ফ্রিজ হওয়া, ফ্রিজ ভেঙে আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা, দর্শকদের মধ্য থেকে মঞ্চে ওঠা, হেলে-দুলে সেট সরানো, আলো-আঁধারি পরিবেশে হালকা মিউজিক কিংবা প্রতীকী কথাবার্তা, বিমূর্তভঙ্গি দর্শকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। অন্যদিকে পরিলক্ষিত হয় গ্রামে হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাইক বাজিয়ে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে *খুনে লাল বাংলা*, *রক্ত দিয়ে লেখা*, *জল্লাদের দরবার*, *সোনার বাংলা* প্রভৃতি নাটকের আবেগময় অভিনয়।

সাহিত্যমূল্যগুণে নাটক অধ্যয়নযোগ্য হলেও মঞ্চায়নের মাধ্যমেই এর প্রকৃত সাফল্য নির্ণীত হয়। দর্শক নাটকের বিষয়গুরুত্ব, নতুনত্ব ও নাট্যায়ন কৌশল দেখে বিমুগ্ধ এবং বিকশিত হতে চায়। নাট্যকারকে তাই সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ কিংবা সুদূর অতীতের বিষয়চিত্র আর ইতিহাস-পুরাণকে নবরূপায়ণে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়। বাংলাদেশের নাটকসমূহ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। ইতিহাস-পুরাণ-ঐতিহ্য এবং সমকালকে ধারণ করেই তার বেড়ে ওঠা। সামগ্রিক সমাজজীবন, ভাষা-সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, অবক্ষয়-বিসর্জন-অর্জন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এসবই বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয়-উপকরণ। আর প্রকরণে প্রধান্য পেয়েছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্মাণশৈলীর নিরীক্ষিত রূপ কিংবা প্রজ্ঞাদীপ্ত নাট্যকারের স্বনির্মিত রচনারীতি যা স্বদেশ ও স্বকালনির্ভর এবং সমৃদ্ধ রূপ-রূপান্তরের অভিনন্দিত।

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সাতচল্লিশ-পূর্ব অথবা সাতচল্লিশ-সমসাময়িক বাংলাদেশের নাটক ছিল সহজসরল জীবননির্ভর। গ্রামীণ কিংবা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শুদ্ধতম চেতনানির্ভর এসব নাটকের আঙ্গিক বা মঞ্চায়ন প্রক্রিয়াও ছিল সাদামাটা। বাহ্যিক কিংবা অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভাব নাটকের নাটকীয়তা সৃষ্টি, কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রের বিকাশে বিশেষ অন্তরায় হয়েছে। ইব্রাহীম খাঁ, শাহাদৎ হোসেন,

আকবরউদ্দীন, আবুল ফজল প্রমুখ নাট্যকারের নাট্যকর্মের কথা স্মরণ রেখেও বলতে হয় এ পর্যায়ের প্রথম সার্থক নাটক নুরুল মোমেনের নেমেসিস [র.কা. ১৯৪৪, প্র.কা. ১৯৪৮]। নাট্যকার নুরুল মোমেন [১৯০৬-১৯৯০], আসকার ইবনে শাইখ [১৯২৫-২০০৯] ও মুনীর চৌধুরী [১৯২৫-১৯৭১] ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশে শক্ত হাতে নাটকের হাল ধরেন। নাট্যবিষয়ে ও শিল্পাঙ্গিক আনেন পরিবর্তন।

নাটকে মুসলমানদের অবদান যখন খুবই সীমিত, তখন মোমেনের *রূপান্তর* ও *নেমেসিস* নাটকদ্বয় নাট্যামোদীদের আশার সঞ্চার করে। *রূপান্তর* কমেডি নাটক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ এদেশের অনেক যুবককে বিভ্রান্ত ও বিকৃত করে। তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছেড়ে উগ্র-আধুনিকতার স্রোত ভেসে যায়। নুরুল মোমেনের *রূপান্তর* এই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কথা ছিল রিজিয়ার সাথে রশিদ সংসার করবেন, কিন্তু বিলেত থেকে প্রকৌশলী হয়ে দেশে ফিরে রিজিয়াকে অনাধুনিক ভেবে ঘর বাঁধতে অস্বীকার করেন। 'ঘর-বিমুখ মন হন্যে হয়ে খোঁজে আধুনিকা'। এক পর্যায়ে রশিদের ভুল ভাঙে এবং আকৃষ্ট করে 'ডোবা ঘাসের ও ভিজা ধুলোর মিষ্টি গন্ধ'। রিজিয়াকেই করেন জীবনসঙ্গী। *রূপান্তর*-এর বিষয়মূল্য থাকলেও নাট্যিক সংগঠনশৈলীতে স্বয়ং নাট্যকার অতৃপ্ত ছিলেন। *নেমেসিস* সেই খামতি পূর্ণ করে। বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী বিষবাষ্প মানুষের জীবন ও জীবিকার মূলে মর্মান্তিক আঘাত হানে। অবিভক্ত ভারতবর্ষেও তা নেমে আসে। দুর্ভিক্ষকে উপজীব্য করে আবুল মনসুর আহমদ রচনা করেন অনবদ্য রম্যরচনা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এঁকেছেন অবিস্মরণীয় স্কেচ, আর নুরুল মোমেন রচনা করেন প্রচলিত প্রথাবিরোধী একক চরিত্রের অমূল্য নাটক *নেমেসিস*। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে কেউ হয়েছে পর্যুদস্ত, কেউ-বা গড়েছে বিত্তের পাহাড়। গরিব স্কুলশিক্ষক সুরজিত নন্দী স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সুলতাকে ভালোবাসা তার কাল হয়। লোভী নৃপেন বোস সুরজিতের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেন বিশেষ শর্তসাপেক্ষে, 'যদি তুমি তিন মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা না করতে পার তবে তোমার এ বিবাহ অস্বীকৃত হবে।' ফলে টাকা সংগ্রহের নেশা তাঁকে বিবেকহীন ঘৃণ্য মানুষে পরিণত করে। কালোবাজারি ধরে ধনবান হলেও তিনি মানসিক শান্তি পাননি। ফেলে আসা শুদ্ধ জীবনবোধের দংশন ও বিবেকের পীড়নে তিনি ছটফট করেন : 'বাঙলা আজ নরকের ধূমায়িত অগ্নির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা বাংলাকে এ দশায় পরিণত করেছে, যারা মানুষ হয়ে মানুষকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেছে, তারা কি রেহাই পাবে? Nemesis, প্রতিহিংসা দেবী, একবার ফিরে চাইবে না?' পরিশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই বলেছেন, 'I paid the penalty with my life and saved my generations.' চল্লিশ দশকের এ নাটকটিকে কেউ কেউ 'যুগদর্পন' ও 'বিশ্বমানের' নাটক হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাঁর পরবর্তীকালে

রচিত যদি এমন হত, *আলোছায়া, শতকরা আশি* প্রভৃতি নাটক শিল্পসাফল্যের চেয়ে বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক প্রচারধর্মিতাই প্রধান্য পেয়েছে।

আসকার ইবনে শাইখের নাট্যমানস গঠনে ইতিহাস, স্বদেশ ও স্বকালের ভূমিকা প্রভূত। বহু নাটকের স্রষ্টা শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫০), *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *তিতুমীর* (১৯৫৭), *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৫৭), *রক্তপদ্ম* (১৯৫৭), *প্রচ্ছদপট* (১০৫৮), *লাল ফকির* (১৯৫৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রক্তপদ্ম সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। নাটকের শুরুতে কানপুরের শের খান নামক এক সর্বহারা চরিত্র বলে, 'তোমার আমার দেশ আজ বেনিয়া কোম্পানির করায়ত্ত্ব। সময় এসেছে বিদেশিকে তাড়াবার উপযুক্ত সময়। হ্যাঁ, জান তো, এই চাপাতি আর রক্তপদ্ম হাতে পেয়ে নিজের কাছে রাখা যাবে না? বিলিয়ে দিতে হয় অন্যের কাছে?' নানা নির্যাতন ভোগ করে এভাবেই মুক্তির জন্যে প্রতিবাদ সঞ্চারিত হয় এবং নাটকের শেষে সুবেদার মামসুদ্দিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে, 'আজ আর কোনো দ্বিধা নেই। আজ শুধু সংগ্রাম, মুক্তির নেশায় এগিয়ে চলা।' এ নাট্যকারের কাছেও কলানৈপুণ্যের যে দাবি, তা বিষয়ের গুরুত্বকে অতিক্রম করতে পারেনি।

নাটকের সংখ্যা নয়, গুণগত মানের ভিত্তিতেই তার সাফল্য নির্ভরশীল। সেই নাটককে বিষয় ও শিল্পাঙ্গিককে আবার দেশের জনভূমি স্পর্শ করে হতে হয় আন্ত র্জাতিক। বৈশ্বিক নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় চিরায়িত নাট্যসাহিত্য। তাই সচেতন নাট্যকার মাত্রই সস্তা জনপ্রিয়তার মুখাপেক্ষী নন। অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও শিল্পবোধকে পুঁজি করে নাটক লিখতে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সেরূপ এক শ্রমনিষ্ঠ বিপুল প্রতিভার নাট্যকার; যাঁর মাত্র চারটি নাটক নিয়ে কর্ষিত ও সুশোভিত সাহিত্যভুবন। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি দেশবিদেশে অধিক খ্যাতি অর্জন করলেও বাংলাদেশের নবনাট্যধারা নির্মাণের বিশিষ্ট পথিকৃৎ। তাঁর রচিত নাটকসমূহ : *বহিপীর* (১৯৫৭), *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬৪), *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪) ও *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩)। এসব নাটকের উপকরণ স্বদেশের সমাজজীবন, কিন্তু উপস্থাপনরীতি পাশ্চাত্য শিল্পকলা ও জীবনবোধস্নাত।

নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, সাঈদ আহমদ প্রমুখ নাট্যকারের দলভুক্ত হয়েও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ব্যতিক্রম, ষাটের দশকের শক্তিমান নাট্যকার। তিনি কোনো ইতিহাস-আশ্রিত কিংবা নিছক প্রেমের নাটক রচনা করেননি। সমাজের অভাব, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভণ্ডামি, শোষণ, নৈঃসঙ্গচেতনা ও আশাবাদের নির্মোহ নাট্যরূপায়ণে তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞাজন। ঘাটে বজরা থামিয়ে, বিচারালয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে, ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে, নদীতে নৌকো টেনে তাঁর নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনা গড়ে ওঠেযা ইতোপূর্বে বাংলা নাটকে ছিল বিরল। স্বতন্ত্র বিষয়নির্বাচন, চরিত্রায়ণ, সংলাপ-সংযোজন ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতেও তাঁর পারদর্শিতা নাট্যজনস্বীকৃত।

দীর্ঘকাল বিদেশে, বিশেষত ফ্রান্সে বসবাসের ফলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও আধুনিক সাহিত্যকলার নিরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁর নাটকে অস্তিত্ববাদ, চেতনাপ্রবাহ ও অ্যাবসার্ড শিল্পরীতির প্রাধান্য বিদ্যমান। তাঁর অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত চেতনা, মেটাফিজিক্যাল জীবনবোধ এবং ইনার রিয়্যালিটির অনুসন্ধানী-দৃষ্টিও ছিল স্বচ্ছ। *বহিপীর* নাটকের বহিপীর, জমিদার হাতেম আলী, তাহেরা; *তরঙ্গভঙ্গ*-এর আমেনা, ভিখারিণী; *উজানে মৃত্যু*-র নৌকাবাহক প্রমুখ চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাধারাসৃষ্টি, সংলাপনির্মাণ ও মঞ্চনির্দেশনায় উল্লিখিত এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে:

আপনার মনে হতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। [*বহিপীর*]

তারপর সূর্য ডুবে যায়, আকাশে চাঁদ, ধানের ক্ষেতে মরে যায় হাওয়া: বিশ্বভূমণ্ডলে আপন-আপন চক্রপথে ঘুরতে থাকে নীরবে। আবার চাঁদ ডুবে যায়, পূর্ব আকাশে উঠে সূর্য হাওয়া জাগে বলে ধানক্ষেতে আন্দোলন হয়, সহস্র চক্রপথে বিশ্বভূমলের গতি শ্লথ হয় না। কিন্তু প্রাণ ধড়ফড় করে গো, প্রাণে ধড়ফড় করে। [*তরঙ্গভঙ্গ*]

বাঁশে বিদ্ধ হয়ে লোকটি তিনদিন তিনরাত একটুও নড়ে নাই। কিন্তু সে কি তখন সত্যই স্থির হয়ে ছিল? না। প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্তে তখন সে কোথাও যাচ্ছিল। না গিয়ে উপায় কি? তার মধ্যে শক্ত বাঁশটা তিলে-তিলে পচছিলো, তার ব্যথা কষ্টের শেষ ছিল না। আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে ঘিরে কাঁদছিল। কিন্তু সে-সবের তখন কোনো অর্থই ছিল না। তখন কিছুতেই যদি কোনো অর্থ হয় তা সে-যাওয়াতেই। তাই অবশেষে তার কষ্ট, তার মৃত্যু, অন্যের কষ্টে পরিণত হয়েছিল। [*উজানে মৃত্যু*]

মুনীর চৌধুরীর সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সংখ্যাবহুল সাহিত্যকর্ম নাটক। বাংলাদেশের নাট্যধারাকে তিনি জীবনবাদী শিল্পরসে সজীব এবং স্বতন্ত্রমাত্রা প্রদানে সক্ষম হন। নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজজীবন তাঁর নাটকের প্রধান উপকরণ হলেও বিষয়ভাবনায় বৈচিত্র্য ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সমকালীন জীবন-বিশ্বাসের সাথে ইতিহাস, পুরাণ ও মিথের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গঠিত তাঁর নাটকের কাহিনীবৃত্ত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে একাঙ্ক নাটক এবং ট্র্যাজেডির চেয়ে কমেডি রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

ইতিহাসের যুদ্ধকে উপকরণ করে মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটক রচিত হলেও তাতে যুদ্ধবিরোধী চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে। যুদ্ধের প্রান্তরের চেয়ে রক্তাক্ত অন্তরের মানবিক আবেদনই প্রাধান্য পেয়েছে। *চিঠি*, *দণ্ডধর*, *দণ্ডকারণ্য*, *একতালা*, *দোতালা*, *মর্মান্তিক*, *বংশধর* প্রভৃতি নাটক ও একাঙ্ক নাটকেও বর্তমান নাট্যকারের উদারমানবিক এবং হৃদয়বৃত্তিক চেতনার সাফল্য সূচিত হয়। তাঁর *কবর* বায়ান্নর ভাষা

আন্দোলনভিত্তিক প্রথম প্রতিবাদী নাটক। *মানুষ, মিলিটারি ও একটি মশা* নাটকে বিধৃত হয়েছে নাট্যকারের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। *নষ্ট ছেলে*-তে স্থান পেয়েছে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের সংগ্রাম ও মানবিক প্রত্যয়বোধ। আর *নেতা* একাঙ্ক নাটকে উন্মোচিত হয়েছে নেতাদের ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতার মুখোশ। *পলাশী ব্যারাক*-এ ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামোর সমস্যা এবং নিম্ন বেতনভুক্ত ব্যারাকবাসীর করুণ জীবনচিত্র। বস্তুত, মুনীর চৌধুরীকে নাটকের বিষয় নির্বাচন নিয়ে ভাবতে হয়নি, ইতিহাস-পুরাণ-সমকালীন সমাজজীবন যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, তা স্বীয় চেতনা ও শিল্পদৃষ্টির আলোকে নাট্যিক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। তিনি *রক্তাক্ত প্রান্তর*-এ ইতিহাসের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিক, মানবিক এবং হৃদয়বৃত্তিক চিরন্তন অনুভূতিতে শিল্পরূপ দিয়েছেন; আবার ইব্রাহীম কার্দির চরিত্রের আদর্শগত দৃঢ়তা, মর্যাদাবোধ ও বীরত্বের প্রকাশে মহাভারত-এর কর্ণ চরিত্রের কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য রক্ষা করে সুকৌশলে মিথকেই নাট্যচরিত্রের অন্তর্গত করেছেন।

ইতিহাস থেকে সরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন-পরিবেশকে *চিঠি* নাটকের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেও সোহরাব, রুস্তম, তারেক, খালেদ, তহমিনা চরিত্রের নামকরণ এবং সংলাপপ্রকরণ পুনরায় ইতিহাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দণ্ডকারণ্য একাঙ্ক নাটকে পৌরাণিক অরণ্যসম্মোহিত জীবনপরিবেশ ও জাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীর জীবনভাবনাকে একই পাদপীঠে এনে মিথের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে একই চরিত্র দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে। পৌরাণিক রাম, লক্ষ্মণ, তপস্বী, সীতা, শূর্পণখাই যথাক্রমে বাস্তবের মনোয়ার, কায়সর, দরওয়ান, লায়লী ও ওয়াফা। বাল্মিকীর রামায়ণ-এর শূর্পণখার নাসিকাকর্তন সম্পর্কিত প্রসঙ্গটি অক্ষুণ্ন রেখে অবশিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। *রামায়ণ*-এর রাম প্রায় পূজনীয় ব্যক্তিত্ব; কিন্তু নাটকের রাম বৈচিত্র্যপিয়াসী, নারীলিপ্সু ও আধুনিক মানুষের প্রতিভূ। সীতা তেজোদীপ্ত, সাহসী ও প্রতিবাদী। আর লক্ষ্মণ সীতার রূপে মুগ্ধ। মুনীর চৌধুরীর রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-শূর্পণখাকে প্রেক্ষাপটে রেখে রূপজ মোহ সৃষ্টির মাধ্যমে পৌরাণিক ও লোকবিশ্বাসকে মিথ-এ উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর কৃতিত্ব অপরিসীম। ইতিহাস-পুরাণ-ঐতিহ্য ও সমকালীন সমাজজীবনকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি; অভিন্ন বা পরস্পর নির্ভরশীল আবহমান বাংলার জীবন-বিশ্বাসই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু।

নাটকের চরিত্র নির্মাণে মুনীর চৌধুরী নির্মোহ, নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ স্রষ্টা। যদিও তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত এবং কখনো-বা আদর্শপ্রকাশ ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রদর্শনের শিল্পিত হাতিয়ার। তিনি অযথা নাটকের আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় মনোযোগী হননি। বিষয়কাঠামো ও চরিত্রায়ণের প্রয়োজনে এবং আধুনিকতা রক্ষার্থে যতটা দরকার, ঠিক ততটাই নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন। দেশের আর্থসামাজিক

অবস্থা ও নাট্য-উপকরণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মঞ্চপ্রকরণের আড়ম্বর বর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর *কবর* ও *দণ্ডকারণ্য* নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা ও নিরীক্ষার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো-বা অ্যাবসার্ড নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেননা অ্যাবসার্ড নাটকের রীতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাঙালিমানসের ব্যবধান ছিল বিস্তর। তাই তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ থাকলেও সেগুলো পুরোপুরি অ্যাবসার্ড নাটক নয়।

মুনীর চৌধুরী সুবিদিত ছিলেন যে, সংলাপই নাটকের প্রাণ। চরিত্রের বিকাশ ও ঘটনাধারার উত্তরণ-পরিণতিতে তাঁর সংলাপ হয়েছে শিল্পমণ্ডিত সহায়ক মাধ্যম। চরিত্র ও বিষয়ের প্রয়োজনেই তিনি প্রয়োগ করেছেন আধুনিক মননিষ্ঠ ভাষা, কখনো আঞ্চলিক সংলাপ, এমনকি আরবি-ফারসি-ইংরেজি শব্দরাজি। তবে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর সংলাপের পাশেই ব্যঙ্গরসাত্মক কৌতুককর হালকা মেজাজের সংলাপ নির্মাণ এবং তার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পস্রষ্টা। *রক্তাক্ত প্রান্তর* ও *কবর* থেকে সামান্য দৃষ্টান্ত

কার্দি। তুমি এসেছো জোহরা? আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

জোহরা। আমিও জানতাম, আমি আসবো।

কার্দি। কতো দিন তোমাকে দেখিনি। তৃষ্ণায় দুচোখ আমার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতো দিন তোমার এই রূপ আমি দেখিনি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহেদী পাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ নির্মীলিত চোখ–এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে। [*রক্তাক্ত প্রান্তর*]

নেতা। দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ দেশের রাজনীতি আঙুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক। কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে।

মূর্তি। কবরে যাব না।

নেতা। আগে কথাটা ভালো করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে উঁচু ক্লাসে উটেছে। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি। ছিল। এখন নেই, খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল, রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা। জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা

শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে যারা এখন মরেনি তাদের নামে মিনতি করছি তুমি যাও, যাও, যাও।

মূর্তি। আমি বাঁচবো। [*কবর*]

এই বাঁচার প্রত্যাশা বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত ছিল বলেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এখানেই নাটকের বিষয়গুরুত্ব ও নাট্যকারের সদর্থক দূরদৃষ্টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০)-র *মানচিত্র* (১৯৬৩)-এ স্কুলমাস্টার মজিদের যে সমসা ও করুণ অবস্থা, *এ্যালবাম* (১৯৬৫) নাটকের বিত্তবান ও বিত্তহীনের যে জীবনালেখ্য, *চেহারা* (১৯৭৯)-য় মানবচরিত্রের যে স্বরূপ উন্মোচনতা আমাদের সমাজব্যবস্থাকেই চিহ্নিত করে। তবে তিনি বিষয় নির্বাচনে যত্নশীল হলেও আঙ্গিক নির্মাণে নিরীক্ষাপ্রিয় নন। অবশ্য সাঈদ আহমদ (১৯৩১)-এর ভূমিকা উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য। তাঁর নাটকের বিষয় সমাজজীবন ও প্রকৃতি-নির্ভর হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতোই ভিন্নমাত্রিকতায় উজ্জ্বল। তাঁর *কালবেলা* (১৯৭৬) ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায়, *মাইলপোস্ট* (১৯৭৬) দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের তীব্র আর্তনাদের প্রেক্ষাপটে, *তৃষ্ণায়* (১৯৭৬) লোককাহিনী বা রূপকথাকে আধুনিক চেতনার আলোকে এনে অস্তিত্ব রক্ষায় অভিপ্রায়ে রচিত। আর *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮)-এর বিষয়ে যুদ্ধোত্তর মানবিক অবক্ষয়। খানিকটা বিমূর্তভঙ্গিতে গড়ে উঠেছে এসব নাটকের শিল্পকাঠামো। যেমন

মোড়ল : আমাদের তুমি অপেক্ষায় রেখেছো উপেং।

আহম্মদ : স্বপ্ন আমার বাস্তব হল।

মুনীর : এখন তোমার মৃত্যুও যদি হয়, কোনো খেদ থাকবে না আমার।

উনেন : হে আচার্য, আনুষ্ঠানিক শুরু করবে কি?

উপেং : কুসুম-কলি আপন সময়ে ফোটে। পল্লব পত্র শুধু সমীর হিল্লোলে বেজে ওঠে। অধৈর্য হয়ো না উনেন। আমাদের একটি মাত্র জীবন। শুধু একটাই। দুহাতে আমরা ধরে রাখবো এ জীবনকে। উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করে আমরা তা হারাতে পারি না।

তাছাড়া শচীন সেনগুপ্ত কিংবা সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজদ্দৌলা* নাটকের সাথে সাঈদের *শেষ নবাব* (১৯৮৯) পড়লে বোঝা যায় তিনি ইতিহাসকে সমকালীন করতে কতটা পারদর্শী।

বিপুল প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ বাংলাদেশের নাট্যভুবনে যাঁরা মুক্তবাতাস সঞ্চরণ এবং সজীব পরিবেশ নির্মাণে সর্বদা সচেষ্ট, মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৩৫-) তাঁদের দলভুক্ত হয়েও ভিন্নমাত্রিক কর্মগুণে অনন্য। প্রতিভাদীপ্ত নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যসংগঠক হিসেবে তাঁর পরিচয় দেশবিদেশে বিস্তৃত। আন্তরিকতা, শ্রমনিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, স্বদেশপ্রীতি এবং মানবিক মূল্যবোধ তাঁর এ পরিচিতিকে করেছে অধিক সমৃদ্ধ। সমাজজীবন এবং শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ বলেই তাঁর নাটকসমূহ মৃত্তিকানির্ভর; ভিনদেশি

নাটকও রূপান্তরগুণে পেয়েছে মৌলিকতার মর্যাদা। ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যা কিংবা অবস্থা চিহ্নিতকরণ এবং বিশেষত ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতাভিত্তিক নাট্যরূপায়ণে তিনি কুশলী কারিগর। তাঁর নাটকের চরিত্রসমূহ কথা বলে কখনো ধীরলয়ে, কখনো উচ্চস্বরে, কখনো তির্যকভঙ্গিতে, কখনো রসালোভাবে, কখনো-বা প্রতীকী ঢঙে। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে গঠিত হয় সতেজ নাট্যসংলাপ, রচিত হয় সাহসিক বক্তব্য। নাটকের বাস্তবতায়, অভিনয়ের ঋজুতায় এবং সংগঠকের মমতায় মমতাজউদদীন আহমদ উজ্জ্বল আর অকুতোভয় নাট্যজন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর রচিত ও মঞ্চায়িত নাটকসমূহ যেন শত্রুহননের হাতিয়ার এবং জনগণের জাগরণের মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। সাহসী মুক্তিযোদ্ধার মতো তিনিও এক নাট্যসৈনিক, যাঁর নাট্যায়োজন দেখে হাজার হাজার দর্শক স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর এসব নাটক স্লোগানসর্বস্ব নয়, শৈল্পিক মানদণ্ডে অবশ্যই উত্তীর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে। মুনীর চৌধুরীর *কবর* (র. ১৯৫৩, প্র. ১৯৬৬) নাটকের পর ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দ্বিতীয় কোনো সার্থক নাটকের নাম উচ্চারিত হলে তা অবশ্যই হবে মমতাজউদদীন আহমদের *বিবাহ* (১৯৭৯)। দুটো নাটকের রয়েছে দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং মানুষের অস্তিত্ববাদী চেতনা। ভাষা আন্দোলনের পরের বছর রচিত বলেই কবর নাটকের শহিদ মূর্তিদের প্রতিবাদ ও বাঁচার আবেদন সুস্পষ্ট। তারা কবরে যাবে না। তারা মরেনি, মরতে পারে না। প্রকৃত অর্থে এখানে মৃত ব্যক্তির সদর্থক চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে জীবিতদের মাঝে। তারপর বীর বাঙালি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে কেউ বিত্তবান হয়েছে। কেউ-বা আশাভঙ্গের বেদনা কিংবা ত্যাগের মহিমাকে বছরের পর বছর লালন করে চলেছে। *বিবাহ* নাটকের সখিনারও সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল। সে যখন গায়ে হলুদ আর হাতে মেহেদি মেখে বধূবেশে বসে ছিল, তখন তার হবু বর বায়ান্ন'র উত্তাল মিছিলে ছুটে গিয়ে নিজ রক্তের বিনিময়ে ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। সখিনার চেতনায় সেই হলুদের রঙ রক্তের মতোই গভীর। মোছা যায় না। তাই স্মৃতি আর স্বপ্নের সাগরে ভাসমান কঠিন-করুণ সখিনার আবেদন, 'আমার আনন্দ, গৌরব, সুখ সংসার। কাকে দেব, কেমন করে দেব ছোট মামা। হলুদ শাড়ি আমার শাড়িতে যে বেঁচে থাকার প্রদাহ, দাহ লেগে আছে। না জানা ভালোবাসা ছোট মামা, আমার এক এক করে অনেক বছরের ফাল্গুন জমে আছে। আমি যে নীড় রচনার কাজে নিমগ্ন আছি। এই দেখলাম হাঁড়িতে ভাত টগবগ করে ফুটছে, কখন শুনছি একটি সবল নরম কণ্ঠ এসে আমাকে বলছে : চল না নৌকায় চড়ে নদীর মোহনায় যাই। কখন শুনি একটি কচি কণ্ঠের অমৃত কান্না বলছে : মা, ও মা আমাকে কোলে নাও, ঘুম যাব। ছোট মামা আকাশ, ঘর, পানি ভরা কলসি, বর্ণ পরিচয়, দুঃখ অভিমান, আমি যে এক এক করে এত বছর সাতশো বছর অন্ধকার, আলো, জীবন বুনছি আমি বাঁচার জন্য।' সখিনার বাবাকেও মমতাজউদদীন

বাংলা ভাষা, স্বাধীনতা ও মানবতার পক্ষের একজন দরদী মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, 'ঢাকাতে শুনছি ছাত্ররা খুব ক্ষেপে গিয়েছে আতিয়া। মিছিল করবে, হরতাল করবে। করবেই তো। বাংলাভাষা যদি না থাকে তো কিসের দেশ, কিসের স্বাধীনতা'। এবং 'আমার মেয়ের জামাই জালেমের গুলিতে শহিদ হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। এ তো একটা ঘটনা না। এত ইতিহাস, এত একটা অগ্নিগিরি। আমি বলছি, আমার দেল বলছে ঐ ছেলেকে আমরা মাটির নিচে রাখব না। আমার ছেলেকে হরগিজ কবরে যেতে দেব না।' আন্দোলন কিংবা যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গের কবরে না যাওয়া অথবা যেতে না দেয়া Irwin Shaw-Gi *Bury The Dead*, মুনীর চৌধুরীর *কবর* এবং মমতাজউদদীন আহমদের *বিবাহ* নাটকে প্রতিবাদ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তিনজনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মমতাজউদদীন মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে ছিলেন চট্টগ্রামে কর্মরত। স্বাধীনতার অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং মুক্তির শুদ্ধ চেতনায় জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নে নিমগ্ন হন। *স্বাধীনতা* (১৯৭৬) নাটকে স্বাধীনতাবিরোধী চরিত্র নূর মোহাম্মদ যখন বলে প্রয়োজন হলে লক্ষ মানুষের জীবন যাবে তবু দেশ ভাগ করা চলবে না, তখন নাট্যকার জনতার প্রতিনিধির মাধ্যমে জানান দেন, 'প্রেমের জ্বালা আর স্বাধীনতার আগুন কখনো নিভে না।' *এবারে সংগ্রামে* (১৯৭১) নাটকেও একজন নির্যাতিত মানুষ শত্রুর উদ্দেশ্যে বলে, 'আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ আকাশ এ মাঠ আর সমুদ্রকে বলে দিচ্ছি, ভাইসব, এদের চিনে রাখ, এরা ধর্মের নামে, সংহতির নামে, নানা ফন্দির জাল বিস্তার করে আমাদের শোষণ করছে। আর এদের ছেড়ে দিও না। এবার এরা ঘরে ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের সন্তানকে হত্যা করবে। এরা খুনি। মানুষের রক্তের বিনিময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে আনে, তোমরা এদের নির্মূল কর।' *স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১) নাটকের জহুরুল এবং *বর্ণচোরা*-র মতিউরের কণ্ঠেও একই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং স্বাধীনভাবে বাঁচার স্পৃহা ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার মমতাজউদদীন। *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৪) নাটকের বিপথগামী তরুণ রাজু শুদ্ধজীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে একুশের শহিদ বরকতের কাছে মিনতি জানায়, 'বরকত তুমি যেও না, আমাকে আলো দাও। আলো জ্বালাও।' এ আলো প্রতীকী অর্থে জীবনের গভীর সত্য, যা নাট্যকারের জীবনদর্শনেরই শৈল্পিক প্রকাশ। সে-কারণেই তাঁর *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা* (১৯৭৩) নাটকের বিত্তবান অশুভ-চরিত্র সূর্যকুণ্ডর প্রলোভন থেকে লেখক-চরিত্র থেকেছেন মুক্ত এবং সত্য প্রকাশে হয়েছেন অকুণ্ঠচিত্ত।

মমতাজউদদীনের *এই সেই কণ্ঠস্বর* (১৯৮৪) নাটকটি স্বাধীনতার উজ্জ্বল-করুণ স্মৃতি-সমৃদ্ধ এবং অস্তিত্ব ও জাগরণী চেতনায় ঋদ্ধ। তাঁর আরেক অনবদ্য ভালোবাসার, স্বাধীনতার এবং প্রতিবাদের নাটক *কী চাহ স্বাধীনতার* অশুভ শক্তিকে

বোঝানো হয়েছে। এ নাটকের প্রধান চরিত্র রৌশনারা স্বাধীনতার শত্রুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবার পূর্বেই সন্তানসম্ভবা হয়। আর লোভী স্বামী বীরাঙ্গনা স্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে হয় বিত্তবান। তারপর সন্তান লালনকে অপবিত্র ভেবে হত্যা করে, স্ত্রীকে পাগল বানিয়ে পাঠায় মানসিক হাসপাতালে। সন্তানহারা মা চিৎকার করে বলে, 'যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর, আমি তো প্রতিবাদ করিনি আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য করতে চাও কেন? আমার সন্তানদের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন? ...আমাকে নিয়ে তোমাদের এত উল্লাস কেন? কী পেয়েছি আমি? ...মায়ের কোলে বাচ্চা নাই, মানুষের চোখে নিদ নাই, নদীর বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা? তোমার মাথার ওপর থাইক্কা উড়োজাহাজের মতোন জল্লাদ পাখি তাড়াইতে পারবা? আমার মাথার আগুন নিভাইতে পারবা?' রৌশনারার এ-প্রশ্ন সচেতন বিবেককে বিদ্ধ করে, স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রাপ্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতার প্রায় দেড়যুগ পর মমতাজউদদীন আহমদ রচনা করেন মঞ্চসফল কালজয়ী নাটক *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৯১)। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির জাগরণ, স্বজন-সম্পদ ও ইজ্জতহারা মানুষের বেদনা, তোষামোদকারীদের সুবিধাভোগ, স্বৈরশাসনের দাপট এবং গণমানুষের প্রতিরোধ-সংকল্প বর্তমান নাটকের উপজীব্য বিষয়। নাট্যকার কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো অপ্রত্যক্ষভাবে, কখনো প্রতীকের আলোকে, কখনো-বা সূক্ষ্ম হিউমারের মাধ্যমে বক্তব্যবিষয়কে নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকে যুবকদের ন্যায়সঙ্গত যে জিজ্ঞাসা তা নাট্যকারের সত্যাশ্রয়ী, প্রতিবাদী, স্বাধীনতাপ্রীতি উদারমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক :

যুবক-২ : মুনীর চৌধুরীকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার হল না কেন?
যুবক-৩ : জহীর রায়হান হত্যার তদন্ত হল না কেন?
যুবক-৪ : বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ঘুরে বেড়ায় কেন?
যুবক-১: উত্তর কোথায়?

নাটকের শেষ পর্যায়ে দেশমাতৃকার প্রতীক মা-এর উদাত্ত আহ্বান সন্তানের কাছে, দেশবাসীর কাছে :

মা : ...কারা আমার ছেলেদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলোচ্ছেরে দাসু?
দাসু : ...ওদের পরিচয় জানার দরকার নেই, তুমি তাদের সঙ্গে পারবে না। ...

মা : তাহলে আমার ছেলেরা যুদ্ধ করল কেন? তা হলে আমার স্বামী জীবন দিল কেন? তাহলে আমি ইজ্জত লুটিয়ে ঘরে ফিরলাম কেন? ...কইরে আমার ছেলেরা কইরে... আয় তো একবার পুনরায় একবার ।

সকলে : মাগো আমরা এসেছি ।

মা : এইবার, এইবার যুদ্ধ ।

সকলে : আমাদের যুদ্ধ ।

মা : স্বাধীনতার যুদ্ধ ।

সকলে : স্বাধীনতার যুদ্ধ ।

মমতাজউদদীন-ঘোষিত এ যুদ্ধ অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থবহ করার জন্যে, সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে । বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র নাট্যকার যিনি জীবনের প্রায় সব অনুভূতিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন । সিরিয়াস নাটকের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন প্রচুর হাস্যরসাত্মক নাটক, শিশুতোষ নাটক, লোকনাটক ও রূপান্তরিত নাটক । এ পর্যায়ে স্মরণযোগ্য তাঁর *হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার* (১৯৭৭), *রাজা অনুস্বরের পালা* (১৯৮৭), *প্রেম বিবাহ সুটকেস* (১৯৮৭), *ডিম্বকাব্য* (১৯৮৭), *হাস্য লাস্য ভাস্য* (১৯৯৭), *ভালোবাসার নাটক* (২০০৬) প্রভৃতি নাটকসমূহ ।

সব্যসাচী লেখক হিসেবে খ্যাত সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫)-এর নাটকের ঘরানায় বড় কৃতিত্ব কাব্যনাট্য রচনায় । এ ধারার সবচেয়ে সফল, বহুল অভিনীত ও অভিনন্দিত নাট্যদ্বয় *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) এবং *নুরলদীনের সারা জীবন* (১৯৮২) । বিপুল ত্যাগ, শ্রম ও সাধনায় অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা । ইতোপূর্বে এ প্রসঙ্গনির্ভর আরো নাটক রচিত হয়েছে । কিন্তু কাব্যনাটক রচনায় সৈয়দ হক একক এবং অনন্য । একদিকে স্বাধীনতার জন্যে দেশপ্রেমিক মানুষের আত্মবিসর্জন, করুণ জীবনযাপন, সংগ্রাম-যুদ্ধ; অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী মাতবর নিজ কন্যার ইজ্জতের বিনিময়ে হলেও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় । ভয়াবহ ও মর্মান্তিক এই ঘটনাচিত্রকে নিপুণ কাব্যকথায় নাট্যায়িত করেছেন সৈয়দ শামসুল হক । স্বদেশ ও শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ এ নাট্যকারের সদর্থক ভাবনাই শেষ পর্যন্ত জাগ্রত হয় । মুক্তিবাহিনীর হাতে মাতবর মারা যায় যেন স্বাধীনতার আগমনী আওয়াজ পাওয়া যায়; পাইক চরিত্রের

আহ্বান তারই প্রমাণ :

এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কোথায় কখন
কি গজব কি আজাবে ছিল লোকজন

জালেমের হাতে ছিল যখন শাসন
শত শত মারা গেছে আত্মীয় স্বজন ।
এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কিভাবে কখন
মেলেটারি ঘাঁটি নিয়া ছিল কয়জন
কারা কারা সঙ্গে ছিল তাদের তখন ।
অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন
জলদি জলদি সব চলেন এখন ।

নুরলদীনের সারা জীবন-এ নাট্যকার অধিক বিষয়সচেতন, শিল্পমনস্ক ও আঞ্চলিক সংলাপ নির্মাণে পারদর্শী । নাট্যকারের ভাষায়, 'নুরলদীনের আত্ম ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সঙ্কট সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি ।' বাংলা ১১৮৯ সালে রংপুর অঞ্চলে নুরলদীনের নামে এক কৃষকনেতা ছিলেন । ইংরেজ কর্তৃক তৎকালীন অধিকারবঞ্চিত কৃষকদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলেন নুরলদীন । বীরদর্পে সংগ্রাম করে তিনি আত্মাহুতি দেন, কিন্তু অনন্তকালের জন্যে রেখে যান মহামানবিক চেতনা যার কাব্যনাট্যিক প্রকাশ *নুরলদীনের সারা জীবন* । নুরলদীন গভীর বিশ্বাসে ও নিজস্ব ভঙ্গিতে ডাক দেন 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায় ।' কিংবা 'হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই । এক এ নুরলদীন যদি চলি যায়,/ হাজার নুরলদীন আসিবে বাংলায় ।' নুরলদীনের ক্ষয় নেই । তাই যখন যেখানেই অসহায় মার খায়, তখনই নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় । তাঁর সহযাত্রী আব্বাস গণবাহিনীর সাথে নুরলদীনের জয়ধ্বনি তুলে নাটকের শেষ সংলাপ ঘোষণা করে 'ধৈর্য সবে ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন ।/ লাগে লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন ।' উল্লিখিত নাটক দুটোর মঞ্চায়ন-উপকরণের আড়ম্বর নেই । বিস্তৃত গ্রাম কিংবা খোলা আকাশের নিচে হতে পারে এর অভিনয়-আয়োজন । *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮২), *ঈর্ষা* (১৯৯১), *খাট্টা তামাশা* (১৯৯৭), *মুখোশ* (২০০৩) প্রভৃতি নাটকে সৈয়দ শামসুল হকের যে সাফল্য তা বাংলাদেশের নাট্যধারাকে করেছে সমৃদ্ধ ।

অনুবাদ ও নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনায় জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) এক প্রাজ্ঞ নাট্যজন । তাঁর *শুভ্রা কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০) একটি প্রতীকধর্মী নাটক, অ্যাবসার্ড ফর্মে রচিত । মানুষ মাত্রই শান্তিপ্রত্যাশী । শতবিঘ্ন অতিক্রম করে সে সুখরাজ্যে পৌঁছাতে চায় । বিরুদ্ধ সমাজ তা হতে দেয় না । তবু মানুষ প্রতীক্ষায় থাকে । নাটকের শুরু ও শেষে তাই চারজন নারীপুরুষের কণ্ঠে একই সংলাপ ধ্বনিত হয়, 'আমরা চারজন । শান্তিগড়ের যাত্রী । আমরা জানি কি, কেউই জানে না, কতোকাল ধরে সুবর্ণগ্রাম নামের এই ছোট্ট জংশন স্টেশনের ততোধিক ছোট্ট ওয়েটিং রুমের ফর গডো কিংবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লার *উজানে মৃত্যু*-র মতো; কিন্তু আলাদা । তাঁর *সাদা গোলাপে আগুন*

(১৯৮২) ও *পঙ্কজ বিভাস* (১৯৮২) নাটকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও নির্যাতনের অমানবিক ঘটনাচিত্র শিল্পরূপ পেয়েছে।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের মঞ্চনাট্যশিল্পকে গুরুত্ববহ ও দর্শকনন্দিত করার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮) অন্যতম পথিকৃৎ। স্বাধীন দেশে মানুষের কাম্য-প্রাপ্তি, অস্থিরতা-অবক্ষয়, জাগরণ-প্রত্যাশা তাঁর নাটকের বিষয়-উপকরণ। *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫), *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *সেনাপতি* (১৯৮০), *চারদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), *কোকিলারা* (১৯৯০), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৬) প্রভৃতি প্রাতিস্বিক নাটকের রচয়িতা তিনি। মামুন প্রধানত মধ্যবিত্ত সমজজীবনের রূপকার। তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটকসমূহে প্রাচীন মূল্যবোধ বা আদর্শ-বিশ্বাসের সাথে পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রায়শ সংঘাত বাধে। এবং নাট্যান্তে পাঠক-দর্শককে শুদ্ধচেতনা নাড়া দেয়। একটি দৃষ্টান্ত

'বাবা : তপু, তুই চলে যা। হতভাগা বুঝতে পারছিস না পুলিশ তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তপন : পুলিশকে আসতে দাও।

বাবা : আমার বাড়িতে কেন পুলিশ আসবে? কি অন্যায় আমি করেছি?

তপন : তোমার ছেলেকে গাড়িতে চড়িয়েছো। আরে তাই কি হয় নাকি? তোমার লাইসেন্স আছে? ডিলারশীপ? রেশন দোকান? তাহলে কোন আইনে তোমার ছেলে গাড়িতে চড়ে? পুলিশ তো আসবেই। [...]

তপন : বলনি? তাহলে ঐ কথাটা কি যেন কথাটা যার প্রথম প্রথম অংশটুকু আমার মনে নেই শুধু শেষ অংশটুকু মনে আছে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই আমার বড় ভাইকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিন কি করে যেন ঐ কথাটার প্রথম অংশ আমার মন থেকে মুছে গেল ঐ যে ছোট বেলায় তোমার সঙ্গে ক্লাসে যেতাম তুমি যেমন করে ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড লেখা মুছতে ঠিক তেমনি করে মুছে গেল' [*সুবচন নির্বাসনে*]

কোনো প্রতিভাবান লেখকই নিজেকে নির্দিষ্ট ছকে আটকে রাখেন না। নাট্যকার মামুনেরও ক্রমউত্তরণ লক্ষ করা যায়। একক নারীচরিত্রের ত্রিমাত্রিক রূপকে ধারণ করে রচনা করেছেন *কোকিলারা*। সাধারণ, খুব সাধারণ এবং অসাধারণ কোকিলা আমাদের সমাজ-পরিবারের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মামুনের সব নাটকই গতিময় ও

নাটকীয়তাযুক্ত। সাবলীল সংলাপ রচনার পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক সংলাপ নির্মাণেও পারদর্শী।

বাংলাদেশের নাট্যধারায় মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-) বহুলাংশে ভিন্নমাত্রিকতায় বিশেষিত। কেবল সমতলভূমি নয়; নদী, সাগর, পাহাড়, বনাঞ্চল ঘেরা গোটা বাংলার মানচিত্রে বসবাসরত বিত্তহীন নিম্নবিত্ত এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামই তাঁর নাটকের বিষয়-আশয়। কেবল স্বদেশই বলি কেন; সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন, বিশ্বায়ন, তৃতীয় বিশ্বের অবস্থানও তাঁর নাট্যবিষয়ের অন্তর্গত হয়ে যায়। *ওরা কদম আলী* (১৯৭৮), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *গিনিপিগ* (১৯৮৫), *অববাহিকা* (১৯৮৬), *রাঢ়াঙ* (২০০৫) প্রভৃতি নাটক প্রমাণ করে মামুনুর রশীদ শ্রমনিষ্ঠ, উদারমানবিক, প্রতিবাদী ও শক্তিধর নাট্যকার। তিনি তাঁর নাটকের বিষয়-চরিত্রের সাথে মিশে যান এবং সংলাপ রচনা করেন নির্লিপ্ত মমতায়

'শ্যামলী : কি শরম লাগে গো চাঁদটা কি বেহায়া কীভাবে চোখ বড় বড় করে দেখছে গো চাঁদটা কি আমার বাবু? বলছে কিরে শ্যামলী পারলিনে, আবার সংসার করলি?

পূর্ণ : শালা জানগুরু! সব ওলট-পালট করে দিল কীসের দরকার ছিল? এখন মহুয়া খেতে পারি না, হাড়িয়া খেতে পারি না। মাথায় সব গিজগিজ করে্ সেই নাচোলের কথা মনে পড়ে, হুড়কি, কানাইলাল, অনিল সব মাথায় চাপে। মহানন্দা, আত্রাই, আত্রাইয়ের কূলে কি সব ঘটে গেলোরে, শ্যামলী হ্যাঁরে তুই আমার বউ? বউ? হা, হা, হা

শ্যামলী: আস্তে আস্তে কথা কও সব জেগে যাবে' [*রাঢ়াঙ*]

সেলিম আল দীন (১৯৪৮-২০০৮) প্রথাবিরোধী এবং সদানিরীক্ষাধর্মী নাটক লিখতে অভ্যস্ত। দেশীয় ঐতিহ্য-পূরণ; ইউরোপীয় বিভিন্ন ইজম বিশেষত এক্সপ্রেশনিজম, স্যুরিয়ালিজম, অ্যাবসার্ড তাঁর নাটকের বিষয়-প্রকরণে বড় জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু তাঁর নাট্যকলা কখনই বিদেশিকরণ নয়; স্বদেশকেই নতুনভাবে, বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দেখা। সে বিচারে বলা যায়, সেলিম আল দীনের হাতে বাংলা নাটকের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। ছিল আশাভঙ্গ কিংবা আশানির্ভর বাঁচার আকুতি। সেলিমের প্রথম দিকের নাটকের বিষয় ও নামকরণে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*, *এক্সপ্লোসিভ ও মূলসমস্যা*, *করিম বাওয়ালির শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা*, *সর্প বিষয়ক গল্প*, *সংবাদ কার্টুন*, *আতর আলীদের নীলাভ পাট* প্রভৃতি নাটকের বিষয়গুণ দেশপ্রীতি, নির্মাণশৈলী গতানুগতিকতামুক্ত ও অভিনয়কৌশলে আছে অভিনবত্ব। যেমন

রোগী : শরীরে কুলোচ্ছে না। গা-হাত কেমন ধরে আসছে।

সঙ্গী : আমারও যে খুব ভালো যাচ্ছে তা নয়। সকালে আয়নায় দেখি চোখগুলো কেমন হলদে।

রোগী : ওই জন্ডিস ভাবছি আমারটাও হয়তো সেরে উঠবে। ওষুধ নেই সে জন্যে ভালো হলেও রক্তে বীজ থেকে যাবে।

সঙ্গী : এ আর তেমন কি। একদম বজ্রপাত তো নয় যে লাগলো আর অক্কা পেলাম। ...ভয় ভাবনা এলে আমি ফুঁ দিয়ে বেলুন ফুলাই।

রোগী : কতো চমৎকার জিনিস।

সঙ্গী : হাহ। শেষ অবধি আমাকেও আপনার অবস্থায় পৌঁছতে হবে। আসলে ওষুধ হলে

রোগী : দুস সাহেব। ওসব কথা গল্পের মতো শোনায়।' [*জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*।]

প্রকৃতপক্ষে, সেলিম আল দীনের নাট্যপ্রতিভা অধিকতর, পূর্ণতা পেতে থাকে *মুনতাসির*, *শকুন্তলা* ও *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬) রচনার মাধ্যমে; আর সার্থকতার শিখরস্পর্শ করে *কেরামতমঙ্গল*, *হাত হদাই*, *চাকা* (১৯৯১), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯২), *হরগজ* (১৯৯২), *বনপাংশুল* (১৯৯৭) ও *প্রাচ্য* (১৯৯৭) নাটক নির্মাণ প্রকৌশলকর্মে। দেশের মাটি, মানুষ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণকে একীভূত করে নবসৃষ্টির মর্যাদা দেন নাট্যকার।

উল্লিখিত নাট্যকারদের নাট্যকর্ম ছাড়াও এস এম সোলায়মানের *এই দেশে এই বেশে*, *আলাল দুলাল*; আবদুল্লাহেল মাহমুদের *কৈবর্তগাথা*; মান্নান হীরার *খেলা খেলা* বাংলাদেশের নাটকের বিষয়সম্ভার ও আঙ্গিক-প্রকরণকে করেছে সমৃদ্ধ। নাটকের সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের একক কিংবা কোরাস দলের লোকগান, অভিনয়ভঙ্গিতে এসেছে নৃত্যঢঙ। যেমন, গম্ভীরা গানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় *এই দেশে এই বেশে* নাটকে

'নাতি : আমি বিহা করবো বলে এলুম ঢাকা শহরে
আমি মনের মতো কনে দেখে কিনে নিমু আহারে

নানা হে।

নানা : হেই নান কুনঠে গেলিরে? ইশ্‌শিরে কতো মানুষ আইসাছে ইখানে।
এত মানুষ আইসলো কুনঠে থেইকে?'

সার্বিক বিবেচনায় বলতেই হয়, বাংলাদেশের নাট্যচর্চার পথ ও পাথেয় যতই সীমিত হোক না কেন, তা বহতা নদীর মতো চলমান সবুজ বৃক্ষের মতো ফলবান।

উৎস : থিয়েটার, জুলাই ২০১০ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্যজন, গবেষক ।]

বাংলাদেশের নাটক : সমস্যা ও প্রবণতা

আ লী আ নো য়া র

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বাংলা সাহিত্যে নাটক চিরকালই দুর্বল। আধুনিক সাহিত্যের অন্যান্য অনেক শাখার মতো আমরা একেও ইউরোপ থেকে ধার করেছি কিঞ্চিদধিক একশ বছর আগে। কিন্তু আজও উপন্যাস বঙ্কিমের মতো বা কবিতায় মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো যুগন্ধর প্রতিভার নাট্যসাহিত্যে পদপাত ঘটেনি। এমন নাটক লেখা হয়নি যাকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য প্রথম শ্রেণির নাটকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। রবীন্দ্রাথ এবং কিয়দংশে মাইকেল নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁদের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তাদের প্রতিভার প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে কবিতাকেই ব্যবহার করেছিলেন। কাজেই বিস্ময় কী যে দেশভাগের পরও এখানে অন্যান্য শাখার তুলনায় নাটকের চর্চা কম হয়েছে। যত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিভা কবিতায় এসেছেন নাটকে তত আসেননি।

এতদসত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে দু'টি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। একদিকে যেসব সাধারণভাবে নাটক প্রথম শ্রেণির প্রতিভা আকর্ষণ করতে পারছে না; অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতার পর থেকে নাটকে বিশেষ কর্মচঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। এর কারণ বোঝা দরকার এবং তবেই বাংলাদেশের নাটকের বিশিষ্ট সমস্যা, তার চরিত্র ও প্রবণতার পরিচয় পাব।

২.

শিল্পের একটা সামাজিক পটভূমি থাকে, কিন্তু শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটা একান্তই প্রতিভানির্ভর। কাজেই কেন শিল্প হচ্ছে বা হচ্ছে না এ ব্যাপারে কোনো অভ্রান্ত সামাজিক কারণ নির্দেশ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। বহুমাত্রিক পরিবেশ ও প্রতিভার একত্র সংযোগে শিল্পের শিখাটি প্রজ্বলিত হয়। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড যাকে 'পাওয়ার অব দি ম্যানের' সঙ্গে 'পাওয়ার অব দি মোমেন্টের' সংযোগ বলে বর্ণনা করেছেন। কখনো-বা প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশেও প্রবল প্রতিভা এই দাহ্যতার অগ্নি-সংযোগ করে। মিল্টনের *স্যামসন এ্যাগনিস্টিস* যার উদাহরণ। কখনো-বা পরিবেশের আনুকূল্যে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবানকে দিয়েও কালের চাহিদা মিটিয়ে নেয়; ওয়েস্টার বা ব'মল্ট ও ফ্লেচারের নাট্যাবলি যার উদাহরণ। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রজনন বিরলতার পেছনে প্রতিভাবানদের কুণ্ঠার উল্লেখ করেছি, এবার সামাজিক পটভূমির কথাটাও বলা দরকার। বস্তুতপক্ষে প্রতিভাবানদের কুণ্ঠার একটা সামাজিক কারণ নির্দেশ করা বোধ হয় দুঃসাধ্য নয়।

আমার ধারণা নাট্য প্রজননে আমাদের সমাজের সামগ্রিক পরিমণ্ডল বৈরী। নাটকের উদ্ভব একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হয়। এমনকি ইউরোপেও নাট্যসাহিত্যের চর্চা কখনো কখনো বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করেছে, কখনো কখনো ঊষর বন্ধ্যাত্বে গিয়েছে লুপ্তপ্রায় হয়ে। নাট্যানুকূলে পরিমণ্ডলের আবশ্যিক শর্তাবলি তবে কী? অভ্রান্তভাবে বলা যাবে না, তবে অনুমান করি যে কোনো সমাজে যখন যে কোনো কারণেই হোক বিভিন্ন বিরোধী মূল্যবোধের সংঘাত চলতে থাকে বা এক সহনশীল ও উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিরোধী মূল্যবোধসমূহ সহাবস্থান করে তখনই নাট্যরচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মূল্যবোধের টেনশন সমাজস্থিত মানুষের চিন্তায়, চেতনায়, অনুভবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রশ্নবৃত্তিগুলো প্ররোচিত হয়, আত্মানুসন্ধানের প্রেরণা মানুষের অহংবোধকে উচ্চকিত রাখে। আড়াই হাজার বছর আগে অদ্ভুত গ্রিক নাটকের কুশীলবদেরও, বিশেষ করে ট্রাজেডির নায়কদের মধ্যেও দেখি একটা প্রশ্ন করার বৃত্তি জুগুপ্সা ও অহংবোধ। এলিজাবেথীয় ইংরেজি নাটকেও একই জিনিস প্রত্যক্ষ করি। এই অহংবোধ এইসব নাটকের প্রশ্নবিড়ম্বিত নায়কদের প্রয়োজন হলে এমনকি বিশ্বশক্তির প্রতিপক্ষেও দাঁড় করিয়ে কখনো কখনো হয়তো নিরুত্তর নিয়তির প্রতিপক্ষে জীবনের অনিবার্য দুঃখ ও তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা তাকে বেদনায় আবিষ্ট করে, কিন্তু

নিয়তি তাঁকে দমিত করতে পারে না। সমস্ত ট্রাজেডির কাঠামোর মধ্যে অন্তঃসূত্রের মতো কাজ করে এই 'এক ধরনের অহঙ্কার'। যখনই আমরা প্রাপ্ত মূল্যবোধগুলোকে প্রশ্নাতীত, অভ্রান্ত বলে ধরে নেই বা সামাজিক নিরোধের ফলে একসেট মূল্যবোধ আমাদের ওপর চেপে বসে এবং আমাদের মানসিকতা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হয়, প্রশ্নবৃত্তিগুলো কুণ্ঠাপীড়িত হয়ে পড়ে তখন আর ভালো নাটক জন্মায় না। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডে এই অবস্থাটি হয়েছিল এবং এসময় কোনো মহৎ নাটকও লেখা হয়নি। নাট্যপ্রয়াস হয়েছে প্রচুর কিন্তু তাতে কালচিহ্নের স্বাক্ষর যতটা অভ্রান্ত, ততটা তা' কালকে জয় করতে পারেনি। মহৎ নাটক সামাজিক নিরোধে প্রতিহত হয়েছে। অথচ এই দীর্ঘ পর্যায়ে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতারও কমতি ঘটেনি।

মূল্যবোধের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সমাজ সংস্থানে বিভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠীর বিবদমান সম্পর্ক ও তজ্জনিত বিশ্ববীক্ষা থেকে আসতে পারে; পরিবর্তমান সমাজের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বিরোধ থেকে আসতে পারে; সনাতন জীবনদৃষ্টি যখন নতুনতর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার চাপে ভেঙে পড়ে তার টেনশন থেকে আসতে পারে বা অন্যতর কোনো কারণ থেকে আসতে পারে যা হয়তো নাট্যকারের কাছেই প্রথম প্রতিভাত হল।

এই মূল্যবোধের প্রশ্নটি অন্যদিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের জন্ম হয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্ররোচনায়। গ্রিক নাটক আদিতে বস্তুত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। নাটকের এই ধর্মীয় পটভূমি ইংরেজি নাটকের উদ্ভব সম্পর্কেও সত্য। আমাদের লৌকিক সংস্কৃতিতে 'যাত্রার' অর্থ হল পুণ্যার্থীর ধর্মযাত্রা। যাত্রায় বিবেক নামক চরিত্রটি নাটকে বক্ষ্যমাণ মূল্যবোধেরই বহিঃ সম্পাদন বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'এক্সটেরিও রাইজেমন'। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি 'মর‍্যালিটি প্লে'র কথা মনে পড়বে। অর্থাৎ নাটকের মাধ্যমে একটি মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। নাটক অবশ্য মর‍্যালিটিতেই আবদ্ধ থাকেনি, মর‍্যালিটির প্রচার তার উৎকর্ষের মানদণ্ডও নয়। আমাদের দেশে যাত্রাও সমৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মীয়বৃত্তকে অতিক্রম করে সমাজচিত্রণের বিস্তৃততর পরিসরে। তবে মহৎ নাটকের পেছনে আছে একটা 'মর‍্যাল ইম্প্যারাটিভ' বা ধর্মীয় দায়। উপন্যাসের মতো 'এন্টারটেনমেন্ট' বা বিনোদনের পথে এর জন্ম হয়নি। উপন্যাসও অবশ্য শুধুই এন্টারটেনমেন্ট থাকেনি, তারও বিবর্তন হয়েছে। মহৎ ঔপন্যাসিকেরাও একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্টফর্ম হিসেবে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের মধ্যেও অনুভূতির সহস্র তন্তুজালে আশ্লিষ্ট জীবনের জটিল ও গভীর সত্যের উন্মোচন হয়েছে। তবে নাটক জন্মলগ্ন থেকেই একটা 'সেক্রেড কলিং'।

আধুনিক বাংলা নাটক আমরা বিদেশ থেকে ধার করেছি, একটি সাহিত্যিক বা শিল্পগত ফর্ম হিসেবে। এর পেছনে কোনো ধর্মীয় অনুপ্রেরণা নেই; বা ছিল না সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা। কথকতা বা যাত্রা থেকে তা উদ্‌ভূত হয়নি। বাংলা নাটকের জন্ম বিনোদনের পথ ধরে প্রহসনের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করে। ঊনবিংশ শতকের শেষ

কোয়ার্টার থেকে বিংশ শতকের প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত প্রহসনের আধিক্যের কথা মনে করুন। নাটকের মূল চরিত্র থেকে এই প্রতিসরণ নাটককে সংকীর্ণ প্রতিসরণ প্রতারকও বটে। নাটকের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় চেতনার, মানুষের নিয়তি ও শুভাশুভ বোধের যে বিকল্প ভুবন সৃষ্টির মহৎ দায়িত্ব ইউরোপীয় নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ বা আহ্বান আমাদের প্রতিভাবানদের আকর্ষণ করেনি। যারা নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন তাদেরও পরিশ্রম বা কল্পনার পেছনে কাজ করেনি কোনো ধর্মীয় দায়। অবশ্য নাটকের সামাজিক ভূমিকা ইতোমধ্যে অনেকটা বদলে গিয়েছিল তবু নাটককে একটা 'ইন্টেলেকচ্যুয়ল ডিসিপ্লিন' হিসেবে আমরা কখনোই নিইনি।

সফোক্লিস বা ইউরিপিডিস সাধারণ অর্থে ধর্মীয় নাটক নয়, যে অর্থে যিশুখ্রিস্টের আত্মোৎসর্গকে কেন্দ্র করে 'প্যাশন প্লে'গুলো ধর্মীয় নাটক। কিন্তু উক্ত নাট্যকারদ্বয়ে জীবনের কিছু মূল প্রশ্ন বা সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। ধরা যাক সনাতন ধর্মে নির্দেশিত শুভাশুভ বোধের সঙ্গে জাগতিক বোধের দুরপনেয় বিরোধ বা নিয়তির সঙ্গে মানবিকতার। এইসব বৈপরীত্যে আবিষ্কার ও অনুভবকে একটা সংহত বিন্দুতে এনে তীব্রতা দান করা, মানুষের এই বিশিষ্ট ভাগ্যের অমোঘতাকে ফুটিয়ে তোলা এসবই গ্রিক নাটকের উপজীব্য এবং সে কারণেই এইসব নাটক ধর্মচর্চারই বিকল্প ভুবন সৃষ্টি করে। একইভাবে মার্লোর *ডক্টর ফস্টাস* ধর্মচেতনায় নিষিক্ত হয়ে থাকে এবং *হ্যামলেট* অন্তিম বিশ্লেষণে ধর্মীয় নাটকে রূপান্তরিত হয়।

এই একই প্রশ্নকে আবার কোনো একটি সমাজধর্মের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। কোনো কোনো ধর্ম তার জীবনবিমুখ পিউরিট্যান অতিরেকতার জন্য বা বর্জনপ্রাণ বিশ্বদর্শনের বিন্যাসের জন্য এই বিরোধকে উস্কে দিতে পারে। আবার ধারণক্ষমতার ব্যাপকতা, উন্মুক্ত বিন্যাস (open system)-এর জন্য বিভিন্ন বৈপরীত্যের অনুভব কোনো ধর্মের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে পড়তে পারে, জোরাস্ট্রীয় ধর্মবিশ্বাসে যেমন রয়েছে অথবা কোনো ধর্মের কঠোর নিরোধের অনুশাসনে ঐ বৈপরীত্যের বোধকে অসহিষ্ণুভাবে অস্বীকার করা হতে পারে, মুসলিম সমাজে যেমন হয়েছে। একই পরিস্থিতি সামাজিক কারণেও জন্ম নিতে পারে তা আগেই বলেছি। কোনো সমাজের একটি পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অসমন্বিত বিরোধ (unresolved tension) থেকে যেতে পারে : এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের সমাজে যেমন হয়েছিল। ঐ সমাজে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সঙ্গে রেনেসাঁ মূল্যবোধের ঠিক সমন্বয় হয়নি। সমাজের একটা বিরাট অংশ একই সঙ্গে দুই বিরোধী মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, কোনোটিকে ছাড়তে পারেনি। এই অসমন্বিত বিরোধের অস্বস্তি যন্ত্রণাই নাটকের প্রজননের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। শেক্সপিয়রের নাটকে এই হিউম্যানিক ও খ্রিস্টীয় বিরোধের কেন্দ্রীয় ভূমিকা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত হতে পারে। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশেরও স্থানীয় ও পাশ্চাত্য এই দুই বিরোধী সংস্কৃতির ও মূল্যবোধের সংঘাত লক্ষ করি এবং তা একইজাতীয় অস্বস্তিবোধের জন্ম দিয়েছে। লক্ষণীয় যে বাংলা

সাহিত্যে নাটকীয় সংঘাত-চেতনার উৎপত্তিকালও এই ঊনবিংশ শতাব্দী। ঊনবিংশ শতকের লেখকদের যেন আবিষ্ট করে আছে এক দুরপনেয় সংঘাত ও বিনষ্টির চেতনা এবং ট্র্যাজেডি রচনার মধ্যে তাকে মূর্ত করার আকাঙ্ক্ষা ও এই সময়কার; মাইকেলের কবিতায় যার সার্থক স্ফুরণ ঘটেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মিল্টনের *স্যামসন এ্যাগনিস্টিসের* সঙ্গে *মেঘনাদবধের* সমান্তরালতা আপতিক নয়। এই বিরোধসংক্ষুব্ধ অবস্থা রক্ষণশীল বা ভবিষ্যতমুখী কারো পক্ষেই প্রীতিকার নয়। রক্ষণশীল মানসিকতার প্রতিক্রিয়া সাধারণত এই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পলায়ন প্রবণতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের রক্ষণশীল মানসিকতা নতুন ও মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধের প্রতিপক্ষে সনাতন জীবনবোধকেই আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করেছে দীর্ঘকাল। তা-ও নাটকের মাধ্যমেই বিম্বিত হয়েছে অবশ্য স্যাটায়ার ব্যঙ্গ ও প্রহসনরূপে। অর্থাৎ দুই বিরোধী মূল্যবোধের ট্র্যাজেডি সম্ভব দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান নয় একমাত্রিক চিন্তার কোটিতে স্বস্তির অন্বেষণ। সমাজ পরিমণ্ডলে এই রক্ষণশীল মনোভঙ্গি নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ক্রমেই জোরদার হয়েছে অন্তত সামাজিক নেতৃত্ব থেকেছে রক্ষণশীলদের হাতে। ফলে একমাত্রিক পিউরিট্যানিক নিরোধের মরুবালুরাশিতে সিরিয়াস বাংলা নাটকের ধারাটি কিছু দুর্বল প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর গেছে হারিয়ে। অসমন্বিত বিরোধের চেতনা ও ট্র্যাজিক বোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল বঙ্কিমের উপন্যাসেও। অনুমান করি বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যগুণের উৎস এইখানেই। অবশ্য সমাজের চাপে বঙ্কিমও শেষে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা সনাতন মূলবোধে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে শোধিত হয়েছে। আনুপাতিকভাবে তাঁর উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধিও এসেছে দীর্ণ হয়ে। এই একমাত্রিক পিউরিট্যানিক নিরোধ অবশ্য এসেছে গৌরবদীপ্ত জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে সে জন্যেই তার মার হয়েছে আরো মারাত্মক।

মূল্যবোধের এই রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রশ্নটি গুরুত্বে খাটো নয়। একমাত্রিক মূল্যবোধকে জাতীয়তাবাদের নামে, সংহতির নামে, তাহজিব-তমদ্দুনের নামে রাজনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে। একমাত্রিক মূল্যবোধ রাজনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেয়া হলে যে নিরোধের জন্ম হয় তাতেও নাটক বাঁচে না। পিউরিট্যান ইংল্যান্ডে ধর্মের নামে থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তাতে ইংল্যান্ডে খ্রিস্টীয় ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ, তবে ক্রমওয়েলীয় একনায়কত্বের সুদীর্ঘ পর্যায়ে নাটকের আর রাহুমুক্তি ঘটেনি। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে থিয়েটার মঞ্চসমূহ আবার খুলে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পিউরিট্যান পরিমণ্ডলের পিছুটান নাট্যকল্পনাকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। দীর্ঘ দুশো বছর এর জের চলেছে। প্রধান প্রধান প্রতিভা আকৃষ্ট হয়েছে কবিতায় বা উপন্যাসে। রোমান্টিক শেলির *প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ডের* পর দুর্বলভাবে টেনিসনের সংশয়ে ও শেষ হার্ডিতে ও হাউসম্যানে ট্র্যাজিক চেতনার ও মানবিক বোধের প্রত্যাবর্তন ঘটল। কিন্তু লক্ষণীয় এঁরা নাট্যরচনাকে প্রকাশমাধ্যম করেননি। এবং এ-ও মনে রাখতে হবে যে শেলি সমাজচ্যুত

outsider সংশয়ের বেদনা টেনিসনকে ভারাক্রান্ত করেছে এবং হার্ডি সম্পর্কে খ্রিস্ট্রীয় সমাজ সন্দিগ্ধ। তবে সামাজিক নিরোধ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে রোমান্টিক ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন মাত্রিক দ্রোহিতার উপর্যুপুরি অভিযাতে। এই দ্রোহিতা পিউরিট্যান জীবনবিমুখিতার বিরুদ্ধে, জীবনের একমাত্রিক সরলীকরণের বিরুদ্ধে। দ্রোহিতা তাই মানবপ্রত্যয়েরই অন্য নাম। জীবনের বহুমাত্রিক ঐশ্বর্যের সপক্ষে, মানুষের অভিজ্ঞতার, আকাঙ্ক্ষারও প্রচেষ্টার সপক্ষে এই মানবিক প্রত্যয়ের পেছনে আছে একটা কালাপাহাড়ি হেরেটিক্যাল দুঃসাহস, নাস্তিক মার্লো বা শেলি যার চারিত্রিক প্রতিভূ। সফোক্লিস বা ইউরিপিডিসে আছে এই সাহস। শেক্সপিয়রে আছে একমাত্রিক মূল্যবোধের আবিষ্ট মানুষের প্রতি অপার করুণা। সার্ত্র বা বেকেট এই হেরেসির সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এই সাহস ছাড়া মৌলিক সিরিয়াস নাট্য রচনা সম্ভবপর নয়। এই সাহস সাধারণত প্রশ্রয় পায় সংঘাতগর্ভ সমাজে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিমণ্ডল ঊনবিংশ’ শতকে ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি বিদ্রোহ দ্বারা সাময়িকভাবে বিব্রত হলেও অনতিবিলম্বে রক্ষণশীলতার কোটিতে ফিরে গেছে। ব্রাহ্ম সমাজের আপাত প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও একমাত্রিক পিউরিট্যান নিরোধ তাদেরকেও প্রভাবিত করেছে শেষ পর্যন্ত। তবু যে বাংলাদেশে সিরিয়াস নাট্য প্রচেষ্টা হয়েছিল তার কারণ এদেশের পাঠ্যক্রমে পাশ্চাত্য নাটক বিশেষ করে শেক্সপিয়রের উপস্থিতি। বাঙালি নাট্যকাররা চিরকাল শেক্সপিয়রের শিল্পসিদ্ধির দ্বারা অভিভূত, প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত হয়েছেন। শেক্সপিয়রের বহিরঙ্গকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদাপ্রসাদ, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বহিরঙ্গেরই অনুকরণ। যে মানবিক প্রত্যয় ও মূল্যবোধের বিচিত্রতা তারা শেক্সপিয়রে অবলোকন করেছিলেন, হয়তো বা আত্মস্থ করারও চেষ্টা করেছিলেন তার কোনো ভূমিজ সমর্থন ছিল না তাঁদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজে। সংঘাতের যে অমোঘ তীব্রতা নাটকে বেগের সঞ্চার করে এঁদের পরিমণ্ডলে মূল্যবোধের বিরোধ সে তীব্রতা কখনোই পায়নি। সর্বোপরি তাঁদের ছিল না মানবতাবাদ পোষিত শেক্সপিয়রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যা জীবনের তলদেশ পর্যন্ত বিধাতার মতো অবলোকন করে, ছিল না তার শিল্পবৈভব যা জীবনের নিরুদ্ধ সংঘাতকে, বিরোধী সত্যের বিচিত্রতাকে তুলে ধরে সূর্যের আলোয়।

বাংলা নাট্যপ্রচেষ্টার পরাভূত প্রতিভা শেষপর্যন্ত সান্ত্বনা খুঁজেছে ঐতিহাসিক নাটকে। সেখানে অন্তত প্রকরণগত একটা সুবিধে এই যে, সংঘাতের একটা বস্তুনির্ভর, দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপ আছে যাকে সহজেই বোঝা যায়, ছোঁয়া যায়, চিত্রিত করা যায়। মূল্যবোধের বিরোধের মতো বিমূর্ত কুহক তা নয়। এইসব ঐতিহাসিক নাটকে

মূল্যবোধের বিরোধের বিনিময়ে স্থান করে নিয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকেও ‘শেক্সপিয়রের প্রেরণা সমানভাবে সক্রিয়। তবে শেক্সপিয়রের

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার পরিসর ট্র্যাজেডির সমগোত্রীয়, দার্শনিক প্রস্তাবনায় তা ধর্মীয় নাটকের মতোই ব্যাপক। দ্বিজেন্দ্রলাল এটিই ধরতে পেরেছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণও করেছিলেন মূলকে। তবে তা' চাতুর্য ও দক্ষতা সত্ত্বেও অনুকরণ ও আরোপনই থেকে গেছে, মানবভাগ্যের আত্যন্তিক প্রশ্নের যন্ত্রণা ও আবেগ দ্বারা আলোড়িত, উন্মথিত হয়ে ওঠেনি। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা। মাইকেলের মতো বা বঙ্কিমের মতো প্রথমশ্রেণির স্রষ্টার কাছে এইখানে তার হার।

বাংলাদেশের সংস্কার আন্দোলনকে রঙ্গব্যঙ্গ করে বা তার সমর্থনে রচিত নাট্যধারাই প্রবলতম ধারা হিসেবে পরিপুষ্ট হয়েছে। মদ্যপান, কুলীন সমস্যা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ক্রমিক নাটক বা প্রহসন রচিত হয়েছে অজস্র। এ-জাতীয় সংশোধনমূলক রচনার স্যাটায়ার ও ব্যঙ্গের পথ না ধরে উপায় নেই। সিরিয়াস বাংলা নাটকের বন্ধ্যাত্ব ও সংকট মোচনে যিনি এক অনন্য সমাধান উপস্থিত করলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সাহিত্যাদর্শেও পরিবর্তন ঘটেছে। নীতিশিক্ষা, যা সংস্কারমূলক নাটকের প্রেরণা সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে হয়েছে বিচ্যুত। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান প্রতীকী নাটকের আমদানি করলেন যা তাঁর কাব্যপ্রতিভারই পরিপূরক মাত্র। বিমূর্ততার অন্যমেরুতে সংস্থিত এইসব নাটক রবীন্দ্রনাথের স্বকাল থেকে যতটা এগিয়ে যাচ্ছে ততটাই তার দাবি বুদ্ধিপ্রধান দর্শকের কাছে। উত্তরসূরিবিহীন দুঃসাধ্য এইসব নাটক বাংলা নাট্যকর্ষণার ক্ষেত্রে দুর্লভ অর্কিড হিসেবেই রয়ে গেল। উপন্যাসের অনুকরণে সমাজচিত্রণমূলক প্রচেষ্টায় বাংলা নাটকের সীমিত মুক্তি ঘটেছে। সীমিত এই কারণে যে, যে স্থূল উদ্দেশ্যপ্রবণতা সংস্কারমূলক নাটকের প্রেরণা তা থেকে এইসব নাটকও পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। উদ্দেশ্যপ্রবণ নাটকের ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে আরেক ধরনের নাটকে... জাতীয়তাবাদী উজ্জীবন যার মহৎ প্রেরণা। এই ধারাই আবার পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নাটকের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ দেশের সাহিত্যে এ অক্ষম্যও নয় নিন্দনীয়ও নয়। এর মধ্যে কিছু নাটক শিল্পকুশলতা ও জীবনের বলিষ্ঠ উচ্চারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণে* যে বিপ্লব অনুপ্রাণিত নাট্যধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুলসী লাহিড়ীর *ছেঁড়াতারে* বা উৎপল দত্ত ও মনোজ মিত্রের নাট্যাবলিতে তা আজো প্রবহমান। অনুমান করি আরো দীর্ঘকাল আমাদের মতো দরিদ্র ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতাড়িত দেশে এইজাতীয় নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে।

৩.

পাকিস্তানি আমল থেকে বাংলার নাটকেও উপরোক্ত ধারাক্রমের অনুসৃতি লক্ষ করি। ইব্রাহিম খাঁর *কাফেলা* ও আবুল ফজলের *কায়েদে আজম* নাটক দিয়ে রাজনৈতিক চরিত্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদী নাটকের ধারাটি উদ্বোধিত হয়েছিল। মুসলিম

আত্মানুসন্ধানের রাজনৈতিক আবেগের প্রবলতা স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ে মানুষের অন্যতর কোনো পরিচয়ের বৃত্তে নাটকের ফোকাসটিকে সংস্থিত হতে দেয়নি। ফলত চিরায়ত নাটকের বিষয়বস্তু যে আত্যন্তিক মানুষ, কালচিহ্নহীন, সম্প্রদায়নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ, অস্তিত্বের যে সমস্যা নাট্যকারদের কল্পনারও বাইরে থেকে গেছে। পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* এই জাতীয়তাবাদী ধারার নাটক থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যদিও গোষ্ঠী আত্মানুসন্ধানের প্রেরণা এখানে পশ্চাদমুখী আত্মগৌরববোধের চাইতে আত্মবিশ্লেষণের শানিত আয়রনিতে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রসংঘাতে ও নাট্যকুশলতায়ও মুনীর চৌধুরী আবুল ফজল বা ইব্রাহিম খাঁ-কে অতিক্রম করে গেছেন অনায়াস সাফল্যে। তবে মুনীর চৌধুরীর সমগ্র জীবনের নাট্যকর্মের সীমাবদ্ধতাও প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায়ের পরিবর্তন-কুণ্ঠ মুসলিম সমাজে নাট্যসঙ্কটেরই ভিন্নতর দ্যোতক। এটাও তাৎপর্যহীন নয় যে মুনীর চৌধুরীর অন্যতম সিরিয়াস নাটক 'কবর'ও আছে একটি রাজনৈতিক আবেগের হাত ধরে।

আসকার ইবনে শাইখকে দিয়ে মুসলিম সামাজিক নাটকের ধারাটির শুরু। আনিস চৌধুরীর *মানচিত্রে* তা প্রবহমান। লক্ষণীয় যে আসকার ইবনে শাইখ যে ভাবে নাট্যাবলিতে বিরোধের বা সংঘাতের মাত্রাসমূহকে চিহ্নিত করেন সেখানে সম্প্রদায়গত পরিচয়টি ক্রমেই গৌণ হয়ে আসে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, প্রথানিষ্পিষ্ট গ্রামীণ সমাজসংস্থানের সঙ্গে নতুন সমাজসংস্থানের বিরোধ তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আনিস চৌধুরীতে নাগরিকতার পদপাত আরো বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্বিরোধ, দীর্ণতা ও ট্র্যাজেডি তাঁর অন্বিষ্ট। কিন্তু *মানচিত্রের* পরিণতি বড় muted রঙে আঁকা। ট্র্যাজেডির প্রবলতা যা অনিবার্য নয়। ফলে প্রভূত সততা সত্ত্বেও একধরনের ম্লানতা এই নাটকের মঞ্চসাফল্যে বাদ সাধে।

বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুদয় ও আধুনিক নজর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের নাট্যচরিত্রেও পরিবর্তন লক্ষ করি। সমাজের নগরবাসী অংশে যাদের শেকড় এখনো হয়তো গ্রাম্যসমাজেই প্রোথিত তাদের মানসিকতায় নাগরিক নতুন মূল্যবোধ ও সনাতন গ্রামীণ মূল্যবোধের মধ্যে বিরোধিতা আসন্ন হয়ে ওঠে। পিউরিট্যান পরিমণ্ডল নিয়ে অসন্তোষ দানা বাঁধে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি আধা-আন্তর্জাতিক শহর গড়ে ওঠে ত্রিশ বছরের পরিসরে। বিবিধ বিচিত্র জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার হাতছানি যুগান্তরব্যাপী প্রায় স্থাণু সমাজকে সচকিত করে তোলে। এর কিছুটা প্রাকচেতনা আসকার ইবনে শাইখ ও আনিস চৌধুরীতে বিম্বিত হলেও উনিশ'শ বাহাত্তরে একগুচ্ছ তরুণ নাট্যকারের আবির্ভাবে যে বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা সূচিত হয় তার তুলনায় পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টা প্রায় কিছুই নয়।

এই নাট্যবিস্ফোরণের উৎস কোথায়? একটা জিনিস এইসব নাটকে খুব স্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা হয়েছে যে সনাতন মূল্যবোধ ভেঙে পড়েছে সুবচনসমূহ নির্বাসনে অন্তর্ধান করেছে। শুধুমাত্র নাগরিক প্রসার এই সনাতন মূল্যবোধ অবসিত হওয়ার কারণ হতে

পারে না। বস্তুতপক্ষে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর গণআন্দোলন, ২৫ মার্চ ও তৎপরবর্তীকালের গণহত্যা ও প্রতিরোধের traumatic বিদীর্ণ করা অভিজ্ঞতা অগ্রজ পোষিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে প্রচণ্ড ফাটল সৃষ্টি করেছে তরুণদের মনে। তরুণ সম্প্রদায় স্বাধীনতা আন্দোলনের মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মহৎ প্রাপ্তির সূচনা করেন তা অগ্রজেরা দূরতম কল্পনায়ও ভাবতে পারেননি।

তরুণরা একদিকে যেমন মরণোন্মুখ পশুশক্তির বিরুদ্ধে জীবনের জয় ঘোষণা করেন ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় উচ্চকিত হন, অন্যদিকে তেমনি হতাশ্বাস ও তিক্ততার ফসলও কম সঞ্চয় করেন না। জাতির অত্যন্ত সংকটের সময়ে অগ্রজদের আত্মকেন্দ্রিক ভীরুতা এবং আপোষের ও আত্মসমর্পণের অবসান না করার চিত্রে তারা বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। ফলত প্রাক্তন সব সামাজিক প্রতিশ্রুতি মূল্যবোধ বা বিশ্বাসে এরা আস্থাহীন হয়ে পড়েন। দেশের রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ শেষপর্যন্ত জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধে রূপান্তরিত হয়। ট্র্যাজিক সংঘাতের সহস্র পুনরুচ্চারণে তরুণরাই তার মূল্য শোধ করেন তিক্ত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র তরুণরাই নয়, সমগ্র সমাজের মানুষই দীর্ঘ ন'মাসের দুঃস্বপ্নপীড়িত দিনগুলোকে পাশবিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করে মানুষের সব মূল্যবোধই সমাজ আরোপিত, সম্মতিনির্ভর। কিছুরই বুঝি পবিত্রতা নেই : না জীবনের, না জীবন বিরজিত মরদেহের, না মানবিকতার, না ধর্মীয় অনুশাসনের। জীবনমৃত্যুর নিষ্করুণ দোলাচলে বিধৃত ঐসব রূঢ় বিনষ্টির মুহূর্তে অবলম্বনহীন নগ্ন অস্তিত্বের আবিষ্কার বারবার খুলে দিয়েছে অচিন্ত্যপূর্ব প্রেক্ষিত বজ্রের আলোয়। এইসব বোধ হয়তো অধিকাংশের ক্ষেত্রে হয়েছে তাৎক্ষণিক, হয়তো তারা প্রত্যাবর্তন করেছে জীবনের প্রাত্যহিক অভ্যাসে। কিন্তু অনেকেই তো প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি; হারিয়ে ফেলেছে ভারসাম্য, প্রাত্যহিকতার নোঙর হয়েছে আলগা। এবং বলা যায় যে, সংশয়ের বীজ আরোপিত হয়েছে ব্যাপক পরিধিতে।

আজকের নাট্যকারের বর্ণালীতে ধরা পড়েছে অভিজ্ঞতার এই বিচিত্রতা ও তাৎপর্য, তার একপ্রান্তে আছে সংশয়ের গাঢ় ছায়া, অন্যপ্রান্তে জীবনআসক্তি ও আত্মবিশ্বাসের চড়া রঙ। নতুন নাট্যকারদের নাটকে যে চড়াসুরের প্রাদুর্ভাব দেখি তার কারণ বুঝি এইখানেই। এ যেন প্রাক্তন অগ্রজদের ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও দাস্যের প্রতিপক্ষে তরুণদের প্রতিবাদ। এদের নাটকগুলোতে বিদ্রোহপ্রবণ হেরেটিক তরুণ নায়কের সংখ্যাধিক্য এই প্রতিবাদই চিহ্নিত করে। রক্তমূল্য অর্জিত এই সব নবাবিষ্কৃত অনুভব নাটক ছাড়া আর কোথায় এত elemental ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে? সাম্প্রতিক নাট্যবিস্ফোরণের কারণ কি তাই নয়?

প্রাক্তনদের মতো মুদ্রিত পুস্তকের পরোক্ষে প্রাপ্ত রেনেসাঁ মূল্যবোধের দুর্বল অনুকরণ নয়, জীবনের আত্যন্তিক সত্যচিত্রণের দায় প্রেরণার চাপ সৃষ্টি করেছে এইসব তরুণতর নাট্যকারদের চেতনায়। এই জীবন সততা ও আততি থেকেই নতুন নাটক তাৎপর্য পায়। নাটক আকর্ষণ করেছে প্রতিভাবানদের আবার। উনিশশো ছেচল্লিশ থেকে

একাত্তর এই পঁচিশ বছরে নাটক লেখা হয়েছে আনুমানিক দশটি কি বারোটি। আর গত কয়েক বছরে নাটক লেখা হয়েছে গোটা চল্লিশেক। এই ধারা ক্রমেই স্ফীত হয়ে চলেছে। অবশ্য আমরা সামাজিকভাবে পিউরিট্যান পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হয়েছি বলাটা নিছকই অতিকথন হবে। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপর্যস্ত করা অভিজ্ঞতা ছাড়া স্বাধীনতাপরবর্তী পর্যায়ের সামাজিক কাঠামো অপরিবর্তিতই আছে এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাও আবর্তিত হচ্ছে প্রাচীন খাতেই। তবে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যায়ের অভিজ্ঞতা একটি স্থায়ী টেনশন সৃষ্টি করেছে সামগ্রিক পিউরিট্যান পরিমণ্ডলে। তাই সাম্প্রতিকতম নাটক এখনো একটা বিদ্রোহ, একটা হেরেসি এবং মির‍্যাক্‌ল্।

সাম্প্রতিকতম এই হেরেসির বিশ্লেষণের আগে দুটি ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরের উল্লেখ করতে হয়। নাট্যপ্রকরণে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *তরঙ্গ ভঙ্গ* নাটকে। সামাজিক দায়িত্ববোধ তার নাট্যপ্রেরণা সংস্থিত...*বহিপীর* ও *তরঙ্গ ভঙ্গ* তার প্রমাণ। মীর মোশাররফ হোসেনের *জমিদার দর্পণ* থেকে *তরঙ্গ ভঙ্গ* থিমেটিক দিক দিয়ে বিরাট *পথ পরিক্রমা* নয়; কিন্তু বক্তব্য উপস্থাপনে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। এক্সপ্রেশনিস্ট টেকনিককে সমাজ-বক্তব্যের কাজে লাগান হয়েছে। প্রতীক ব্যবহারের কুশলতা সঙ্কীর্ণ বাস্তবতা থেকে রচনা করে মুক্তি। নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা করার ও সাসপেন্সের ব্যবহারে দক্ষতা তাঁর উপন্যাসকেও নাট্য লক্ষণাক্রান্ত করেছে।

ষাটের দশকের শুরুতে নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমদ। তাঁর *কালবেলা* ওয়ালীউল্লাহ্‌র তুলনায় আরো সাহসীদীপ্ত সৃষ্টি। এই প্রথমবারের মতো একটি বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রশ্ন বা আর্তি নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশেষ দেশকাল মাত্রায় বা সাম্প্রদায়িক চিহ্নে চিহ্নিত মানুষ নয় ঐতিহাসিক, জাতীয়তাবাদী বা সামাজিক প্রাক্তন সব নাটকে যেমনটি চিত্রিত হয়েছে। বরং জীবনমৃত্যুর অনিশ্চয়তা স্পষ্ট আত্যন্তিক মানুষের বেদনা ও হাহাকার ফুটে উঠেছে বাত্যাপীড়িত, প্লাবন-নিমজ্জিত বঙ্গোপসাগরীয় কাল্পনিক দ্বীপবাসীদের এই চিত্রণে। বক্তব্যের অন্তশ্চাপে টেকনিক গেছে গৌণ হয়ে।

যেটা লক্ষণীয় এই দুই নাট্যকারের ক্ষেত্রেই, তা হল এই যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রায় সারাজীবনই কাটালেন প্রবাসে, ভিন্নতর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে। সাঈদ আহমদের দীর্ঘ প্রবাসজীবন কেটেছে ইউরোপের নাট্যনগরী প্যারিসে। আধুনিক জীবনবোধ আলো-হাওয়ার মতো এদের চেতনায় স্বচ্ছন্দসঞ্চারী। স্বদেশীয় পিউরিট্যান নিরোধ এঁদের কল্পনার স্ফূর্তিকে নিষ্পিষ্ট করেনি।

তরুণতর নাট্যকাররা একদিকে যেমন বক্তব্যের অভিনবত্বে নতুন স্বাক্ষর রাখার চেষ্টা করছেন তেমনি আঙ্গিকগত উদ্ভাবনাও তাদের উচ্চকিত রাখে। সেলিম আল দীনের সংবাদ *কার্টুন*, আবদুল্লাহ আল মামুনের *সুবচন নির্বাসনে*, জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, সাযযাদ কাদিরের *সাড়ে সাতশো সিংহ* বা হাবিবুল হাসানের *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ* এর নানা উদাহরণ। যেটা লক্ষণীয় সেটা হল এই যে, এরা সবাই এক্সপ্রেশনিস্ট আঙ্গিক দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত।

তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান আবদুল্লাহ আল মামুন ও সেলিম আল দীন সামাজিক বক্তব্যকেই তুলে ধরেন *এখন দুঃসময়, সুবচন নির্বাসনে* বা *করিম বাওয়ালী শত্রুতে*; যদিও আঙ্গিকের উদ্ভাবনায় চমক দেয়ার চেষ্টা আছে। সেলিম আল দীন এদের মধ্যে অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়। সেলিম আল দীনের নাটকের সামাজিক প্রেক্ষাপটটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। নাটকের একটি পর্যায় পর্যন্ত তিনি তা বেশ দক্ষতার সঙ্গে তুলেও ধরতে পারেন। কিন্তু তারপরই তার ফোকাসটি আর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংস্থিত থাকে না ছড়িয়ে যায়। ফলত, বক্তব্যের অস্পষ্টতা নাটকের পরিণতিকে আচ্ছন্ন করে। করিম বাওয়ালীর সামাজিক শত্রুদের সনাক্ত করতে বেগ পেতে হয় না, নাটক একটি লক্ষ্যের দিকে অনিবার্যভাবে ধাবিত হতে থাকে। কিন্তু তারপরই মৃত্যু ও তার অনুষঙ্গআশ্রয়ী চিত্রকল্পের এক্সপ্রেশনিস্ট tableaux পরিণতিকে অস্পষ্টতায় আবৃত করে। মূল বক্তব্য যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। *সর্প বিষয়ক গল্প* বা *আতর আলীদের নীলাভ পাটেও* একই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখি। রিয়ালিস্টিকভাবে শুরু হয়ে এক্সপ্রেশনিজমে বক্তব্যের অন্তর্ধান। আমার সন্দেহ এটা আঙ্গিকগত প্রলোভন থেকে এসেছে যার পেছনে কোনো গভীর দার্শনিক প্রস্তাবনা নেই, ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্ট বা অ্যাবসার্ড নাটকের পেছনে যেমন আছে।

আবদুল্লাহ আল মামুনের সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই কিন্তু কোনো আত্যন্তিক সংঘাতের বিস্ফোরণও নেই বিশেষ করে *সুবচন নির্বাসনে*। তবু *সুবচন নির্বাসনের* চাইতে *এখন দুঃসময়* নাটক হিসেবে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। প্রসঙ্গত মনোজ মিত্রের *চাক ভাঙা মধু* নাটকটি মনে পড়ে। *চাক ভাঙা মধুতে* ঘটনার ঘাত-প্রতি -সাসপেন্সটিকে কোথায়ও শিথিল হতে দেয়নি। এর সহযোগী সংলাপ রচনায় অনিবার্যতা বা অমোঘতা এই সাসপেন্সটিকে ধাপে ধাপে উত্তুঙ্গে তুলেছে পরিণতির প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত, নাটক পরিসমাপ্ত হয়েছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সর্বত্র সংলাপে, ঘটনাসংস্থানে লেখকের সংযম ও নৈপুণ্য অসাধারণ। দুঃখজনকভাবে *এখন দুঃসময়ে* সম্ভাবনা অসাধারণ থাকা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ্‌ আল মামুন এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করে নাটকটিকে মহত্তর শিল্পসিদ্ধিতে নিয়ে যেতে পারেননি। বিশেষ করে নাটকের সংলাপ অনেক জায়গাতেই নাটকের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। সংলাপ-চটুলতার প্রশ্রয় অভিনয়-বৈগুণ্যে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়ে নাটকের সিরিয়াস বক্তব্য পানসে করে দিতে পারে। মনে হয় অনেক বেশি কুশলতা, যত্ন ও সংযম প্রত্যাশিত ছিল আমাদের।

সহানুভূতিশীল সমালোচক মাত্রই বিব্রত হয়ে লক্ষ করবেন; সাম্প্রতিক নাটকের অনেকগুলোতেই নাট্যকার যেন দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা দ্বারা আক্রান্ত। একদিকে সামাজিক দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে মানুষের জীবন ও নিয়তি সম্পর্কে গভীরতর সত্যানুসন্ধানের প্ররোচনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর এক্সপ্রেশনিস্ট ভঙ্গিমা সত্ত্বেও বক্তব্যে স্থিতধী কোনো গভীরতর জীবনসত্য উন্মোচন তাঁর অন্বিষ্ট নয়। তাঁর *তরঙ্গ ভঙ্গে* ইবসেনীয় discovery বা সযত্নে রক্ষিত গোপন পাপকে সহসা প্রকাশিত করার

টেকনিকটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ নাটকের পেছনে তেমন কোনো প্লটের গ্রন্থনা নেই কাজেই ঐ জাতীয় ইবসেনীয় টেকনিকের প্রশ্নও অবান্তর। তবে *করিম বাওয়ালী* বা *আতর আলীদের নীলাভ পাট* নানাদিক দিয়ে *তরঙ্গ ভঙ্গের* সমীপবর্তী, কিন্তু নাটকের ফোকাস সামাজিক বক্তব্য ও দার্শনিক বক্তব্য এই দুই প্রবণতার মধ্যে দ্যোদুল্যমান। নাট্যকার যেন নিজেও নিশ্চিত নন কোন ব্যক্তিটিতে তিনি জোর দিতে চান। তাঁর চরিত্রগুলোকে তাদের নিয়তির শিকার অথবা তারা নিজেরাই তাদের নিয়তির স্রষ্টা তা আর স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। এই দ্বৈধতা নাটকের নামকরণেও পরিস্ফুট : *করিম বাওয়ালীর শত্রু বা মূল মুখ দেখা*। আবদুল্লাহ্ আল মামুনের কমিটমেন্ট অনেক বেশি। নিরঞ্জন অধিকারীর *কালো অশোক লাল ফুল* বা ফরহাদ মজহার এর *প্রজাপতির লীলালাস্য* অনেক দুর্বল, নাটক হিসেবে, কিন্তু এ-জাতীয় অস্পষ্টতার উদাহরণ হিসেবে নগণ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের *রাজরক্তের* মতো নাটকের সঙ্গে *প্রজাপতির লীলালাস্যের* তুলনা মনে পড়ে এবং এ নাটকের দুর্বলতাগুলো বিক্ষুব্ধ করে। নাটকে এই অস্তিবাচক মূল্যবোধের বিপর্যয়,৩বিপর্যয় ছাড়া আর একে কিই-বা বলি? সন্দেহ হয়, কোথায় এদের নাট্যকাররা যেতে চান তজ্জনিত অনিশ্চয়তারই প্রতিফলন।

এ-ও সন্দেহ হয় যে, এই বিপর্যয় আঙ্গিকগত প্রলোভন থেকে আসেনি তো? এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। অন্তিম বিশ্লেষণে এ্যারিস্টটলের সঙ্গে প্রভূত মতপার্থক্য সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নাটক একটি অনুকরণমূলক শিল্প বা 'ইমিটেটিভ আর্ট।' নাট্যকার কী অনুকরণ করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার, তবে তিনি কী চিত্রিত বা অনুকৃত করতে চান তার ওপর নির্ভর করবে কী টেকনিক বা শিল্পপদ্ধতি তিনি ব্যবহার করবেন। টেকনিক এবং বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সত্যি খুব বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার ইউজীন ও নীল যেমন তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে জীবনের গভীরে অন্তর্লীন সত্য বা essential reality উন্মোচন করাই তার লক্ষ্য। এখন প্রশ্ন হল যে, জীবনপ্রক্রিয়ার পেছনে অন্তর্লীন রহস্য বা চূড়ান্ত সত্যটি কী? সে কি ইতিহাসে বিধৃত শ্রেণিসংগ্রাম, সেকি শৃণান্ত বিশ্বে মানুষের দুর্মের একাকিত্ব, সে কি মানুষের পাপবোধের খ্রিস্টীয় উত্তরাধিকার, সেকি ফ্রয়েডীয় লিবিডোর তাড়না? ও' নীল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে অন্ততপক্ষে তার দুটি নাটকে ব্যবহার করেছেন তার একটি *Mourning Becomes Electra*, লক্ষণীয় যে এইটি চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি একটি গ্রিক মিথের পুনর্নির্মাণ করেছেন আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পটভূমির কাঠামোর মধ্যে। অথচ তাঁর আত্মজৈবনিক ট্র্যাজেডি উন্মোচিত হয়েছে *অমারজনীর পথে* বাস্তবধর্মী শিল্পপদ্ধতির মাধ্যমে। এটাও কোনো ফর্মূলা নয়। তবে শ্রেণিসংগ্রাম বা তুলনীয় কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য চিত্রিত করতে গিয়ে আঙ্গিকে যে অবজেকটিভ বাস্তবতা কাম্য, মানুষের দুঃসহ একাকিত্ব ও আত্যন্তিক বিচ্ছিন্নতাবোধের চিত্রণে সেই একই টেকনিক অতটা অনিবার্য নয়; হয়তো-বা এক্সপ্রেশনিস্ট টেকনিক সেখানে বক্তব্য আকারে অনেক

বেশি সহায়ক। *ওয়েটিং ফর লেফটি* এবং *ওয়েটিং ফর গোডোর* মধ্যে আঙ্গিকের ব্যবধান তাই নিছকই ক্লিফোর্ড ওডেটস্ ও বেকেটের আঙ্গিকগত উদ্ভাবনারই ফল নয়।

জাঁ জেনে, বেকেট বা ব্রেশট-এর ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নাট্যকারদের অনেকের মধ্যেই এ্যাবসার্ড নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে। এ সমস্ত দার্শনিক বা তাত্ত্বিক আন্দোলন আমাদের দেশে জন্মলাভ করেনি, এর প্রাসঙ্গিকতাও আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকটাই আরোপিত। তবু যেহেতু আমাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কাজেই মানবভাগ্য নিয়ে অন্যত্র যা ভাবা হচ্ছে এবং সাহিত্যে যেভাবে চিত্রিত হচ্ছে তা আমাদের শিল্পস্রষ্টাদের প্রভাবিত করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে তত্ত্ব বা আঙ্গিক সময় ককতোঁর 'স্যুররিয়ালিজম' থেকে বেকেটের 'অ্যাবসার্ড' বা ব্রেশ্‌টের 'কমিটমেন্ট' আলাদা করে নিতে পারা চাই অন্যথায় একটি জগাখিচুড়ি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সমস্ত নাট্যকারদের নাটকের পেছনে নাটকের আঙ্গিকের পেছনে যে দার্শনিক সমর্থন আছে তা' আমাদের এ-জাতীয় প্রচেষ্টার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিশেষ করে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রলোভন গদ্যকবিতার মতোই আপাত-সহজতার প্রলোভন। এটা বিপজ্জনক, কারণ ভারসাম্য রাখা কঠিন, বিভিন্ন বিষয়ক জটিলতাই বাড়তে থাকে প্রাপ্তিযোগ হয় না বিশেষ কিছু। আমাদের অধিকাংশ নাটকে এমনকি অত্যন্ত প্রাগ্রসর আভাঁ গার্ড নাটকেও সামাজিক বক্তব্য উপস্থাপনার একটা প্রয়াস লক্ষ করি অথচ আঙ্গিকের টান অন্যদিকে। এক্সপ্রেশনিজম ও সমাজবক্তব্য-প্রবণতা এক জিনিস নয়। কোনো সৃষ্টিধর যদি এই দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারেন তিনি এক অসামান্য প্রতিভা, যেমন ব্রেশট। অথবা ভিন্নতর দার্শনিক আঙ্গিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ। অ্যাবসার্ড নাটকের পেছনেও আছে আইডিয়ার বিদগ্ধ গ্রন্থনা।

পূর্বোক্ত নাটক থেকে একেবারে ভিন্ন জাতের নাটক জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*। এ নাটকের উপস্থাপনা আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্যগন্ধী মেটাফিজিক্যাল নাটকসমূহকেই মনে করিয়ে দেয়। প্রতীককে উপজীব্য করে এই নাটক দাঁড়িয়ে আছে। দর্শনরিক্ত বাংলা নাটকে এটি একটি 'প্লে অব আইডিয়াস' বা আইডিয়াপ্রধান নাটক। এ- জাতীয় নাটক লেখারও একটা প্রবণতা হালে লক্ষ করি। আক্তার কমলের *রঙহীন সিগন্যাল*, জাহিদ হায়দারের *কালো আয়না* এই ধারায় সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। এই সমস্ত নাটকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে না গিয়ে বলব যে এদের শিল্পসিদ্ধি ততটা অর্জিত বিষয় নয়, যতটা আরাধ্য বিষয়।

বিমূর্তনের প্রথম শর্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে যে নাট্যকারের একটি প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য আছে এবং সেটি বিমূর্তনের মাধ্যমেই সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরা সম্ভব। প্রতীক ব্যবহারেও অতিকথন দোষ ঘটতে পারে, মমতাজ উদদীন আহমদের *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতায়* যে প্রবণতা দেখা গেছে। নাট্যকার তার রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের ব্যগ্রতার প্রতীকসমূহকে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গন্ধী করে তুলেছেন। আবার বিমূর্তনের অন্য প্রান্তেও বিপরীত বিচ্যুতি ঘটতে পারে এবং প্রতীকের উপর্যুপরি অভিঘাত নাটকে বিশ্বাস হরণের কারণ হতে পারে। প্রতীক বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে সম্পৃক্ত হওয়ার বদলে। আইডিয়াপ্রধান নাটকের কুহক এই আইডিয়াসর্বস্বতায় যখন আমরা আবিষ্কার করি বাস্ত বতায় প্রত্যাবর্তনের পথ সব বন্ধ। নাটক অবাস্তবতায় পর্যবসিত হতে পারে। অথচ প্রতীকের শক্তিশালী ব্যবহার আমাদের আইডিয়া ও বাস্তবের অন্তঃসঞ্চারী প্রবহমানতার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে অনেকেই নাটক লিখেছেন। এরকম একটি বহুমাত্রিক প্রচণ্ড বিপুল অভিজ্ঞতা আরো পর্যাপ্তভাবে নাটকে আসবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। বস্তুতপক্ষে ওপরে যে সমস্ত প্রবণতা ও নিরীক্ষজনিত সমস্যার উল্লেখ করেছি তার পূর্ণতম প্রয়োগের ও অন্বেষণের সম্ভাবনা ছিল যুদ্ধ, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী প্রত্যাবর্তনজনিত অভিজ্ঞতাআশ্রয়ী নাটকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যতটা আবেগ এইসব নাটকে চিত্রিত হয়েছে, ঐসব নাটকের নির্মাণে ততটা মননের পরিচয় নেই। আলাউদ্দিন আল আজাদের *নিঃশব্দ যাত্রা* মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় অষ্টাবক্র জটিলতাযুক্ত প্রেমের গল্প। তুলনামূলকভাবে লাঞ্ছিত রমণীদের সমস্যা নিয়ে লেখা *নরকে লাল গোলাপ* অনেক বেশি হৃদয়কে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ যাত্রার পরিণতিতে স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা নাটকটিকে দুর্বল করে ফেলেছে। মনে হয় সমস্যাটি নাট্যকারের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে মোহাম্মদ এহসানুল্লাহর *কিংশুক যে মরুতে* রিচ্যুয়ালিস্টিক উপস্থাপনার গুণে অন্তর্নিহিত আবেগকে অনেক বেশি জোরালোভবে তুলে ধরে। তবে এখানেও অতিকথনের প্রবণতায় সে আবেগ যতটা উচ্চকণ্ঠ, ততটা গভীরে প্রবেশ করে না।

আমার এ আলোচনায় সমস্ত নাটকের উল্লেখ বা আলোচনা আমার অভীষ্টও নয়, সাধ্যও নয়। সাম্প্রতিক নাট্যপ্রচেষ্টার কিছু সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। তুলনামূলকভাবে আমি হয়তো ব্যর্থতার কথাটাই বিশেষভাবে বলেছি, তারও কারণ এই যে সাম্প্রতিক নাট্যকারদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। দীর্ঘকাল পরে বিনোদনের জন্যে নয়, এরা একটা নৈতিক দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়েই নাট্যাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে বিচিত্র, প্রবল এবং অস্তিত্ব আলোড়নকারী যৌথ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সাম্প্রতিককালে আমরা সবাই গিয়েছি নাটক ছাড়া আর কোথায়ই তা এমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারত? সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর যৌথত্ব।আশ্চর্য কি যে নাটকের মতো যৌথ জীবনময় শিল্পই এর যথোপযুক্ত শিল্পমাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নাটক যেন সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অবলোকন ও আত্মস্থকরণের অনিবার্য মাধ্যম। সনাতন প্রবাহিত সমাজের জীবনযাত্রায় হয়তো এই সাম্প্রতিক আলোড়নের প্রভাব এখান তার মূল্যবোধে রূপায়িত হয়নি, সে অভিজ্ঞতার অবয়ব ও তাৎপর্য অধিকাংশের চেতনায় এখনো অস্পষ্ট অস্বস্তিবোধেই পর্যবসিত কিন্তু যে নির্ভীক দুঃসাহস সত্যলব্ধ দ্রষ্টাকে প্রথানির্দিষ্ট মূল্যবোধের নিরাপদ শিখর ছেড়ে নতুন অনুভূতির তীর সন্ধানে প্ররোচিত করে, পিউরিট্যান বিরোধকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠুর এবং বিব্রতকর প্রশ্নসমূহকে প্রকাশ্য শিল্পের আলোয় রাখে সাম্প্রতিক নাটকের পেছনে আছে সেই দ্রোহিতা ও হেরেসি। আপ্ত ও আরোপিত মূল্যবোধকে মেনে নেয়া নয় বরং জীবনের উপরিতলে অভিজ্ঞতাকে পরিশ্রমী কৃষকের মতো বারবার উল্টে দিয়ে নতুন সত্যের ফসল ফলায়। বাংলা নাটকে এই প্রথম ব্যাপকভাবে এই প্রেরণা কাজ করছে। তবে অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটকে সাধারণতভাবে কবির মন্ময় অনুভূতির তীব্রতা (intensity) যতটা ধরা পড়েছে তার সঙ্গে উপন্যাসের তন্নিষ্ঠ জীবন অবলোকন ততটা সংযুক্ত হয়নি। ফলে নাটক জীবনের নির্যাস থেকে যে বিকল্প মিথ তৈরি করে ততটা সাফল্য কোনো সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ভাগ্যে এখনো ঘটেনি।

উৎস : থিয়েটার, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্যজন।]

প্র ব ন্ধ

দুই বাংলার প্রতিবাদী চেতনাসমৃদ্ধ নাটকের তুলনামূলক মূল্যায়ন

মো. জা কি রু ল হ ক

বিশ শতকের দুই বাংলার সত্তর ও আশি'র দশকে রচিত প্রতিবাদী চেতনাঋদ্ধ নাটকের বিশ্লেষণে আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য আন্দোলনের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম আর সেই জন্মলগ্নই সম্ভবপর করে তুলেছিল সেখানাকার নব নাট্যচর্চা। যেখানে লেখা হচ্ছিল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের অসংখ্য নাটক। পশ্চিমবঙ্গে চল্লিশের দশকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'র মধ্যে দিয়ে যে নতুন নাট্যধারার সূত্রপাত তারই পথ ধরে'৪৭-এর স্বাধীনতা তথা দেশবিভাগের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা হল অনেক শিল্পঋদ্ধ নাটক। এ সময়ে বিজন ভট্টাচার্য ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ নাটক লিখেছেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ঋত্বিক ঘটক, সলিল সেন প্রমুখ।

ক্রমে পঞ্চাশের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের বিস্তার। মূলত গণনাট্যসঙ্ঘের রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনাকে সাঙ্গীকার করেই নাটককে শিল্পসম্মত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে সেই নাট্যচর্চা এগিয়ে চলেছিল। ষাটের দশকে আরো নতুন নাট্যদল তৈরি হল। নাটকের চাহিদাও বাড়ল। মৌলিক নাটকের পাশাপাশি আমরা বহু সমৃদ্ধ রূপান্তরিত নাটকও পেলাম। বহু নাটকেরই প্রধান নির্ভর ছিল আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনের অসন্তোষ। এরই মধ্যে আবার জীবনের নানা অসঙ্গতি, তথা জীবনযাত্রার জটিলতাকে কেন্দ্র করে লেখা হতে থাকল প্রতিবাদী চেতনাঋদ্ধ নাটক। যার পূর্ণ বিস্তার ঘটল সত্তরের দশকে এবং আশি'র দশকেও থেকে গেল তার রেশ।

চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ন্যায় সত্তরেও গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর এ দশকের নাটকেও আছে রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা, জীবনবোধের গভীরতা, দেশজ ঐতিহ্য, আছে কৃষক-শ্রমিক, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের শোষণ বঞ্চনা ও দুঃখ-বেদনার কথা। মার্কসীয় দর্শনে উদ্দীপীত এই নাট্যকার কোনো একক মানুষের সমস্যা নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের সামাজিক সমস্যাকে জীবনবোধের

গভীরতায় বিশ্লেষণ করেন এবং তার মধ্যে দিয়েই ঘটাতে চান সাধারণ মানুষের চেতনার জাগরণ। উচ্চকিত প্রতিবাদ না থাকলেও ক্রমশ নাটকে প্রকাশিত হয় প্রতিরোধের চেতনা। তাঁর নাটকের গ্রামীণ সমাজের প্রসারিত প্রেক্ষাপটে এবং শেষ দু'টি নাটকের শহুরে পরিস্থিতিতে সমকালের ক্ষোভ-সংঘাত চিরকালের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে আমরা দেখি তাঁর 'নবান্ন', 'দেবী গর্জন' কিংবা 'গর্ভবতী জননী'র মতো সত্তরের 'চলো সাগরে', 'চুল্লী' কিংবা সর্বশেষ 'হাঁসখালির হাঁস' নাটকেও নতুন আঙ্গিক গড়ে ওঠে, যা তাঁর নাট্যভাবনা তুলে ধরতে একান্ত সহায়ক।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক আসলে সাধারণ মানুষের কথা। গ্রাম কিংবা শহরের বুকের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ, নিরন্ন বুভুক্ষ মানুষ, তাদের বঞ্চনার কথা, অধিকার হরণের কথা। আবার সমস্ত রকম অন্যায়, অবমাননা, শোষণ ও বঞ্চনাকে অতিক্রম করে কীভাবে তাকে বেঁচে থাকতে হবে সে কথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় নাটকে।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে জীবনের অসহায়তার যন্ত্রণার মধ্যে থেকে ক্রমশ পিছু হটতে হটতে প্রায় চকিত উপলব্ধির মতো জেগে ওঠে যে কৌমচেতনার প্রতিবাদী স্বরূপ, উৎপল দত্তের নাটকে কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে ওঠে একেবারেই ভিন্ন চেহারায়। সেখানে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্যবাদী বিশ্বাসের জোরালো প্রতিফলনে আমরা জেনে যাই সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের শেষ কথাই মানুষের বিদ্রোহ। তাই বাস্তবের ঘটনায় মানুষ পড়ে পড়ে মার খেলেও, নাট্যকারের রোমান্টিক বৈপ্লবিক চেতনায় সে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী, সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায় প্রবল পরাক্রমে। তাই এ দশকে প্রতিবাদী চেতনার নাট্যধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন মার্কসবাদী বিপ্লবী নাট্যকার উৎপল দত্ত। যিনি ষাটের দশকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'কল্লোল' (১৯৬৫) প্রযোজনার কারণে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে কারারুদ্ধ হলেন। অবশ্য তিনি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কলকাতা শহরে কল্লোল উৎসবও হয়েছিল। নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে যা অনন্য ঘটনা।

শুধু 'কল্লোল'ই-বা কেন তারও আগে 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', বা 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'তীর', 'মানুষের অধিকারে' সর্বত্রই প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে এক বিপ্লবী আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে। সেসব নাটকে লড়াই হল অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে। যার মধ্য দিয়ে আবার এক শোষণহীন সমাজের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র একটি বা দু'টি নাটকে নয়, তাঁর সমগ্র নাট্যচর্চাই মার্কসীয় দর্শনের রাজনৈতিক আদর্শে সোচ্চার। উৎপল দত্ত তাঁর অনেক নাটকেই স্বদেশ-বিদেশের অতীত বিপ্লবের কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন আর সেখানেও তাঁর সমকালের সমাজবাস্তবতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন সুনিপুণ ভাবে। 'টিনের তলোয়ার', 'ঠিকানা', 'ব্যারিকেড', 'মহাবিদ্রোহ (টোটা)', 'তিতুমীর', 'লেনিনের ডাক', 'নীল সাদা লাল' প্রভৃতি নাট্য পাঠেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেসব নাটকে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে অত্যাচারীরা ক্ষমতায় আসে,

কোন সমাজ তাদের প্রশ্রয় দেয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন “From the very beginning of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perspective. Studying social phenomena in isolation, assuming each phase of development as a whole, that is, substituting the general with the particular, is a universal bourgeois vice.”[১] অবশ্য আশি'র দশকে তাঁর শেষ পর্যায়ের কিছু নাটকে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যকে বড় করে তুলেছিলেন এমন অভিযোগ করা হয়, বলা হয় সেসব রচনায় বক্তব্যের বিস্তার অনেকটাই আরোপিত। রচনায় যথার্থ নাট্যগুণ সঞ্চারিত হয় না।

এ দশকের অপর গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার শম্ভুমিত্র গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথভাবে ‘নবান্ন’ নাটকের নির্দেশনার মধ্যদিয়ে যে দিকচিহ্ন রচনা করেছিলেন তা-ই পরবর্তীকালে দিগন্তপ্রসারী হল রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’, ‘রাজা’ এবং সফোক্লিসের ‘রাজা অয়দিপাউস’ প্রযোজনার মধ্যদিয়ে। তাঁর মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা মাত্র তিনটি। ‘উলুখাগড়া’(১৯৪২), ‘ঘূর্ণি’(১৯৬৬), এবং ‘চাঁদবণিকের পালা’(১৯৭৮)। এছাড়া যৌথভাবে রচনা করেছেন দু'টি নাটক ‘বিভাব’(১৯৫১) এবং ‘কাঞ্চনরঙ্গ’(১৯৬১)। অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করেছেন–ইবসেনের ‘এ ডলস হাউস’ অবলম্বনে ‘পুতুল খেলা’(১৯৫৮) এবং সফোক্লিসের ‘রাজা অয়দিপাউস’(১৯৬৯); ‘গর্ভবতী বর্তমান’(১৯৬৩) এবং ‘অতুলনীয় সংবাদ’(১৯৬৫) নামে দু'টি ‘কৃষ্ণ কৌতুকীয়’ নাটিকাও লিখেছেন। তবে তাঁর অসামান্য ও অসাধারণ কীর্তি ‘চাঁদ বণিকের পালা’। শম্ভুমিত্রের রচনায় একথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনীতি-বহির্ভূত শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর নাটকের কেন্দ্রবিন্দু বিজন ভট্টাচার্য বা উৎপল দত্তের নাট্যভাবনার অনেকটাই বিপরীত মেরুতে। সেসব নাটকে থাকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস। ব্যক্তিমানুষের বাঁচার লড়াই সমাজে কী অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু উচ্চকণ্ঠে বাঁচার অধিকার ঘোষণা করেননি কোথাও। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ নয়, মানবিক চেতনার বোধটিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাটকে। দেশজ ভঙ্গিতে নিজস্ব নাট্যধরনের মধ্যদিয়েই সেসব কথা বলবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কারো কারুণ্য বা অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে নয়, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে চায় প্রতিটি মানুষ। বুঝে নিতে চায় নিজের যথার্থ পরিচয়–এ কথাই বলে তাঁর নাটকের নায়কেরা।

বাদল সরকার কমেডি ও অস্তিত্ববাদী নাট্যরচনার পথ থেকে সরে এসে সত্তরের দশকে ঝুঁকলেন ‘তৃতীয় থিয়েটার’-এর দিকে। প্রসেনিয়াম মঞ্চের আভিজাত্য থেকে নাটককে নিয়ে এলেন মুক্তমঞ্চে একেবারে সাধারণ জনতার মধ্যে। দর্শক তথা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগে নাট্যকারের প্রতিবাদী চেতনাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজেই সঞ্চারিত হয়। আমরা জানি, তাঁর ‘মিছিল’, ‘ভোমা’, ‘লক্ষীছাড়ার পাঁচালী’ বা ‘বাসি খবর’ অথবা ‘খাট মাট ক্রিং’ অনেক মানুষকে আলোড়িত করেছিল। আসলে

'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের যে অসহায়ত্ব গ্লানি এবং অপরাধবোধ নিয়ে লেখা হয়েছিল তার আরো অস্তিত্ববাদী নাটক, সত্তর দশকে এসে সেই বোধজনিত ক্ষোভের অনেক তীব্র প্রকাশ দেখা গেল তাঁর 'থার্ড থিয়েটারে'র নাটকে, যখন নিছক শহুরে ব্যক্তির নিরুপায়হীনতা নয়, তার অসহায়তা সঞ্চারিত হয়ে গেল অনেক বিস্তৃত পরিসরে, তৈরি হল রাজনৈতিক তথা সামাজিক প্রতিবাদের এক ভিন্ন স্বর।

ষাটের দশকে নাট্যরচনার প্রথম পর্বে যে কিমিতিবাদী ঘরানার নাটক লিখেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীল রঙের ঘোড়া', 'মৃত্যু সংবাদ', 'চন্দ্রালোকে অগ্নিকাণ্ড', প্রভৃতির প্রসঙ্গ আমাদের মনে পড়বে) সেখানে ব্যক্তি বনাম সমাজের সংঘাত ধরা পড়লেও সত্তরের দশকের শুরুতেই সমাজকে যেন আরো বৃহত্তর অর্থে ধরতে চাইলেন তাঁর নাটকে। বিশেষ করে রাষ্ট্রের অপশাসনে এবং সহানুভূতিহীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নিষ্পেষিত অবস্থা তাঁকে বিচলিত করছিল। ফলে নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেল 'রাজরক্ত'তে(১৯৭২)। "দেশকাল রাজনীতি আমাকে মানুষের অর্ন্তলোকের জগৎ থেকে প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতের সমস্যার দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করেছিল। ফলে আমি আমার নাটকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং প্রকাশভঙ্গী অনুসন্ধান করছিলাম। এই তাড়না থেকেই নতুন পর্যায়ে নতুনভাবে লিখতে চেয়েছি।"[২] 'স্বদেশী নকশা' এবং 'মহাকালীর বাচ্চা'ও এই মানসিকতা থেকে লেখা। অবশ্য আশি'তে এসে এ নাট্যরীতিও বদলে যায়। আশি'র দশকের নিরুত্তাপ সমাজে বসে উৎপল দত্ত ব্যতীত আর সকল নাট্যকারই নাটকের গতিপথের বদল ঘটালেন। নাটক নিয়ে চলল নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর নাট্যবিষয়ে রাজনীতি তথা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তুলনায় দেখা গেল সম্পর্কের জটিল বিন্যাস, সমাজভাবনার নানা তির্যক স্তর-পরম্পরা আবার কোথাও-বা মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েন।

এই দশকে মনোজ মিত্রের নাটক সম্পর্কে বলা চলে যে, সমাজ ও মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে। গ্রামবাংলার চালচিত্র, সামাজিক বৈষম্য, শোষণ, দরিদ্র-অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক দীনতা, ধর্মীয় ভণ্ডামি, সামাজিক নানান সমস্যা-সংকট, তাদের ক্ষোভ, প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধ সবই ধরা পড়ে তাঁর নাটকে। তবে সব নাটকে প্রতিবাদী চেতনা বিশেষ তীব্র নয়। তাঁর নাটকে মানুষ খুঁজে পায় নিজেকে, পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজকে। 'চাকভাঙা মধু' থেকে 'কেনারাম বেচারাম', 'শিবের অসাধ্য', 'সাজানো বাগান', 'আমি মদন বলছি', 'নরকগুলজার', 'মেষ ও রাক্ষস', 'অলকানন্দার পুত্র কন্যা', 'শোভাযাত্রা', 'গল্প হেকিম সাহেব' ইত্যাদি নাটকে মনোজ মিত্র হাসি-কৌতুক ও আনন্দ-বিনোদনের মধ্যেদিয়েই সমকালের সমাজের রুক্ষ নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করেন। তবে মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, ধর্মের নামে অধর্ম, সীমাহীন লোভ, প্রতারণা, দেশপ্রেমের নামে শোষণ, আধিপত্যবিস্তার, ঘুণ ধরা এই সমাজের ভিতরকার অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা রূপান্তরিত হলেও প্রত্যক্ষভাবে হয়তো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সরব নয়। সত্তর দশকে শুধু

মনোজ মিত্র নন, আরো অনেকেই যেমন অরুণ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার তাঁদের নাটকে দেখিয়েছেন ব্যক্তির জাগরণ। যারা তুচ্ছ, অসহায়, নিপীড়িত, অতি সাধারণ মানুষ তারাও যে চূড়ান্ত মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে, তাদের মধ্যেই যে সুপ্ত হয়ে আছে বিপ্লবের বীজ তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন অনেক নাট্যকারই।

আমরা দেখেছি সত্তর-আশি'র দশকের সীমারেখায় বাংলাদেশের নাটকের যে বিকাশ ও সমৃদ্ধি তার মর্মমূলে রয়েছে'৭১-এর স্বাধীনতা-চেতনা। মুক্তিযুদ্ধকালে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রচিত নাটকসমূহে স্বাধীনতার উত্তাপে মননের চেয়ে আবেগই বেশি প্রকাশিত। সংগত কারণেই শুধুমাত্র শিল্পের বিচারে এসব নাটক মূল্যায়ন করা যায় না। তবু স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস হয়েই শুধু কিছু রচনা নাটক হিসেবেই আজও অমলিন হয়ে আছে আমাদের স্মৃতিতে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারের অনুসরণে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তা ক্রমান্বয়ে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছিল। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিকশিত শাখা হয়ে উঠল নাটক। মূলত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-চেতনা বাঙালির জাতিসত্তাকে যে নতুন চিন্তা-চেতনায় পুনর্জাত করেছে স্বাভাবিকভাবেই এর উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর। তবে নাটক যেহেতু সমকালেই অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের সামনে উপস্থাপিত হয় সে কারণে নাটকই ছিল স্বাধীনতার রক্তধারায় স্নাত উজ্জ্বল শিল্পমাধ্যম।

আমরা দেখেছি পাকিস্তানি আমলে সৌখিন নাট্যসংগঠন 'ড্রামাসার্কল' ব্যতীত নিয়মিত নাট্যচর্চার কোনো দলের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায় না। প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে ড্রামা সার্কলের পক্ষে নিয়মিত নাট্যচর্চা করা সম্ভব ছিল না। ফলে নাটকের নিয়মিত দর্শকও তৈরি হয়নি। যদিও পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সময়ের প্রেক্ষাপটে কিছু নাটক লেখা হত। তা-ও আবার প্রতীক কিংবা রূপকাশ্রয়ী। অধিকাংশ নাটকই রচিত হত সময়ের উত্তাপ কিংবা আন্দোলন সংগ্রাম-বিবর্জিত মানব-মানবীর প্রেম, সাংসারিক, পারিবারিক বা সামাজিক নানা জটিলতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এসব নাটক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা ক্লাবে সৌখিন নাট্য গোষ্ঠীর আয়োজনে বছরের কোনো একটি সময়ে মঞ্চায়িত হত। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমস্ত প্রতিকূলতার অচলায়তন ভেঙে দিল, উন্মুক্ত করে দিল মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্র, বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ব্যাপক উদ্যমে শুরু হল কবিতা, সংগীত ও সাহিত্যের অপরাপর শাখার ন্যায় নাট্যচর্চা। পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যদিয়ে চল্লিশের দশকে যে গণনাট্য বা নব নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশে তার শুরু সত্তরের দশকে। যুগোপযোগী মঞ্চ, আধুনিক আলো ও শব্দের ব্যবস্থা কিংবা প্রয়োজনার প্রয়োজনীয় অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা বলতে গেলে কিছুই ছিল না, ছিল শুধু যুদ্ধফেরত একদল নাট্যপাগল তরুণ, যাদের ছিল অফুরন্ত উদ্যম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত

সীমাহীন প্রাণাবেগে চঞ্চল মুক্তিপিয়াসী এই তারুণ্য সব বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হল। আর ঔপনিবেশিক আমলের মৌসুমি নাট্যচর্চা নয় নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন নাট্যকর্মীরা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারবদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা নাটককে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেন। সময়ের দাবিতে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে রচিত হতে থাকল নতুন নতুন নাটক। নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধে পরিশ্রুত এসব নাটকে প্রাধান্য পেল সুস্পষ্ট বক্তব্য। শুধু তাই নয়, নব্য রাষ্ট্রের শাসকদলের নেতৃত্বে অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত ও লুণ্ঠন মনোবৃত্তির কারণে সমাজে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী স্বজনহারা সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, বঞ্চনা, আনন্দ-বেদনা সবকিছুই হল নাটকের উপজীব্য। ফলে নাটকের মৌল চেতনাই হয়ে উঠল প্রতিবাদ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল একথা যেমন দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায় তেমনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সৃজিত হয়েছিল অজস্র ধারায় শিল্প-সাহিত্য। যুদ্ধের রক্তাক্ত ক্ষত ও যন্ত্রণাকে ধারণ করে অনেক নাটক যেমন রচিত হয়েছিল তেমনি সাহিত্য-শিল্পের অন্যান্য শাখাও থেমে নেই। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্রেও উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের দগদগে ক্ষত, তুলে ধরা হয়েছে নিঃশেষে প্রাণদানের বীরত্বের মহিমান্বিত ছবি, বিজয়ের অশ্রুসিক্ত উল্লাস। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠল সাহিত্য-শিল্পের অপরিহার্য বিষয়। কারুণ্য, বেদনা আর আনন্দের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস ও ঘটনাবলি রূপায়িত হল শিল্প-সাহিত্যে। তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান আর দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর মূল্য হয়তো এমনিভাবেই স্বীকৃত হয়ে যায়। কেননা তাঁদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়েই তো বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাইতো রচিত হল গান 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা / আমরা তোমাদের ভুলব না।' মনে করা যায় শামসুর রাহমানের সেই বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি/ রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান/ স্বাধীনতা তুমি/ কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা– / কিংবা 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা/ আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়? / আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?/ তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা/ সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো/ সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর/' অথবা মনে পড়ে নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর' বা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে রচিত রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'লাশগুলো আবার দাঁড়াক' প্রভৃতি কবিতা। শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ ছাড়াও এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ শামসুল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মহাদেব সাহা, আল মাহমুদ, আসাদ চৌধুরী প্রমুখেরা। মনে করা যায় সেলিনা

হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ উপন্যাসটির কথা, যা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃতও হয়। হুমায়ুন আহমদের ‘নন্দিত নরকে’ ‘শঙ্খনীল কারাগার’ উপন্যাসগুলোও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রাবেয়া খাতুনের হাতে রচিত হয় বেশ কয়েকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পসমৃদ্ধ উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘ওরা এগার জন’, ‘আবার তোরা মানুষ হ’, ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’, ‘আলোর মিছিল’, ‘সূর্যগ্রহণ’, ‘আগুনের পরশমনি’, ‘বাঘা বাঙালি’ ও ‘লেট দেয়ার বি লাইট’ প্রভৃতি সে সময়ে মানুষকে আলোড়িত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও অজস্র ধারায় শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রাধান্য নাট্যসাহিত্যেরই। এ ধারার নাটকগুলোর প্রধান প্রবণতাই হচ্ছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-চেতনা। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে শতাব্দীপ্রাচীন নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত হলে বাংলাদেশের প্রগতিশীল নাট্যকাররা সৃষ্টিমুখর হয়ে উঠলেন। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে অন্যায় আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইলেন নাট্য-আয়ুধ হাতে। তবে মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ বিভিন্নভাবেই উপস্থপিত হয়েছে এসব নাটকে।

বাংলাদেশের যে নাট্যকারদের প্রতিবাদী চেতনার নাটকসমূহ এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের হাত ধরেই বাংলাদেশের নাটকের মূল ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে। সেসব নাটকের মধ্যে দর্শক-পাঠক পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ, স্বাধীনতা-চেতনা, সমকালের সর্বব্যাপ্ত হতাশা ও ক্ষোভের ছবি এবং খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কেও ধারণ করেছেন নির্ভীক সৈনিকের মতো। তুলে ধরেছেন স্বৈরশাসনের ক্লেদাক্ত রূপ। শ্রেণিশাসনে, অর্থনৈতিক অসাম্যে, শোষণে- নিষ্পেষণে সামাজিক সংকট তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের নাট্যে। তবে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কিংবা গণমাধ্যম হিসেবে সবসময় নাটককে গড়ে তুলতে পারেননি তাঁরা। সংগ্রামের কথা বললেও সংগ্রামী জনতার কথা সবসময় বলতে পারেননি কিংবা সংগ্রামী জনতার কাছে পৌঁছতেও পারেননি বহু সময়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা খুবই জরুরি তা হল, বেশিরভাগ নাটকই রচিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে। এসব নাটকে ক্ষোভ-বিদ্রোহ ও সংগ্রামের কথা থাকলেও গণমানুষের কথা কিংবা সংগ্রামী জনতার কথা তেমন নেই। যে নাটকে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত, যা দেশব্যাপী সাড়া জাগাতে সক্ষম তেমন নাটক খুব বেশি রচিত হল না। শ্রমিক-কৃষক-কুলি-মজুর-ব্রাত্যজনকে কেন্দ্র করে, তাদের দুর্বিষহ জীবনকে আশ্রয় করে যথেষ্ট নাটক লেখা হয়নি। মামুনুর রশীদের ‘ওরা কদম আলী’, ‘এখানে নোঙর’, ‘ইবলিশ’, আবদুল্লাহ আল মামুনের ‘এখনও ক্রীতদাস’, সেলিম আলদীনের ‘কিত্তন খোলা’, ‘কেরামত মঙ্গল’ এরূপ কয়েকটি নাটকের কথা আলাদাভাবে মনে রেখেই একথা বলা যায়। মঞ্চনাটক কিংবা টিভিনাটক সর্বত্রই মধ্যবিত্তের জীবন ও চালচিত্র নিয়ে রচিত। দেশের ব্যাপক নিম্নবিত্ত,

বিত্তহীন, শ্রমজীবী মানুষ যেন উপেক্ষিত, অপাঙ্‌ক্তেয় । কিংবা এদের দৈনন্দিন দুর্দশাগ্রস্ত বঞ্চনার জীবন যেন নাট্যকারদের চোখেই পড়ে না । অথচ পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সঙ্ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে প্রকৃত গণমানুষের নাটক রচনা ও প্রযোজনার মধ্যেদিয়ে দেশব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং সূচনা করেছিলেন গণনাট্য বা নবনাট্যের । বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭) তার প্রমাণ ।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের মানসজমিন তৈরিতে এবং বাম ধারার রাজনৈতিক পরিবর্তনে নাট্যআন্দোলন যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিংবা নাটককে গণমানুষের শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যাপকতর জনতার গভীরে তার শিকড় পৌঁছে দিয়েছে সে তুলনায় বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃত্ত থেকে বেরুতেই পারেনি । গ্রাম থিয়েটার কিংবা মুক্তনাটক সে চেষ্টা শুরু করলেও দ্রুতই তা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় । ফলে বাংলাদেশের নাটক মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধী চেতনার মধ্যেই বৃত্তাবদ্ধ । আবার মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা বাংলাদেশের নাট্যচর্চার বদ্ধ অর্গল খুলে দিলেও পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের গোড়ায় নকশালবাদী আন্দোলনের উন্মাদনা ও তা দমনে শাসকগোষ্ঠীর পৈশাচিক তাণ্ডব এবং '৭৭-এর পূর্বপর্যন্ত বিরোধী পক্ষকে দমনপীড়নে ফ্যাসীবাদী কায়দায় শাসন-নিপীড়ন ছাড়া পরবর্তী সময়ে আর তেমন কোনো জটিল সংগ্রামী পরিস্থিতি প্রায় ছিলই না, ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদী নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিস্তার লাভ করেনি । ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর থেকে সমগ্র আশি'র দশকে কিংবা পরবর্তী সময়েও বাস্তব জীবনে স্পষ্টত কোনো রাজনৈতিক তথা সামাজিক উত্তাপ না থাকায় প্রতিবাদী চেতনার নাট্যচর্চা কমই হয়েছে, আর ধর্মের নামে আশি'র দশকের শেষে যে মৌলবাদের শুরু তা উপেক্ষিতই থেকে গেছে সমকালীন নাটকে ।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নাটকের তুলনামূলক মূল্যায়নে আরো যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হল, তিরিশ বছরের সমৃদ্ধ নাট্যচর্চা, নাট্যান্দোলন ও নাট্যঐতিহ্যকে ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যকারগণ সত্তর ও আশি'র দশকে

নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে যেভাবে রাজনীতি ও সমাজভাবনাকে ধারণ করে বিষয় বৈচিত্রে, নানান আঙ্গিকে গভীর রসের শিল্পসমৃদ্ধ ও প্রতিবাদী চেতনাঋদ্ধ নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছেন, তার সমগোত্রীয় নাটক বাংলাদেশে সবসময় পাওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা তুলনায় সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের নবীন নাট্যকারেরা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের সৌখিন নাট্যচর্চার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই প্রথম স্বাধীন নাট্যচর্চার মধ্যদিয়ে (নাট্য প্রযোজনার আনুষঙ্গিক কলাকৌশলের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও) অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাংলাদেশের নাট্যচর্চার পথকে প্রশস্ত করছেন। এরই ফলে 'এখনও ক্রীতদাস', 'ওরা কদম আলী', 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরুল দীনের সারাজীবন' এবং 'সাতঘাটের কানাকড়ি'র মতো প্রতিবাদী চেতনাসমৃদ্ধ শিল্পসফল নাটক আমরা পেয়েছি। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', 'দেবী গর্জন', 'চলো সাগরে', উৎপল দত্তের 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার', 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'তিতুমীর', শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা', মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', কিংবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্তে'র মতো অসংখ্য শিল্পঋদ্ধ নাটক না পাওয়া গেলেও সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', কিংবা সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরুল দীনের সারাজীবন' অবশ্যই মনে রাখার মতো এবং এসব নাটক সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের শিল্পসমৃদ্ধ নাট্যতালিকাকে সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Utpal Datt, Towards A Revolutionary Theatre. First Edition: 1982, Page No. 28. Calcutta.

২. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শূদ্রককে দেওয়া সাক্ষাৎকার, শূদ্রক ২ সংখ্যক।

উৎস : বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা' গ্রন্থ।

[লেখক: নাট্য-গবেষক।]

প্র ব ন্ধ

আমাদের লোকনাট্যের বর্তমান সংকট

কা জী সা ই দ হো সে ন দু লা ল

নদীমাতৃক এই জনপদ মধুমতি, মহানন্দা, আত্রাই, নন্দকুজা, মুশাখা, বারনই, পাগলা, নারদ, খলশাডাঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অসংখ্য নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। নদীর পাড়ে খেয়াঘাটের তীরে অসংখ্য একচালা, দোচালা, চৌচালা মঞ্চ, মঞ্চকে ঘিরে মেলা। পৌষ মেলা, মহররমের মেলা, পাঁঠা কাটার মেলা, মাঘি পূর্ণিমার মেলা, দোল পূর্ণিমার শেলা, শিবরাত্রির মেলা, চড়কের মেলা, ফ্যাস কাটার মেলা, মোরগ লড়াইয়ের মেলা, মহাদেবের মেলাসহ অসংখ্য মেলা। মেলাকে ঘরে হাজার পার্বণ বটপাইকবের বিয়ে, পুতুলের বিয়ে, মাথায় প্রথম চিরুনি, ফ্যাস কাটা, সাধন খাওয়া, যাবতীয় পার্বণ বাঙালি জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ যেন বারো মাসে তেরো পার্বণ, পার্বণকে ঘিরে লোকাচারে পরিপূর্ণ আমাদের জীবন। লোকাচারগুলোর মাঝে হাজার মানত। যেমন ছেলে হলে মাদার পীরের হাতে দেব, মেয়ে হলে মহাদেবের থানে ভোগ দেব, সাপ দেখলে মনসার পুজো দেব, গোলাভরা ধান হলে গাজির ভিটায় সিন্নি দেব, এ সবই আমাদের লোকসংস্কৃতিতে একে অপরের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে।

বছর তিনেক আগে, মনসার গান হচ্ছে কাঁঠালবাড়িয়ার নিত্যানন্দের বাড়িতে, সন্ধ্যার পরে গান হবে। আমি নিত্যানন্দের আমন্ত্রণে বাড়ির দিকে যেতে রামজীবনপুর চৌধুরীদের জরাজীর্ণ পুকুরপাড়ে হঠাৎ সন্ধ্যার আলোআঁধারিতে সাপের ফণা তোলা দেখে আমি ও নিত্যানন্দ চমকিয়ে পিছিয়ে পড়ি। যাই হোক সাপ তৎক্ষণাৎ স্থান পরিবর্তন করে চলে যায়। ঘটনাটি এমন একটি সময়ে যখন নিত্যানন্দের বাড়িতে মনসার গানে ভেসে আসছে মনসা বন্দনা, সুর ও গান 'প্রাণমহ বিষহরি, বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী, তুমি দেবী জগৎজননী, তুমি দেবী হরসুতা অস্তিকস্ব মুনির মাতা, নাগমাতা ভুবনমোহনী, তুমি শিবের নন্দিনী, ত্রিভুবনের উদ্ধারিণী, যোগমাতা যোগ সনাতনী'। নিত্যানন্দের মনে তখন প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, মা মনসা তাকে দর্শন দিয়েছে। নিত্যানন্দ আসরে পৌঁছে মঙ্গলঘটের সামনে জড় হয় প্রণাম করে, সেকি আকুতি তার।

হারানপুরের রহিমউদ্দিনের কোনো সন্তান হয় না, বিবাহিত জীবন ষোলটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। সে অগ্নিনির্বাপণকারী, সন্তানদানে আশীর্বাদকারী পীর মাদারের মানত করেছিল। আঠারো বরের মাথায় রহিমুদ্দিনের প্রথম সন্তান হয়েছে। রহিমুদ্দিনের গৃহাঙ্গনে নারকেলের পাতার ছাউনি দিয়ে ঘেরা মাদার গানের আসর থেকে জুমল বলে ওঠে, সত্যই যদি তুমি সন্তানদানকারী পীর হয়ে থাক, চার যুগ ধরে তোমার সেবা করে আমার কেন সন্তান হয় নাই, এই প্রশ্নের বিধান কর সভাজনে। সভাস্থলে রহিমুদ্দিন তার নবজাতক শিশুকে মাদার পীরের কোলে তুলে দেয়। মাদার তখন দশজনের উদ্দেশ্যে বন্দনা করে।

মাদার তখন দেশমাতার উদ্দেশ্যে গেয়ে ওঠে।

"জাগো, জাগো জননী
জাগো, জাগো, জাগো জননী
প্রথম ছন্দে অধম বন্দে
জন্মভূমির মাটি গো
যে মাটির ধূলিকণা
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আহা প্রথম ছন্দে।"

এরূপভাবেই আমাদের সামাজিক জীবনে লোকনাট্যের প্রভাব। লোকনাট্যের হাজার প্রকার শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চাইপাড়ার চাইদের সমন্বয়ে লক্ষ্মীর গান, পদাবলীর গান, আবার শাঁখারীপাড়ার শাঁখারীদের মনসার গান, মাদারের গান। মণ্ডলপাড়ার হাজারি লাঠিয়াল দল, ঘোষপাড়ার ঘোষদের কৃষ্ণকীর্তনের দল। অনেক আগে এইরূপ লোকদলগুলো পাড়াভিত্তিক গড়ে উঠেছিল। এ লোকদলগুলোর অভিনয়ের স্থান ছিল বটতলায় অথবা আটচালা, চৌচালা, দোচালা বা নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ের কথা যখন উঠল তখন একটি জনশ্রুতির কথাই আলোচনা করা যাক। বার্ষির জীবনদানের আচিন ঘাটে উৎপত্তির কথা জানা যায়।

বার্ষি নামে কোনো-এক কন্যা যমুনার ঘাটে আত্মবির্সজন দিয়েছিল। আমার এই দেহ যমুনার স্রোতজলে যতদূর যাবে শুধু অন্ন আর পুষ্প বর্ষিত হবে। বার্ষির এই আর্তির পিছনে যে জনশ্রুতি লোকমুখে উচ্চারিত হয়, তা হচ্ছে যে বার্ষির সাত সন্তান অর্ধাহারে অনাহারে মারা যায়। বার্ষি মা লক্ষ্মীকে পুজো করত বারোমাস। মা লক্ষ্মী প্রসন্ন না হওয়ায় বার্ষি দেহত্যাগ করে যমুনার জলে। আচিনঘাট নামক এক স্থানে বার্ষির দেহ এসে মাটিতে মিশে যায়। সেই থেকে ফাল্গুন মাসের পনেরো তারিখে হিন্দু-মুসলমান সকল জাতি বার্ষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বছর দশেক আগে পাটকেলী নামক গ্রামে এ্যামেচার যাত্রাদলের অভিনয় হবে। সেখানকার স্থানীয় লোকের আমন্ত্রণে আমি যাত্রা দর্শনে পাটকেলীতে যাই। যাত্রা হবে 'অশ্রু দিয়ে লেখা'। যথারীতি যাত্রার কনসার্ট পড়েছে, আসর বন্দনা চলছে, রমণীগণ

দ্বারা রুচিশীল একটি ব্যালট নৃত্যের পরে যথারীতি যাত্রাপালা শুরু হয়েছে। গরিবের বন্ধু, না হিন্দু না মুসলমান মানুষরূপী গোরাচাঁদ তখন প্রাঞ্জল অভিনয় করছে, হঠাৎ হৈ রৈ রৈ শব্দ। কী ব্যাপার কী ব্যাপার! মঞ্চে এখন নৃত্য চালাতে হবে। দর্শককুল তখন অভিনয়ে এতটাই মত্ত যে তারা নৃত্য দেখতে চায় না। তারা গোরাচাঁদের নেতৃত্বে হাবশি জানোয়ারের উচ্ছেদ চায় কিন্তু চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর হম্বিতম্বিতে বাধ্য হয়ে মাতৃরূপিনী কৃষ্ণাকুমারী তার শাশ্বত মায়ের পোশাক ছেড়ে ডিস্কো প্যান্ট, শার্ট পরে নাচতে থাকলো। সংস্কৃতির এইরূপ অবক্ষয় দেখে মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে এলাম।

আমাদের এলাকায় ঘোষপাড়াতে রেখা রাণী সম্প্রদায়ের ‘নীলাচলে মহাপ্রভু’ পালাটি চলছে। আমি এবং আমার এক বিদেশি বন্ধু যিনি সুইডেন থেকে এসেছেন একটি প্রজেক্ট দেখতে তাঁকেসহ আসরে গিয়ে দেখি শ্রোতৃমণ্ডলী আসরে এত আবেগাপ্লুত যে সমগ্র আসর জুড়ে একে অপরকে জড়িয়ে শ্রোতারা কান্নাকাটি করছে। মিনিট দশেক মনে হয় হবে আমি খেয়াল করে দেখি আমার বুকের উপরের অংশও তখন ভিজে গেছে। আমাদের পাড়ার হোসেন মৌলভি সে-ও কান্নাকাটি করছে। আমার বিদেশি বন্ধুটির কথায় হঠাৎ আমার খেয়াল হয়। সে আমাকে প্রশ্ন করছে, কী ব্যাপার কী হয়েছে। আমি তখন বোঝার চেষ্টা করি। বিষয়টি হচ্ছে মহাপ্রভুর সাথে মহাপ্রভুর এক শিষ্য সন্ন্যাসব্রত নিয়ে মহাপ্রভুর সাথে আছেন প্রায় ১১ বছর যাবৎ। একযুগ পূর্তি হলে শিষ্যটি সন্ন্যাসদীক্ষা পাবে। সন্ন্যাসধর্মে আছে যিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবেন তিনি ছয় রিপু মেনে চলবেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, সঞ্চয় করা চলবে না। মহাপ্রভুর হরিতকি খাওয়ার অভ্যাস আছে। দুপুরের ভোজনের পরে শিষ্যকে বলেছেন, বাবা আমার জন্য একটু হরিতকি আনো তো। শিষ্য হরিতকি আনতে অনেক দূরে গেছে, শিষ্য মনে করছে গুরুদেব তো রাতে খাওয়ার পরে আমার কাছে হরিতকি খেতে চাইবে। আমি একটা বেশি নিয়ে যাই। যথারীতি রাতে খাওয়ার পর গুরু শিষ্যকে বলছেন, আমাকে একটু হরিতকি দাও তো, শিষ্য দুপুরে ট্যাকে রাখা হরিতকিটি বের করে দিয়েছে। হরিতকি দেখে গুরুদেব বলছে, তুমি সঞ্চয় করেছো, তোমার তো সন্ন্যাসধর্ম হবে না। সনাতন ধর্মে আছে যদি কোনো মানুষ সন্ন্যাসধর্ম পালন করতে গিয়ে না পারে তবে সে হয় পাতকী (বাদুড়)। তাই শিষ্য আসরে কান্নাকাটি করছে গুরুদেবের চরণ ধরে। এই দৃশ্য দেখেই দর্শকের এই কান্নাকাটি। আমার বিদেশি বন্ধুটি অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন, এ ধরনের লোকসংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া কখনো দেখেননি।

আমাদের দেশ সাধারণত চারণ ও পা-ফাটা গোত্রের মানুষগুলোই লোকসংস্কৃতি চর্চা করে। যেমন বলা যেতে পারে কৌচর পাড়ার সাজ্জাদ বাউল গান করে, ওষুধ বিক্রির জন্য হকারিও করে। আরইলের মামুনুর রশিদ সাজ্জাদ কিচ্ছাগান করে। কৃষিশ্রমিক, জামনগর গ্রামের দীন-হীন আশরাফ আলী মনসার গান করে।

এইরূপ হাজারো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই চারণগণ আমাদের বিবেচনায় শিক্ষিত নন, কিন্তু স্বশিক্ষিত এই চারণগণ রচনা করেন আমাদের লোকসাংস্কৃতির সোপান। তাই যখন দেখি দবিলার জহির উদ্দিন পলান উচ্চ মার্গের দেহতত্ত্ব নিয়ে মঞ্চে রচনা করেন প্রতি রজনীতে নিত্যনতুন যুগী পর্ব। গানের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণ। দশ মাস দশ দিন সন্তান মাতৃগর্ভে কোনক্ষণে কী রূপ ধারণ করে তা যখন অবলীলায় বলে চলেন, তখন অবাক বিস্ময়ে না তাকিয়ে উপায় আছে?

পলানদার যুগী পর্বের গানের কথাই যখন আসলো তখন ভয়াবহ একটি আগামী অশনি সংকেতের কথা বলা যাক। পলানদার বয়স এখন সত্তরের ঊর্ধ্বে; যুগী পর্ব গানের কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই, নেই কোনো অডিও বা ভিডিও। পলানদার মৃত্যুর সাথে সাথে এই অঞ্চলের যুগী পর্ব গানের মৃত্যু ঘটবে। শুধু যুগী পর্ব গানের কথাই বলি কেন, ঈমান যাত্রা আজ প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ এ অঞ্চলে হয় না।

মহররমের কারবালার ওপরে এই কাহিনী খুবই জনপ্রিয় কিন্তু এর লিখিত কোনো কিছুই নেই। এমন একটি পালা পুঠিয়ার বিখ্যাত মিছিল গানও আজ আর মঞ্চায়ন হয় না। দুই-একজন লোক এখনো জীবিত আছেন যাঁরা এসব কাহিনী জানেন কিন্তু এর কোনো চর্চা বা পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বিলুপ্তির পথে লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

বছর দুয়েক আগে বারানই মুছাখা নদীর কূল দিয়ে হোজা নদী পেরিয়ে সোজা পাগলা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যে তিনটি থানা পেরিয়েছি। একটি অনেক বড় বিলের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করছি, একদিল যাত্রার লোকদের বাড়ি। পথ ফুরায় না, পরিশ্রান্তের মতো এগোচ্ছি। ধান, খাল আর বিল শুকনো নদীর পাড় দিয়ে হাঁটছি।

আমি জায়গাটির নাম জিজ্ঞাসা করলাম নামটি বখতিয়ারপুর। সামনে মান্দা থানা, ডান পাশে আত্রাই-বাম পাশে বাগমারা। তিন থানার মোহনা, বিচিত্র তাদের ভাষার ধরন। কখনো আপনি, আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাগমারার শেষ সীমানা মান্দার শুরু। একটা গ্রাম চৌগাছি। চৌগাছি পৌঁছে আমি একদিল যাত্রা শিল্পীদের কথা জিজ্ঞাসা করি। ঠিকানা অনুসারে যে বাড়িতেই যাই কেউ একদিল যাত্রার কথা স্বীকার করে না। আমি অবাক হই। হঠাৎ দেখি বাড়িঘরহীন শূন্য একটি মাঠ। মাঠ থেকে ধুলোবালি মাখা তিনজন মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি একদিল যাত্রার কথা। তারা খুব চুপিসারে প্রায় মাইলখানেক দূরে আমাকে নিয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, কী ব্যাপার আপনারা কি আমাদের উৎসবে একদিন যাত্রা নিয়ে যাবেন? তারা বলে, ভাই মাসছয়েক আগে আমরা তাহেরপুরে একদিল যাত্রা করতে গিয়েছিলাম। একদিল যাত্রা করে গ্রামে ফিরে আসলে গ্রামের মোল্লারা আমাদের একঘরে করে। আমরা প্রায় মাসতিনেক কাজ

কর্মহীনভাবে একঘরে হয়ে থাকি। পরে ওত (কাফ্ফারা) পঁচিশ টাকা করে দিয়ে সমাজের সবার কাছে মাফ চেয়ে সমাজে ওঠি। আমরা আবার গান করতে গেলে ওরা আবার আমাদের একঘরে করবে। আমরা না খেয়ে মারা যাব। আমি ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করি, কী এমন আছে একদিল যাত্রাতে, যাতে ওরা আপনাদের একঘরে করল?

তারা যে কাহিনী বর্ণনা করল তা এ রকম দাঁড়ায়, আল্লাহর সঙ্গে মুসা নবীর যে বাহাজ (যুক্তিতর্ক) তা নিয়েই এই কাহিনী। কাহিনীতে শিষ্যরূপী মুসা নবী বস্তুবাদের পক্ষ নেন। আর গুণীরূপী আল্লাহর বা ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গোল বৃত্তাকার থেকে বেরিয়ে এসে চৌদিকে ঘুরে ঘুরে একদিল যাত্রা অভিনীত হত।

তিন থানার মোহনায় বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষার এই জনপ্রিয় লোকপালা আর কখনো আমাদের সংস্কৃতিতে ফিরে আসতে পারবে কি না জানি না। এইরূপ আরো একটি লোকপালা নীল বরজের কিচ্ছা। পানের বরজ আর মাটির স্বাস্থ্য কামনা করে গাওয়া হত এ গান। এখন আর এ গান মঞ্চায়িত হয় না। গোরক্ষনাথের গান, তা-ও আজ নেই।

নবজাতক গরুর সুস্বাস্থ্য কামনা করে গোয়ালঘরে খোল-করতাল আর জুড়ির মাধুর্য কণ্ঠে যা গীত হত তা আর হয় না। এরূপভাবে বিলুপ্তির পথে লোকপালার মাঝে প্রচলিত পালার যে বিবর্তন হচ্ছে তার দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় লোকপালা আলকাব, যার লোকভিত্তিক অর্থ হচ্ছে আল অর্থ খোঁচা, কাব অর্থ ঠাট্টা। আলকাব আগে ছিল শিবের গাজন, পর শিবগাজনের গীত থেকে আলকাব। আলকাব থেকে আজকের অতিআধুনিক কালে গম্ভীরা। আলকাবের একাল-সেকালের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আলকাবের রসাত্মক মঞ্চায়নকালে গর্ভবতী কন্যার উদ্দেশ্যে ছড়া কাটা হত ধাঁধার মতো করে :

দোল দোল দুলোনী
ছোট বেলার খেলোনী
পাকলে সুন্দর হয়
ন্যাংটা হয়ে হাটে যায়। -এর অর্থ তেঁতুল।

এখনকারকালে আলকাবের একটি অতিআধুনিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মামা-ভাগ্নীর প্রেমপ্রণয়ের কাহিনী "বাড়ির পাশে চম্পা নদীর হুলা কাইশার বন, সেই বনেতে মামা আমার মজাইল মন" এই হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা।

এ বছর শীতের শুরুতে করমদোশী নামক গ্রামে যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। করমদোশী লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। সেখানেও দশটির মতো মনসামঙ্গল, লক্ষ্মীর গান পদাবলী, অরুণ শান্তি প্রভৃতি। একটি অসাম্প্রদায়িক অঞ্চল হিসেবে এটি সর্বজনস্বীকৃত। ছেলে-বুড়ো মিলে বাড়িতে বাড়িতে গানের আসরে বসে। দীনহীন গায়কের বাড়িতে পানি চাইলে যত কষ্টই হোক বাঙালি রীতি অনুযায়ী বসতে পিঁড়ে,

খাওয়ার জন্য গুড়, মুড়ি, পানি দেয়। এইরূপ একটি অঞ্চলে যাত্রা প্যান্ডেলে হাউজি নামক জুয়া চলছে। মধ্যরাতে হাউজি শেষ হলে যাত্রার টিকিট বিক্রয় শুরু হয়।

হঠাৎ বিকট শব্দে সনাতনী কর্নেট ফুলটের বদলে সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে ক্যাসি ও নামক যন্ত্রের উৎপাত শুরু হয়। মিনিট বিশেক কর্ণফাটা শব্দ বন্ধ হওয়ার পরে, হঠাৎ দেখি 'রূপে আমার আগুন জ্বলে যৌবন ভরা অঙ্গে' নামক গান গেয়ে মঞ্চে ১০/১২ বছরের একটি মেয়ের নাচন-কুদন।

খেয়াল করে দেখি মা জননীর যৌবন আসতে অনেক দেরি। নৃত্যের নামে গোটা দশেক যে নৃত্য মঞ্চে প্রদর্শিত হল তা অশ্লীলতাকেও ছাড়িয়ে যায়। রাত্রের মধ্যপ্রহরে শুরু হল যাত্রাপালা 'বেদের মেয়ে জোছনা'। একটি-দুইটি দৃশ্য মঞ্চায়নের পরেই খেয়াল করে দেখি দর্শকগণ হাজার বছরের সংস্কৃতির শিকড়ে প্রবেশ করেছে। দ্রুত পালা শেষ করার লক্ষ্যে দৃশ্য বাদ দিয়ে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার চেষ্টা করলে দর্শকগণ কর্তৃপক্ষকে চেপে ধরছে। পালায় প্রবেশ করছে একের পর এক দৃশ্য, অভিনয়ের মধ্যে দর্শকগণ। হঠাৎ কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক নৃত্যগীত দাবি করলে যাত্রামঞ্চ থেকে ফিরে আসি। এ যদি হয় পূণ্যভূমির লোকনাট্যের আঙিনার দৃশ্য তাহলে আমাদের লোকনাট্যের অবস্থা কী? কেন এই অবস্থা? আমাদের লোকসংস্কৃতির অবস্থা সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে এরকম দাঁড়ায়, আগে বাঙালি ছিল মাছে ভাতে। গোলাভরা ধান ছিল, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু ছিল। মোটামুটি আগেকার দিনে মানুষের অভাব ছিল কম তাই গ্রামের সবাই মিলে লোকসংস্কৃতির চর্চা করতো। কিন্তু গরিব আরো গরিব হচ্ছে, ধনী আরো ধনী হচ্ছে। শোষণপ্রক্রিয়ার এই পরিস্থিতিতে ধনীরা লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন না, তারা অন্য মাধ্যমে অবসর সময় কাটান। দ্বিতীয়ত বিজাতীয় সংস্কৃতি ও আকাশসংস্কৃতির প্রভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে লোকসংস্কৃতিতে কোনোরূপ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় বা দর্শকের বিভাজন একটি বড় কারণ। আগেকার দিনে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র বা স্যাটেলাইট মাধ্যমগুলো ছিল না। তখন আপামর জনগণ লোকনাট্যকে একমাত্র অবলম্বন মনে করত। এখন সে দর্শক ও চারণগণ বিভক্ত হয়েছে নানাভাবে। অপরদিকে মানুষ ছিল অসাম্প্রদায়িক। এখন নানাভাবে মৌলবাদের উত্থানের জন্য তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গত ভাদ্র মাসে ৮/১০টি মনসার গান দর্শন শেষে জামনগর গ্রামে ভাসান গান শুনতে যাই। বেশ কিছু সাঁওতাল পরিবার ভাসান গানের আয়োজন করে। আয়োজন ও শ্রোতাগণের যে আবেগ দর্শন করি, দীনহীন মানুষের ২৫টি টাকা ভাসান দলকে নিতে না পারার যে আকুতি প্রত্যক্ষ করি, তা লোকনাট্যের শেকড়কেই মনে করিয়ে দেয়। তমাল তলায় জুম্মার নামাজের আগ পর্যন্ত মনসার গান দর্শনে হাজির উদ্দিন হাজীর যে শ্রদ্ধা দেখেছি এবং হাজির উদ্দিনের ভাষার ৫০ বছর ধরে এ গান দর্শন করে বছরের মানত দিয়ে যায় এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতহীন বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার আবার প্রতিধ্বনি হয়।

কোনো অপপ্রয়োগ ধ্বংস করতে পারবে না আমাদের লোকনাট্যকে। আগামী প্রজন্মের জন্য বিলুপ্তপ্রায় নাট্য সংরক্ষণ, আর্থিকভাবে আসল লোকশিল্পীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক সহযোগিতা দান, মেধাবী লোকশিল্পীদের জাতীয়ভাবে সম্মান প্রদান, গ্রামে গ্রামে লোকপালা পরিবেশনের জন্য চৌকোণ খোলা মঞ্চ নির্মাণ, বাদ্যযন্ত্রসহ যাবতীয় উপকরণ সহযোগিতা প্রদান, কমপক্ষে সারাদেশে ১৫টি লোকগবেষণা কেন্দ্র বা একাডেমী গঠন করে লোকনাট্যকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও আমাদের ওপর।

উৎস : থিয়েটার, মে ২০০২ সংখ্যা।

[লেখক: নাট্য-গবেষক ।]

ঢাকা শহরে যাত্রাচর্চা

ত প ন বা গ চী

ষোড়শ শতকে অভিনয়-কলা হিসেবে যাত্রার উদ্ভব হলেও এর বিকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। যাত্রার উৎপত্তি যেমন থিয়েটার তথা নাটকের আগে, যাত্রার বিকাশও তেমনি নাটকের আগেই শুরু হয়েছে। তাই নাটকের আলোচনা করতে গেলে যাত্রার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা এই যে, আমাদের দেশে নাটককেন্দ্রিক আলোচনায় যাত্রার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নাট্যগবেষক ডক্টর বৈদ্যনাথ শীলের আলোচনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য'বাংলা নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম যাত্রা সাহিত্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা বাংলা নাটক মিশ্র

সাহিত্য। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজি রঙ্গমঞ্চ এবং ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রভাবে আমাদের বাংলা নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের এই বাংলাদেশে যাত্রা নামে এক প্রকার নিজস্ব জনপ্রিয় অভিনেয় সাহিত্য ছিল।' (বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, দ্বি-সং, এ.কে. সরকার এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১-২)

গবেষক এখানে যাত্রাকে সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অভিনেয় শিল্প হিসেবে শক্তিযাত্রা, রামযাত্রা, নাথযাত্রা, পালযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা প্রভৃতি নানান রীতির যাত্রার প্রচলন থাকলেও ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে জন্ম নেয়া কৃষ্ণযাত্রাই অধিকতর স্থায়ী এবং জনপ্রিয় হয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের কেঁদুলি গ্রামের অধিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রাকে শিল্পসম্মতভাবে পরিবেশন করতে উদ্যোগী হন। তিনি 'কালীয়দমনযাত্রা'র প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণলীলার কালীয়দমন পর্বের অভিনয় জনপ্রিয় হতে থাকায় 'কৃষ্ণযাত্রা' তখন 'কালীয়দমনযাত্রা' নামেই পরিচিত হতে থাকে। শিশুরাম অধিকারীই নবযাত্রার প্রবর্তক। শিশুরাম অধিকারীর শিষ্য, বীরভূম জেলার রামবাটি গ্রামের পরমানন্দ অধিকারী (১৭৩৩-১৮২৩) যাত্রাগানের মাধ্যমে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটান। তিনি যাত্রায় সঙ্গীতের পাশাপাশি গদ্যসংলাপের প্রবর্তন করেন। 'কালীয়দমনযাত্রা'র খ্যাতিলাভকারী শ্রীদামদাস অধিকারী ও সুবল অধিকারী নামের দুই ভাইকে এই যাত্রার শেষ প্রতিনিধি বিবেচনা করা হয়। 'কালীয়দমনযাত্রা' এরপর 'কৃষ্ণযাত্রা' নামেই পরিচিতি অর্জন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমি ধাঁচের থিয়েটারের প্রচলন হলে অভিনয়প্রিয় মানুষেরা সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিতদের হাতে পড়ে যাত্রা রুচি ও পরিবেশনার দিক দিয়ে ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকল। এসময়ে 'সখের যাত্রা'র প্রচলনও বাড়তে থাকে।

গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) যাত্রার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। ১৮৬০ সালে তাঁর রচিত 'স্বপ্নবিলাস' ও 'দিব্যোন্মাদ' পালার মাধ্যমে যাত্রা নতুন প্রাণ পায়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডেই ছিল তাঁর পালা পরিবেশনের অঞ্চল। তাঁর রচিত পালাদুটি ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে ঢাকা থেকেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমলের যাত্রাপালাই যাত্রাসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত দলিল। এরপর ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিচিত্রবিলাস' যাত্রাপালা। এই তিনটি পালা নিয়ে গবেষণা করে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬০ সালকে তাই আধুনিক যাত্রার আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই সময়ের আরেকটি যাত্রার কথা

জানা যায় হৃদয়নাথ মজুমদার নামে ঢাকার এক আইনজীবীর স্মৃতিকথা থেকে। গবেষক মুনতাসীর মামুন এই স্মৃতিকথা থেকে তথ্য নিয়ে জানিয়েছেন যে–

> যাত্রার জন্যে ঢাকা ছিল বিখ্যাত। 'সীতার বনবাস' হলো ঢাকার প্রথম যাত্রা। তারপর একরামপুর থেকে 'স্বপ্নবিলাস' নামে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ হলো। এই যাত্রা শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'স্বপ্নবিলাস'-এর সাফল্যের পর একরামপুর থেকে পরপর মঞ্চস্থ হলো 'রাই-উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্রবিলাস'। নবাবপুরের বাবুদের তখন বেশ নামডাক। যাত্রা প্রতিযোগিতায় তারাও পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না। তাদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হলো 'ধনকুণ্ডু' 'নৌকাকুণ্ডু' এবং 'ব্রাহ্মের গীতা'। কিন্তু এর কোনটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।
>
> ঢাকার শেষ এমেচার যাত্রা 'কোকিল সংবাদ'। সুভাড্যার কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে এর আয়োজন করেন। শহরে ছয়মাস এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় একবছর ধরে 'কোকিল সংবাদ' চলেছিল।' (মুনতাসীর মামুন, 'হৃদয়নাথের ঢাকা শহর', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ঈদসংখ্যা ১৯৭৬, পৃ. ১৪৪)

হৃদয়নাথ মজুমদার 'সীতার বনবাস'কে ঢাকার প্রথম যাত্রা অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, গবেষক ও রাজনীতিবিদ সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) একে নাটক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তা 'স্বপ্নবিলাস'-এর আগে অভিনীত হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন–'এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের দলগুলো বছরের পর বছর এখানে এসে অভিনয় করার ফলেই এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে থিয়েটারের হুজুগ জেগে ওঠে। ঢাকায় বসাকরা বহুকাল আগে থেকে উৎসাহের সঙ্গে গানবাজনা চর্চা করে আসছিলেন। নাট্যাভিনয়ের তরঙ্গ তাঁদের মনে দোলা জাগিয়ে তুলল। সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। উনিশ শতকের শেষভাগে নওয়াবপুরের বসাক সম্প্রদায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' অবলম্বনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে একরামপুরের অধিবাসীরা কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত 'স্বপ্নবিলাস' নাটক অভিনয় করলেন। এই নাটক পরপর ছয় রাত্রি মঞ্চস্থ হয়। এই ঢেউ এবার গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৩২ সালে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মোগরাপাড়ার (প্রাচীন সোনারগাঁ) সৌখিন ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরপর দুই রাত্রি 'স্বপ্নবিলাস'-এর অভিনয় হয়েছিল।' (সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৮-৩৯)

সত্যেন সেন 'সীতার বনবাস'কে উনিশ শতকের শেষভাগে পরিবেশিত নাটক হিসেবে মনে করেছেন। কিন্তু এটি যদি 'স্বপ্নবিলাস'-এর আগে অভিনীত হয় তাহলে এর অভিনয়কাল ১৮৬০ সালের আগে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এ সময়ে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর-র 'স্বপ্নবিলাস' নামের যাত্রাপালা রচিত ও অভিনীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া 'সীতার বনবাস' থিয়েটারমঞ্চে অভিনেয় নাটক মনে না করে যাত্রামঞ্চে

অভিনেয় পালা মনে করাই সঙ্গত। কারণ এটি প্রত্যন্ত গ্রামের খোলা মঞ্চে অর্থাৎ যাত্রামঞ্চে অভিনীত হওয়ার উপযোগী। বাঙালি সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রণী পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এই 'সীতার বনবাস'-এর কাহিনীকার হিসেবে যাত্রার ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'সীতার বনবাস'-এর কথা গেজেটিয়ারে পাওয়া যায় এভাবে 'It was in 1862 that *Purba-Banga-Ranga-Bhumi*, a public theatre, was established in Dacca [Dhaka]. The Basaks of Nawabpur introduced the *Jatra*, and the first performance was *Sitar Banobas*. This was followed by Islampur Hindus, who staged *Swapna Bilas*. *Swapna Bilas* was written by Krishnakamal Goswami, a domiciled Hindu of Dacca. The drama or *Jatra* was re-staged at Murapara in 1882. Rai Kumudini [Unmadini] improved upon such Bengali *Jatra* dramas and composed songs and set them to musical tunes suitable for occation. *Jatras* used to be accompanied by Hindu *Kheyal Thumri*'. (*ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার*, ১৯৭৫, পৃ. ৩৪২)

১৮৬৪ সালে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' রচিত ও অভিনীত হয়। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় এটিই প্রথম বাংলা গীতাভিনয়। (*হিন্দু প্যাট্রিয়ট*, ২২ মে ১৮৬৫ [উদ্ধৃতি : রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বি-সং ১৯৯৩, পৃ. ৫৪)। ঢাকায় এসময় নবাবপুরের বাবুদের সঙ্গে রেষারেষির রেশ ধরে সূত্রাপুর ও একরামপুরের বাবুরা মৈষুণ্ডির গোবিন্দ চক্রবর্তীর লেখা 'নারদ সম্বাদ' বা 'প্রভাসলীলা' পালা মঞ্চস্থ করেছিল। এরপর রামকুমার বসাকের পালা 'ধনকুণ্ড', 'নৌকাকণ্ড', 'ব্রহ্মার গীত' এবং গোবিন্দ চক্রবর্তীর অপর পালা 'কুণ্ডেশ্বরীর মিলন'ও তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। (মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১৭-১৮)

ঢাকায় কৃষ্ণকমলের যাত্রাপালার আরো সংবাদ জানা যায় আলেকজান্ডার ফর্বেস সম্পাদিত *দি বেঙ্গল টাইমস* পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে। ১৮৮৭ সালে লেখা 'থিয়েট্রিক্যাল' শিরোনামের এই চিঠিতে প্রায় ১২ বছর আগের অর্থাৎ ১৮৭৫ সালে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণকমলের যাত্রাপালার উল্লেখ রয়েছে। চিঠিতে বলা হয়– 'Sir, Nawabpore is grand arena of histroinic display and aesthetic performance in Dacca, while in music, its excellence is unrivalled. More than a dozen years ago, when theartical performance had not attained that degree of perfection which it now boasts, and when its spread was not so universal as at present, it placed on the stage two or three pieces of country *Jatras* composed by Krishna Komal Goswame. Since, then, fasion has undergone a radical change. *Jatra* have vanished, yielding to operas. Same five or six years back, the Nawabpore company performed

a beautiful piece entitled *Sakuntala*. This year that company has produced a piece entitled *Utter Ramcharita*, describing the later years of Ramas life after his return from exile... আলেকজান্ডার ফর্বেস (সম্পা.), 'দি বেঙ্গল টাইমস', ঢাকা, ১১ এপ্রিল ১৮৮৭ [উদ্ধৃতি : মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, অষ্টম খণ্ড* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২০২]

এই চিঠিতে নবাবপুর কোম্পানি নামে একটি থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা কোম্পানির তথ্য পাওয়া যায়। এই দলের জনপ্রিয় প্রযোজনা ছিল 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' ও 'উত্তর রামচরিত' নামের দুটি পালা। থিয়েট্যিাল কোম্পানিগুলোর পরিবেশনা ছিল যাত্রা ও থিয়েটারের মিশ্রণ। এ ধরনের পরিবেশনা ছিল বেঙ্গল ক্রাউন থিয়েটারের 'লায়লা ও মজনু', 'রাজা বাহাদুর' এবং 'মীরা বাঈ'। (আলেকজান্ডার ফর্বেস (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪ [উদ্ধৃতি: মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)

১৮৮৩ সালে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত বিধানপল্লীতে অর্থাৎ বর্তমানে নিমতলীর কাছাকাছি কোনও স্থানে 'ধরাতলে স্বর্গধাম' নামে একটি যাত্রাপালার আয়োজন হয়। অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন হয়। সোমবার দুইশত টিকেট বিক্রয় হয় এবং রাত্রি একটার সময় অভিনয় আরম্ভ হয়। (বঙ্গচন্দ্র রায় (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু, ২৮ অক্টোবর ১৮৮৩ [মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত) 'ধরাতলে স্বর্গধাম' যে যাত্রাপালা তা বোঝা যায় এর অভিনয়শুরুর সময় বিবেচনা করলে। যাত্রা যে মধ্যরাতে শুরু হয়ে সারারাত ধরে চলে, সে রেওয়াজ এখনও রয়েছে। তবে সে সময়ে দুইশত টিকেট বিক্রি হওয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯১০ সালে ঢাকায় 'অক্ষয়বাবু' নামের এক ব্যক্তি একটি যাত্রাদল খোলেন। এই দল 'অক্ষয়বাবুর দল' নামে পরিচিতি পায়। ১৯২৪ সালে ফরিদপুরে জীবনবাবু নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যাত্রার দল এসেছিল। তারা 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মবিপ্লব' পালার অভিনয় করে সুনাম অর্জন করে। ফরিদপুরের ওই পালার সফল মঞ্চায়নের সংবাদে প্রাণিত হয়ে ১৯২৫ সালে ঢাকার ফরাশগঞ্জে সৌখিন যাত্রার এই পালা মঞ্চায়ন করে বলে জানা যায়। ফরাশগঞ্জে বৈরাগীটোলা পাড়ায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করত। একই সঙ্গে তারা পাড়ার যাত্রায় বা নাটকে অভিনয় করত। এই পাড়ার 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মবিপ্লব' পালার প্রযোজনা সম্পর্কে জানা যায় সত্যেন সেনের আলোচনায় 'বৈরাগীটোলার বেণী পোদ্দারের বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় স্টেজ বেঁধে 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মবিপ্লব' নাটকের অভিনয় চলছিল। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এই আসরে নাটকের নির্বাচনটা খুব ভালো হয়েছিল বলা চলে না। সাধারণ হিন্দুর কাছে কালাপাহাড়ের দেবমূর্তি ভাঙার বা ইসলামধর্ম গ্রহণের কাহিনীটা তেমন মুখরোচক হওয়ার কথা নয়। হিন্দুদের মনের মধ্যে যাই থাক না কেন, গোলমালটা কিন্তু এ নিয়ে উঠল না। বিতর্কটা উঠল একটা সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র

করে। নাটকে ছিল, কালাচাঁদ ওরফে কালাপাহাড় বাদশাহের মেয়ে দুলালীকে ভালোবেসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হিন্দুরা আপত্তি তুলল, কথাটি সত্য নয়, আসলে দুলালীই প্রথমে কালাচাঁদকে ভালোবেসেছিল। এই নিয়ে মুসলমান আর হিন্দু দর্শকদের মধ্যে ধুম তর্ক বেঁধে গেল। প্রথমে মুখেমুখে তর্ক, তারপর গালাগালি, হাতাহাতি, অবশেষে অভিনয়ক্ষেত্র রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। অভিনয় মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তিনদিন এই অবস্থা বজায় রইল। কিন্তু অভিনয়প্রিয় ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল না। শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যেই দু'পক্ষে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। উভয়পক্ষই শান্তিকামী। কাজেই শান্তিপ্রতিষ্ঠার একটা ফর্মুলা পাওয়া গেল। উভয় পক্ষ একমত হয়ে স্থির করল যে, নাটক থেকে বিতর্কমূলক অংশটা বাদ দিতে হবে। নাটক কিন্তু চালাতেই হবে। এরপর এই নাটক দুই রাত্রি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।' (সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪)

'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মবিপ্লব' পালাকে সত্যেন সেন নাটক বলেছেন। এটি আসলে যাত্রাপালা। ঐতিহাসিক এই পালার রচয়িতার নাম চয়ে পাগলা। মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম পালা রচনার প্রবৃত্ত হন এবং প্রথম মুসলিম পালাকার হিসেবে স্বীকৃত হন। এটি বিশের দশকের একটি জনপ্রিয় পালা। পেশাদার দল ছাড়াও সৌখিন দলে এই পালা অভিনীত হয়। বৈরাগীটোলার দর্শকগণ ধর্মানুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে কিছুটা সংশোধন করেও এই পালার মঞ্চায়ন অব্যাহত রাখে।

১৯৩২ সালে নারায়ণগঞ্জের মোগরাপাড়ায় সৌখিন ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্নবিলাস-যাত্রা'র মঞ্চায়নের সংবাদ জানা যায়। (সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯) তবে এই যাত্রার পরিবেশনকারী দলের নাম জানা যায়নি।

তৎকালীন ঢাকা তথা আজকের মানিকগঞ্জের কার্তিকচন্দ্র সাহা ১৯৪৪ সালে গঠন করেন 'অন্নপূর্ণা যাত্রা পার্টি'। এই সময়ে দৌলতপুর থানার বিনোদপুরে 'কানাই-বলাই অপেরা পার্টি' নামের একটি সখের দল ছিল। তখনকার খ্যাতিমান যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে সুধীররঞ্জন বসুরায়, গৌরগোপাল গোস্বামী, নীতীশচন্দ্র অধিকারী, আকালী হালদার প্রমুখের নাম শোনা যায়। নীতীশচন্দ্র অধিকারীর পুত্র, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী 'কানাই-বলাই দলে'র শিশুশিল্পী এবং পরবর্তী সময়ে সহ-নির্দেশক হিসেবেও ভূমিকা রেখেছেন। গোটা পাকিস্তান আমলে আর ঢাকা অঞ্চলে নতুন কোনও যাত্রাদলে প্রতিষ্ঠার খবর আমাদের জানা নেই।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে মানিকগঞ্জের ডা. ব্রজেন্দ্রকুমার মণ্ডলের 'জগন্নাথ অপেরা' ও ভানু সাহার 'অম্বিকা যাত্রাপার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় গঠিত হয় করম আলী ভুঁইয়ার 'বিজয়লক্ষ্মী অপেরা'। এই বছরে তাপস সরকার প্রতিষ্ঠা করেন 'চারণিক অপেরা'। তাপস সরকারের পরে 'চারণিক নাট্যগোষ্ঠী'র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অমলেন্দু বিশ্বাস। ১৯৮৭ সালে অমলেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে এই দল পরিচালনার দায়িত্বে আসেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস। 'রাজা সন্ন্যাসী', 'মাইকেল', 'জানোয়ার',

'লেনিন', হিটলার' প্রভৃতি পালায় তাঁর অভিনয় এখন কিংবদন্তীতুল্য। তাঁর মৃত্যুর পরে এ সম্পর্কে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় লেখা হয়– 'যাত্রাঙ্গনের এই স্বাপ্নিক পুরুষ স্বীয় প্রতিভা, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন, তা শুধু ঈর্ষণীয়ই নয়, দুর্লভও বটে। সকলের মুখে মুখে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন যাত্রাসম্রাট হিসেবে। প্রচারবিমুখ এই শিল্পপ্রাণ ব্যক্তিত্ব আজীবন সৃষ্টির নেশায় মেতে থেকেছেন, নব নব সৃষ্টির প্রেরণা ও আনন্দে নিজে যেমনি, অপরকে তেমনি বিমুগ্ধ করে গেছেন তিনি।' (শাহীন রেজা নূর, 'পরলোকে যাত্রাশিল্পের অগ্রসেনানী অমলেন্দু বিশ্বাস', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭) ঢাকার মানুষের কাছে যাত্রার গৌরব তুলে ধরার ক্ষেত্রে অমলেন্দু বিশ্বাসের ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।

ঢাকা জেলায় ১৯৭৬ সালের উল্লেখযোগ্য দল হল শেখ বোরহানউদ্দিনের 'বলাকা অপেরা' (মানিকগঞ্জ), খোকন চৌধুরীর 'নবচন্দন অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ), আফতাব উদ্দিনের 'কোহিনুর অপেরা' (মানিকগঞ্জ), সাধুচরণ পণ্ডিত ও যুধিষ্ঠির মণ্ডলের যৌথ আধিকারিত্বে 'বাসুদেব অপেরা পার্টি' (মানিকগঞ্জ) এবং গিয়াসউদ্দিন আহমেদের 'আজাদ অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ)। ১৯৭৭ সালের নারায়ণগঞ্জে গঠিত হয় খোকন চৌধুরীর 'নিশিবাণী অপেরা'।

১৯৮২ সালে মানিকগঞ্জের সুকুমার কর্মকারের 'নবপ্রভাত অপেরা' দেশব্যাপী পরিচিতি অর্জন করে। ১৯৮৩ সালে মানিকগঞ্জের নারায়ণচন্দ্র মণ্ডলের 'সত্যনারায়ণ অপেরা' যাত্রামোদী দর্শকশ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। ১৯৮৪ সালে জন্ম নেয়া মোহম্মদ আলী চৌধুরীর 'সোনালী অপেরা' (গাজীপুর), চক্রবর্তীর 'আদি অগ্রগামী যাত্রাসমাজ' (ঢাকা) বেশ জনপ্রিয় যাত্রাদল হয়ে উঠেছিল।

মানিকগঞ্জের হায়দার আলীর 'নবরূপা অপেরা' ১৯৮৫ সালের একটি যাত্রার দল। ১৯৮৫ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের জন্যে একটি অন্যরকম দিন। এদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে অমলেন্দু বিশ্বাস নির্দেশিত ও চারণিক নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'মাইকেল মধুসূদন' পালাটি সম্প্রচারিত হয়। এ পালার মাধ্যমে অমলেন্দু বিশ্বাস যাত্রাভিনেতা হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। ১৯৯১ সালের ২৪ এপ্রিল পালাটি পুনঃপ্রচারিত হয়। এ পালায় অমলেন্দু বিশ্বাস ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস ছাড়াও অতুল রায়, হেম সেন, সুনীল মণ্ডল, রিপন বাড়ৈ, বাদল ঘোষ, সবিতা মল্লিক প্রমুখ শিল্পী অভিনয় করেন।

মানিকগঞ্জের কেএম হারুনুর রশিদ, ছাকেলা বেগম এবং আ. জলিল সিকদার (তারা মিয়া) ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে 'মহানগরী যাত্রা ইউনিট', 'নিউ জয়ন্তী অপেরা'

এবং ‘আদি প্রগতি নাট্যসংস্থা’ গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের নতুন দল হচ্ছে নরসিংদীর সুমি অপেরা এবং মানিকগঞ্জের ‘নিউ প্রতিমা অপেরা’ (শিপ্রা সরকার উমা ও সুশীল সরকার)। ১৯৮৮ সালে আজগর আলীর ‘দুর্বার অপেরা’ (নারায়ণগঞ্জ), ১৯৮৯ সালে নারায়ণগঞ্জের আনোয়ার হোসেনের ‘বিউটি অপেরা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকায় গড়ে ওঠা মো. আবদুল হালিমের ‘আকাঙ্ক্ষা নাট্যদল’ বেশকয়েকটি যাত্রাপালা পরিবেশন করে। ১৯৯১ সালে আলমগীর হোসেনের ‘বিশ্বেশ্বরী নাট্যসংস্থা’ (ঢাকা) গঠিত হয়। ১৯৯২ সালে রাজধানী ঢাকায় জন্ম নেয় তিনটি দল। এগুলো হলমানজুরুল ইসলাম লাভলুর ‘চন্দ্রা যাত্রা ইউনিট’, আলাউদ্দিন দেওয়ানের ‘তাজমহল যাত্রা ইউনিট’ এবং নয়ন চৌধুরীর ‘শিল্পী অপেরা’।

১৯৯৩ সালে ‘দেশ অপেরা’ (মিলনকান্তি দে, ঢাকা) জন্ম নেয়। ‘দেশ অপেরা’ মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক পরিবেশনার মধ্যে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ‘বিদ্রোহী নজরুল’, ‘এই দেশ এই মাটি’ প্রভৃতি পালার মাধ্যমে অধিকারী অভিনেতা নির্দেশক সংগঠক মিলনকান্তি দে নাগরিক জীবনে যাত্রাকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলছেন।

১৯৯৪ সালে জন্ম হয় মুন্সিগঞ্জের মো. নয়ন মিয়ার ‘শিল্পী শোভা অপেরা’ এবং ‘শিল্পী শোভা অপেরা’ মূলত গীতিধর্মী পালা আসরস্থ করে থাকে। এই ধারার আরো দুটি দল হচ্ছে, ১৯৯৫ সালের ‘সৌখিন গীতিনাট্য’ (মো. শামীম হোসেন, গাজীপুর), এবং ‘ঝুমুর টঙ্গী’ (নুরুল ইসলাম সবুজ, গাজীপুর)। ১৯৯৬ সালেও ঢাকা অঞ্চলে দুটি যাত্রাদলের জন্ম হয়। দল দুটি হল মুন্সিগঞ্জের আরশাদ আলীর ‘বিনোদন ঝুমুর যাত্রা’ এবং মানিকগঞ্জের সেকেন্দার আলীর ‘সূর্যমহল অপেরা’। ১৯৯৭ সালে গাজীপুরের সুনীল চার্লস রডরিক্সের ‘নাগরী সৌখিন ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠী’। দলটি সৌখিন শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত হলেও গীতিধর্মী পালা আসরস্থ করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও যাত্রাদল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যাত্রানুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয় না। একসময় সাপ্তাহিক ‘চিত্রালী’, সাপ্তাহিক ‘সিনেমা’, সাপ্তাহিক ‘পূর্বাণী’ ও মাসিক ‘ঝিনুক’ পত্রিকায় নিয়মিত যাত্রার সংবাদ ছাপা হত। মাত্র দুই-তিন জন যাত্রার লোকই এসকল পত্রিকায় সংবাদ ও প্রতিবেদন রচনা করত। তাই তাদের পছন্দের দলগুলোর কথাই বারবার এসেছে ওই সকল পত্রিকায়। কোনও কোনও দলের খবর কখনই পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

দলমালিকরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের দলিলপত্রও সংরক্ষণ করেন না। তাই যাত্রাদলের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পুঙ্খানু ও পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভবপর নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনও যাত্রাদল টিকে আছে এবং নতুন দলের জন্ম হচ্ছে এটি নিঃসন্দেহে স্বকীয় ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের চিরন্তন আকর্ষণের স্বাভাবিক প্রতিফল।

ডক্টর তপন বাগচী : কবি, সাংবাদিক ও ফোকলোরবিদ।

[লেখক : যাত্রানাট্য-গবেষক, কবি, প্রাবন্ধিক। পেশাঃ বাংলা একাডেমিতে চাকরি।]

প্র ব ন্ধ

মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা সম্পর্কে

র ণে শ দা শ গু প্ত

সাহিত্য আর প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ যে পরস্পরের পরম মিত্র হতে পারে, সে কথা মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনগুলোতে একটা প্রমাণ নিয়ে সামনে এসেছিল। ১৯৪২ সালে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দেয়ার পথে তরুণ গল্পলেখক সোমেন চন্দ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হন, তখন সেই রক্তাক্ত মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাংলার সাহিত্য আর রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। পরের বছর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত সোমেন স্মৃতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, উদীয়মান গল্পলেখক। তখনও তিনি ছাত্র তবে আসল যোগটা ঘটল প্রগতিশীল সাহিত্য আর মার্কসীয় রাজনীতির মধ্যে।

মুনীর চৌধুরী গুছিয়ে বক্তব্য বলতে অল্প বয়সেই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তিবাদী হিসেবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকেই আঘাত করতেন প্রধানত। কবিতা তিনি কদাচিৎ লিখতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গদ্যে। ভলটেয়ারের ধাঁচ ছিল তাঁর মধ্যে।

আমাদের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পর্কের সূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল তার এই ধর্মীয় গোঁড়ামি-বিরোধী মুখরতার দরুন। তখন সেই যুগ চলছে যার কবি সুকান্ত। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করার নিশান লাল নিশান। তবে ঢাকায় আমরা যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুতরাং আমাদের লাল নিশানের রাজনীতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনীতি। আর মুনীর চৌধুরী এই সংগ্রামের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শরিক হয়েছিলেন তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক অসাম্প্রদায়িকতার প্রবণতা নিয়ে। মুনীর চৌধুরীর ‘মানুষ’ নাটকের নায়ক তিনি নিজেই। এই নাটকের জন্ম হয়েছিল আমাদের সাধারণ রাজনৈতিক সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা থেকে। মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়িকে বুঝতে হলে এই ‘মানুষ’ নাটকটি পড়তে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছিলেন মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের একজন সেরা ছাত্র হিসেবে। অধ্যাপনা তাঁর জন্য ছিল নির্দিষ্ট হয়ে। কিন্তু প্রগতিশীল সক্রিয় রাজনীতি তাঁকে টানছিল। সারা সময়ের কমিউনিস্ট কর্মী হবার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি চাপ দিতাম তা হলে সর্দার ফজলুল করীমের মতো মুনীর চৌধুরীও অধ্যাপনা ছেড়ে দিতেন। আমরাই হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তিনি যদি অধ্যাপনা করেন এবং কমিউনিস্ট হিসেবে কাজ করেন তা হলে লাল নিশানের রাজনীতির পক্ষে তা সহায়ক হবে এরকম একটা কথা ছিল আমাদের মনে। আমরা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন রাজনীতিবর্জিতভাবে শিক্ষক জীবনকে চূড়ান্ত গুরুত্ব এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য দিয়ে, তার জন্য আংশিকভাবে দায়ী আমরা ও তার সাথিরা যারা প্রধানত প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেছি। এ ব্যাপারটা ঘটবার আগে সমস্ত মিলিয়ে মুনীর চৌধুরী সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে যে সম্মেলন সাধন করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল অনির্দেশ্যতা। তিনি নিজেও একটা পরিষ্কার ফয়সালটা করে নেননি। আমরাও বিশেষ করে যারা তার সাহিত্যিক সতীর্থ ছিলাম তারাও ফয়সালা করে দেইনি। এই অবস্থাতেই মুনীর চৌধুরী ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার এই সময়েই শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির অগ্নিপরীক্ষা। মুসলিম লীগের শাসনের সমস্ত রোষ পড়েছিল কমিউনিস্টদের ওপর। দু’টি ঘটনার কথা মনে আছে। মুনীর চৌধুরী সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দুরূহ দায়িত্বে শরিক হয়েছিলেন।

সেটা বোধহয় ১৯৪৮ সালের মে মাস। আমাদের কয়েকজন কমরেড তখন আত্মগোপন করেছেন। আমরা কয়েকজন বাইরে খোলাখুলি পার্টি অফিস চালাচ্ছি। ঠিক হল আমরা এক সঙ্গে বসব। নারায়ণগঞ্জ থেকে অদূরে লক্ষা নদীর অপর পাড়ে একটি গ্রামে আমরা দু'তিন আলোচনায় বসেছিলাম। সেখানে মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন উচ্ছল প্রাণবন্ত সঙ্গী হিসেবে। মুনীর চৌধুরীর একটা গুণ ছিল এটাই। অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্তে এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে তিনি সহজ হতে পারতেন। গ্রামে থাকার সেই দু'টি দিনের কথা কোনোদিন ভুলব না। মনে পড়ে সকালবেলায় যখন নৌকায় লক্ষা পেরিয়ে আসি, তখন নদীতে খুব ঢেউ ছিল। আমরা একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কিভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখব সে সম্বন্ধে একটা সাহসী পরিকল্পনা নিয়েই ফিরেছিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ৪৮ সনেরই ৩০ জুন-এর দিন সাতেক আগে আমরা ঠিক করেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য রাখব জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি। ৩০ জুন দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সদরঘাট পার্কে জনসভার জন্য। সাতদিন ধরেই আমরা বিকেলে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মোড়ে সভা মারফত ৩০ জুনের সভায় বিষয়টিকে সবাইকে জানাচ্ছিলাম। কিছুটা গেরিলা পদ্ধতিতে আমাদের যাতায়াত করতে হত লাল নিশান নিয়ে। যে কোনো মুহূর্তে আমদের ওপর হামলা হতে পারত। এই রকম একটা বিকেলে আমরা তিন-চারজন একটা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ঢাকায় একটি জনাকীর্ণ মহল্লার দিকে যাত্রা করলাম। মুনীরও আমাদের ছিলেন। লাল ঝাণ্ডাটা মাঝে মাঝে হাত বদল হচ্ছিল। মুনীর চৌধুরীকে লাল ঝাণ্ডাটা হাতে নিতে দেখতে বেশ ভালো লাগত। ওর জামাকাপড় ছিল খুব সাধারণ। মুখচ্ছবিতে ছিল প্রতিভার বিচ্ছুরণ। মাঝখানে একসময়ে হঠাৎ সে আমার হাতে নিশানটা তুলে দিয়ে একটা রিকশায় চেপে বসে বলল 'একেবারে মনে ছিল না, রেডিওতে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে।'

তিরস্কারের দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর মুখের ওপর। তবে যেতে দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই দিন কয়েক দেখা না হবার ফলে উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম জনসভার দিন কাকে পাবো, কাকে পাবো না ভেবে। মুনীর চৌধুরী কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তটিতে। বিরাট হামলার ঝুঁকি নিয়ে আমরা সদরঘাট পার্কে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মুনীর চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছিলাম। সভার শেষের দিকে মুসলিম লীগের লোকেরা আমাদের সভা ভেঙে দিয়েছিল। আমরা পার্টি অফিসে চলে আসার পর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচণ্ড ৫ হামলার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার মধ্যে মুনীর চৌধুরীও একজন ছিলেন। এর পরে ৪৯ সালে দেখা হল কারাগারে, এই সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের সর্বশেষ সংগ্রাম শুরু গিয়েছে এবং এই কারণেই সমস্ত সাথির কাছ থেকে ষোলো আনা সংগ্রাম আদায় ছিল আমাদের চাহিদা। সুতরাং মুনীর চৌধুরীর কাছ থেকেও চেয়েছিলাম অন্য কিছু নয়, সাহিত্য নয়, অধ্যাপনা নয়, শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এখানেই আমদের ভুলে হয়েছিল, তাঁরও ভুল হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী তখন কিছুটা অধ্যাপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর কাছে সাহিত্য বোধহয় বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে এক চুল আলগা হয়ে গিয়েছে। এক চুল পার্থক্যই সে সময়ে পারস্পরিক চিন্তার ব্যবধানের বিস্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমরা সেই মুহূর্তে মনে করেছিলাম, তা হলে তাঁকে আর রাখা অনাবশ্যক। তিনিও মনে করেছিলেন তা হলে থাকা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি আর জেলখানায় পড়ে থাকার মধ্যে কিছু দেখলেন না। কর্তৃপক্ষ একটা সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিল। তাঁরা মুনীর চৌধুরীকে ছেড়ে দিল এই মনে করে তিনি আর রাজনীতি করবেন না। কিন্তু আমাদের, মুনীর চৌধুরী নিজের এবং কর্তৃপক্ষের হিসেবে গোড়াতেই ভুল হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরে মুনীর চৌধুরী গ্রেপ্তার হলেন। কারাগারে আটক থাকলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত। এই জেলে থাকার সময়েই মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকটি লেখেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে একটি নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা জেলে দু'নম্বর খাঁচায় আটক কমিউনিস্ট বন্দিরা। তারা অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখে দিতে। যেহেতু আমার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর একটি বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বরাবরই, সেজন্য সকলের হয়ে আমি পুরনো হাজত হতে গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীকে নাটক লিখে দেবার জন্যে। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা জেলের দেওয়ানি নামক ছোট ঘরটিতে আটক থাকতেন। এই 'কবর' নাটকটি আবার প্রমাণ করে সাহিত্য আর বৈপ্লবিক রাজনীতিকে একত্রিত করার জন্য যে চেষ্টা একজন বিপ্লবী লেখককে করতে হয়, তাতে মুনীর চৌধুরী কত সাবলীল ছিলেন। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে তিনি অনায়াসে সাঁতরাতে পারতেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি এরপর দু'মাস বাইরে ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে নাকচ করে সামরিক গভর্নরের শাসন জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এই সময়ে প্রায় পাঁচ মাস আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তিনি জেল থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ঘরে গিয়ে বসতেন। ইংরেজির ছাত্র এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলা ভাষা আন্দোলনে জেল খাটার সময় প্রগতিশীল রাজনীতি, মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য বাংলাকেই অনেক ভেবেচিন্তে নির্বাচন করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে ঢুকলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপরে আমরা সবাই, তিনি নিজে এবং কর্তৃপক্ষীয়েরাও ধরে নিয়েছিল মুনীর চৌধুরী প্রগতিশীল রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরী ভাষাবিদ, মুনীর চৌধুরী শিক্ষাবিদ, মুনীর চৌধুরী বাগ্মী, এই হয়েছিল তাঁর পরিচয়। কিন্তু কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী যে মরে যায়নি এর প্রমাণ তার নানাকাজের মধ্যে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসত। কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার জন্য বেরিয়ে আসার

ব্যাপারে অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারেননি বলে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শুধু বাগ্মী মুনীর চৌধুরী রূপেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। আর কিছু নয়। কিন্তু আমরাও অবিচার করেছিলাম শুধু বাইরেরটা দেখে। মনে পড়ে ১৯৬৫ সালে ঢাকার চলচ্চিত্র উৎসবের একটি আলোচনাসভায় মুনীর চৌধুরী সভাপতি। আমাকে মূল বক্তব্য উপস্থিত করতে বলা হয়েছিল। এখানে শিল্পকলা আর বৈপ্লবিক রাজনীতির গভীর সম্পর্কের প্রয়োজনটিকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। বিপ্লবী মানবতা কথাটা নিয়ে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী আমরা বক্তব্যের সমর্থনে আমার চেয়ে অনেক ভালো করে যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তাঁর সভাপতির ভাষণে। এই ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ঘষা লাগালেই আগুন জ্বলে উঠত। একটা জায়গা ছিল মুনীর চৌধুরীর সত্তার, যেখানে কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট হিসেবে বারবার মাথা তুলেছেন বিদ্রোহের লাল নিশান হাতে। এইখানেই ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী মুনীর চৌধুরীর দুর্নিবার ভবিষ্যৎ। এই কারণে পরের দিকে তাঁর কথা উঠলে অনেক সময় মনে হয়েছে, তাঁকে আবার সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতির ক্ষেত্রে যৌবনের মতো ফিরে পাব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারার শত্রুরা তাঁর এই ভবিষ্যৎকে তাদের হায়নার চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিল বলেই কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রগতিবাদী লেখক মুনীর চৌধুরীকে তারা হত্যা করেছে।

এখন রক্তের সাগর থেকে কমরেড মুনীর চৌধুরীকে তুলে আনতে গিয়ে আমরা যারা সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতিকে নবগুণাত্মকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, তাদের বিপ্লবী অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে শিখতে হবে। বিপ্লবীদের পরস্পরের হাতে হাত রেখে দুর্গম পথে অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে শিখতে হবে। মনে মন রেখে চলতে শিখতে হবে। অতর্কিতে হাত ছুটে গেলেও আবার হাতে হাত রাখতে পারা যাবে সানন্দে। তা না হলে মুনীর চৌধুরীকে ফিরে পেয়ে কী শিখলাম?

উৎস : থিয়েটার, নভেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা

[লেখক: সমাজবাদী চিন্তক।]

লিয়াকত আলী লাকী, তারিক আনাম খান, বিপ্লব বালা, মান্নান হীরা

স ঞ্চা ল ক : আ জা দ আ বু ল কা লা ম ও হা সা ন শা হ রি য়া র

[এক আড্ডায় বসা হয়েছিল। যাদের প্রথম প্রজন্মের বলা যাবে না আবার যারা বর্তমান প্রজন্মেরও না, তাদের সাথেই আড্ডায় বসেছিল থিয়েটারওয়ালা। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত যে নাট্যচর্চাটা শুরু হয়েছিল, সেটার যারা সহায়ক ভূমিকায় থেকে আজ অব্দি থিয়েটার চর্চাটাকে বেগবান রেখেছেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রজন্মেরই ওনারা প্রতিনিধি। তাদের কাছ থেকে জানা গেল থিয়েটার চর্চার বর্তমান পর্যায়ে আসার প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে তৈরি হওয়া কিছু সংকটের কথা। এসব সংকট নিয়ে ভাবনা-চিন্তার এক পর্যায়ে হয়তো-বা মিলে যাবে সমাধানের উপায়। আপাতত এই প্রত্যাশায় থাকা যাক।

আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন চার নাট্যজন– লিয়াকত আলী লাকী, তারিক আনাম খান, বিপ্লব বালা আর মান্নান হীরা। আড্ডাটিতে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন দু'নাট্যজন– আজাদ আবুল কালাম আর হাসান শাহরিয়ার। আড্ডাটি অনুলিখন করেছেন– *থিয়েটারওয়ালার* সহকারী সম্পাদক সুমন নিকলী।]

আজাদ আবুল কালাম

আমরা এ রকম একটা জায়গা থেকে শুরু করতে পারি যে, স্বাধীনতার পর পর আমাদের দেশে একধরনের নাট্যচর্চা শুরু হয়েছে যাকে আমরা নাগরিক নাট্যচর্চা বলতে পারি এবং এটার মাধ্যমে আমাদের দেশে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত মঞ্চনাটক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এবং এই মঞ্চনাটক করবার জন্য এক ধরনের থিয়েটার দল তৈরি হয়েছে যাদেরকে আমরা গ্রুপ থিয়েটার বলি। এভাবে চর্চা শুরুর পরের জেনারেশন হিসেবে আপনাদের উপস্থিতি আমরা দেখি। তো আপনাদের শুরুটা কীভাবে হল সেটা একটু জেনে নিই।

তারিক আনাম খান

ব্যাপারটা তুমি যেটা বলছ, আমার মনে হয় টিপিক্যাল আরবান এবং ঢাকা বেইজড থিয়েটারের কথা বলছ। মানে এখন যে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে বলছ। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, আমি হুট করেই নাটকে এসেছি ... আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন থেকেই প্রতিবছর নাটক করতাম। অন্তত দুটো নাটক এবং চার-পাঁচটা প্রদর্শনী করতে হত। তো আমরা নাটক দেখেছি, করতে শুনেছি ... আমার মনে হয় না যে, নাটকটা আসলে আমাদের স্বাধীনতার জন্যই থেমে ছিল। আসলে ভেতরে ভেতরে এটার চর্চাটা ছিল। আমার মনে আছে আমরা অনেকে সকালবেলা উঠে দৌড়াতাম, তারপর ব্যায়াম করতাম, কণ্ঠের চর্চা করতাম ... এখন যেটা আমরা কর্মশালায় শেখাই 'ক চ ট ত প ....', সেগুলো তখন আমরা করতাম। কোলকাতা থেকে বই এনে একসঙ্গে পড়তাম। আমাদের সিনিয়র অনেক লোকজন এটার সাথে জড়িত ছিলেন। এই যে বললাম বছরে অন্তত দুটো নাটক হত, এগুলো তো ওনারাই করতেন। আমি এজন্যই বলছি যে, এই চর্চাটা আমার কাছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে মনে হয়েছে।

লিয়াকত আলী লাকী

তারিক ভাই যেটা বলতে চাচ্ছেন তার সাথে আমি একমত। মানে বিষয়টা এরকম না যে, একটা শিল্প শুরু হল হঠাৎ করেই স্বাধীনতার পর। কেন, এর আগে কি এটার কোনো ট্র্যাডিশন ছিল না? ঐতিহ্য ছিল না? অবশ্যই ছিল। এই যে আমরা বলি প্রসেনিয়াম থিয়েটার ...

হাসান শাহরিয়ার

না, পাভেল ভাই বলতে চাইছে যে, এই চরিত্র নিয়ে ছিল না ... মানে নিয়মিত এবং দর্শনীর বিনিময়ে ছিল না। একটা সৌখিন মেজাজে হত আগে।

লিয়াকত আলী লাকী

আমি বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে যখন *বাকি ইতিহাস* বা *ভেঁপুতে বেহাগ* দেখলাম, তখন আমি একটা দৃশ্যে নাটক মঞ্চায়ন হতে দেখে চমকে গেলাম। আমি নিজে নাটক করি '৬৪ সাল থেকে। প্রতিবছর ৩-৪টি নাটক আমি করতাম। তো চমকে গেলাম মানে আমারো মনে হল এভাবে থিয়েটার করা যাবে। এটা হঠাৎ করে পাওয়া কিছু আমার কাছে মনে হয়নি। আমি '৬৪ সাল থেকেই প্রসাদ বিশ্বাস, কল্যাণ মিত্র, শম্ভু মিত্র, ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... এদের নাটক করতে শুরু করেছি। কীভাবে যেন আমি বাংলাবাজারে আসকার ইবনে শাইখের *অনেক তারার হাতছানি* নাটকটি পেলাম, এবং

সেই নাটকটিও করেছি। আমার প্রভাবটা মূলত পারিবারিক প্রভাব। কাজী বাটা, মুসা আহমেদ, আমার বড়ভাই মুরাদ আলী , তারা জগন্নাথ কলেজে নাটক করত, সেই নাটক দেখার যে অভিজ্ঞতা ... এবং আরো অভিজ্ঞতা হল আমার ঘুম ভাঙত কীর্তনের সুরে এবং আমি থিয়েটার বলতে যা বুঝেছি সেটা যাত্রা, পালাগান, কীর্তন, নিমাই সন্নাসী পালা তারপর জারি-সারি, কবির লড়াই তো আছেই ...

হাসান শাহরিয়ার
এগুলোকে থিয়েটার মনে করতেন?

লিয়াকত আলী লাকী
হ্যাঁ, আমি থিয়েটার মনে করতাম, পারফর্মিং আর্ট হিসেবে আমি ...

হাসান শাহরিয়ার
না, আমি বলছি এগুলোকে নাটক মনে করতেন কিনা?

লিয়াকত আলী লাকী
নাটক মনে করতাম না, কিন্তু ...

তারিক আনাম খান
আমি মনে করতাম।

হাসান শাহরিয়ার
আপনি কেন নাটক মনে করতেন?

তারিক আনাম খান
থিয়েটার মানেই তো পারফরমেন্স। রাত জেগে যাত্রা শোনা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পালা শোনা, মজমা শোনা, সঙ-এর ঢঙ দেখা, সার্কাস দেখা, সবই পারফরমেন্স। সচেতনভাবে না হলেও অবচেতনে ও-সবই ছিল।

লিয়াকত আলী লাকী
আমার কাছে একটু আলাদা মনে হত, এই কারণে যে, ১৯৬২ সালে আমার বড়ভাইয়েরা প্রসাদ বিশ্বাসের *গাঁয়ের ছবি* ও *পরিণতি* নাটক করলেন, তো সেটা দেখার পর মনে হল এগুলোতে যাত্রার স্টাইলের যেমন প্রভাব আছে, তেমনি সিনেমারও প্রভাব আছে ...

আজাদ আবুল কালাম
কোন শহরের কথা বলছেন?

লিয়াকত আলী লাকী
শহর না, আমার নিজের গ্রাম, নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামের কথা বলছি। সেখানে আমি মুসা আহমেদের সাথে দুটো নাটক করেছি *বৌদির বিয়ে* এবং *অনন্যা*। কিন্তু যাই করি-না কেন ১৯৭২ সালের আমাদের শহরের নাট্যচর্চার যে শুরুটা হল সেটা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিল। কারণ, আগের নাটকের চেয়ে এটা অনেক আধুনিক মনে হল। একটা দৃশ্যের পর আরেকটা দৃশ্য আসছে অথচ পর্দা পড়ছে না। সেট সরানো হচ্ছে, দর্শক একটানা কেবল নাটকই দেখছে। আগে তো মাঝখানে গান দিতে হত, নাচ দিতে হত। এটাকে আধুনিক মনে হয়েছিল। তো পাভেল যে কথাটা দিয়ে শুরু করল যে, আমাদের আগের প্রজন্ম এই ধারাটার প্রবর্তক ... আমি বলব যে এটা ওনারা ঐতিহ্য থেকেই পেয়েছেন। আগে হয়তো অনেক সাজানো-গোছানো ছিল না, অপরিশীলিত ছিল, ওনারা এটাকে পরিশীলিতভাবে উপস্থাপন শুরু করলেন।

মান্নান হীরা
প্রজন্মের কথাটা পাভেল যেটা বলেছে, সেটার ব্যাপারে আমার যেটা অবজার্ভেশন সেটা হল, আমাদের আগের প্রজন্মের কেউ সরাসরি থিয়েটারের লোক নন। স্বাধীনতার পূর্বকালে কেউ ওভাবে থিয়েটার করেননি। নানান কাজের ফাঁকে তাদের কেউ কেউ একটু-আধটু সৌখিন মঞ্চনাটক করতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এঁরা এসে থিয়েটারে জায়গা করে নিয়েছেন। এই যে আলী যাকের ভাই, উনি প্রথম নাটকই করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ... মামুনুর রশীদের লেখা রেডিও নাটক। তো এরকম অনেকেই আছেন কিন্তু এঁদের যেটা সুবিধা ছিল, সেটা শিল্পের নানা শাখার মানুষগুলো এদের বন্ধু ছিল। সবার সাথে এদের মেলামেশা ছিল। কবি, পেইন্টার, গায়ক, আবৃত্তিকার ... এই যোগাযোগগুলো ছিল এবং এদের একটা শিল্পের আড্ডারও পরিমণ্ডল ছিল। কিন্তু আমাদের যে প্রজন্মটা, মানে যেটাকে আমাদের প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত করতে পারি, আমাদের বেলায় দুর্ভাগ্য যে আমরা থিয়েটারের বাইরে কারো সাথে মেলামেশার, আড্ডা দেয়ার সুযোগটা পাইনি। আমাদের ক'জন কবিবন্ধু আছে? ক'জন চিত্রশিল্পী বন্ধু আছে? কিন্তু আজকের যে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, মোস্তাফা মনোয়ার, রফিকুন্নবী, শাহাবুদ্দিন, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক ... এমন অনেক নাম আছে যাদের সাথে ওনাদের নিয়মিত আড্ডা হত।

আজাদ আবুল কালাম
স্বাধীনতার পর কি তাদের এই আড্ডা ছিল?

মান্নান হীরা
কমে গেছে। অনেক কমে গেছে। এবং আমাদের সময় থেকে এমন ধারণা হয়ে গেছে যে, যে থিয়েটার করবে সে কেবল থিয়েটারই করবে।

তারিক আনাম খান
এটা কিন্তু নিয়মিত নাট্যচর্চার একটা নেগেটিভ দিক।

মান্নান হীরা
হ্যাঁ, আমি সেটাই উল্লেখ করতে চাচ্ছি। আমরা একেবারে কনফাইন্ড হয়ে গেলাম থিয়েটারের প্রতি। কবি কনফাইন্ড হয়ে গেলেন কবিতা লেখার প্রতি। পেইন্টার নিজেকে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আটকে ফেললেন। এর সুবিধা হয়তো আছে কিন্তু ...

তারিক আনাম খান
আমরা কিন্তু প্রফেশনালিজম বা নিয়মিত মঞ্চায়ন যখন বলছি তখন কিন্তু ইউরোপকে মাথায় রেখে বলছি ... মানে একটা ফ্রেমের মধ্যে বেঁধে দিচ্ছে তোমার কাজ। তুমি এই এই করবে, এতটুকু করবে ...

মান্নান হীরা
শিল্পের যে ক্রশ ফার্টিলাইজেশন, এটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। এবং স্ব স্ব গণ্ডিটা উৎকর্ষ সাধন করতে থাকল। আজকে থিয়েটারের লোকগুলো যার যার থিয়েটার করে থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করতে চাচ্ছে।

বিপ্লব বালা
কিন্তু যেটা বলা হয় যে, থিয়েটার হল মিক্সড মিডিয়া, সব শিল্পের সমন্বিত মিডিয়া ... সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস এবং আমাদের বলাটা মিলছে না।

আজাদ আবুল কালাম
হীরা ভাই আমি একটু বলছি ... মানে আপনি যেটা বললেন যে, এই সমন্বিত ব্যাপারটা চলে গেল, মানে নাটক যে করে সে কেবল নাটকই করে, তার কোনো কবিবন্ধু নেই, গল্পকার বন্ধু নেই অথবা এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো যে হল ... এই চিন্তাটা বা এই উপলব্ধিটা আপনার ভেতর কবে এসেছে? এখন, না অনেক আগে থেকেই?

মান্নান হীরা
আমি বিগত পাঁচ বছর যাবত এটা অনুভব করি এবং আমি মনে করি যে, কেবল আমাদের মতো নাটকের লোকদের বেলাতেই না– শিল্পের বিভিন্ন শাখার লোকদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ থাকা উচিত। কবিদের সাথে এক-রকম একটি সম্পর্ক কম-বেশি সবার আছে, সেটা দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের কারণে হতে পারে বা সামাজিক আন্দোলনের কারণে হয়তো-বা আছে। আর যতটুকু শেষ অংশ আছে সেটা আমাদের প্রজন্ম পর্যন্ত। আমাদের পরের প্রজন্মের তো এইটুকুও নেই।

লিয়াকত আলী লাকী
আমার মনে হয় হীরা ভাইয়ের কথাটা পুরোপুরি পরের প্রজন্মের বেলায় খাটে। আমাদের প্রজন্মের বেলায় না। আমাদের যোগাযোগটা আছে ... কিন্তু পরের প্রজন্ম শিল্পের অন্যান্য ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। অনেক কমে গেছে।

মান্নান হীরা
আমি আগ্রহের কথা বলছি না।

তারিক আনাম খান
হীরা যেটা বলছে সেটা আগ্রহের কথা না, সেটা ইন্টারেকশনের কথা। আমি আপনি হয়তো রফিক আজাদ, শামসুর রাহমানের বা গুণদা'র বই পড়ছি। কিন্তু তাদের সাথে আড্ডা কিন্তু দিচ্ছি না।

লিয়াকত আলী লাকী
না, আমি মনে করি না যে আমাদের প্রজন্মের কোনো দীনতা আছে।

তারিক আনাম খান
না, দীনতার কথা উঠছে না। বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা কালচার আস্তে আস্তে চলে গেছে। যেটা আগের প্রজন্মের মধ্যে ছিল। সেটা হল ইন্টারেকশন কমে গেছে, বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সাথে জড়িত লোকদের মধ্যে। একটা উদাহরণ দিই ... সেলিম আল দীন হলেন মূলত কবি। সে নাটকে আসার আগে তার পরিচয় ছিল মূলত কবি হিসেবে। তার সঙ্গে আবুল হাসান সহ কত কবির ওঠাবসা ছিল। তো তিনি নাটকে আসার কারণে নাটক সমৃদ্ধ হল। কিন্তু আমরা এখন কি কোনো নাট্যকার পাই যিনি

কবি বা সাহিত্যিক? একমাত্র সৈয়দ শামসুল হক পরবর্তী সময়ে এসেছেন, সেটার আবার অন্য একটা হিসাব আছে।

আজাদ আবুল কালাম

হিসাবটা কী?

তারিক আনাম খান

তিনি একজন বহুমুখি লেখক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র বিস্তর বিষয়ে কাজ করেছেন। ইউরোপের কালচারটাও জানেন। ... তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে ... স্পেনের কথা যদি চিন্তা করি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা ইজ বেসিক্যালি এ পোয়েট, শেক্সপিয়ার ইজ বেসিক্যালি এ পোয়েট। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বেসিক্যালি এ পোয়েট। তো আসলেই তো ইন্টারেকশন না থাকার ফলে আমাদের নাটক বঞ্চিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। সেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা যদি খালেদ চৌধুরীর কথা ভাবি ... পশ্চিমবঙ্গের বা অন্যান্য অনেক জায়গার কথা ভাবি যেখানে তিনি সেট ডিজাইন করতেন ... এখন কিন্তু সেটা নেই। এখন দলে যে থাকে সে-ই সেট ডিজাইন করছে, লাইট ডিজাইন করছে। তো বলছি যে, ইন্টারেকশনটা দরকার ছিল। সেটা আমাদের নিয়মিত নাট্যচর্চার বা প্রফেশনাল থিয়েটার ... এসব মোড়কের কারণে আর এগুতে পারেনি। থিয়েটার নিয়ে যে ভিন্ন চিন্তা করবে, সেই চিন্তাটা আসবে কোত্থেকে? ডাইভারসিটি কমে গেছে।

মান্নান হীরা

এবং সেটা সৃজনশীলতাকেও একটা সংকটের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, মানে নাট্যফর্মে ...

লিয়াকত আলী লাকী

সেটা কেবল নাটককেই দায়ী করছেন কেন? চলচ্চিত্রকেও আপনি টানতে পারেন। সেখানে কি এইসব ইন্টারেকশন আছে?

মান্নান হীরা

না, অবশ্যই নেই। আমরা তো প্রত্যেকটা মাধ্যমের কথাই বলছি। কিন্তু আমার ভাবনা তো আমাকে নিয়েই বেশি হবে তাই না? আজকে কবিতা নাটক ভুলে গেছে। নাটক তো কবিতাই, তাই না? পেস, রিদম এসব তো সংলাপে রাখতে গেলে কবিতা জানতে হবে। আজকে আমি আপনাকে, তারিক ভাইকে যদি প্রশ্ন করি গত ২/৩ বছরে আপনারা ক'জন কবিবন্ধুর সাথে কতটুকু সময় ব্যয় করেছেন? বা ক'জন ভালো গায়ক বন্ধুর সাথে গত ২/৩ বছরে আড্ডা দিয়েছেন?

তারিক আনাম খান
হ্যাঁ, আমি তাদের কবিতা পড়ছি, গান শুনছি, কিন্তু তাদের সাথে বসছি না।

মান্নান হীরা
নির্মলেন্দু গুণের কবিতা পড়া এক জিনিস আর তার সাথে আড্ডা মারা কিন্তু অন্য জিনিস।

লিয়াকত আলী লাকী
না, সেটা হয় কি, যেমন ধরুন সামাজিক একটা সময় আসে, একটা মুভমেন্ট আসে তখন একটা রাজনৈতিক জায়গা তৈরি হয়। স্বাধীনতার আগে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই কিন্তু এসব বন্ধুত্ব তৈরি করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। এবং পরবর্তী জেনারেশনের কবিরা সেই ধারাতেই মুভমেন্ট করল, যেমন রুদ্ররা ... তো সেটার সাথে কিন্তু আমরাও ছিলাম। এবং আমরা সবাই মিলে কিন্তু এরশাদবিরোধী আন্দোলনও করলাম। এভাবে সময়, সমাজই আসলে সব শিল্পীদের মিলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। সেটার জন্য তো আর প্রজন্মকে দায়ী করা যায় না।

আজাদ আবুল কালাম
প্রজন্মের কথাটা তুললাম এই জন্য যে– যাদের হাত ধরে আপনারা নাটকে এলেন, মানে আমি এই নাগরিক নাট্যচর্চার কথাই বলছি, নিয়মিত মঞ্চনাটক মঞ্চায়নের কথাই বলছি ... তো যাদের নেতৃত্বে এলেন, এখনো কিন্তু তারাই নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, সেটা শহীদ মিনারে হোক বা সাংস্কৃতিক জোটের মাধ্যমেই হোক, তাহলে আপনারা নেতৃত্বে আসতে পারলেন না কেন?

বিপ্লব বালা
আসলে এটার, মানে নেতৃত্বদানের কোনো প্রয়োজন বোধ আমরা করিনি। আর ওনারা এখনও যে, যেকোনো আন্দোলন বা ইস্যুতে শহীদ মিনার যান বা জোটের প্রোগ্রাম করেন ... সেটা একটা রুটিনওয়ার্কের মতো হয়ে গেছে তাদের কাছে। কিন্তু আমাদের কাছে নেতৃত্ব দেয়া ... এসব কিছু আমাদের হয়তো-বা টানেনি।

তারিক আনাম খান

আসলে আমাদের কাছে নেতৃত্ব ব্যাপারটা অর্থহীন ঠেকে। মানে থিয়েটার করাটা আমাদের কাছে বেশি জরুরি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রথমে যারা শুরু করেছেন, তারা কিন্তু নাট্যকর্মী না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারতেন। এবং আমরা দেখেছিও যে একেকজন একেক ব্যবসা নিয়ে পাশাপাশি নাটক করে গেছেন। কিন্তু আমাদের প্রজন্ম নাটক করবার জন্যই মাঠে নেমেছিলাম। নইলে নাটক পড়তে বাইরে যাব কেন? সুতরাং আমার মনে হয় নেতৃত্ব আমাদের তেমনভাবে টানেনি।

বিপ্লব বালা

ওনারা কিন্তু তারণ্যের শক্তি কাজে লাগিয়ে থিয়েটার করেছেন, কিন্তু যখন তরুণদের জীবিকার প্রশ্ন আসল, তখনই খটকাটা লাগল। মানে আমরা ধরে নিয়েছিলাম নাটকই করব, কিন্তু জীবিকার ব্যাপারটা কীভাবে মেটাব সে-প্রশ্ন যখন সামনে এল তখন কিন্তু আমরা আবার একা হয়ে গেলাম। কারণ, একসাথে থিয়েটার করলেও মূলত আমরা বিচ্ছিন্নই ছিলাম।

আমরা যারা থিয়েটারে আসলাম, তারা মূলত কারা? নিশ্চয়ই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা বেশি হলে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। আবার দেশের যেকোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় কারা? এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তরাই, তাই না। ফলে হয়েছে কী, আমরা যখন নাটক শুরু করি তখন কিন্তু স্বাধীন দেশ হলেও পরিস্থিতি ছিল রিএ্যাক্ট করার মতো। অর্থাৎ আগের প্রজন্ম বলে থাকে যে স্বাধীনতার পর তাদের কাছে মনে হয়েছে স্বাধীন দেশে থিয়েটার করবে। সেটা তাদের উত্তেজনা। কিন্তু আমরা যখন শুরু করি তখন কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা রিএ্যাক্ট করবার মতো। এবং তখন সচেতনভাবে কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আমাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্যও একটা প্লাটফর্ম দরকার, এবং হয়তো-বা ঐ ধরনের স্ফুরণ থেকেই আমরা ঢুকে পড়ি থিয়েটারে। কারণ, একসময় আমরা তো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সিম্বলিক স্বৈরাচারবিরোধী নাটক করেছি, নকশালপন্থী আন্দোলনও করেছি ... তো জীবিকার ব্যাপারটা আমরাও ঐভাবে মাথায় রাখিনি। ভেবেছিলাম একটা কিছু হয়ে যাবে।

বিপ্লব বালা

আপনি যে রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বললেন, সেই বিশ্বাস কি এখনও আছে?

তারিক আনাম খান

হ্যাঁ, এখনো আছে, সেটা মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছে। কমেডি নাটক হোক কিংবা সিরিয়াস নাটক হোক, একটা স্রোত থাকে যা সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ... এমনকি

যদি মলিয়রের কমেডিও হয়, যোগাযোগটা কিন্তু আজকের সমাজের সঙ্গে হতে হবে। তা না হলে জনগণের পার্টিসিপেশনটা হয় না। আমার স্থির বিশ্বাস এই ভারতীয় উপমহাদেশে থিয়েটার ভীষণভাবে রাজনীতিনির্ভর ...

বিপ্লব বালা

সেই রাজনীতিটা তো ভীষণভাবে শূন্য হয়ে গেছে ... এই রাজনীতির কোনো মানে নেই এখন, তার ফলে আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে কিনা?

তারিক আনাম খান

হ্যাঁ, একসময় তো সে-কারণেই আমরাও জীবিকার সন্ধান করতে থাকলাম। এবং কেমন যেন বঞ্চনার ভেতর পড়ে গেলাম। কেবল থিয়েটারই করব এই জায়গা থেকে সরে গেলাম। ফলে আমাদের পড়াশোনা-মেধা কোনো কিছুই আর থিয়েটারের পেছনে ব্যয় করতে পারলাম না। কিন্তু এখনকার ছেলে-মেয়েদের সেই বঞ্চনার জায়গাগুলো কমে গেছে। এখন ওদের মাথায় দুটোই থাকে। থিয়েটারও করবে, টেলিভিশন নাটকও করবে। আবার একের পর এক চ্যানেল বাড়ছে, সুতরাং ওদের চাহিদা কিন্তু তৈরি হয়েই আছে। ফলে থিয়েটারকে কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সেদিকে কিন্তু তারা আর সময় দেবে না। আমরাও কিন্তু জীবিকার জন্য অন্য কিছু করেছি, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনায় এমনটা ছিল না। ফলে নিজেদেরকে কিন্তু বঞ্চিত মনে হয়।

বিপ্লব বালা

হ্যাঁ, এখন সংকট তো কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে, মানে নিজেকে বাঁচতে হবে, নিজের জন্যই সব ভাবনা ... ফলে একটা কিছু করব, পাল্টাব এই ব্যাপারটা তো থাকছে না।

তারিক আনাম খান

সেটা আমরা আশাও করতে পারি না।

লিয়াকত আলী লাকী

এটা পৃথিবীর সব দেশে সবসময়ই আসে যে, একটা আবেগ থাকে কিন্তু সেটা বেশিদিন থাকে না। পাভেল যে বিষয়টা নিয়ে শুরু করেছিল যে, যারা প্রথম প্রজন্মের ব্যক্তি ছিলেন তারা এখনো একটিভ আছেন, এবং ৫/৭ জন স্ব স্ব দল চালাচ্ছেন এবং এখনো তারা সৃজনশীল ... কিন্তু আমি বলব, এটা কেবল ঢাকাতে কিছুটা দেখা যাচ্ছে। চট্টগ্রামে তো তাদের প্রজন্মের কেউ ছিল না। আজকে ৩৪ বছর পর যদি দেখি, তাহলে কী দেখি ... এই মঞ্চটা আলোকিত করে রেখেছে কারা? এই যে প্রায় ৩০০টি নাট্যদল আছে তার মধ্যে ১০০টি তো অবশ্যই সিরিয়াসলি নাটক করে, আর বাকি ২০০টি

ধরলাম কম করে, কম জানে কিন্তু এই যে '৭২ সালের পর থেকে নাটককে প্রসারিত করা এবং বাইরের সঙ্গে, মানে আন্তর্জাতিক আবহের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ...

বিপ্লব বালা
এই যে কথাটা বললেন– আন্তর্জাতিক আবহের সাথে সুর মিলিয়ে ... এর মানে কী? আমরা এর সাথে মেলাব মানে, আমরা জানি কি যে আন্তর্জাতিক প্রবাহ কী? এটা একদম ফাঁকা কথা ।

লিয়াকত আলী লাকী
না, ফাঁকা না ।

বিপ্লব বালা
তাহলে আমরা যদি বলি যে– আন্তর্জাতিক থিয়েটারের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, এই বিষয়টা কী?

লিয়াকত আলী লাকী
তাল মিলিয়ে মানে ... একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জানাশোনা আমাদের আছে ... আমরা জানি আমেরিকায় কেমন থিয়েটার হয়, ইংল্যান্ডে কেমন থিয়েটার হয়, আমরা আন্ত র্জাতিক সেমিনারগুলো সম্বন্ধে জানি, সেখানে আমরা প্রতিনিধিত্বও করি ... সেখান থেকে বলতে চাই যে– আন্তর্জাতিক নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আছে এবং সেখান থেকেই আমরা নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি । এখন বলতে পারেন যে সংকট আছে ... হ্যাঁ, সংকট তো আছেই কিন্তু এরই মধ্যে কিন্তু থিয়েটার প্রসারিতও হচ্ছে । বিপ্লব দা যেটা ভাবছেন সেটা কিন্তু একেবারেই সমসাময়িক সমস্যা । এবং সঙ্গত কারণেই যখন আমরা গ্রুপ থিয়েটার বলি, তখন এটা এ্যামেচার হবে সেটা ধরে নিতেই হবে । তারপরও আমরা যে পরিমাণ প্রফেশনাল, কাজের ব্যাপারে, সিরিয়াসনেসের ব্যাপারে সেটাও কিন্তু কম না । আমরা তাহলে কীভাবে চলি? এটার জন্য আমরা কেউ কেউ আয়ের উৎস খুঁজে নিয়েছি, ইদানিং আবার টিভি মিডিয়াতে কাজ করেও আয় হচ্ছে ... কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কিন্তু থিয়েটার করা । বিশ্বের সব ভালো থিয়েটারই কিন্তু সাবসিডাইজড, সে অর্থে আমাদের এখানে আমরা সাবসিডাইজড করে নিয়েছি, মানে নিজেরা আয় করে তা দিয়ে থিয়েটার চালাচ্ছি । যেমন তারিক ভাইয়ের এ্যাড ফার্ম আছে এবং মিডিয়াতে নাটক করে, পাভেল করে ... সেই টাকা দিয়ে ওরা থিয়েটার করে ।

হাসান শাহরিয়ার

এটা কি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ না? মানে এভাবে কি সবার করা সম্ভব? আর যদি সম্ভব হয় তাহলে কি থিয়েটারে সময় দিতে পারবে?

বিপ্লব বালা

অর্থাৎ থিয়েটারকে ভালো করতে হলে থিয়েটারটাকে পাল্টাতে হবে। সেই পাল্টানোতে তো সময় দিতে হবে থিয়েটারে। বাইরে আয় করতে তার সময় দিতে হয় না? তাহলে সে থিয়েটার নিয়ে কী ভাববে? কেবল নাটক নামানো মানেই তো থিয়েটার না, তাই না?

লিয়াকত আলী লাকী

হ্যাঁ, এ জন্যই আমাদের মধ্যে অনেকেই থিয়েটার করে যাচ্ছে। এভাবে থিয়েটার এগুচ্ছে না, তা বলতে আমি রাজি না, কিন্তু আরো এগুতে গেলে, এই যে সাবসিডির কথা বললাম, সেই সাবসিডিটা বাইরে থেকে আসতে হবে। হয় সরকার দেবে না হয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেবে। এই যে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা করেছে, এটাকে আমি মাইলফলক হিসেবে দেখি। এ-রকম পৃষ্ঠপোষক আমাদের অনেক প্রয়োজন। তাহলে যারা ভালো থিয়েটার করতে চায়, থিয়েটার নিয়ে ভাবতে চায়, তাদের অন্য জায়গায় বা অন্য প্রফেশনে যেতে হবে না। সারা বিশ্বে এ্যামেচার থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছে সরকার। সেখানে কালচারাল মিনিস্ট্রি বলেই দেয় যে– আপনারা থিয়েটারের উপর প্রজেক্ট দিন, আমরা ফান্ড দেব। কিন্তু আমাদের দেশটা এরকম না। আমাদের দেশে এই খাতে তেমন কোনো বাজেট নাই। সরকারকে বলা হয়েছিল যে– সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট বাড়াতে হবে, তো অর্থমন্ত্রী বলেছেন– আমি বাঁশি বাজানোর জন্য টাকা দিতে পারব না। যার কাছে সংস্কৃতি মানে হল কেবল বাঁশি বাজানো, সেখানে আর কী বলার থাকে!

হাসান শাহরিয়ার

তার মানে আপনি যে বললেন আপনারা কোনো না কোনোভাবে অন্য জায়গার আয় এখানে ব্যয় করেন বা সাবসিডি দেন, এটা কি সারা বাংলাদেশের দ্বারা সম্ভব? ঢাকার বাইরের শহরে কি মিডিয়া আছে না এ্যাড ফার্ম আছে? ওরা কীভাবে থিয়েটারকে বাঁচাবে?

লিয়াকত আলী লাকী

আমি মনে করি সংকটটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজা উচিত। তারিক ভাই যে বললেন যে– আমরা যখন থিয়েটারে আসি তখন– দেশপ্রেম, কমিটমেন্ট,

বাঙালি জাতি ... এসব শব্দগুলো আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছিল। আমরা আসলেই শব্দগুলো দিয়ে তা-ই মিন করতাম। কিন্তু এখন সেটা নেই।

আজাদ আবুল কালাম

না, আমাদের কারো হাতেই কিন্তু এখন থিয়েটারের জন্য সময় নাই। মানে বিপ্লব দা' যেটা বলছিলেন যে থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে সেখানে কিছু বাড়তি সময় দিতে হবে, কিন্তু বাড়তি সময়গুলো আমাদের হাতে নাই। তো আমি জানতে চাচ্ছি যে, প্রথম জেনারেশান যখন প্রফেশনালিজমের কিছু বের করতে পারল না, এবং আপনারা এসেছিলেন কেবল থিয়েটার করতেই ... তো আপনারা সাবসিডি বলেন আর প্রফেশনাল হওয়াই বলেন, এটার জন্য বড় কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বা আদৌ নিয়েছিলেন কিনা? সরকারের সাথে বড় কোনো মুভমেন্টে যাওয়া বা বিদেশি বড় কোনো ফান্ড জোগাড় করা? নাকি নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে বেশি ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন?

হাসান শাহরিয়ার

বিদেশি ফান্ড মানে, সব দলের যেন কাজে লাগে সেরকম ফান্ড। আমরা দেখেছি বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো অনেকেই ফান্ড জোগাড় করতে পেরেছেন কিন্তু তা আমাদের থিয়েটার মুভমেন্টের কাজে লাগবার মতো না। সবার জন্য কিছু করার চেষ্টা কি হয়েছিল?

লিয়াকত আলী লাকী

আমি জানি এখানে যারা আছি তাদের জন্মই হয়েছে নাটক করতে এবং থিয়েটারটা করেই যদি তারা বেঁচে থাকতে পারত, তাহলেই তাদের স্বপ্ন পূরণ হত। এবং সেটা হচ্ছে না বলে কিন্তু একধরনের ক্ষোভ তাদের আছে। আমি জানি বিপ্লব বালাকে, তারিক আনামকে, মান্নান হীরাকে বা তোমরাও আছ ... আমি এক্সক্লুসিভলি থিয়েটারের উপর পড়াশোনা করিনি, তারপরও আমি থিয়েটার করেই বেঁচে থাকতে পারলেই খুশি হতাম। আমাদের দেশে ৩৪ বছর গণতন্ত্রের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়ে যখন তথাকথিত গণতন্ত্র পেলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, থিয়েটারের পক্ষে আমরা কী চাই। আমরা চেয়েছি থিয়েটারকে একটা প্রফেশনাল জায়গায় নেবার জন্য সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে। কিন্তু সেটা কে করবে? দলগুলো একা একা করবে? আমরা দেখেছি কেউ কেউ একা একা প্রফেশনাল দল তৈরির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেগুলো কি প্রফেশনাল হয়েছিল? কে না চায় যে যদি থিয়েটার করেই ইনকাম হত তাহলে থিয়েটারটাই করতে?

মান্নান হীরা

লাকী ভাই যে কথাটা বললেন যে, আমরা থিয়েটার করে বেঁচে থাকতে চাই বা যারা অন্য কাজের সাথে যুক্ত তারা থিয়েটার করে বেঁচে থাকলে অন্য কাজ করতাম না ... এই কথাটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। যে লোকটি থিয়েটার করে বেঁচে থাকতে চায় তার জীবনের ইকোনোমিক্সটা কী? কত টাকা হলে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন বা পারতেন? এখন কত আয় করেন? এই দুয়ের মধ্যে ডিফারেন্স কত?

তারিক আনাম খান

পাশাপাশি আমি এটা বলি বিশ্বরূপা, রঙ্গনা, স্টার, মিনার্ভা ... কোলকাতায় তারা কিন্তু প্রফেশনাল থিয়েটার করত। সপ্তাহে ৫ দিন। আমি ব্রডওয়ে-র কথা ধরে বলি, যেখানে সবচেয়ে বেশি পয়সা আছে, তো সেখানে ম্যাক্সিমামটা হল সাবসিডি। ইংল্যান্ডের রয়েল শেক্সপিয়র কোম্পানি থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার হচ্ছে সাবসিডাইজড। আপনি প্রফেশনাল থিয়েটার বলতে বোঝাচ্ছেন যে, বাইরের কোনো ডোনার বলবে– তোমরা থিয়েটার কর, আমি টাকা দেব? আর টাকা দিলেই-বা কি? প্রফেশনালিজম যদি ডেভেলপ করতে চান, তখন ডিরেক্টর, এক্টর সবার স্বাধীনতাকে আপনার মেনে নিতে হবে। ব্রডওয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে কোম্পানির কন্ট্রাক্ট হচ্ছে। একবছর, দুবছর ... তো যখনই তাদের হলিউড থেকে ডাক আসে তখন কিন্তু তারা বলে দেয় যে– এবছরের পর আর আমি নেই, চলে যাব। তারপর আরো বলা যায় এন.এস.ডি-র ব্যাপারে, এন.এস.ডি থেকে পাশ করা অনেকেই বোম্বে ফিল্মে চলে গেছে। কেন? কারণ সে বড় কাজ করতে চায়। প্রফেশনালিজম আর আবেগ দুটোই থাকবে থিয়েটারে এমন হবে না। ফলে আপনাকে যদি তখন নাটক করতে হয় ৪/৫ জন নিয়ে করতে হবে, ৩০/৩৫ জন নিয়ে পারবেন না। তারা কেন আপনার পেছনে সময় দেবে? তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সে ভালো পারফরমেন্স করবে এবং সেটার পুরস্কার চাইবে। এটা দোষের কিছু না।

লিয়াকত আলী লাকী

মান্নান হীরা, আপনি, পাভেল এখনো নাটক করছেন ... মাসে আপনার কত টাকা লাগবে সেটা বড় কথা না, আমি বলছি যেটা আপনারা মিডিয়া থেকে পাচ্ছেন, সেই ফিডব্যাকটা যদি থিয়েটার থেকে পাওয়া যেত? এই যে ৩৪ বছর পর একটা জাতীয় নাট্যশালা হল, তারপর চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগ হয়েছে, সেখানে যারা চাকরি করছেন, তারা তো প্রফেশনাল, নাকি? সেখান থেকে প্রতিবছর যারা পাশ করে বেরুচ্ছে তারা থিয়েটারের আশেপাশে থেকেই বেঁচে থাকবে, এবং এটাতো সত্য, থিয়েটার তার জায়গা করেই নেবে। থিয়েটার কখনো মরবে না। আমি মনে করি যদি

সরকারকে চাপে ফেলা যায় বা বড় বড় কোম্পানিকে চাপে ফেলা যায় যে ভালো কাজ করলে তারা ফান্ড দেবে, তাহলে কিছুটা প্রফেশনালিজম হয়তো-বা আসবে।

তারিক আনাম খান

পাভেল যে বললে আমাদের সময় কমে গেছে ... সেটা কেন জান? সেটা হল আমরা আমাদের চাওয়াটা বড় করে ফেলেছি। আজকে মিডিয়াতে যাচ্ছি এম্বিশন নিয়ে এবং এম্বিশন ক্রিয়েটিভ না, ইনকাম করার এম্বিশন। তা না হলে এই এইযে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছে টিভি মিডিয়ায়, কতজন দর্শক সেগুলো দেখছে? কয়টা কাজ হচ্ছে মিনিমাম মানসম্মত? হচ্ছে না। তার মানে সেখানেও প্রফেশনালিজম তৈরি হয়নি। আমার অভিনয়ের যে ক্ষুধা, সেটা সেখানেও মেটাতে পারছি না।

বিপ্লব বালা

অভিনেতার মধ্যে ক্ষুধা তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকছে কি মঞ্চে?

তারিক আনাম খান

ঐ যে, যদি সময় কম দেয়া হয় তাহলে হবে না। আমরা করেছি, আমাদের পরেও অনেকে করেছে, সেটা হল কত দূর থেকে হেঁটে হেঁটে রিহার্সেলে এসেছি। কেন? থিয়েটার করব বলে। এখনো অনেকে হেঁটে হেঁটে আসে। কেন? টিভি মিডিয়ায় কাজ করবে বলে।

মান্নান হীরা

অর্থ পাবে টিভিতে আর ট্রেনিংটা নেবে মঞ্চে। মঞ্চটাকে ইউজ করছে।

তারিক আনাম খান

আমি এমনও কয়েকটা দল সম্পর্কে জানি যে তারা বলছে– টিভি নাটক বা সিরিয়াল না ধরলে তারা দল টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

মান্নান হীরা

অনেক দল থেকে বলা হয় যে, আমার দলের কিছু কিছু ছেলে-মেয়েকে কাজ দিন, নইলে দল টেকানো যাচ্ছে না। এটাই কিন্তু বাস্তবতা।

লিয়াকত আলী লাকী

আমরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসেছি, আমি একজন সংগঠক হিসেবে বলছি যে– একটা সময় ছিল, দলে সদস্য নেব, সেখানে ৩০০/৪০০ আবেদন পড়ছে। এখন ১০০

আবেদনও পাই না। এবং এরা আবার খবর রাখে এই দলে গেলে মিডিয়ার কী কী সুবিধা পাবে। এখন এমনও হচ্ছে যে– কোনো নাটকে কেউ-একজন কাজ করছে, কাজ করার সময়েই সে অন্য দলে চলে যাচ্ছে। আমার নাটক সিদ্ধিদাতা, এই নাটকে একটা মেয়ে অভিনয় করত। হুট করেই সে অন্য দলে চলে গেল। তাই বলছি আমার মনে হয় সামনে এমন সময় আসবে, যার কাছে পুঁজি আছে সে-ই থিয়েটার দল চালাবে। পুঁজি দিয়ে প্যাকেজ নাটক বানাবে এবং ছেলেপেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার দলে কাজ করার জন্য। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। হবে কেবল প্যাকেজ নাটক। আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎটা। মানে আমি যদি দল টেকানোর জন্য প্যাকেজ নাটক না বানাই তাহলে আমাকে অথর্ব বলবে। কী ভয়ঙ্কর ভেবে দেখেন! দর্শক এসে বলবে টিভি-র কে কে আছে এই নাটকে?

হাসান শাহরিয়ার

যদি কেউ থিয়েটার করতেও চায়, তাহলে থিয়েটার কি তার সময়টার প্রপার ব্যবহার করতে পারবে? মানে মাসে যদি তিন-চারটা নাটকের তিন-চারটা ক'রে শো কোনো দল করতে চায়-ও তাহলে এটা কি সেই দলের পক্ষে সম্ভব? আমি মঞ্চ-সমস্যার কথা বলছি। আপনি বললেন ৩৪ বছর পর শিল্পকলার বিরাট মঞ্চ হয়েছে, এটাই কি যথেষ্ট?

লিয়াকত আলী লাকী

নিশ্চয়ই না। ঢাকা শহরে একটা সমস্যা হল মহিলা সমিতি বা শিল্পকলা একাডেমীর মঞ্চ ছাড়া আর কোনো হল নেই। তা-ও আবার মূল হলটি ব্যবহার করা সম্ভব না আর্থিক কারণে। গাইড হাউজ বন্ধ হয়ে আছে, পাবলিক লাইব্রেরিও তা-ই। তাহলে নাটকটা হবে কোথায়? লন্ডনে এক রাতে ৫০ থেকে ৬০ টি স্থানে নাটক হয়।

তারিক আনাম খান

তার মানে ভুলটা কোথায় হয়েছে? আপনি মূল জায়গায় আসুন, কেন হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কে? আমরা দর্শক কেন টানতে পারিনি বা কেন বাড়েনি দর্শক? ভুলটা কোথায়?

আজাদ আবুল কালাম

একটা ভুল আমার কাছে মনে হয় যে, লাকী ভাই আন্তর্জাতিক মানের কথা বলেছিলেন ... আমি বলব আমরা কি আমাদেরই আগের প্রযোজনার সাথে প্রতিযোগিতায় পারছি? ভালো নাটক না হলে কি দর্শক বাড়বে?

লিয়াকত আলী লাকী
আমি মনে করি আমরা এখনো ভালো থিয়েটার করি। কিন্তু মহিলা সমিতিতে বসে আপনি ক'জন দর্শক টানতে পারবেন? উন্নত দেশে সরকারই নাটকের দর্শক তৈরি করে দেয়। আমাদের এখানে রাষ্ট্র আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। এর জন্য তো নাট্যদলগুলো দোষারোপ করলে চলবে না। আমি যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর কথা বললাম, তারা একটা ব্যান্ড শো করতে ২৫ লক্ষ টাকা দেবে কিন্তু থিয়েটারের বেলায় দেবে না।

তারিক আনাম খান
আপনাকে কেন দেবে, বলুন তো? ওরা ব্যান্ড শো করে পাবলিসিটি পাচ্ছে, ক্লোজ-আপ ওয়ান করে তরুণ প্রজন্মকে টানতে পারছে। আপনাকে ইকোনোমিক্সটা বুঝতে হবে, তারা কেন টাকা দেবে আপনাকে?

লিয়াকত আলী লাকী
কেন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ১৩ লক্ষ টাকা দিয়ে মহিলা সমিতি এয়ারকন্ডিশানড করে দেয়নি? নিয়মিত তারা ১৩ লক্ষ টাকা দিচ্ছে না?

আজাদ আবুল কালাম
এটা তো একসেপশনাল। এটা তো উদাহরণ হতে পারে না।

তারিক আনাম খান
আর উদাহরণ হলেই-বা কী? এখন এ/সি করার কারণে হলভাড়া দিচ্ছি ৪০২৫ টাকা। বিজ্ঞাপন, ঠেলা-গাড়ি, লাইট সব মিলিয়ে প্রত্যেকের প্রডাকশন খরচ ৭-৮ হাজার টাকা। দর্শক হচ্ছে ৫০-৬০ জন। তার মানে কী হল?

হাসান শাহরিয়ার
বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এ/সি-র বাতাস কিন্তু আমার গায়ে লাগছে না। বরং খরচের পর গরম আরো বেড়ে যাচ্ছে।

লিয়াকত আলী লাকী
আমি মনে করি এটা রাজনৈতিক কারণ। আমরা আপার মিডল ক্লাশ দর্শক হারিয়েছি। ৭০ দশকে আমরা নাটক দেখতে আসতাম গাড়ি নিয়ে। ৪০-৫০ টা গাড়ি এসে ভিড়ত এই মহিলা সমিতির সামনে। এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এখন এভাবে পার্কিং করা

সম্ভব? তো যে গাড়ি নিয়ে আসবে সে কোথায় গাড়ি রেখে এসে নাটক দেখবে। এভাবে আমরা আপার মিডল বা মিডল ক্লাশ দর্শক হারিয়েছি। সেটা স্বীকার করতে হবে।

মান্নান হীরা

গাড়ি পার্কিং সমস্যা হতে পারে কিন্তু বড় সমস্যা থিয়েটার দেখার সংস্কৃতি তৈরি করতে পারিনি। এখানে বাঙালি মুসলমানদের এই ঐতিহ্য নাই যে, তারা থিয়েটার দেখবে। আগরতলায় বা কোলকাতায় যারা নাটক দেখতে আসে তারা দুপুরবেলা এসে বুড়োবুড়ি অডিটোরিয়ামের বাইরে বসে বাদাম খাচ্ছে ... আর আমাদের এখানে বেইলি রোডের ফ্ল্যাটগুলোতে খবর নিয়ে দেখুন তো কেউ কোনো দিন থিয়েটার দেখেছে কিনা? এই শান্তিনগর, মগবাজার, বেইলি রোড সব কিন্তু আবাসিক এলাকা।

তারিক আনাম খান

এটার জন্য গবেষণার দরকার হয়। নাটক করে যাব আর দর্শক দেখতে আসবে এটা হয় না। এখানেও একটা মার্কেটিং-এর ব্যাপার আছে। আমি শাহরিয়ারকে বলেছিলাম যে দর্শক কীভাবে খবর পায় যে আজ নাটক আছে, সেটা বের করতে হবে। আন্দাজে বললে হবে না যে, ইত্তেফাকে বিজ্ঞাপন দিলে দর্শক বেশি হয় বা এখন প্রথম আলোতে দিলে বেশি হয়। আমাদের যারা নাটক দেখতে আসে তাদের উপর রিসার্চ হতে হবে যে– আপনি কীভাবে খবর পেয়েছেন, বা আর কী করলে আপনি আরো সহজে খবরটা পাবেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি। নাটক আবেগ দিয়েই অনেক দূর এসেছিল, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা যদি আমরা চাই তা হলে কিছু কিছু গবেষণা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেটা কে করবে? দর্শককে যদি বুঝতে চেষ্টা না করি তাহলে কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। এবং পড়েছি-ও। এখন থিয়েটারে রাজনীতিটা বেড়ে গেছে। যতটুকু এগিয়েছে থিয়েটার, সেখানে রেখেই এখন কেবল রাজনীতি করতে চায় থিয়েটার নিয়ে। হয়তো কেউ কেউ মাইন্ড করবেন, তবুও বলি আজকে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যেই উত্তেজনা দেখি, অন্য কোনো নাটকের বেলায় কিন্তু তা দেখি না।

আজাদ আবুল কালাম

হ্যাঁ, কোনো বিখ্যাত নাটকের প্রিমিয়ার শো-তেও কিন্তু নিস্তেজ আবহ দেখি।

তারিক আনাম খান

ফেডারেশন অনেক ব্যাপারে ইনভলব হয়ে যাচ্ছে। এমনকি জাতীয় রাজনীতির সাথেও ইনভলব হয়ে যাচ্ছে।

লিয়াকত আলী লাকী

'৮০-র দশকে নতুন নাটক আসলে মনে হত যে আমার একটি নাটক এসেছে, প্রথম শো থেকে প্রায় ২৫ টা শো পর্যন্ত ১৫/২০ জন নিয়মিত নাট্যকর্মীকে সবসময় পেতাম। আসলে সত্যি কথাই, গবেষণার প্রয়োজন, জরিপ করার প্রয়োজন আছে।

তারিক আনাম খান

আপনি ফেডারেশনে আছেন, আপনি করেননি কেন? নাকি আপনারা রাজনীতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন? একটা ফেডারেশন কোনো গবেষণা করল না যে, দর্শক কেন কমছে বা দর্শক কী চায় বা কী করলে দর্শকের কাছে নাটকের সংবাদটা যাবে– কোনো জরিপ করতে পারলেন না? আমার মনে হয় *থিয়েটারওয়ালা*-ও করতে পারে। যদিও এখানে গবেষণা করতে হয়তো অর্থেরও প্রয়োজন হতে পারে। সেটা যদি *থিয়েটারওয়ালা* ম্যানেজ করতে পারে ...

লিয়াকত আলী লাকী

আমরা কেবল রাজনীতি নিয়ে ছিলাম, এটা মানতে আমি রাজি না। আমরা অনেক কাজ করেছি। অনেক অনুদানের ব্যবস্থা করেছি, নাট্যকার তৈরির কর্মশালার আয়োজন করেছি। ঢাকার বাইরে গিয়ে নাটক নির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ঢাকার বাইরের প্রযোজনা যেন ঢাকায় হতে পারে, প্রতি মাসে অন্তত একটি, সেটির ব্যবস্থা করেছি। তবে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই স্বীকার করছি দর্শকের ব্যাপারে একটা গবেষণা হওয়া দরকার। আজকে গুলশান-বনানী এলাকাতে কোনো হল নাই ... হয়তো বলবেন তাতে কী হল ...

তারিক আনাম খান

না, কেন বলব? অবশ্যই থাকলে ভালো হত। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে যেতে পারছি না, অথচ যাদের বাজারের হিসাব করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত তাদেরকে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি। আমাদের এখানে টাকাওয়ালারা নাটক দেখে না, প্রবীণরা নাটক দেখেন না, দেখে হল ইয়াং ছাত্র-ছাত্রী বা থিয়েটারকর্মী যাদের কোনো আয় নেই। এটা কিছু হল? আমি নাটকে ঠিক বলি বা ভুল বলি, যাদেরকে বলি বা যাদের মাধ্যমে বলি, তাদেরকে তো থিয়েটার দেখতে আনতেই পারছি না। আমি কোলকাতাতে দেখেছি, ব্রডওয়েতে দেখেছি, নাটকের আগে খুব হৈচৈ, কিন্তু যেই নাটক শুরু হলো পিনপতন নীরবতা। নাটকের সময় কাশলে পর্যন্ত অন্যরা বাঁকা চোখে তাকায়, তাকে তিরস্কার করে। মানে হল, নাটকের দর্শককে কালচার জানতে হয়। হাতে-পায়ে ধরে এনে নাটক দেখালে সে সম্মান নাটককে করবে না।

হাসান শাহরিয়ার

হ্যাঁ, সে জন্যই গত ৩৪ বছরে হলের ভেতর বাদাম বা চিপস খাওয়া বন্ধ করতে পারিনি। আর গত ৫-৬ বছর ধরে তো মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতে বলে পায়ে ধরেও কাজ হচ্ছে না। ওরা তো নাটক দেখতে আসে না, আপনাকে করুণা করতে আসে। সেজন্য হলের ভেতরেও তার ব্যস্ততা শেষ হয় না।

তারিক আনাম খান

একটু সময় নিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে চারদিক দিয়েই আমরা খুব বিপর্যয়ের মধ্যে আছি। আরো বিপর্যয়ের দিকেই যাচ্ছি। আমরা রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে বিতাড়িত হয়েছি, আমরা বিভাজিত হয়েছি বার বার।

আজাদ আবুল কালাম

দর্শকের প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, আমরা যারা মঞ্চে যাচ্ছি, আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা যে খরচ করতে পারবে, সে-ই আমাদের দর্শক হবে। কিন্তু আমরা যখন পথনাটক করি, পথনাটকে কিন্তু একটা সময় আমরা অভ্যস্ত হয়েছিলাম ... তো আমরা শহীদ মিনারে পথনাটক করবার সময় শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। নাটকের মধ্যে যখন গামছা পেতে টাকা তুলি তখন দেখা যায় যে ১০০০/১২০০ টাকা উঠে আসে। অর্থাৎ পথনাটকের জন্য ওই টাকা যথেষ্ট এবং ওই পরিমাণ টাকা উঠবেও, কিন্তু মঞ্চনাটক করতে হচ্ছে লস দিয়ে। এটা কেন?

মান্নান হীরা

ঐ যে বললাম, থিয়েটার দেখার অভ্যাসটা গড়ে উঠছে না, বা গড়ে তুলতে পারিনি। তুমি যেটা বললে যে পথনাটকে শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ... তো সেটা কিন্তু এক ধরনের প্রিপারেশন, দেখা যায় নাটক দেখে আর বাদাম খায়। কিন্তু যে অর্থে নাগরিক নাট্যচর্চাটা শুরু হয়েছিল, সেটা কিন্তু মঞ্চে নাটক করবার জন্য। সুতরাং দর্শক সেটা দেখার জন্য প্রিপেয়ার্ড কিনা সেটা জরুরি।

লিয়াকত আলী লাকী

আসলে তারিক ভাইয়ের কথা ধরেই বলতে হয় যে, দর্শকের উপর বা তাদের রুচি, আচরণের উপর গবেষণাটা জরুরি। আমরা প্রচারণা চালিয়েছিলাম, শ্লোগান দিয়ে যে– মঞ্চে নাটক দেখুন। কিন্তু আসলে গত সময়টা রাজনৈতিকভাবে যে অস্থিরতা গেল এবং যে নির্যাতন দিয়ে সরকার তার যাত্রা শুরু করল ... আপনারা জানেন ফরিদপুরের ৩৩ জন নাট্যকর্মীর জেল খাটতে হয়েছিল এবং ৩ জন মহিলা নাট্যকর্মীর উপর ...

আজাদ আবুল কালাম

হ্যাঁ, সারা দেশের মানুষ সেটা জানতে পেরেছে, কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলোর একটা ফোরাম আছে, পথনাটকের একটা ফোরাম আছে, তার মাধ্যমে কিন্তু ৫০ জন লোকও সেখানে যেতে পারিনি।

লিয়াকত আলী লাকী

আমরা যেটা করেছি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মাধ্যমে আইনি লড়াই করেছি। তাদের জামিন করিয়েছি। তবে এখানে আমাদের যে ইফেক্টিভ রোল প্লে করা উচিত ছিল, সেটা করিনি।

মান্নান হীরা

তবে এটাও বুঝতে হবে সরকার যদি আমাদের সরাসরি নাটকবিরোধী হয়, তাহলে সেটা সামলানো মুশকিল হয়। কিন্তু আমরা বরাবরই নাটকবিরোধী সরকারই পেয়েছি, কম বা বেশি।

লিয়াকত আলী লাকী

আজ যে জাতীয় নাট্যশালা হয়েছে, এর স্বরূপটা কী? এর চিন্তাটা কার? কাদের? নিশ্চয়ই আমাদের সবার, কিন্তু কোনো সরকারেরই না। তা না হলে, প্রথম দিনেই আমরা দাবি তুললাম যে, মূল হলটির ভাড়া ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে, তা না করে এখন বরং নিচে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট বসানো হয়েছে। জাতীয় নাট্যশালার পরিবেশটাই তো নষ্ট হয়ে গেল। সবকিছুতেই পরিবেশ লাগে তাই না?

মান্নান হীরা

মহিলা সমিতিতে এখন গড় দর্শকসংখ্যা প্রতি সন্ধ্যায় ২৫/৩০/৩৫-এ ঠেকেছে। নামাজের সময় এমন কোনো রাস্তা নাই যেগুলো যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে হয় না, সেখানে কি জোর করে নিয়ে যাচ্ছে? না। কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামো এমন জায়গায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে যে, মানুষ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

তারিক আনাম খান

লাকী ভাই যে বললেন– মূল হলটি ৫ হাজার টাকা করবার জন্য ... তো তাতেই আমাদের কী লাভ হবে। দর্শক আসতে হবে না? হীরা যে কথাটা বলল যে, রাষ্ট্রীয়ভাবেই চাওয়া হচ্ছে এদেশে থিয়েটার হবে না, ধর্মীয় উন্মাদনা হবে, তো সেখানে আপনি পৃষ্ঠপোষক কোথায় পাবেন? আমাদের থিয়েটারটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে না? কীভাবে নেবেন?

আজাদ আবুল কালাম

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এই প্রশ্নটাই করছি যে, স্বাধীনতার পর যেভাবেই হোক যতটুকুই হোক নাটক হয়েছে এবং আস্তে আস্তে দর্শক বেড়েছে। তারপর যে ঢাকায় লোক বাড়ছে আর দর্শক কমছে, সেটাকে আপনারা কে কীভাবে দেখছেন?

লিয়াকত আলী লাকী

একটা কারণ এটা হয় কিনা যে, আমরা মহিলা সমিতিতে গিয়ে একটা ভালো নাটক দেখলাম এবং সেই টানে আবার আমরা অন্য একদিন গেলাম কিন্তু দুর্বল কোনো নাটক দেখতে হল ... তো তারপর সেই দর্শক আর রিস্ক নিতে চায় না। আগে শুনতে চায় যে, কোন কোন নাটক ভালো, তারপর সময় যদি করতে পারে নাটক দেখে। ফেডারেশন কেবল ২২ দিন বরাদ্দ দিতে পারে বাকি দিনগুলো দেয় মহিলা সমিতি। আগে ওরা নিয়ম করে দিত যে, ফেডারেশন দলভুক্ত না কিন্তু ভালো নাটক করে এমন দলকে বরাদ্দ দিত। কিন্তু এখন সেই নিয়ম উঠে গেছে, যাকে তাকে বরাদ্দ দিচ্ছে ...

হাসান শাহরিয়ার

আপনি বলতে চান যে, ফেডারেশনভুক্ত সব দল ভালো নাটক করছে?

লিয়াকত আলী লাকী

না, সেটা বলব না। তবে অধিকাংশই ভালো নাটক করে।

হাসান শাহরিয়ার

তাহলে আপনাদের যে ২২ দিন হাতে আছে, সেগুলো কি ভালো নাটক দেখে দেন, না ইচ্ছামতো বরাদ্দ দেন?

লিয়াকত আলী লাকী

না, ইচ্ছামতো না। একটা নীতিমালা আছে।

হাসান শাহরিয়ার

আমি জানতে চাচ্ছি ভালো নাটক বাছাই করে বরাদ্দ দেবেন, এমন কোনো নীতিমালা আছে কিনা?

লিয়াকত আলী লাকী

না, সেটা নেই। কিন্তু দলগুলো যেন ঘুরেফিরে নাটক করতে পারে সেই নীতিমালা আছে।

তারিক আনাম খান

এতে কি ফেডারেশনভুক্ত কিন্তু ভালো নাটক করে না, তারাও বরাদ্দ পায় না?

লিয়াকত আলী লাকী

তা পায়।

তারিক আনাম খান

এটা কি ফেডারেশনের ব্যর্থতা না?

আজাদ আবুল কালাম

না, আমি ব্যক্তিগত রেসপনসিবিলিটির কথা জানতে চাচ্ছিলাম। এই যে দর্শক বাড়াতে পারলাম না বরং কমে গেল, সেখানে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো দায় অনুভব করেন কিনা?

তারিক আনাম খান

আমি তো অবশ্যই নিজেকে দায়ী মনে করি। দায়িত্ব ছিল আমার, অথচ আমি কী করেছি? যেটা চালু জিনিস ছিল, সেটাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। ২-৩ টা শো এবং কল শো এবং কয়েকদিন রিহার্সেল ব্যস এটুকুই। কারণ আমার প্রফেশন আছে, আমি রিস্ক নেইনি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমি দায়ী। নইলে একটু রিস্ক নিলে বিয়েবাড়িতে যে ব্যান্ডসঙ্গীত হয়, সেটার জায়গায় আমরা নাটক নিয়ে যেতে পারতাম, ছোট্ট নাটক। কিন্তু আমি যাইনি। হয়তো ভেবেছি, দলের যারা সিনিয়র আছেন তারা বাধা দেবেন বা ... মোট কথা, আমি রিস্ক নিতে চাইনি।

আজাদ আবুল কালাম

আচ্ছা যদি এভাবে জিজ্ঞাসা করি যে– আপনারা চালু জিনিসের বিপরীতে কিছু ভাবলেন না কেন? মানে আপনি তখন এনএসডি ফেরত এবং আপনার মতো হাতে-গোনা কয়েকজন মাত্র এই মানের পড়াশোনা করে এসেছিলেন। সেদিক থেকে ভালো কাজ করা বা থিয়েটার নিয়ে নতুন ভাবনার জায়গাটা আপনাদের মাধ্যমেই হতে পারত। হল না কেন। কী মনে হয়?

তারিক আনাম খান
আসলে আমি এবং জামিল যখন আসলাম, এবং আমাদের আগে-পরে আরো কয়েকজন আসলেন, আমরা কিন্তু তখন কোনো না কোনো দলের সাথে যুক্ত ছিলাম। তারপরও তখন যারা সিনিয়র ছিলেন ... এককভাবে কারো নাম বলার দরকার নেই, আমরা যাদেরকে প্রথম প্রজন্মের বলে থাকি ... তো তাদের সাথে কিন্তু আমরা বসেছিলাম। বসেছিলাম এই জন্য যে, কোনো ন্যাশনাল রিপার্টরি করা যায় কিনা ... আমরা তো সীমিত সময়ে কাজ করছি, একটা নাটক ধরছি, সেই দলের ক্ষমতা অনুযায়ী করছি, তারপর শেষ। তো একটু অন্যভাবে করা যায় কিনা। বিভিন্ন দলে যে সমস্ত ক্রিম অভিনেতা-অভিনেত্রী বা নির্দেশক আছে তাদেরকে নিয়ে কিছু করা আর কি! দলে তো একটা ফরমেট থাকে, কমিটি থাকে ... অনেক কিছু, এ্যামেচার থিয়েটারে যেমন হয়, কিন্তু এর বাইরে গিয়ে রিপার্টরি দল করা। একজন নির্দেশকের ভাবনায় ভালো কিছু আসল, সে প্ল্যান করল ওমুক-ওমুককে লাগবে। তাদের সাথে সিডিউল হয়ে গেল যে, কে কবে আসবে ... সবারই সবদিন আসার হয়তো দরকার নেই। এটা কিন্তু প্রফেশনাল স্টাইল। তো কয়েকটা মিটিং হল কিন্তু তারপর আর এগুনো গেল না। আমরা যারা এনএসডি থেকে ফিরেছি, তাদের তো তখন অনেক ক্ষুধা। ভালো কিছু, অন্যরকম কিছু করার জন্য মরিয়া হয়ে আছি। আমরা একটা কাজ করেছি, ঢাকা পদাতিকের হয়ে শুধুমাত্র যারা এনএসডি ফেরত তারা মিলে নাটক করলাম *তালপাতার সেপাই*। তারপর করলাম *কঞ্জুস*, শুধুমাত্র এনএসডি স্নাতকদের নিয়ে। এটা করার সময়ে যে ক্রাইসিস দেখা দিল, সেটা হল জীবনের ক্রাইসিস। আর কিছু না। কী খাব, কীভাবে খাব? বয়স চলে যাচ্ছে, তারপর চাকরি পাব কোথায়? এসব আর কি! তো এই যে সংকটটা, এটাকে বাদ দিয়ে তো থিয়েটারও করা যায় না, কিছুই করা যায় না। এখন বলতে পার যে– গা-বাঁচানো কথা বলছি, কিন্তু এটা বাস্তবতা ছিল, কিছু করার নেই।

আজাদ আবুল কালাম
আমি তাহলে সবার কাছেই একটু করে জানতে চাই যে, দর্শক কমে যাওয়ার ব্যাপারে যে দায়ের কথা বলা হচ্ছিল– লাকী ভাই আপনি কোনো দায় বোধ করেন কিনা?

লিয়াকত আলী লাকী
আমাদের নাটক কিন্তু যখন শুরু হয়েছিল, '৭২ সালে, তখন কিন্তু পুশিং সেল ছিল। প্রত্যেকটা নাট্যদলকেই তাদের টিকেট নিয়ে বাসায় বাসায় যেতে হয়েছিল। এভাবেই দর্শক আসা শুরু হল। কিন্তু তারপর এটা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। একটা নাটক দেখার পর দর্শক কী রিয়েক্ট করে, সেটা কিন্তু আমরা জানতে চাই না। বা যদি খারাপ বলে, তাহলে সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশে কিন্তু সমালোচনার ধারাটাও তৈরি

হয় নি। আমরা হয় স্তুতি করি নয়তো নিন্দা করি। কিন্তু উচিত ছিল, আসলেই দর্শক কেন নাটক দেখবে, এ বিষয়ে গবেষণা করা। আর একটা কথায় আমি একদম বিশ্বাস করি যে, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই নাট্যচর্চা টিকবে না। এ্যমেচার থিয়েটার না ও প্রফেশনাল থিয়েটারও না। কেবল দর্শকের পয়সা দিয়ে ... হ্যাঁ, আমরা হয়তো গবেষণা করে দর্শক বাড়ালাম, কিন্তু টিকেটের টাকায় কি দল চলবে?

মান্নান হীরা

আমাদের আগে যারা থিয়েটার শুরু করেছেন, মানে যাদের মাধ্যমে আমাদের এই নিয়মিত নাট্যচর্চার শুরু বলি, তারা অবশ্যই নমস্য ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে যাঁরা এখনো থিয়েটার করে যাচ্ছেন, তারা অনেকের চেয়ে বেশি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। তবে সব কিছু মেনে নিয়েও আমি বলতে চাই যে– নাটক একটা পর্যায়ে আসার পর, অর্থাৎ কিছু ভালো কাজ, ভালো দর্শক সৃষ্টির পর, থিয়েটারটা কোন পথে যাওয়া উচিত, কোন পথে গেলে এর ধারাবাহিকতা থাকবে, সেটা তারা বের করতে পারেননি। এখানে শুধু আগের প্রজন্মই নয়, আমরা সবাই মিলে দায়ী এবং সে কারণেই একটা সময় থিয়েটারটা মুখ থুবড়ে পরে গেল। আমি বলতে চাই যে– একজন শিল্পপতিকেও ক্রমশই তার প্রফিট বাড়াতে হয়, নইলে সে পিছিয়ে যাবে। পুঁজির বিকাশের জন্য প্রতিনিয়তই প্রোডাকশন বাড়াতে হয়। এটা ভাবলে হবে না যে– অনেক হয়েছে, এখন সেটা ভেঙে ভেঙে খাব। তাহলে একসময় সে দেখবে যে তার 'মূল পুঁজি'-ই নেই। সুতরাং দর্শক বাড়তে বাড়তে এক সময় আমাদের অগ্রজরা মনে করেছেন কিনা যে অনেক হয়ে গেছে, আর লাগবে না ... ফলে কোনো নতুন ভাবনা তারা যোগ করেননি। এবং ফলে দর্শক আর আগের জায়গায় না থেকে কমে গেছে। যতই আমরা মার্কেট ইকোনোমি বলি, সংকট বলি এর মধ্যেও কীভাবে নাটককে গতিশীল করা যায়, সে ব্যাপারটি কিন্তু অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। এখন এসে যদি আমি আবিষ্কার করতে চাই যে, কেন দর্শক কমে গেছে, বা দর্শক কীভাবে বাড়ানো যায়– তাহলে আমি বলব বিষয়টি বেশ জটিল আকার ধারণ করে ফেলেছে। কীভাবে? সেটা হল আমি সবসময় মনে করি থিয়েটার ইজ ভেরি মাচ কনসার্নড উইথ দ্য সোসাইটি, এবং সোসাইটির যে অবস্থা এখন, এই সোসাইটিতে আমরা ভালো থিয়েটার বা দর্শক– আশা করতে পারি না। কারণ ভালো থিয়েটার বা দর্শক বাড়ানো, এসব সংস্কারের কোনো ধরনের আয়োজন সমাজে নেই।

লিয়াকত আলী লাকী

না, সেটা তো অনেক বড় জায়গা ...

তারিক আনাম খান
না, এটা মূল জায়গা ...

মান্নান হীরা
অবশ্যই। আজকে কোনো বুদ্ধিজীবী থিয়েটার দেখে না। কোনো রাজনীতিবিদ থিয়েটার দেখে না। শিক্ষকরা ... স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কথা বাদ দিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্ত থিয়েটার দেখে না। গণিত জানেন, বিজ্ঞান জানেন এমন কেউ-ই আমাদের থিয়েটার দেখেন না। যারা দেখেন তারা আমাদের বন্ধু-বান্ধব।

লিয়াকত আলী লাকী
তারা দেখে না, এটা তাদের দুর্বলতা।

তারিক আনাম খান
না, হয়তো-বা আমরা পৌঁছতে পারিনি তাদের কাছে। মানে কারণটা বের করতে হবে।

মান্নান হীরা
তাদের দুর্বলতা না আমাদের ব্যর্থতা সেটার চেয়ে বড় সত্য হল ওনাদের কাছেই যদি থিয়েটারের মেসেজটা না পৌঁছাতে পারি, তাহলে ...

আজাদ আবুল কালাম
এ প্রসঙ্গে আমি একটু বলি, হীরা ভাই, আপনি এদিক থেকে খুব সৌভাগ্যবান যে আপনি মঞ্চনাটকের পাশাপাশি অনেক পথনাটকেরও কিন্তু জন্ম দিয়েছেন। পথনাটকের ব্যাপারে খেয়াল করেছেন যে– আপনাকে ডাকাডাকি করতে হয় না, এমনিতেই লোকজন ভরে যায়। কিন্তু যখন *ময়ূর সিংহাসন* করছেন বা *আগুনমুখা* করছেন, তখন দর্শক আনতে পারছেন না। আপনার কি মনে হয় পথের দর্শকদের সাথে আপনি বেশি কমিউনিকেট করতে পারেন আর মঞ্চের দর্শকদের সাথে পারেন না, এমন?

মান্নান হীরা
না, আসলে প্রসেনিয়াম থিয়েটারটা হল অভিজাতদের জন্য। এখানে নাটক দেখতে একটা আর্থিক ব্যাপার জড়িত আবার একটা প্রিপারেশনও জড়িত। হকার, রিকশাপুলার, বাদামওয়ালা এরা কিন্তু প্রসেনিয়ামে আসে না। পথনাটক যেখানে হয় সেখানে ওরা যায়, প্রেমিক-প্রেমিকারা যায় ... এই যাওয়াটা কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে ঐ নাটকটি দেখতে যায় তা নয়। তারা ঘোরাঘুরি করতে করতে দেখে এখানে নাটক হবে,

আচ্ছা একটু বসা যাক– এমন আর কি! কিন্তু মিরপুর, ধানমন্ডি এমনকি বেইলি রোডের মানুষজনও কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে এসে প্রসেনিয়ামে নাটক দেখে না। এখানে দেখতে হলে তাকে একটা পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়। পারিবারিক প্রস্তুতি, আর্থিক প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির জন্য তার চাই একটা জাতিগত সংস্কৃতি নির্মাণ করা।

তারিক আনাম খান
আমি পাভেলকেই একটা প্রশ্ন করি। তুমি যখন একটা পথনাটক দেখ আর পরে যখন প্রসেনিয়ামে নাটক দেখ, এ দুটার মধ্যে তুমি কী পার্থক্য দেখতে পাও?

আজাদ আবুল কালাম
আমি একেবারে শুরুর কথা বলতে পারি যে– আমি যখন মঞ্চে নাটক দেখেছি *কিত্তনখোলা* বা ঐ সময়ের নাটক দিয়েই আমার দেখাটা শুরু, তো আমি দেখে গেছি কিন্তু কখনো ভাবিনি যে, এটা করা সম্ভব। কিন্তু ঐ সময়ে যখন পথনাটক দেখতে গেলাম আর হঠাৎ করেই লক্ষ করলাম মামুনুর রশীদ আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে একটা পাগলের রোল করছেন, আমার মনে হয়েছে এটা বোধহয় করা যাবে। মানে নাট্যক্রিয়াটাকে আমার কাছে আপন মনে হয়েছে।

তারিক আনাম খান
কিন্তু একটা কথা হচ্ছে কী, মঞ্চের বেলায় কিন্তু দর্শকের একটা আলাদা কনসেন্ট্রেশন তৈরি হয়। সে যখন ৫০/১০০ টাকা দিয়ে নাটক দেখতে ঢোকে তখন সে একটা দায়িত্ব নিয়ে ঢোকে। পথনাটক কিন্তু তার ভালো লাগলে দেখে, না হলে উঠে চলে আসে ... মানে যতই বলা হোক যে পথনাটক পলিটিক্যাল থিয়েটার ... আমার কাছে মনে হয় দর্শক কিন্তু মোর রেসপন্সিবল থাকে মঞ্চনাটকের বেলায়।

মান্নান হীরা
যে কারণে আমি অন্য সাহিত্যকে বা শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে তুলনা দিচ্ছিলাম শুরুতে, সেটা হল– আজকে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ক'টা লেখা হয়? গত ৫ বছরে ক'টা ভালো উপন্যাস লেখা হয়েছে?

বিপ্লব বালা
ছোটগল্প লেখা হচ্ছে।

মান্নান হীরা

ক'টা লেখা হচ্ছে? লেখা ছাপবার মতো কাগজ কোথায়? কোনো সাহিত্য পত্রিকা আছে? লিটল ম্যাগাজিন, সেই আগের মানের লিটল ম্যাগাজিন বের হয়? যদি না হয় লেখা বেরুবে কীভাবে? এ সব কিছু থেকে আমার কেন যেন মনে হয় একটা স্যোসাল রিফরমেশন বা একেবারে রেনেসাঁ ধরনের কিছু একটা প্রয়োজন আমাদের।

বিপ্লব বালা

সোসাইটিতে কিন্তু একটা মনোজাগতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে ইতোমধ্যে– বাজার, বিশ্বায়ন এসব মিলিয়ে।

মান্নান হীরা

হ্যাঁ, সেটা হয়েছে। এবং আমাদের অজান্তেই হয়েছে। আমরা সবাই এখন একটা বিজ্ঞাপনের জগতের মধ্যে আছি।

আজাদ আবুল কালাম

কিন্তু এই যে সময়টা পার করছি, এটাকে কিন্তু আমরা অস্বীকারও করতে পারব না। আবার আমরা কিন্তু এটার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করছি না। আমরা কিন্তু বলছি না যে– এই সময়টাকে রুখে দিতে হবে। ... আমরা সব অনিয়ম মেনে, অনিয়মের ভালো-মন্দ নিয়ে টিকে থাকতে চাচ্ছি। এই অনিয়মের বাইরে রেভ্যুলেশনারি কেউ না কিন্তু আমরা।

বিপ্লব বালা

না, নিশ্চয়ই না।

আজাদ আবুল কালাম

হীরা ভাই একটা কথা বলছিলেন যে থিয়েটার দেখে অভিজাতরা। তাহলে আমরা কি ঐ মাপের অভিজাত নই? তা না হলে অভিজাতদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি না কেন? আজকাল তো অভিজাতরাও নাটক দেখছে না। তাহলে আমাদের সমস্যাটা কোথায়?

মান্নান হীরা

আমি মনে করি, অভিজাতদের মনোজগতের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের অনেক ভালো ভালো কাজ না থাকার ফলে তারা সরে পড়েছে। বিপরীতভাবে মার্কেট

ইকোনোমির অন্যান্য মজা, আধ্যাত্মবাদের মজা ... ইত্যাদি তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে তারা থিয়েটারের পথটা ভুলে গেছে। আর যা কিছু করলে তাদেরকে এই পথে আনা যেত, আমরা সেটা করিনি, করতে পারিনি। তাদেরকে একেবারেই আনা যাবে না, আমি সেটা বলছি না বা বিশ্বাস করি না।

তারিক আনাম খান

আসলে এক সময় গতিশীল ছিল, কিন্তু গতিটাকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগটা নেয়া হয়নি।

বিপ্লব বালা

আমি বলতে চাই যে, নাটকের কনটেন্ট ও ফর্মের মধ্যেও কিন্তু আমরা একটা ফরমেটের মধ্যেই আছি। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, মঞ্চনাটকে এরকম ফর্ম বা কনটেন্ট হবে, এটাও একটা ফরমেটে দাঁড়িয়ে গেছে কিনা? পরিবর্তিত সময়ে দর্শক কেমন যেন মাইনাস হয়ে গেছে। নতুন বাস্তবতাতে দর্শকের মানসিকতা চেঞ্জ হচ্ছে, ফলে আমার ফর্ম এবং কনটেন্ট পাল্টাতে হবে– এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা ভাবিনি, এখনো ভাবি না? আগের ফরমেটে যে এখন চলবে না, দর্শক যে পাল্টে গেছে– সেখানে আমার ফাইটটা কী হবে, মিডিয়ার পাশাপাশি থেকে, সেটা আমরা ভাবিইনি। অনেকে মনে করে ঐ তরল থিয়েটার কেন করব? বা অনেকে এমনও ভাবেন যে, দর্শকও দরকার নেই। থিয়েটার হচ্ছে একেবারে একটা নান্দনিক শিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয় শুরুতেই এমনভাবে শুরু হয়েছিল কিনা যে, এটা একটা এলিটিস্ট ব্যাপার, এটা নান্দনিক ব্যাপার, এটা সকলের জন্য না। ফলে শুরু থেকেই দর্শককে আমরা সম্মানই করিনি। দর্শককে আমার ক্লায়েন্ট ভাবিনি। এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা তুলতে চাই। একটা টিভি অনুষ্ঠানে ত্রপা মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নারীকে মিডিয়ায় কীভাবে দেখানো হবে, এটার ব্যাপারে যারা এসব নির্মাণ করে তাদের কি হাত থাকে? তো ত্রপা বলেছিল যে– হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করি নারীকে যেন পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা না হয়। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে কিন্তু ক্লায়েন্ট আমার ফ্যাক্টর। সে যদি বলে যে– না এভাবে না, ওভাবে কর, তাহলে কিন্তু আমি সেভাবে করতে বাধ্য। তো ব্যবসায় যেখানে ক্লায়েন্ট ফ্যাক্টর হয়, থিয়েটারে সেই ক্লায়েন্ট বা দর্শক কিন্তু কোনো ফ্যাক্টরই না। কারণ এটাতো আমার জীবিকা না, কিন্তু ঐটাতো আমার জীবিকা। ওখানে ক্লায়েন্টকে না ভাবলে আমার ভাত হবে না, কিন্তু থিয়েটারে ক্লায়েন্ট না থাকলে বলতে পারব যে– ও তো কিছু বোঝে না। আগে আমার কাজ বুঝুক, তবে তো আসবে সে।

হাসান শাহরিয়ার
দর্শককে যখন আপনি প্রমাণ করে দেন যে, সে মূর্খ, তারপর সে টাকা খরচ করে আপনার নাটক দেখতে আসবে কেন? মূর্খ সাজার জন্য?

বিপ্লব বালা
সে-ই-তো। দর্শককে আমরা হেয় করেছি সব সময়।

আজাদ আবুল কালাম
আপনার কি মনে হয় যে, আমরা থিয়েটারের মানুষেরা সময়টাকে বুঝতেই পারছি না?

বিপ্লব বালা
আমার একটা ধারণা হল, ঐ যে একটা শ্লোগান আছে না যে– থিয়েটার হল সমাজের দর্পণ বা থিয়েটার সমাজ বদলের হাতিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি ... তো সেগুলো যারা বলেছি, সেটা নিজেদের কথা ছিল না। ফাঁকা বুলি ছিল। অনেকে বলেন যে– না, থিয়েটার দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হয় না ... আমি সেদিকে যাচ্ছি না, আমি বলতে চাচ্ছি, যে বলে– থিয়েটার আমার দর্পণ, আসলে এটা সে নিজেই বিশ্বাস করে না। সে বানোয়াট বিশ্বাস দেখাতে চায় দর্শককে। নাটক হল নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের বিশ্বাস থেকে শুরু করে সব কিছুকে প্রকাশ করা। তো আমরা কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করিনি, লুকিয়েছি। নিজেকে লুকিয়ে একটা বানোয়াট কথাবার্তা দর্শককে বলতে চেয়েছি। দর্শক সেটা বুঝে ফেলেছে। বুঝে ফেলেছে কারণ, আপনি আপনাকে বাদ দিয়ে যখন কিছু এক্সপ্রেস করতে চান, সেটা ধরা পড়ে যায়। একসময় বলতাম রাজনৈতিক, এখন বলি নান্দনিক। কিন্তু দুটোর কোনোটাই আমি বিলং করি না। যেহেতু এটা দৃশ্যকাব্য, সেহেতু দর্শকেরও মনে হয়নি যে, এটা তার থিয়েটার হচ্ছে। কারণ, দর্শকের মধ্যে তো লুকোচুরির ব্যাপার নেই। সে যখন টের পেল যে বানোয়াট এসব গল্প, তার গল্প নয় বা সামাজিক আর আর বাস্তবতার সাথে এসব কন্টেন্ট যায় না, তখন সে সরে পড়েছে।

হাসান শাহরিয়ার
হ্যাঁ, কারণ আমরা তো কেবল নাটক করি। কিন্তু একই দর্শক কিন্তু বাজারে যায়, অফিসে যায়। রাস্তাঘাটের বহু পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে সে। আমাদের কাছে থিয়েটার যেমন খেলা খেলা, দর্শকের কাছে কিন্তু এসব খেলা খেলা দেখার সময় নেই। সে এই নোংরা জীবন থেকে মুক্তি চায়, তার কিছুই সে নাটকে এসে পায় না। ফলে সে নাটকের কাছে আসে না।

বিপ্লব বালা

মানে আমি দেখাচ্ছি আমার বাইরের জিনিস। আমি যা না তা দেখাচ্ছি। আমার লক্ষ্য হল থিয়েটারটা নান্দনিক হচ্ছে কিনা। আগে ছিল রাজনৈতিক হচ্ছে কিনা, এখন হল নান্দনিক হচ্ছে কিনা। এসব কিন্তু সৌখিন ব্যাপার তাই না? এই সৌখিন জিনিসের পেছনে ছোটার সময় দর্শকের নেই।

হাসান শাহরিয়ার

আমার নিজের জীবনে, চলাফেরায় কখনো নান্দনিকতার ছাপ নেই, কিন্তু আমি মঞ্চে নান্দনিকতা ফুটাচ্ছি। আমি আমার সব আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মার্কেট ইকোনোমিতে গড়াগড়ি খাচ্ছি আর মঞ্চে রাজনীতির আদর্শ ফুটাচ্ছি। দৃশ্যকাব্যে এগুলো ধরা পরে। ফলে দর্শক বলে– আপনারা থাকেন আপনাদের বানোয়াট জিনিস নিয়ে, আমরা যাই।

লিয়াকত আলী লাকী

আসলে আমরা যে সময়টা পার করছি, মানে গ্লোবালাইজেশনের যে কুফলগুলো আছে সেটা আমাদের রাজনীতি ফেস করতে পারছে না। আমাদের দেশে একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিন্তু গড়ে ওঠেনি। ফলে একজন নাট্যকর্মী হিসেবে আপনি যা করতে পারবেন, সেটা কেবল আপনার সৃজনশীলতা দিয়েই হবে না। আপনি রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনার কাছেও কিন্তু জিম্মি। আমি আপনার (বিপ্লব বালা) কথায় একমত হয়েও বলছি যে, এত সংকটের মধ্যেও আমাদের কাজের মধ্যে যে টেনডেনসিগুলো এসেছে, সেটাও কিন্তু কম কথা নয়। যেমন আমাদের লোকনাট্য, নিজস্ব সংস্কৃতির কাছে ফিরে যাওয়া বা সেটা নিয়ে কাজ করা ... এগুলো কিন্তু থিয়েটারে হচ্ছে। আজকের যত জঙ্গি-বোমাবাজি, এসবের বাইরে কিন্তু আমাদের একটা অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আছে, যেগুলো লোকফর্মে পাওয়া যায়। সেগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি। এগুলো কিন্তু সমাজে প্রভাব ফেলছে।

বিপ্লব বালা

না, না, আমরা এগুলো জনগণের প্রয়োজনে করিনি, এগুলো করেছি আমার কাজের এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে। এটার এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলে দেখবেন আরেকটা ধরবে।

হাসান শাহরিয়ার

লাকী ভাই, আপনার কি মনে হয় যে, আমরা লোকফর্মে গেছি দর্শক বাড়াবার জন্য? দর্শক কিসে বাড়বে না বাড়বে তাতে আমার কী আসে-যায়? আমি দেখব আমার অভিজ্ঞতায় কী কী পালক যুক্ত হল। ব্যস, 'আমি' থাকলেই তো হয়। এত কষ্ট করে

স্বাধীন দেশে নাট্যচর্চা শুরু করেছি কি সবার জন্য? একসময় দর্শকের কথা ভাবিনি, এখন নিজের দলের কর্মীদের কথাও ভাবার দরকার নেই। তাই লোকফর্ম নিজের দলের নাট্যকর্মীরাও বুঝুক না বুঝুক আমাকে করতেই হবে। তো নিজের দলের অভিনেতৃরাই যুক্ত হতে পারছে না, দর্শক যুক্ত হবে কীভাবে?

লিয়াকত আলী লাকী

তার মানে আমরা আসলে সাহসের সাথে সত্যকে ফেস করতে পারছি না। তারপরও আমরা যারা থিয়েটারটা করে যাচ্ছি, তারা কিছু কিছু সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি। যেমন আগে আমরা থিয়েটার করেছি, যে সততা ছিল এখন সেটা নেই। সামাজিক বিভিন্ন খারাপ জিনিস তো নতুন নাট্যকর্মীর ভেতরেও ঢুকে গেছে। আজকে একটু দেরি করে রিহার্সেলে আসলেই বলে জ্যাম ছিল। বা সেলফোনে বলে– বাবা অসুস্থ, আসতে পারছি না। আসলে কিন্তু সে কোনো নাটকের স্যুটিং-এ ব্যস্ত ...

হাসান শাহরিয়ার

এগুলো কিন্তু সে বড়দের দেখে দেখে শিখেছে। বড়দের মধ্যে কিন্তু এখন প্রবণতাই নেই যে সঠিক সময়ে রিহার্সেলে আসতে হয়। নতুনরা মিথ্যা বলে, এটা দিয়ে প্রমাণ হয় যে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রবীণরা মনেই করে না যে, এটার ব্যাপারে কোনো জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে, ফলে তাকে মিথ্যা বলতে হয় না।

লিয়াকত আলী লাকী

আমাদের হতাশার কিন্তু অনেক কারণ আছে, সেটা মেনেই বলছি, আমাদের বোধহয় ভালো সময় আসার সময়ও হয়ে গেছে। মানে আমরা নব্বুয়ের দশকের শেষের দিকে যেমন ছিলাম, থিয়েটারের দর্শকদের প্রেক্ষিতে বলছি, দলের প্রোডাকশনের প্রেক্ষিতে বলছি, তার চেয়ে বোধহয় একটু ভালোর দিকে যাচ্ছি। যেমন ধরুন– গত বছর কিন্তু প্রায় ৩৫ টি নতুন নাটক মঞ্চে এসেছে এবং এর প্রায় ২৫ টি মানসম্মত নাটক।

তারিক আনাম খান

তাতে কী হল? আমরা শো করতে পারব ক'টা? সুতরাং আমাকে নাম্বার অব শো'জ এবং নাম্বার অব দর্শক দিয়ে বলতে হবে ভালোর দিকে যাচ্ছি কিনা, তাই না? আমি আরেকটা সংকটের কথা বলতে চাই সেটা হল মানসিকতার সংকট। আমি যখন *বিচ্ছু* করলাম, প্রথম কয়েকটি শো কিন্তু তেমনভাবে দর্শক আসেনি। এবং এই নিয়ে জ্ঞানী মহলে কোনো কথাও হয়নি। কিন্তু তারপরই দর্শক আসা শুরু হল এবং সমালোচনার ঢেউ শুরু হয়ে গেল। অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ভালো নাটক মানে দর্শক কম হবে, দর্শক উপচে পড়া মানেই সন্দেহ ... এই বুঝি থিয়েটারটা গেল। আমি তারপর *তুঘলক* করেছি।

দর্শক পেয়েছি, কিন্তু *বিচ্ছু*-র মতো না। পরে আমি নিজেও শংকিত হয়ে গেলাম, যে আসলেও কি কমেডি নাটক করা ঠিক না?

বিপ্লব বালা
এমন একটা আইডিয়া কিন্তু আমরা ছড়িয়েছি যে, হাসির নাটক করা যাবে না। আর যে সব নাটকে দর্শক উপচে পড়বে, বুঝতে হবে সেখানে গোলমাল আছে।

তারিক আনাম খান
তখন কিন্তু আমারও মনে হচ্ছিল যে– তাহলে কি আমি ট্র্যাকে নেই? আমি কি খারাপ কিছু করছি?

হাসান শাহরিয়ার
এটা হয়েছিল কিন্তু অন্য কারণে। তারিক ভাই আপনি স্মরণ করে দেখবেন যে, *বিচ্ছু*, *কঞ্জুস* জনপ্রিয় হয়ে যাবার পর একটা বন্যা বয়ে গেল মলিয়রের নাটক করবার জন্য। আপনাদের নাটকের মান, অভিনয়-ডিজাইন সব কিছু মিলিয়ে যে স্তরে গেছে, অন্যদেরগুলো কিন্তু ধারে-কাছেও ছিল না। ওরা ভেবেছিল মলিয়রের নাটক মানেই দর্শক উপচে পড়বে। ফলে কেউ কেউ লিখল 'দম ফাটানো হাসির নাটক' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলো দেখার পর দর্শক আসলে সরতে শুরু করেছে।

তারিক আনাম খান
হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। কিন্তু আমার তখন হঠাৎ করেই মনে হল যে, অধিক পপুলারিটি বোধহয় ঠিক না। থিয়েটার মানে সরাসরি রাজনীতি থাকতে হবে ... এসব। কিন্তু মলিয়রে কি রাজনীতি নেই?

বিপ্লব বালা
কিন্তু কমেডির সমস্যা হল মজা দিতে গিয়ে বক্তব্য আর স্পষ্ট হয় না। দর্শক মজাটাই নেয়।

তারিক আনাম খান
কমেডির ডিজাইনই-তো এমন তাই না? এখন কমেডির রাজনৈতিক বক্তব্য যদি আমি সিরিয়াসলি দিই, তাহলে তো কমেডির চরিত্র থাকবে না। কমেডিকে ফর্ম হিসেবে আদর্শ ভাবছি, অথচ ওটা যখন করছি, তখন সবাই বাঁকা চোখে তাকাচ্ছি। এটা কেমন কথা!

হাসান শাহরিয়ার

আমি এবার বিপ্লব দা'র কাছে একটু জানতে চাই। সেটা হল এই যে আমাদের এত কথা হল, তাতে করে একটা সত্য বের হয়ে এসেছে যে আমাদের দর্শক কমে গেছে। সেটা যদি হয় যে গ্রুপ থিয়েটার আর এভাবে চলবে না, প্রফেশনাল থিয়েটার করতে হবে– সেটা হতে পারে বা ভিন্ন কোনো চিন্তাও থাকতে পারে। আমি জানতে চাইছি, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পড়ছে তারা কি এসব ব্যাপারে কোনো মৌলিক ভাবনা ভাবছে বলে মনে করেন?

বিপ্লব বালা

আসলে এখানে ভর্তির পদ্ধতির মধ্যে একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে। এখানে অনেকেই যে ইচ্ছে করে, স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হচ্ছে তা না। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই কোথাও সুযোগ না পেয়ে এখানে আসে। তবে এখানে পড়তে গিয়ে অনেকেই খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে বিষয়টিকে। তবে ওরা বের হয়ে কীভাবে কী করবে এমন কিছু নিয়ে মৌলিক ভাবনা ভাবছে, বলা যাবে না। কিন্তু কেউ কেউ খুব ভালো কাজ করছে।

হাসান শাহরিয়ার

আমি জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের থিয়েটারের যে বাস্তব চিত্র, আজকের আমাদের আলাপচারিতাতেও বের হল, সেই বাস্তবতাকে নিয়ে আপনারা তাদের সাথে আলাপ করেন কিনা?

বিপ্লব বালা

ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা পাশ করার পরও থিয়েটারটাই করতে চাইবে। কিন্তু সত্য হল, সেই বাস্তবতা তো নেই। ফলে কেউ কেউ এনজিওতে যোগ দিচ্ছে কেউ কেউ অন্যান্য দলে কাজ করতে চাইছে। এভাবেই আপাতত আছে।

হাসান শাহরিয়ার

দলে কাজ করতে গেলেও কিন্তু সংকট আছে। আপনি *বেহুলার ভাসান* করতে গিয়ে যে ইফোর্ট দিচ্ছেন, সেটা তো বাইরের কোনো দল দিতে পারবে না। এত সময় দিয়ে এখন কেউ থিয়েটার করে না। তো যদি ঐ মানের বা ঐ পদ্ধতিতে কাজ করতে চান, তাহলে বর্তমান থিয়েটারের যে বাস্তবতা তার বাইরে নতুন কিছু ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে। নইলে আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না। আর কাজ করতে না পারলে এভাবে অনার্স, মাস্টার্স করার কোনো মানে আছে কি?

তারিক আনাম খান

শাহরিয়ার খুব ভালো একটা প্রসঙ্গ তুলেছ। *বেহুলার ভাসান* করবার সময় মাথায় কী থাকে? ভালো করতে হবে, রাতদিন খাটতে হবে। কারণ সামনে সার্টিফিকেটের ব্যাপার আছে। তার ধ্যান-জ্ঞান সব সে ঢেলে দিয়ে কাজটা করে। আর বাইরে আসলে সে খাবে কী, পড়বে কী, থাকবে কোথায়– এসব প্রশ্নের যখন মুখোমুখি হবে, তখন তার বাস্তবতা কী হবে?

বিপ্লব বালা

এক সময় ওরা অনেকেই বসেছিল যে, একটা রিপার্টরি-জাতীয় কিছু করা যায় কিনা। পরে বেশ একটা অগ্রগতি কিন্তু সেখানেও হয়নি। আসলে বাইরে এসে, সংগ্রাম করে থিয়েটার করবে এমন ছেলে-মেয়ে কিন্তু কমই পাওয়া যাবে।

হাসান শাহরিয়ার

কিন্তু একাডেমিকভাবে শিক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের ভেতর একটা ব্যাপার তৈরি হয় যে তারা প্রফেশনালি কাজ করবে। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে আমরা যে ক্রাইসিসগুলোর মুখোমুখি হই, সেই অভিজ্ঞতা কিন্তু ওদের ভেতর থাকে না। যেমন অর্থ জোগাড় করা, ছেলে-মেয়ে জোগাড় করা ইত্যাদি। সেখানে একটা নির্দেশনা দিয়ে দশ হাজার টাকা পেল, বা ডিজাইন করে পাঁচ হাজার টাকা পেল, এটাকেই তারা ভাবে প্রফেশনালিজম। কিন্তু ঐ দল যে প্রত্যেকটা শো-তেই লস দিচ্ছে বা দর্শক পাচ্ছে না, সেটা কিন্তু তাদের মাথায় থাকে না। ফলে আজকের আলোচনায় যে সংকটের কথা বের হল, দর্শক সংকট– সেটার ব্যাপারে কিন্তু তারা উদাসীনই থেকে গেল বা থেকে যাবে। তাহলে তাদের কাজের ভবিষ্যৎ কী হবে?

তারিক আনাম খান

বিপ্লব বলার আগে আমি একটু বলি। এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন তুলেছ। যদি দল না টেকে, তাহলে ওরা কাজ করবে কোথায়? তার মানে আমাদের আগে যারা কাজ শুরু করেছেন, তারা যদ্দুর করার করে গেছেন। তারপর আমাদের কথা যদি ধরি যে আমরা দর্শক ধরে রাখতে পারিনি বা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছি, সেটাও মেনে নিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের ওরা কী করবে? তাদের কোনো নতুন চিন্তাভাবনা আছে কিনা থিয়েটার নিয়ে, একেবারে মৌলিক চিন্তা-ভাবনা?

হাসান শাহরিয়ার

হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনারা যেহেতু বাস্তবতাটা জানেন, সেটা তাদেরকে ভাবতে বলেন কিনা, নাকি স্বপ্ন দেখান যে– তোমরা অনেক ভালো অভিনয় করছ, কাজ করছ, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল– এধরনের কিছু?

বিপ্লব বালা

ঠিক এমন না, তবে আমার মনে হয়েছে, ওদের অনেকেই বুঝে নিয়েছে যে, অন্য কোনো চাকরি করবে এবং পাশাপাশি থিয়েটার করবে। সাইদুর রহমান লিপন এক সময় গিয়েছিল আহসান মঞ্জিল, শিশুপার্ক– এসব জায়গায়। সে ভাবছিল ওখানে থিয়েটার করা যায় কিনা। মানে আমাদের মহিলা সমিতি বা শিল্পকলার বাইরেও ভেন্যু খুঁজছিল। পরে বোধহয় সেটাও হয়নি।

তারিক আনাম খান

ওদের এখন ভাবা উচিত, প্রয়োজনে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে গিয়ে ছোট ছোট নাটক করতে হবে। ক্লাবে গিয়ে করতে হবে। এভাবে ভেন্যু বাড়াতে হবে। সব জায়গায় একই নাটক করতে হবে তা না। এটা ছাড়া প্রফেশনাল বা সেমি-প্রফেশনাল চিন্তা করা সম্ভব না। আর তারা যদি মনে করে যে কিছু কিছু টিভি মিডিয়াতে কাজ করে আয় করবে এবং থিয়েটার করবে, আমি মনে করি সেটাও সম্ভব। সেদিক থেকে যারা মিডিয়ার নাটকনির্মাতা তাদেরকেও প্রফেশনাল হতে হবে। যদি মনে হয় শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে দিয়ে কাজ করালে ভালো কিছু করা সম্ভব, তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে, তাদের সিডিউল নেবে, এবং সিডিউল মতো স্যুটিং করবে। টিভি মিডিয়াও কিন্তু প্রফেশনাল এটিচিউডে চলছে না। সেখানে কেউ স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে যায় না। ন'টার সময় স্পটে থাকার কথা, দেখা যায় এসেছে বারটায়। ফলে অনেকের এমনও হয় যে একটা মাত্র দৃশ্য স্যুটিং হবে, কিন্তু তার সারাদিন মাটি হয়ে গেছে। অনেক কিছুই হতে পারে কিন্তু এই ভাবনাগুলো ওদেরই ভাবতে হবে। ভারতে কিন্তু এটা হয়েছে। এখন যাদেরকে আমরা চলচ্চিত্রে দেখি তাদের অনেকেই কিন্তু এনএসডি থেকে বেরিয়েছে।

লিয়াকত আলী লাকী

তার মানে কি এনএসডি বা আমাদের নাট্যকলা বিভাগগুলো টেলিভিশন বা চলচ্চিত্রকে ফিডআপ করার জন্যই বেঁচে থাকবে?

তারিক আনাম খান

হোক না, ক্ষতি কি? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেখানেও তো প্রফেশনালিজম তৈরি হচ্ছে না। আজকাল টেলিভিশন কি কেউ দেখে? মনে তো হয় না। যারা কাজ করছে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হল টাকা পাওয়া। কোনো সততা নেই। নয়টার গাড়ি এগারোটায়-ও ছাড়ে না। ইচ্ছেমতো স্যুটিং হচ্ছে ... তো সেসব জিনিস মানসম্মত হবে? হবে না।

হাসান শাহরিয়ার

তাহলে লাকী ভাই প্রথমেই যেটি বলেছিলেন যে, মঞ্চ যদি বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিত, তাহলে সবাই মঞ্চ নিয়েই থাকত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিডিয়া তার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছে, কিন্তু সে সেটাকে সম্মান করছে না, অসততা দেখাচ্ছে। সেটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

লিয়াকত আলী লাকী

হ্যাঁ, আমি বলেছি, কিন্তু এটা মানতে হবে যে, অর্থ পেলেই আমি প্রফেশনাল হব না। আমরা যখন নাট্যকলার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বলছি, তখনও কিন্তু আয়ের কথাটাই বলছি। কিন্তু আমার কথা হল ওরা জানে কিনা যে আমাদের মেইন স্ট্রিম থিয়েটার ... মানে শহুরে থিয়েটার চর্চার মেইন স্ট্রিম কিন্তু এই গ্রুপ থিয়েটার চর্চা, এটা মানতে হবে, এটার বর্তমান অবস্থা, সংকট– এসব ব্যাপারে ঐ শিক্ষার্থীরা সচেতন কিনা? কারণ আমরা এমনও শুনি যে আমরা যা করি সেটা তাদের কাছে কেমন যেন মনে হয় ... মানে যেহেতু সে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে কাজ করে আর দলগুলো অগোছালো ... কিন্তু তাকে যদি থিয়েটার করতে হয় তাহলে কিন্তু বর্তমান অবস্থাটার হাত ধরেই কাজ করতে হবে আর প্রতিভা থাকলে সে এই অবস্থার পরিবর্তন করবে।

বিপ্লব বালা

কিন্তু এই থিয়েটার নিয়ে তাদের কিন্তু একটা সমালোচনার জায়গা তৈরি হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সে সিরিয়াসলি মেথড মেনে থিয়েটার চর্চাটা শেখে, সেটা চরিত্র নির্মাণ হোক বা ডিজাইন হোক সব কিছুতেই সে খুব গভীরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ পায় এবং শেখে। সেখান থেকে সে যখন এই বাইরের থিয়েটার চর্চাটা দেখে, তার কাছে একটা সমালোচনার জায়গা তৈরি হয়। এই যে বানানো অভিনয়, কমন ফর্মুলা ... মানে মঞ্চে থিয়েটার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করার খুব অভাব দেখে সে গ্রুপ প্রোডাকশনগুলোতে। এবং আগে তো তবুও থিয়েটারে ডেডিকেশনের ব্যাপার ছিল, সেটা তো এখন মাইনাস। তো সেখান থেকে একটা সমালোচনার জায়গা তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক।

তারিক আনাম খান

এটা কিন্তু আমাদের বেলাতেও হয়েছিল। আমরাও কিন্তু এনএসডি থেকে ফিরে এসে যখন দলগুলোতে কাজ করতাম, কেমন যেন মেলাতে পারতাম না ... ঠিক সময়ে আসছে না, কনসেনট্রেশন দিচ্ছে না, ইত্যাদি। পরে আস্তে আস্তে মেনে নিতে হল যে এখানে কিছু বাস্তবতাও আছে।

বিপ্লব বালা

হ্যাঁ, এটা বোধহয় তাদের ক্ষেত্রেও হবে। কারণ, ডিপার্টমেন্টে একটা সুযোগ আছে, ভালো কাজ করার, এনালাইসিস করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বা অনেক লম্বা সময় ধরে কাজ করার। কিন্তু বাইরে তো এটা নেই। ফলে সত্যিই এখানে হয়তো একটা আদর্শের জায়গা, কল্পনার জায়গা তৈরি হয়। তো সেদিক থেকে যারা বেরিয়ে এসে দলে কাজ করতে চাইবে, তারা বোধহয় কিছুটা সংকটে পড়তেও পারে।

তারিক আনাম খান

কিন্তু তাদেরকে এই সংকটকে ওভারকাম করতে হবে। আমি তো বললাম যে, যখন এনএসডি থেকে ফিরে আসলাম, এসে একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। কারণ আমি তো একটা মেথডের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত হয়েছি, ডিসিপ্লিন শিখেছি। এখানে এসে দেখি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন থেকে শুরু করে কাস্টিং দেয়া, মহড়া দেয়া সব কিছুই কেমন যেন হেলা-ফেলা করে হচ্ছে। তবুও মেনে নিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, এই নাটকই দর্শক গ্রহণ করছে, দেখছে, তখন বুঝলাম এখানের কাজের মধ্যেও একটা ম্যাজিক আছে। ম্যাজিক না থাকলে দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে কেমন করে? সেই ম্যাজিকটা কিন্তু আমি মেনে নিয়েছিলাম যে, এই থিয়েটার দলগুলোর কাজের ধারাতেও কিন্তু শেখার মতো কিছু আছে। ফলে আমার মেথড, একাডেমিক শিক্ষা এবং পাশাপাশি এই দলগুলোর ডিজাইন সব মিলিয়েই কিন্তু নতুন ভাবনা তৈরি করতে হবে।

হাসান শাহরিয়ার

হ্যাঁ, মেলাতে হবে। কারণ, সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, আপনি যে এনএসডি-তে পড়েছেন সবই কিন্তু আমাদের এই গ্রুপ থিয়েটার চর্চার ধারাবাহিকতা, সেটা বুঝতে হবে। আপনি যে মেথডের কথা বললেন, তা স্বীকার করেই বলছি, আমাদের এখানে যে চর্চাটা হয়, সেটা যতই গোলমেলে মনে হোক-না কেন, সেটাই আমাদের মেথড। আপনার শিক্ষা দিয়ে, মেধা দিয়ে এটাকে উন্নত করবেন আপনি।

আপনার মতো করে আধুনিক করবেন, কিন্তু এটাকে অস্বীকার করে নতুন মেথড কিন্তু আপনি বানাতে পারবেন না, সম্ভবও না।

আমরা আর কথা চালাব না। কিছুক্ষণ কথা বলে এখানে কিছু সমস্যা হয়তো চিহ্নিত করা গেছে। কিন্তু সমাধান অবশ্যই এক বৈঠকে হবে না। এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে নতুন-পুরনো সব প্রজন্মকেই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

প্র ব ন্ধ

সেলিম আল দীন-ডিসপ্লে ও একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সুখ-দুঃখ

মা মু ন হু সা ই ন

> 'যাঁরা থিয়েটারকে পেশাদারি করিয়া বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, থিয়েটারকে জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা দেশের এক মহা-উপকার করিয়াছেন। এই দুঃখ-দারিদ্র্যের দিনে যদি ১০০/২০০ ঘর লোকেও থিয়েটার করিয়া খাইতে পারে, সেটা কি মন্দ কথা?' (*এখনকার থিয়েটার* : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)।

সেলিম আল দীন তাঁর থিয়েটারের কল্যাণে, আনন্দের সংবাদ এই যে, দেশের বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের অন্নসংস্থান-প্রকল্পকে ইতোমধ্যেই বেগবান করেছেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও, যাঁরা ওঁর নিয়মিত নট-নটী ছিলেন বা আছেন– বিবিধ বাণিজ্য-তরণী এবং কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির সেবাইত হিসেবে আশা করা যায়, এই আক্রার বাজারেও তাঁরা বিশেষ অন্ন-কষ্টে ভুগবেন না। আপাত-কৃতজ্ঞ ক্ষুধা-মুক্ত জনগোষ্ঠীর এখন প্রধান ধ্যান সেলিম আল দীন নামক একটি হেরিটেজ ইন্ডাস্ট্রি, একটি এক্সপ্লোরাটোরিয়াম, একটি মিউজিয়াম বা নিদেনপক্ষে একটি ডিসপ্লে শুরু করা যায় কিনা। ইতোমধ্যে

ডিসপ্লে-পর্ষদে নানান সদস্যরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন; নিকট আত্মীয়-স্বজন, থিয়েটারের অপরাপর প্রাণপুরুষ, তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, 'ডিসপ্লে'র রাজনীতি নিয়ে সদ্য সমাপ্তকারী ডক্টরেট, ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার, পত্রিকা অফিস, স্মৃতিরক্ষা কমিটি এবং তাঁর অগুনতি ছাত্র– যাদের কেউ অনুগত, কেউ খানিকটা দুর্বিনীত, কেউ ক্ষুব্ধ আবার কেউ একেবারে ন্যালাভোলা : 'মাস্টার মশাই না থাকলে, আমাদের কান ধরে কে আর ক্লাসের বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখবে!'– এরা সবাই যুক্ত হয়ে সেলিম আল দীন মিউজিয়ামের পত্তনি নিয়েছেন সম্প্রতি।

সেলিম আল দীন মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমাদের যে পথের নির্দেশনা দিলেন আমরা এবার সেই পথে হাঁটতে শুরু করি ... ; (মিউজিয়াম আর ইনহেরেন্টলি ইন্টারএ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া)– ফেনী, ঢাকা, টাঙ্গাইল-করটিয়া হয়ে সুখ্যাত সৈয়দ আলি আহসানের প্রযত্নে কখন খ্যাতিমান অধ্যাপক-ভাবুক-নাট্যকার হলেন সেলিম, তার সংবাদ ঝুলে আছে প্রথম দেয়ালে। মিউজিয়ামের আলো, শব্দ, আর্টিফেক্ট এবং টেকস্ট ঠেলতে-ঠেলতে মানুষ হাঁটে, কথানাট্য দেখে অথবা এপিক রিয়েলিজমের অনুবাদ পড়ে: আমরা সৎসমাজ চাই, নাটকের মাধ্যমে আমরা সৎ সমাজের বক্তব্য রাখব, নাটকে সুস্থ বক্তব্য থাকবে, শিল্প-সম্মত হবে, বাংলাদেশের লেখা নাটক করব, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, টু ডিসকাভার দ্যা লস্ট হেরিটেজ এ্যান্ড দা মিসিং লিংক্স অফেন ওভারলুক্‌ড বাই হিস্টরিয়ান এ্যান্ড থিয়েটার গ্রুপ ইন দা ইভুলুশন অফ বাংলা থিয়েটার। অথবা টু ইন্ট্রোডিউস কনটেম্পরারি থিমস্ এ্যান্ড কন্টেন্টস ইন দা ট্র্যাডিশান অব ফোক-থিয়েটার ফর্ম। ... ফাঁকে-ফাঁকে ঘন হলুদ-ফর্সা-নীল আলোর ভিতর সেলিম আল দীনের একদা *লিব্রিয়াম, জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা, সংবাদ কার্টুন, অনিকেত অন্বেষণ, করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা, নীল শয়তান, মশারী ৭৩, সর্প বিষয়ক গল্প, চাবির দুঃখ, হরগজ, যৈবতী কন্যার মন, চাকা, তাহিতি* ইত্যাদি-র পোস্টার বিবিধ বেলুন হয়ে নরম শীতাতপ-বাতাসে দোল খায়, অথবা কতিপয় পোস্টার পেইন্টিংস-এর মতো আষ্টে-পিষ্ঠে দেয়ালের সঙ্গে মাউন্ট করা, অতিরিক্ত মনোযোগ আদায়ের জন্য। *লিব্রিয়াম* এবং *সর্প বিষয়ক গল্প*-র পোস্টারে নাট্যকারকে না পেয়ে, আমরা পোস্টারের ছবিতে পেইন্টার খুঁজতে নামি– পেইন্টার একবার নিখোঁজ হয়ে যায়, আর একবার ভেসে এসে দর্শকের সারিতে দাঁড়ায়। অথবা দর্শক নিজেই একদা *লিব্রিয়াম* নামক মাইনর ট্রাংকুলাইজারের উত্তাপে লাশবাহী *চাকার* নিচে নাট্যকারের *সংবাদ কার্টুন* খোলামকুচির মতো গুঁড়িয়ে যেতে দেখে অথবা তাঁর ধারাভাষ্যে ডুবে যেতে থাকে: দেখুন এই কথানাট্যের রচয়িতা এক বিবেচনায় প্রেতসিদ্ধ অথবা শিল্পসিদ্ধ– নয়তো তাঁর রচিত পঙ্‌ক্তির মন্ত্রমালায় কীভাবে তিনি ছায়াভুবন অর্থাৎ প্রেতলোক থেকে আকর্ষণ করেন তার উদ্দিষ্ট চরিত্রসকল? বর্ণে মেঘনীলিম হে ছায়ানারী, এই যন্ত্রধ্বনির সোনার সিঁড়িতে তোমার পা রাখো। তুমি দুই নামে দুই কায়া কিন্তু একই যৈবতী কন্যা। পরলোকের ধূম– অগ্নি যদি ভেদ কর– তবে আইস। ...

আমি দুবার দুই জননীর উদর ছিঁড়ে রক্ত ও লালার স্রোতে নেমে এসেছিলাম। দু'বারই যৌবনের উপান্তে এসে খুন করে ফেলি নিজেকে। প্রথম মৃত্যুর পর এক বিষণ্ন দেবদূত আমার আত্মাকে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়েছিল। তাঁর কররেখার সুগন্ধ আমার মৃত্যুবিষকাষ্ঠের ওপর হিমের কুচি ছড়াল। টুনটুনির ডিমের চেয়ে ছোট নয় আত্মা– নীল। ডানার বাতাসে নক্ষত্রের কুচিগুলো রাতের সমুদ্রে ফসফরাস ফেনা তরঙ্গে তরঙ্গে সরে যায়। তারপর ছায়াপথ দিয়ে মধ্য আকাশ থেকে পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেতে যেতে টের পাই দেবদূতের চোখে জল। আমি ডিমের ভেতর থেকে ছোট্ট করে বলি, কাঁদো কেন, হে উজ্জ্বল দেবদূত! ভাইগণ, তোমাদের সামনে মুই ধরম কথা বুইলবো তাতে হামাকের পুণ্যি হবে, বুলবো? এ্যা? তবে বুলতেছি শুন। হে জিয়ো মুই হড় হোপনের গল্প বুইলবো। তখন তামাম পিরথিমী জলে ডুইবে আছে। শূন্য জল খল্‌খল্ করে তবে জিয়োর মন খারাপ। জলের ভিতরে তিনি ছেইড়ে দিলেন কাঁকড়া কাছিম। কিন্তুক তাতেও জিয়ো ভুগমানের মন ভরে না, বুলেন হামাকের বুকের পাঁজরখান শূন্যি লাগে কেন। ভুগমানের সঙ্গে-সঙ্গে নতুন এক হত্যা-রহস্য আমাদেরকেও বেদনার্ত করে ছাড়ে। পরিব্রাজকবৃন্দ মৃত্যু-উৎসব পর্যবেক্ষণের জন্য, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ডিপ্লোমাধারী কতিপয় সুকন্যা কর্তৃক দ্রুত সম্বোধিত হয়– শ্রোতৃমণ্ডলী এখন করুণা জাগে তাদের জন্য যারা তাকে হত্যা করেছে, যারা তাকে ভুল ঠিকানার দিকে প্রেরণ করেছে। করুণা জাগে তাদের জন্য যারা পেট চিরেছে, হত্যার কারণ গোপন করেছে যারা অন্যায়ভাবে। মানব কষ্টের সহস্র সহস্র বর্ষের সঙ্গী যুদ্ধজয়ী ষাঁড়কে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে। নয়ানপুর নবীনপুর জগতের মানুষের কান ও চোখ কর্দমে থুতুতে ভরুক। কেবল বৃদ্ধটি ছাড়া যে হয়তো আজ সন্ধ্যায় পর্যন্তও ভাবছে তারই সোনাফর। লালচে চাঁদ ওঠে পূর্বে। পনর রাতের চাঁদ। এবড়ো থেবড়ো গাঙের পাড় ধরে চলে লাশের সঙ্গে এরা। পূবের ছায়া পশ্চিমের চরে পড়ে। শান্ত জলে কীসের আভা? ভাঙা পাড় বেয়ে নেমে আসে ওরা বরফ গলে লাশ হালকা হয়ে এসেছে। গাড়িটি ও ষাঁড়দ্বয় উঁচু পাড়েই দাঁড়ানো থাকে। ... আজ শিল্পের অতিরিক্ত কোনো সুখ বহন করে চলেছে পরী। যে গঞ্জে যাবে নাম ছাতনপুর। শিল্পের অতিরিক্ত সুখ কী? নীল রৌদ্রে সতেজ সবুজের ভেতর দিয়ে অভিনয়ের উত্তাপ তৈরি হত তখন তা মঞ্চদর্শক অতিক্রম করে নদীর স্রোতে স্রোতে দীর্ঘতর হয়। দর্শকের হৃদয়ে যা উপ্ত করা হল তা চলে যায় জনের জনের যাতায়াতের দিকে– গন্তব্যে। আর যে বীজ বুনে দিল– ছাতনপুর কিমতিগঞ্জে আসার কোন ছড়ানো বীজের আনন্দ সকালের রৌদ্র, যান্ত্রিক শব্দ ও গতির সঙ্গে মিলে শিল্পেরও অতিরিক্ত একটি স্রোত তৈরি করে, হায় শ্রোতৃমণ্ডলী! সেই যে বিষখালী চরের নদীর বাঁকে নেচেছিল পূর্ণিমার নিচে– মৌরাবী গায় সোনাঝুরি ফুল-গাছদের পুতুল নাচিয়েছিল– সেই পরী এই লোকজ শিল্পের ভেতরে পতিত প্রাকৃত জীবনে অম্রনদীতে শেষমেষ জীবনশবের মান্দাস ভাসায় ... নিজেকে নিজের কাছে বড় বেশি ক্লান্তিকর ঠেকে। কিন্তু যখনি ভাবি আমি শীঘ্রই আত্মহত্যা করব তখনই

আকাশের নীল রৌদ্রচাঁদ নক্ষত্রমালাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। সেই যে আমার শাহামালের সঙ্গে যেতে যেতে সূর্যাস্ত দেখা। আশার চরে এ জীবনে আর পৌঁছানো হল না। আসরের ফাঁকে ফাঁকে কোনো কোনো দিন নির্জন দুপুরে, সন্ধ্যায় কি চাঁদের রাতে নৌকায় ভাসা, হুলা বিড়াল, বাবার মুখ, সকিনা, অসহায় অন্ধদিদি, করুণ মীনাকুমারী, আমার উদর থেকে খসে যাওয়া নষ্ট ভ্রূণ, বুকের পাঁজর ছিঁড়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। সে শ্বাসে আমার প্রসাধনের আয়না ঘোলাটে হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি লোকলজ্জায় ভ্রূণহত্যা করিনি। আমার মনে হয়েছিল আসরের পথে পথে একজন পরীর কোনো স্বামী নাই, জনক-জননী নাই, পুত্রকন্যা নাই। কিন্তু আজ শ্যামসোনাপুরে এসে ভাবি কী ক্ষতি হত এই গজারি মহুয়া বনের পাতা ঝরানো হাওয়া লাগালে ওর বাড়ন্ত শরীরে! নাটকের প্রাচীন মাঠকর্মীবৃন্দ খানিকটা থেমে সেলিম আল দীনের কতিপয় কথানাট্য এবং কথাপুচ্ছ পাঠ করছিল ওঁর সুবিস্তৃত অমনিবাস থেকে। নাটকের মতো, পদ্যের মতো, গল্পের মতো– কেউ একজন অদৃশ্য অনর্গল আবৃত্তি করে চলেছে সুরেলা গলায়। মিউজিয়ামের আলো, নতুন রঙ, পুরনো পোস্টারের গন্ধ এবং কতিপয় গানের ভেতর কে যেন অভিশাপ পাঠায়– *কেরামতমঙ্গল* পাঠে যে এ কাব্য-দর্শনে আগ্রহী হয় না তার নিশীথ রাত্রির আকাশ হোক নক্ষত্রবিহীন! এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে, আমরা জরুরি-সরকারের বিদ্যুৎ নিভে যেতে দেখি; খানিকটা হোঁচট খাওয়া– জরুরি আলোয়, নাটক থেকে এবার ঝুরঝুর কল্যাণবার্তা নেমে আসে: সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী এই নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কল্যাণ হোক, পুণ্য হোক। যে এই নাটক দেখে– সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায়-অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে– সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানবজনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়। ... এই নাটকের রচয়িতা কোরানের দোজখ বর্ণনাকে তার অতুলনীয় ভয়াবহ চিত্রকল্পের স্রষ্টাকে প্রণাম জানায়। এই নাটকের রচয়িতা আভূমি প্রণাম জানায় বাংলা কাব্যে মধ্যযুগের মহান কবিদের। এই নাটকের রচয়িতা *মনসামঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কবিদের প্রণাম করে। এই নাটকের রচয়িতা সন্ত কবি দান্তেকে প্রণাম জানায়। এই নাটকের রচয়িতা লাঞ্ছিত যিশুর ক্রুশকাঠকে প্রণাম জানায়। ... আর এই নাটক দর্শনে অবশ্যই বন্ধ্যা নারী ফলবতী হবে!

মন্ত্রপড়া মানুষেরা অভিভূতি নিয়ে এক-দু'জন ইনফার্টিলিটি-আক্রান্ত নারী সামান্য আলোড়িত হয়– নাটক তাহলে বন্ধ্যাত্ব দূর করার শক্তি রাখে? এদের কেউ সন্তান তৈরির টেকনোলজি নিয়ে তথ্য যোগাড় করছিল; ভাবছিল– পালক সন্তানের আনন্দ এবং বিভ্রম কীভাবে একটি এ্যাডপশন-ত্রিভুজ তৈরি করে, নাকি সন্তানহীনতার মধ্যেই আগামীতে নতুন এক মঙ্গলকাব্য খুঁজতে হবে আমাদের?

জবাব পাওয়ার আগেই সেলিম আল দীন মিউজিয়াম'এর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে আয়োজিত বিপুল ডামাডোলে কতিপয় বন্ধ্যানারীর সম্ভাব্য আনন্দ-বেদনা দ্রুত ডুবে যেতে থাকে। সেলিমের নাট্যভাবনা অথবা তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প নাট্যধারা নিয়ে গভীর-গম্ভীর আলোচনা শুরু হয়েছে পাশের ফ্লোরে। সেলিমের বিবিধ বেলুন জন্ডিস আলোয় কেঁপে কেঁপে করিম বাওয়ালীর শত্রুকে আদর করছে। দু'একটি শিশু গোপনে আঙুল ছুঁয়ে বেলুন দেখে। কেউ মিউজিয়াম, জ্ঞান ও ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে– পলিটিক্স কেবল রাজা-বাহাদুরের সিংহাসন জুড়েই থাকে না? এই মিউজিয়ামের আর্কিটেকচার, এই প্রদর্শনীতে আর্টিফেক্টগুলো যেভাবে জাক্সটাপোজড করছি, সেলিমের নানান ব্যবহার্য এই যে খানিকটা গ্লাস-কেসে ঢেকেছি, খানিকটা ঢাকা পড়েনি, সেলিমের ওপর তৈরি ডকুমেন্টরিতে এই যে কোথাও কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে, কোথাও রয়ে গেছে কেবল নীরবতা– এই আপাত অরাজনৈতিক আয়োজনের মধ্যেই ডিসপ্লে'র রাজনীতি আলো-অন্ধকার হয়ে লেগে থাকছে। হয়তো সেলিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেকস্টের ওপর কিউরেটর এবং দলের হাই-কমান্ড পর্যাপ্ত আলো দিতে ইচ্ছুক নন। আলো সরে গিয়ে মেঝে এবং দরজার দিকে পিছলে গেছে। আমরা ভাবছি তাহলে এই প্রদর্শনীর মূল অথার কারা? পিচ্ছিল আলো সেলিমের পোর্ট্রেট ছুঁয়ে বিশিষ্ট নাট্যজন এবং সিভিল সোসাইটির প্রিয়দর্শনী সদস্যের ইয়ার রিং চুইয়ে নামছে। তাহলে কি বলব যারা আয়োজন করলেন তারাই এই সভার মূল অথার এবং আলোকিত মানবমণ্ডলী? শেষতক জানা সম্ভব হয় না, দর্শকদের এরা কীভাবে অনুধাবন করলেন আর কারা হিসাবের বাইরে রইলেন। মিউজিয়ামের ডিসপ্লে-পদ্ধতি নিয়ে যাদের অপার জ্ঞান-গম্যি তাদের কেউ আমাদেরকে অভয় দেন– আসলে এই প্রদর্শনী, এই মিউজিয়াম, দেখার আর এক চশমা বটে– এই চশমার গুণে সেলিমের ইতিহাস, ওঁর সংঘ-চেতনা, উন্নয়নকর্ম, সংস্কৃতিভাবনা ইত্যাদি মিলিয়ে ওঁর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যের একটি খতিয়ান বোঝা সম্ভব, অথবা এই আশ্চর্য চশমা দিয়ে এক লহমায় এই ছোট্ট ঘরের ভেতর একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব। সেলিমের বই-পুস্তক, ওঁর লেখার সরঞ্জাম, ওঁর নথিপত্র, ওঁর গানবাদ্য, নরওয়েজিয়ান বরফপাত নিয়ে ওঁর মুগ্ধতা, ওঁর বিবিধ ফটোগ্রাফ–প্রতিমুহূর্তে সকল ভিজিটর পড়তে পারেন না; ফলে মিউজিয়ামের আলো-ছায়া এবং বিশিষ্টজনদের ডিওডরেন্ট মাড়িয়ে আমাদের চোখ-কান যে কথামালা তৈরি করে আমরা তা-ই নিজের মতো আত্মস্থ করতে শিখি। মিউজিয়ামকে কি তবে বলতে পারি, ... এ পার্ট অব দি লেইজার এ্যান্ড টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ? আমরা যারা কালো-কোলো– ন্যালাভোলা-এ্যাসথেটিক্সশূন্য দর্শক, এখন সবাই বিভ্রমে পড়ি; এই আয়োজনের কোন অংশ পরিচালকের, কোন অংশ এঞ্জিনিয়ারের, কোন অংশ কবি'র, কোন অংশ ঔপন্যাসিকের, কোন অংশ ফটোগ্রাফারের, কোন অংশ পেইন্টারের– সহজে আলাদা করতে পারি না! সেলিমের আত্মজীবনী এবং শিল্পকর্ম আলো এবং আয়নার কারসাজিতে বদলে যেতে থাকে। লক্ষ করি– সেলিম এবং ওঁর নিরুপায়

ইলেক্ট্রনিক্স-জগৎ আমাদের ক্ষ্যাপাটে সরকার, বহুজাতিক কর্পোরেশন, সামরিক শক্তি, কল্যাণময় রাষ্ট্র, স্যাটেলাইট সিস্টেম, রাজনৈতিক গন্তব্য, কল্পনাপ্রবণতা, কল্পনার বিস্তার, শ্রম নিয়ন্ত্রণ, অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট, প্রোসথেসিস, বাণিজ্যিক পর্নোগ্রাফি, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন এবং ধর্ম-প্রণোদনা ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে।

কয়েকজন উৎসাহী দর্শক সেলিমের অভিজ্ঞান খুঁজতে যেয়ে জামশা গ্রামের হাকিম আলি গায়েনের পোর্ট্রেট দেখছিল। *রাখালের পিঠা গাছ* এবং *কাজল রেখার* হাস্তর আয়োজন করেছে নাট্যতত্ত্ব বিভাগ। স্টিভ ফ্রিডম্যান আর জামিল আহমেদ *চাকা* করার অভিজ্ঞতা বলছিলেন পরিশীলিত উচ্চারণে। দুই পাশে দুটি বালিশ নিয়ে মনসুর বয়াতির ফটো সেলিমের সাথে। আমরা প্রদর্শনীর ফাঁকে সেলিমের উদ্দেশে নিবেদিত তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প নাট্যধারা শীর্ষক আলোচনা শুনতে শুনতে নাটকের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে ভাবিত হই; সেলিম ওঁর নাট্যকথায় কোনো দিন পাওলো ফ্রেইরে বা বোয়াল-এর কথা বলেননি– এঁরা বন্দি হয়েছিলেন কেবলমাত্র নাটকের জন্য, এমনকি এক পর্যায়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। সেলিম কোনোদিন নাটককে আনন্দদায়ক, প্রাণময় ও জঙ্গি শিক্ষার বাহন হিসেবে দেখেছিলেন কিনা জানি না। বোয়াল যেমন ভাবতেন, রূপান্তরের মাধ্যমে দর্শককে বাস্তব বিষয়ের মহড়ায় সাহায্য করতে চেষ্টা করা হবে, যা তাকে মুক্তির দিকে চালিত করবে–; সেলিম তাঁর *কথাপুচ্ছ*'এ এ-সম্পর্কিত কথা না বলে মূলত সচেষ্ট হয়েছেন 'কথানাট্য' নামক তাঁর প্রকাশের উপায়কে আবারও ঝোঁক দিয়ে বর্ণনা করতে। সে অর্থে, সেলিমের মৌল প্রবণতায় আমরা থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট বা থিয়েটার অব অপ্রেসড নামক কোনো পুস্তিকার বিশেষ আভাষ দেখতে পাই না। 'মুক্তির ভীতি' নিয়ে কি তিনি নাট্যতত্ত্বের ক্লাসে কোনোদিন এক-দু ঘণ্টা অনর্গল কথা বলেছিলেন, অথবা সমস্যা চিহ্নায়ন শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা কি আদৌ কোনো দিন প্রশ্ন তুলতে পেরেছিলাম সেলিমের নাট্যতত্ত্বের ক্লাসে? পরক্ষণে ভেবেছি– সেলিমকে এ বিষয়ে আদৌ কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় কিনা? ওঁর স্বভাব, নাটক নিয়ে ওঁর ভাবনা, ওঁর গাজীগান, হাস্তর এবং অধ্যাপক সত্তা যে 'রিপ্রেজেন্টেশন' তৈরি করে– তাই সেলিম আল দীন নামক একজন লেখকের কথানাট্য। ওঁর কথানাট্য আমি ছবি, গান, পদ্য, গল্প অথবা ইমেজ আকারে পড়তে থাকি; কখনও খুব এলোমেলো উল্টে গেছি, কখনও থমকে দাঁড়াই, আবার কখনও অনেকখানি গুছিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি– শেষমেষ ধারণা জন্মে, ওঁর কথানাট্যের নানান অর্থ, ভাষাকে বহন করে আসলে আমাদেরকে ক্রমাগত সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত করে গেছে। সংস্কৃতির অপর সদস্যরা তখন তাদের জ্ঞান নামক 'ক্ষমতা' এবং রিপ্রেজেন্টেশন-এর গুণে সেলিমকে গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে। কেউ এই যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নতাড়িত হয়; উচ্ছ্বাসময় কণ্ঠে সিনেমার জয়গান গায়– শেক্সপিয়র, রেমব্যান্ট, বিটোফেন, এবার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করবে। সেলিমের কথানাট্যও তবে কি যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে ঢুকে পড়ছে? কালচারাল স্টাডিজ এবং কালচারাল থিয়োরির

মান্যজনেরা সেলিমকে আরো নানান স্তর থেকে ব্যবচ্ছেদ করার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদর্শন করতে শুরু করেন– নাটকের নানা ফর্ম নিয়ে একজন রেমন্ড উইলিয়ামস জিজ্ঞাসু হন; পপুলার কালচারের সঙ্গে সেলিমের হাই কালচার নিয়ে তর্ক ওঠে; ওঁর লেখায় কালচার ও এ্যানার্কির বিস্তার খুঁজতে কেউ নামে, যেভাবে তিনি নেগোশিয়েট করতেন কালচার ইন্ডাস্ট্রির কাছে, তার বর্ণনা তৈরি হয়; তাঁর 'পাঠ ও অপাঠ'র দ্বন্দ্ব ও নীরবতা নিয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ আসে; যাঁরা তাঁর কালচারাল এন্টারপ্রেনিওরশিপ গ্রহণ করেন তাদের নাম-ঠিকানা ও কৌলিন্য চিহ্নিত হয়, আর সবশেষে তীব্র আলোচনা উত্থাপিত হয় আমাদের সামগ্রিক কালচারাল স্টাডিজ, কালচারাল ক্যাপিটাল এবং পলিটিক্যাল ইকোনোমি নিয়ে। একজন ক্ষ্যাপাটে আলোচক আমাদের বুরোক্রেসি এবং সময়কে রিচার্ড সেনেট (*দি কালচার অফ দি নিউ ক্যাপিটালিজম*)' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– আমাদের পুরো সময় আসলে দি মিলিটারাইজেশন অফ সোশাল টাইম, এমনকি উত্তেজিত স্বরে তিনি এক-সময় আমাদের রাজনীতি ও ভোগবাদিতার ভেতর লুকোনো 'থিয়েটার' আবিষ্কার করতে শুরু করেন– দা রিয়েলম অব কনজামশন ইজ থিয়েট্রিক্যাল বিকজ, দা সেলার, লাইক আ প্লেরাইট, হ্যাজ টু কমান্ড দা উইলিং সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ ইন অর্ডার ফর দা কনজুমার টু বায়। .. আবার দেখুন পলিটিক্স নিজেই এখন যথেষ্ট থিয়েটার করছে– পলিটিক্স ইজ ইকুয়েলি থিয়েট্রিক্যাল! মঞ্চের বাইরে বেড়ে ওঠা এই থিয়েটারের পাঁকে ডুবতে ডুবতে, কিংবা এই তীব্র সেনাশাসিত সময়ে দিক-চিহ্নের আন্দাজ নিতে নিতে সেলিমের 'লেখা' একটি উপলক্ষ হয় বটে, কিন্তু লেখাপাঠের মাধ্যমে পাঠক নিজেই নিজেকে পাঠ করার একটি সুযোগ খুঁজে পান। সেক্ষেত্রে, লেখক সেলিম একটি দেখার যন্ত্র সরবরাহ করেন, যাতে করে পাঠক নিজেকে আর একপ্রস্থ আত্ম-অবলোকনের অবকাশ পান।

সেলিমের 'লেখা' গান-কবিতা-উপন্যাস অথবা নিরেট নাটকের টেকস্ট হিসেবে রিপ্রেজেন্টেড হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলে কতিপয় যুবক লেখক এবং কাগজ-কোম্পানি সেলিমের বক্তব্য ঘষা-মাজা করে বই ছাপেন; তিনশ টাকার বিনিময়ে সেলিমের এই ভাবনা-বৃত্তান্ত আমরা উল্টে দেখিঃ সেলিমের বক্তব্য এবং বৈপরীত্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়– ... আমি লিটল ম্যাগাজিনকে অফ দা ওয়ে ম্যাগাজিন বলি। আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। আমার লেখা এখন হিন্দি, ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং সুইডিশ ভাষায় অনূদিত। ঊষা গাঙ্গুলি হরগজ করেছেন। উচ্চমানের প্যাকেজ নাটকে হাত দিয়েছি, আমার মূল কাজ শিল্প রচনা। বিশেষত কবিদের মধ্যে আমার রচনা বিষয়ে গভীর উৎসুক্য দেখে আমি আশান্বিত। আমরা মুক্তিযুদ্ধে প্রকল্প গ্রহণ করেছি। *চাকা*-কে আপনি কবিতা করে সাজান। টেলিভিশনে শিগগিরই আমি উপস্থিত হব। আমার পরিকল্পনা একটি পণ্য সভ্যতা-বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব। (রম্যাঁ রলা বলতেন 'বিশ্বগ্রন্থাগার'-এর কথা।) এথনিক থিয়েটারে হাত দিয়েছি। পাঞ্জু ধীর লয়ের নাচ। *চাকা* নাটকে সংগীতের স্পর্শ খুঁজুন। দীলিপ রায় এবং উমা বসুর গান শুনছি। *চর*

কাঁকড়া করতে যেয়ে নাট্যকর্মীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। লেখকের লেখা গদ্য হতে পারে না। কাজের ভাষা গদ্য, শিল্পীর ভাষা কবিতা। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। ব্রেখটকে পলিটিক্যাল এজিটেটর ও সেলিমকে হিউম্যান এজিটেটর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বনাটকের ক্ষেত্রে। উত্তরকালে আমি জাতীয় নাট্য-আঙ্গিকের ধারণায় উপনীত হই। আমি নিশ্চিতভাবে ব্রেখটের শিল্পরীতির বিরোধী। *চাকা* লিখতে লাগল পাঁচ দিন পাঁচ রাত। জন্মদিবসের পরিণতি মৃত্যুদিবস। পঞ্চাশ বছর, নক্ষত্রের আয়ুর তুলনায় কতই-না কম। একটা কাছিমও একশ বছর বাঁচে। শুরুতে কবিতা লেখায় নিবিষ্ট ছিলাম। রফিক আজাদ আমাকে শুধুমাত্র নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেন, আমার লেখায় মূল বিন্দুতে উপন্যাস, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও প্রবন্ধ ক্রমে ভিড় করেছে। (মালার্মের 'সংগীতের ধর্ম'– কথাটি কি ভাবনায় আসে?)। আমার গভীর প্রার্থনা মঞ্চগুলো হয়ে উঠবে গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্রভূমি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, শিল্প-চেতনা-সংস্কৃতি– সব কিছুর পথপ্রদর্শক হিসেবে ঐ মঞ্চ একটা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নতুন নাটক তৈরির জন্য কলম্বো, কেপটাউন, ভালেত্তি, রিও ডি জেনিরো, জাভা, হংকং, লিভারপুল, বার্সিলোনা প্রভৃতি সমুদ্র-বন্দরের নানান বিবরণ জড়ো করেছি। ('কারিগর যেভাবে চেয়ার বানায়, আমি সেভাবে নাটক তৈরি করি।'– জাঁ আনুই)। টেলিভিশন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি এ-কথা সত্য নয়– টেলিভিশনই আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমি মার্কসবাদী নই। আমি শিল্পীর সাহস এবং সততা নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাই। মুনীর চৌধুরীর সবচেয়ে বড় সমস্যা তার মধ্যে বার্নাড শ'র প্রভাব। আমি সাভারে থাকি। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কী করছে, আমি কিছুই জানি না। (আপনারা ছুটছেন অর্থের পেছনে, জনপ্রিয়তার পেছনে। খুব কি ভুল বলা হবে?) আসলে জীবন ও জীবিকার কারণে এমনটা হয়েছে। নাটক তো তেমন কিছুই দিচ্ছে না। নাটক থেকে না পেয়ে এমনটা হচ্ছে। আমার লেখার প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করে অর্থদণ্ড নেয়। ... সরকার গোয়েন্দা কাহিনী কিনে পাঠাগারে পাঠায়। *হরগজ* রচনাকালে রাষ্ট্রভাঙনের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো নেপথ্যে সক্রিয় ছিল। এই সময়ে রাশিয়ার ভাঙনে বিশ্বরাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি শঙ্কাও উপস্থিত হয়েছিল। ... সকল মহৎ কবিই বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথের *জয় পরাজয়* গল্পটি প্রায় সম্পূর্ণ সুরারোপ করেছি। *চাকা*-র সবকটি গানই সরাসরি গদ্যে সুরারোপ। ইংরেজি ভাষা বাংলার মতো গীতল নয়। ঢাকা থিয়েটার অভিনয়কে অনুকরণ মনে করে না। এটা হচ্ছে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা। শেক্সপিয়র আমার পছন্দ না। *রুক্সবর্ণ* আমার সবচেয়ে কাছাকাছি আত্মজৈবনিক লেখা। আমার প্রথম সন্তানটি অপরিপুষ্ট ভ্রূণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। শিল্পের ভাষা সবটাই হবে নির্মিতি। নির্মিতি মানেই কাব্য। এস এম সুলতানের সাথে আমার কথা হয়েছিল। থিমের ব্যাপারে তাঁর সাথে আমার মতদ্বৈততা হয়েছিল। কিন্তু ভাষার ব্যাপারে তাঁর সাজেশনটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলাম। সব লেখকেরই তিন-চারটা যুগ থাকে। লেখার প্রত্নপ্রস্তর যুগ, প্রস্তর যুগ,

ব্রোঞ্জ যুগ ... লৌহ যুগ। কম্পিউটার- ব্যবসায়ীদের বানানো কথায় যারা পা দিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই খুব বোকামি করেছে। ... ঘড়ি দেখতে দেখতেই তুমি একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারো। মানুষের তো অবসর লাগে। অবসরটা কোথায় মানুষের? আমেরিকানরা এখন ৫-৬% নাটক দেখে। আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। অষ্টম শ্রেণিতেই শান্তিনিকেতনে পালাতে চেয়েছিলাম। আধুনিকতা মানেই হচ্ছে সর্বগ্রাহিতা। ক্লাস টু-তে পড়ার সময় হাতির পিঠে চড়ে খাসিয়া পল্লীতে গিয়েছিলাম। মার্ক্সীয় ভাবনার একটি প্রধান ত্রুটি এর সাংস্কৃতিক দর্শন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি প্রাচীন বাংলার ধর্মপাল, দেবপাল এবং নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজ্য ও রাষ্ট্রনীতিকে বিশ্বাস করি। বাংলা সাহিত্য এত বড়, এত বিশাল, একটা মাছশিকারের গল্প নেই। এখনকার তরুণ লেখকেরা বিশটি ধানের নাম জানে না। নাট্যকার ক্রমেই দূরবর্তী, ডিরেক্টর একটা বড় জায়গায় চলে আসছেন। মানুষের যে নিউরোবায়োলজিক্যাল বা স্নায়ু-জৈবিক পরিবর্তন তার ভিতরে পপার এবং হকিংস, ইকলিস, এরা প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই মানুষের রূপসৃষ্টির স্থান। ফেরদৌসি মহাকাব্য যে না-পড়েছে সে শিশু। মা কৃষ্ণনগরে নজরুলের গান শুনেছিলেন দোতলা থেকে– শিকলপরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল। ক্লাস এইটে ডিকশনারি দেখে দেখে *মেঘনাদ বধ* কাব্য পড়ে ফেলেছি। আবদুল্লাহ আল মামুন প্রশ্ন শুরু করলেন– তুমি কী কী পড়েছ? আমি তখন বললাম– চেকভ, আনুই, সার্ত্র এ-সব পড়েছি। ... ব্যস পেয়ে গেলাম চেক। ৪০০ টাকা পেয়েছিলাম ('দর্শক ও সমালোচকদের জন্যও যদি রিহার্সেলের বন্দোবস্ত থাকত, চমৎকার হত।'– জাঁ আনুই)। কাম্যুর *ক্যালিগুলা* পড়ে ঘুমাতে পারিনি। রাজনীতি যারা করত, তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে উপহাস করতাম, বিশেষ করে আমরা যারা কবি ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের কালে বন্ধুরা বলল, আপনি শুধু কবিতা আর নাটক লিখবেন। আমিও তাই করতাম। আমি মূলত রবীন্দ্রনাথের পথেই চলেছি বলে মনে করি। বৌদ্ধের বাণী দিয়ে *ধাবমান* শেষ করেছি। আমি এই লেখাটায় নাট্যকার, কবি এবং ঔপন্যাসিকদের চ্যালেঞ্জ করলাম যে, ইউ শুড গো, ইউ শুড ফলো দিস লাইন– এই রাস্তায় তোমাদের আসা উচিত। ইউসুফের হাতে বাংলা নাটকের নতুন একটা গ্রামার তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে, অভিনেতার ডিএ্যাক্টারাইজড হয়ে যাওয়া। মহররমের পুঁথি থেকে, অর্ধযতি দেবার জন্য আমি তারকা চিহ্ন ব্যবহার করি। একবার যেন কোথায় গেলাম– দিগন্ত জোড়া সর্ষেফুল, মনে হল রঙের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। এক সৈনিকের সঙ্গে কথা হল; আর্টিলারিতে যারা কাজ করে, তাদের আকাশের তারার হিসাব রাখতে হয়। তো টার্ম কিন্তু একটাই– সাবলাইম, যেটাকে বলে পেরি-হাইপসু, মানে চূড়ান্ত শিল্পকর্ম। আমাদের গ্রামীণ থিয়েটার এবং গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মকাল কিন্তু প্রায় একই সময়। কিন্তু আমরা নিয়েছি কেবল ইউনিসেফের ফান্ড। কিন্তু চিরটাকালই একটি সমস্যা থেকে গেল– আমার নাটকের যে নাগরিক দর্শক, তাদের বেড়ে ওঠা হল গতানুগতিক, শাদা

চোখ দিয়ে দেখে দেখে বেড়ে ওঠা। তাদের মধ্যে ক্যাথারসিস তৈরি করাটা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। ... এই হল ঢাকা শহর। জ্বী হ্যাঁ, কালোবাজারি, চোরাকারবারির শহর, মুনাফাখোর, মজুতদারদের শহর, হাইজাকার, ব্যাংক লুটেরা ও নকলবাজের শহর। ঢাকা শহর ...।

সেলিম আল দীন, এই চিরকালের পরিচিত ঢাকা শহরের নাগরিকদের জন্য নাটক রচনা করে, একটি বিশিষ্ট নাগরিক শোকসভার জন্মদান করেন ২০০৮ সালে ১৪ জানুয়ারি।

শোকসভার আনন্দ-বেদনা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, অনুমান হয়– সেলিমের বিবিধ অভিজ্ঞান এবং ধ্যানমগ্নতা নিয়ে তর্ক তুলতে তুলতে দীর্ঘতম অভিসন্দর্ভ হয়তো লিখে ফেলবেন কেউ। সেনানিবাসের বুকের ভেতর শুয়ে থাকা নাট্যতত্ত্বের ছাত্ররা কবে ওঁর ৫০ বছর পূর্তি উৎসব করেছিল! কেউ কি সেদিন ওঁর রবীন্দ্র-প্রেমকে সম্মান দেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় আবৃত্তি করেছিল? ওঁর কিউরেটরকে বশ করে, সেলিম আল দীনের ৫০ বছর বয়সী ছবির নিচে এই অংশটুকুর জেরোক্স ঝুলিয়ে দেয়া যায়– আমার তো বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নতুন সন্ধ্যার বোঝা মাথায় করিলে তো কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব, সে কেবল ত্যাগ শিক্ষারই জন্য।

সেলিম আল দীন-মিউজিয়ামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক *হরগজ* এবং *নিমজ্জন*-এর মৃত্যু-উৎসবকে আরো বাঙ্ময় করার জন্য ওয়াল্টার বেঞ্জামিন-এর বাংলা অনুবাদ চিত্রিত করেছেন অপরূপ ক্যালিগ্রাফিতে; দর্শকবৃন্দ বেঞ্জামিনের উদ্ধৃতিতে মারিনেডির ইশতেহার পাঠ করে– সাতাশ বছর ধরে আমরা যুদ্ধকে নান্দনিকতার শত্রু হিসেবে অভিহিত করার বিরোধিতা করে আসছি। আমরা বলি যুদ্ধ সুন্দর। কারণ, যুদ্ধ গ্যাসমুখোশ, ভীতিকর মেগাফোন, অগ্নিশিখা নিক্ষেপক এবং ট্যাংকের মাধ্যমে মানুষের সর্বৈব কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করে। যুদ্ধ সুন্দর, কারণ, তা মৃত্তিকাকে সমৃদ্ধ করে মেশিনগান থেকে ঝরে পড়া আগুনের অর্কিডে। যুদ্ধ সুন্দর, কারণ– তোপধ্বনি, বিরামহীন কামান দাগানো, যুদ্ধ-বিরতি, বারুদের গন্ধ, পচনের দুর্গন্ধ– সবকিছুকে একটি সিম্ফনিতে পরিণত করে। যুদ্ধ সুন্দর, কারণ এটি নতুন স্থাপত্যকলার উন্মেষ ঘটায়। বড় বড় ট্যাংক, বিমানের জ্যামিতিক রকম-ফের এবং প্রজ্বলিত গ্রামগুলো থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি জুড়ে স্থাপত্যকলাসমূহ কেবল বিস্তার লাভ করে। ভবিষ্যৎবাদী কবি এবং শিল্পীগণ, সমর-নান্দনিকতার এই নীতিগুলো বিস্মৃত হবেন না; নতুন সাহিত্য ও শিল্পের জন্য আপনাদের সংগ্রাম এগুলো দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারে।

শিল্পের ভেতর বারুদ এবং সংগ্রামের দ্রোহ শ্মশানঘাটের আগুন ছাইয়ের মতো উড়ে-উড়ে আসুক– সেলিম আল দীন, এই কনফেশন কোথাও কি করেছিলেন? ছাপানো স্মারকগ্রন্থে সহসা আমরা এমনিতর বাক্যগুচ্ছ খুঁজে পাই না।

ধীরে ধীরে বেলা ডুবে যাচ্ছে ভেবে কিউরেটর মিউজিয়ামের দরজা-জানালা বন্ধ করতে চাইছেন। আমরা বেরুনোর জন্য দরজায় ভিড় করি। ভিজিটর্স বুকে লেখার জন্য গোপনে রবীন্দ্রনাথ নকল করেছিলাম। হতে কি পারে, কেউ দারোয়ানের অগোচরে সারা-রাত সেলিমের জাদুঘরে আটকে গেল? জাদুঘরের বাইরে অল্প-আলোয়, আকাশের কালপুরুষ দেখি অথবা সেনাশাসিত সামাজিক দিন-কালের জটায় সার খুঁজতে যেয়ে কৃষকের রক্তবমি দেখি, কৃষকের আত্মহনন পড়ি অথবা অনেক রাতে সিঁদ কেটে নিছক ভাত চুরির গল্প পড়ি। আমাদের ভোঁতা মন, মুমূর্ষু আত্মা, ক্ষুধার্ত শরীর, সেলিম আল দীনের নগদ মৃত্যুর জন্য কোথাও মায়া অনুভব করে। মিউজিয়ামের ভিজিটর্স বুকে, যা লিখতে পারিনি, তা এবার কাগজের ভাঁজ খুলে পড়ি– একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তের দেশ দেশান্তরের জল-স্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে, নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ-সূর্য থেকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যস্নাত আদিম পৃথিবীর ভাব, যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে, শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

পৃথিবীর এই চেনা ঘাস-পাতার কাঁপুনি দেখতে দেখতে এবার অনুভব হয়, মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের আলো এসে পড়েছে বন্ধ দরজায়। আমরা মিউজিয়াম-ফেরত কতিপয় মানুষ দরজার গায়ে সেঁটে থাকা পুরনো একটি ছবি দেখে আবার দাঁড়াই– একজন মঈনউদ্দীন সেলিম অথবা সেলিম আল দীন-নামক কিশোর, হাতির পিঠে চড়ে খাসিয়াপল্লীতে হারিয়ে যেতে যেতে কেবল উদ্বেলিত হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে পলায়নের পথ খুঁজে না পেয়ে। খাসিয়াপল্লী থেকে মৃদু-গম্ভীর-আনন্দময় সঙ্গীত ভেসে আসছে যেন। বহু বছর পর মালার্মের আদলে 'সংগীতের ধর্ম' ছিনিয়ে নেয়ার জেদ শুরু হয় কি ছেলেটির? (মালার্মের ভাগনার এক অনন্ত সংগীত তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যা নাটকে নিখুঁত ঐক্যকে সম্ভব করে তুলবে, যেখানে সঙ্গীত, কবিতা, দৃশ্য, মঞ্চ-রূপায়ণ, নৃত্য মিশে একই লক্ষ্যের দিকে এগুবে!) ছেলেটি অতঃপর হাতির পিঠে ঘুমুতে ঘুমুতে রম্যাঁ রলা'র 'বিশ্বগ্রন্থাগার'-এর মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির স্বপ্ন দেখে। (রম্যাঁ রলা ভেবেছিলেন গ্রন্থাগারের প্রথম পুস্তক হবে, নিজের অনূদিত রবীন্দ্রনাথের ফরাসি *চতুরঙ্গ*।) জাঁ আনুই-র নাম উচ্চারণ করে টেলিভিশন নাটকের প্রথম সম্মানী গ্রহণের সময় ছেলেটির একবার মনে হয়, বলি– 'কারিগর

যেভাবে চেয়ার বানায়, আমি সেভাবে নাটক তৈরি করি।' নাকি খুব ক্রোধ ছড়িয়ে টেলিভিশন-মহাপরিচালককে বলতে পেরেছিল– 'দর্শক ও সমালোচকদের জন্যও যদি রিহার্সেলের বন্দোবস্ত থাকত, চমৎকার হত'? দূর লোকালয় থেকে এবার অনুমান হয়– একজন স্বপ্নভুক কিশোর হাতির পিঠে এথনিক থিয়েটারের খোঁজে অরণ্যের অন্ধকার বুকের ভেতর এগিয়ে যাচ্ছে মৃদু ঘণ্টা তুলতে তুলতে; আর আমরা অধীর অপেক্ষায়, কারণ আজ থেকে দর্শক ও সমালোচকদের জন্য জঁা আনুই লম্বা এক রিহার্সেলের বন্দোবস্ত করবেন।

[লেখক: গল্পকার, প্রাবন্ধিক। পেশা: চিকিৎসক।]

মু খো মু খি

ঢাকার থিয়েটার : দর্শকের মুখোমুখি কলাকুশলীগণ

অ নু লি খ ন : সা ই ফ সু ম ন

[*থিয়েটারওয়ালা* গত ২৮ এপ্রিল ২০০৬, শুক্রবার, সকাল ০৯:৩০ মিনিটে মহিলা সমিতি মিলনায়তন, ঢাকায় আয়োজন করে এক মুখোমুখি অনুষ্ঠানের। উন্মুক্ত এই মুখোমুখি অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'ঢাকার থিয়েটার, জুলাই–ডিসেম্বর ২০০৫: দর্শকের মুখোমুখি কলাকুশলীগণ'। অনুষ্ঠানে সরাসরি দর্শকদের মুখোমুখি হন জুলাই–ডিসেম্বর'০৫-এ ঢাকার মঞ্চের নতুন নাটক *সময়ের প্রয়োজনে*, *স্বদেশী*, *কথা'৭১* এবং *অহরকণ্ডল*-এর নাট্যকার-নির্দেশক-ডিজাইনার আর অভিনেতৃগণ। *থিয়েটারওয়ালা* সম্পাদক হাসান শাহরিয়ারের সঞ্চালনে অনুষ্ঠানটি একটানা চলে দুপুর পৌনে ২টা পর্যন্ত। পাঠকদের জন্য মুখোমুখি অনুষ্ঠানটি অনুলিখন করে ছাপা হল এই সংখ্যায়।

অনুলিখন
করেছেন, *থিয়েটারওয়ালা*'র সহকারি সম্পাদক সাইফ সুমন ।]

হাসান শাহরিয়ার

সুধী দর্শক, শুভসকাল। আমাদের ঘড়িতে এখন সকাল ৯:৩০ মিনিট। নির্ধারিত সময়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের মুখোমুখি অনুষ্ঠান 'ঢাকার থিয়েটার, জুলাই–ডিসেম্বর ২০০৫: সরাসরি দর্শকের মুখোমুখি কলাকুশলীগণ'। আপনারা আপনাদের আসনে বসে পড়ুন। আমাদের অনুষ্ঠানে এবার ৪টি নাটকের কলাকুশলীগণকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। নাটকগুলো হল– *সময়ের প্রয়োজনে, স্বদেশী, কথা'৭১* এবং *অহরকণ্ডল*। অনুষ্ঠান পরিকল্পনাটা আপনাদের জানিয়ে দিই। আমরা একটি নির্দিষ্ট নাটকের নাট্যকার-নির্দেশক আর ডিজাইনারদের মঞ্চে ডাকব এবং অভিনেতৃগণ থাকবেন দর্শক-সারিতে। যে-কোনো দর্শক নির্দিষ্ট নাটকের উপর প্রশ্ন রাখতে পারবেন, তবে যারা নির্দিষ্ট নাটকটি মঞ্চে দেখেছেন তারাই পাবেন প্রশ্ন করবার অগ্রাধিকার। প্রথম পর্বে প্রত্যেক নাটকের জন্য বরাদ্দ থাকছে ৫০ মিনিট করে। ৪টি নাটকের প্রথম পর্বের প্রশ্নোত্তর হয়ে যাবার পর ৪ নির্দেশক মঞ্চে এসে বসবেন এবং তখন প্রশ্নোত্তর পর্বটি থাকবে উন্মুক্ত। অর্থাৎ যে-কোনো নাটকের উপর প্রশ্ন করা যাবে এবং নির্দেশক বা নির্দেশকের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট নাটক-সংশ্লিষ্ট যে-কেউ এর উত্তর দিতে পারবেন। তাহলে শুরু করা যাক। আমি প্রথমেই মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি থিয়েটার আর্ট ইউনিটের *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকের কলাকুশলীদের। মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি নির্দেশক মোহাম্মদ বারী, সংগীত পরিকল্পক সেলিম মাহবুব (অনুপস্থিত), মঞ্চ পরিকল্পক কামালউদ্দিন কবির ও পোশাক পরিকল্পক ফরিদা আকতার লিমাকে।

সুধি দর্শক প্রশ্ন করুন।

বিপ্লব বালা

[নাট্যশিক্ষক, নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের নিয়মিত লেখক]

এখন হয়তো এই প্রশ্নটির মানে নেই, তবুও করা যেতে পারে ... সেটা হল– *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকটা যে করা হল, ঠিক এখনই এটা করা হল কেন? গল্পটা যখন লেখা হয়, তখন সেটা তখনকার সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছে। কিন্তু এখন আপনার নাটক কতটা সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছে বলে মনে করছেন?

মোহাম্মদ বারী

[নির্দেশক-অভিনেতা, সময়ের প্রয়োজনে]

বিপ্লব দা' কে ধন্যবাদ। সেই সাথে *থিয়েটারওয়ালাকে* ধন্যবাদ, এ-রকম একটি মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমাদের নাটক *সময়ের প্রয়োজনে*-কে সম্পৃক্ত করায়। অনুষ্ঠানটি শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে হয়ে আসছিল। কিন্তু এবার এক আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এটি সেখানে অনুষ্ঠিত হতে পারল না। আমি আমার ও আমার দলের পক্ষ থেকে এর নিন্দা জানাই এবং শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যেন এই অনুষ্ঠানটি সেখানে হতে পারে। আমি বিপ্লব দা'র প্রশ্নের উত্তরে যাই, সেটা হল সময়ের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের একটি গল্প এবং বাঙালি জাতির সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ঘটনা হল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পরে বড় কোনো ঘটনা বাঙালির জীবনে আছে বলে আমার মনে হয় না। তো মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে জহির রায়হান একটি ক্যাম্পের ঘটনার চিত্র এঁকেছিলেন কথা দিয়ে। এই গল্পে এক জায়গায় আছে যে, ক্যাম্প কমান্ডার সহযোদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করছেন– কেন তোমরা যুদ্ধ করছ? এর উত্তরে একেক মুক্তিযোদ্ধা একেক উত্তর দিচ্ছে ... কেউ বলছে ওরা (পাকিস্তানিরা) আমাদের শোষণ করছে, কেউ বলছে ওরা আমাদের মা-বোনদের অত্যাচার করছে তার প্রতিশোধ নিতে চাই, কেউ-বা বলছে আমরা ভূখণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। তারপর কমান্ডার সব উত্তর মেনে নিয়েই বলছে– তোমাদের সব কথাই ঠিক, তারপরও আমরা আসলে যুদ্ধ করছি সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের আহ্বানেই আমরা যুদ্ধে নেমেছি। অর্থাৎ সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার রূপান্তরে, যেহেতু নাটকটা করছি সেই মুক্তিযুদ্ধেরই ৩৫ বছর পর এবং দেখতে পাচ্ছি যে, যুদ্ধের ফলাফলটা কী হয়েছে– তাই আমি বলিয়েছি, এই নাটকে, যে– আসলে আমরা যুদ্ধ করছি শান্তির প্রয়োজনে, মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে। কারণ, আমার কাছে মনে হয়েছে– কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধটা হয়নি, প্রয়োজন ছিল মানুষের মুক্তি এবং এই মুক্তির জন্যই আমরা সর্বক্ষণ মুক্তিযুদ্ধ করে যাচ্ছি। সে-কারণে জহির রায়হান যেখানে বলেছেন– সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধ করছি, সেখানে আমি রূপান্তরের সময় আরেকটু যোগ করেছি যে, আমরা যুদ্ধ করছি শান্তির প্রয়োজনে, মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে। এই জন্য আমার মনে হয়েছে এই নাটক এখনও সময়ের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ধন্যবাদ।

সৈয়দ শামসুল হক

[নাট্যকার]

এখানে রূপান্তরের কথা বলা হল ... তো এটাকে কি রূপান্তর না অবলম্বন বলব? আমার মনে হয় এই টার্মিনোলজিগুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার। তুমি রূপান্তর বলছ, রূপান্তর কিন্তু একটি মর্মান্তিক কথা ... একটি রূপকে পাল্টে দেয়া। ঢাকাইয়া ভাষায় যাকে বলে– খোমা বদলে দেয়া। তো এটা পরিষ্কার করবে কি যে, তুমি গল্প অবলম্বনে

করেছ না অনুপ্রাণিত হয়ে করেছ না ছায়া অবলম্বনে করেছ না একেবারে 'খোমা' পাল্টে করেছ, কোনটা?

মোহাম্মদ বারী

খুব যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছেন হকভাই। কিন্তু আপনার কাছে এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম। আসলে আমি যেটা করেছি– ইংরেজিতে যাকে বলে এ্যাডাপ্টেশন, তারই বাংলা বলছি আমি 'রূপান্তর'। আমি বরং আমি কী করেছি বলছি, আপনি বলে দিন প্রকৃতপক্ষে এটাকে কী বলা যায়। আমি যা করেছি সেটা হল– মূল গল্পটির প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে, গল্পের সূত্র থেকে নতুন কিছু ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি তৈরি করেছি। তো এটাকে কী বলব?

মামুনুর রশীদ

[অভিনেতা-নাট্যকার-নির্দেশক]

গল্পটি জহির রায়হানের। তুমি এটির নাট্যরূপ দিয়েছ– রূপান্তর করনি। পশ্চিমবঙ্গে একটা রেওয়াজ আছে, ওরা বলে– গল্পঃ ওমুক (ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ), নাটক : ওমুক ... তো তুমি যেটা করতে পারতে সেটা হল– গল্প : জহির রায়হান, নাটক : মোহাম্মদ বারী। হকভাই-কে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলে ধরবার জন্য। কোনটা রূপান্তর আর কোনটা নাট্যরূপ আর কোনটা অবলম্বন– সেটা আমাদের পরিষ্কার থাকা দরকার। কারণ, আমাদের এখানে রূপান্তরের নামে যা হচ্ছে তা কিন্তু ভয়াবহ। যেমন ব্রেখটের নাটকের ব্যাংকের মালিক, সেটাকে যদি গুদারাঘাটের বেপারি করা হয় তা হলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভয়াবহ হবে।

মোহাম্মদ বারী

রুশিয়ারে অবশ্য আমরা 'নাট্যরূপ' কথাটাই ব্যবহার করি।

অনন্ত হিরা

[নাট্যজন– প্রাঙ্গণে মোর]

আমি হকভাই-এর কাছেই জানতে চাচ্ছি– জহির রায়হান যে রূপটা দিয়েছেন, সেটা গল্প আর বারীভাই কিন্তু আরেকটা 'রূপ'-ই দিয়েছেন। মানে গল্পকে নাটকের রূপ দিয়েছেন। হকভাই বলছেন– রূপান্তর বড় নির্মম, আমি বলব একজন শিল্প-নির্মাতাকে তো শিল্প সৃষ্টির জন্য নির্মম হতেই হবে। বারীভাই তো রূপান্তরই করেছেন মনে হচ্ছে, হকভাইয়ের কী মত?

সৈয়দ শামসুল হক

আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি অভ্যাসবশতক। অনেকের মুখে শুনেছি বা পত্রিকায় পেয়েছি, সেটাই আমিও লিখে ফেলছি। কিন্তু এই যে রূপান্তর ব্যাপারটি ... আমি ব্যক্তিগতভাবে রূপান্তর পছন্দ করি না। কারণ, রূপকে পাল্টে দেয়াটা একমাত্র পারেন যদি একই ব্যক্তি হন। কী রকম? যেমন রবীন্দ্রনাথ যখন *চিত্রাঙ্গদা*কে কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য করেন, এটা সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ার। এটি রূপান্তরিত একটি সংস্করণ। আর কতগুলো চালু কথা আছে, যেমন– অবলম্বন, ইংরেজিতে যাকে বলে বেইজড অন। এ্যাডাপ্টেশন আর রূপান্তর কিন্তু এক না। বারী যেটা বলল এ্যাডাপ্টেশন এবং রূপান্তর এক, না এক না কিন্তু। এ্যাডাপ্টেশনকে অবলম্বন বলা যেতে পারে। আর নাটকের ব্যাপারে একটা কথা বলি– নাটকে কিন্তু মৌলিক গল্প খুব কমই হয়। সেই সফোক্লিস থেকে শুরু করে একেবারে ... কার কথা বলব, মানে আমার ছেলে এখন নাটক লেখার চেষ্টা করছে ... সে পর্যন্ত, শোনা কথা–জানা কথা– অন্যের গল্প– প্রচলিত ইতিহাস– পুরাণ- মিথ ... এগুলোকে নিয়ে নাটক লিখতে চাচ্ছে। সমগ্র শিল্পকর্মের মধ্যে কেবল নাটকেই এই বিষয়টি বেশি পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সূত্র, বিভিন্নকাহিনী বা তার আখ্যানভাগ নেয়া হয়ে থাকে। শেক্সপিয়রও করেছেন। তার আগেও *হ্যামলেট* লেখা হয়েছে দু'বার আবার কেউ কেউ বলে ছ'বার। তাঁর ৩৬ টি নাটকের মধ্যে মৌলিক কাহিনী মাত্র ২টি। ব্রেশটেরও তা-ই ... ইতিহাস থেকে নেয়া, অন্যের কাছ থেকে নেয়া গল্প। এমনকি ব্রেশট এমনও করেছেন যে, উনি স্বীকারও করেননি যে, এটা অমুকের গল্প বা ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আমরা যা-ই করি না কেন– সেটা রূপান্তর না অবলম্বন না ছায়া অবলম্বন, সেটাতে পরিষ্কার থাকা। আমি এখন যে নাটকটি প্রায় শেষ করে এনেছি সেটিকে বলছি– 'বীজ অবলম্বনে'। আজ থেকে বহু শত বছর আগের এক নাট্যকারের বীজ অবলম্বনে এটা করছি। কিছু প্যারালাল সংলাপ, চরিত্রও পাওয়া যাবে, তবুও বীজ অবলম্বনে বলছি। ঐ বীজটাকে আমি একটা নতুন জমিনে প্ল্যান্ট করছি, ভাষা পাল্টে দিচ্ছি, চরিত্রও পাল্টে দিচ্ছি, সময় পাল্টে দিচ্ছি।

তো আমি বোধহয় কিছুটা লম্বাই করে ফেললাম, এই লম্বা করার কারণ আমাকে আসলে একটু উঠতে হবে। অনেক সময় ভালোবাসার মানুষদের রেখে বাজারেও যেতে হয়, আমার বেলাতেও হয়েছে তা-ই। যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু আগে থেকে কথা দিয়েছিলাম তাই যাচ্ছি। যাবার আগে আমি বলতে চাই, এই আয়োজন অবশ্যই এক চমৎকার আয়োজন। আমরা সবাই মিলে কথা বলছি। এই সুযোগটা আরো বেশি বেশি হওয়া দরকার। আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্য *থিয়েটারওয়ালা*কে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ বারী

হকভাই যাওয়ার আগেই একটু বলতে চাই যে, হকভাই বা মামুনভাই, এঁনারা হচ্ছেন আমাদের কাছে একটা আদর্শের জায়গা ... তো থিয়েটারের কালগুলোকে যদি দশক-ওয়ারি ভাগ করি তাহলে সত্তরের দশক হল আমাদের উন্মেষকাল, আশির দশক পুরোটাই রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করল নাট্যকর্মীরা আর নব্বুই দশকে এসে যখন আমাদের নাটক একটা পরিশীলিত রূপ পেতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই আকাশ সংস্কৃতি আর বাজার অর্থনীতির দাপটে আমাদের থিয়েটার একটু দর্শক হারাল। আমরা মনে করছি এটা সাময়িক সমস্যা কারণ, জীবন্ত মাধ্যমের সাথে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কম্পিটিশন হতেই পারে না। তবে এটা মানতেই হবে যে, আমরা আমাদের দর্শক হারিয়েছি– অন্তত পুরনো দর্শক যে হারিয়েছি এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বর্তমান যে দশকটি চলছে, সেটিকে আমি বলতে চাই– পালা বদলের কাল। এখন অনেক নবীন নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতৃ কাজ করছেন এবং আমরা মনে করি অনেক ভালো কাজ করছেন। তো আমি বেশ আক্ষেপ করেই বলতে চাই যে, এই পালা বদলের কালে আমাদের সিনিয়র নাট্যজনেরা কিন্তু আমাদের কাজগুলোকে দেখতে আসছেন না। আমাদের কাজের ভালো-মন্দ দিকগুলো যদি ওনারা নাটক দেখে ঠিক করে দিতেন, তা-হলে আমরা আরো ভালো কাজ করতে পারতাম। কাজের অনুপ্রেরণা পেতাম।

গোলাম শফিক

[নাট্যজন– পালাকার]

হকভাই-এর কথার প্রসঙ্গ ধরে আমি একটু বলতে চাই যে, ঢাকার মঞ্চে আমরা অনেক রূপান্তরিত নাটক, গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে নাটক দেখেছি। ইদানিং যেটা যোগ হয়েছে যে, কোনো বরেণ্য ব্যক্তির ডাইরি অবলম্বনে নাটক হচ্ছে। এটি খুবই ভালো কথা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– এই নবনির্মাণ করতে বা নাটকে রূপান্তর করতে গিয়ে আমাদের কোনো অন্তর্নিহিত নীতিমালা বা ইথিকস মেনে চলা উচিত কি উচিত না? কারণ আমি সব সময় বিষয়টিকে একটা সেন্সেটিভ বিষয় হিসেবে লক্ষ করছি ...

হাসান শাহরিয়ার

একটু পরিষ্কার করলে বোধহয় ভালো হয়। ধরুন *সময়ের প্রয়োজনে* বা *বিনোদিনী* নাটকে এধরনের কিছু পেয়েছেন কি?

গোলাম শফিক

না, এটি সাধারণ প্রশ্ন। এটি উল্লেখিত নাটকগুলোর ব্যাপারে না-ও হতে পারে। আমি বারীভাইকে প্রশ্ন করছি এ ধরনের রূপান্তরে রূপান্তরকারীর বা নব-নাট্যনির্মাণকারীর কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করা উচিত?

মোহাম্মদ বারী

আমি যেটা মনে করি যে, একজন রূপান্তরকারীর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। রূপান্তরের যে বিষয়টি, যেটি অনন্ত হিরা একধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছে, যে, এটি তো এক ধরনের রূপেরই বদল হচ্ছে। গল্প থেকে নাটক, মানে কাঠামোটাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে– সাহিত্য থেকে দৃশ্যকাব্যে রূপান্তর। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে, নাট্যরূপ বা রূপান্তর যেটাই হোক না কেন সেটা যিনি করেন তার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

নূনা আফরোজ

[নাট্যজন– প্রাঙ্গণে মোর, নির্দেশক– স্বদেশী]

আমি বারীভাইয়ের একটু আগের কথার প্রসঙ্গে বলতে চাই ... সেটা হল, আমাদের সিনিয়র নাট্যজনরা নাটক দেখেন না। এই প্রক্রিয়াটি যদি চলতে থাকে তো আমি ভীষণভাবে শংকিত যে, আমাদের সিনিয়ররা কি আলটিমেটলি নাটকের সাথে জড়িত থাকবেন না? তো আমরা জুনিয়ররা কী করছি, কেমন করছি এই বিষয়টি তো শেয়ারিং হচ্ছে না। এই বিষয়ে মামুনভাই বা হকভাইয়ের কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

মামুনুর রশীদ

আমি নিজ থেকেই ভাবছিলাম, এই কথাটার জবাব দেয়া দরকার। আমার প্রশ্ন হল থিয়েটারে কি নবীন প্রবীণ বলে কোনো কথা আছে? একজন সিনিয়র যদি ভালো নাটক করতে না পারে, তাহলে কি শুধু সিনিয়র বলেই লোকে সেটা দেখতে আসবে? আর জুনিয়াররা ভালো করলেও সেগুলো দেখতে আসবে না? হকভাইয়ের কথাই যদি বলি, উনি আমার কত সিনিয়র! সেই ছোটবেলা থেকে ওনার সাহিত্যকর্মের সাথে আমি পরিচিত। কিন্তু উনি কি আমার বন্ধু নন? সেই বন্ধুত্বটা তৈরি হবে কিন্তু সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়েই। আজকে সকালে আমি ভাবছিলাম যে, *থিয়েটারওয়ালার* এই আয়োজনে আমি কেন যাচ্ছি? তো আমার মনে হল আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে যাচ্ছি। কারণ, আজকের এই আয়োজনে যারা মুখোমুখি হচ্ছে তারা সবাই নবীন, এবং আমি মনে করি এই নবীনদের সাথে লড়াই করেই আমাকে টিকে থাকতে হবে। সুতরাং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কী ভাবছে, কী করছে, সেটা আমার জানা দরকার। এই জন্যই এখানে আসা। আর হ্যাঁ, আমাদের সিনিয়রদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা নিজেদের নাটক ছাড়া অন্য-কোনো নাটক দেখেন না। তারা হয়তো ভাবেনও যে,

তাদের নাটক ছাড়া অন্যদের নাটক আসলে হয়ও-না। তো তারা যদি না আসেন তাহলেও তোমাদেরই-বা কী আসে-যায়?

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। তবু একটা কথা বলা প্রয়োজন, সেটা হল মামুনভাই– আপনারা যখন কাজ শুরু করেছিলেন, তখন কোনো সিনিয়র নাট্যকর্মী ছিলেন না। সুতরাং আপনাদের অনুপ্রাণিত করার মতো অভিভাবক হয়তো ছিলেন না, কিন্তু আবার আপনাদের কাজে বাধা দেবার লোকও কিন্তু কেউ ছিলেন না। আমাদের অভিভাবক থাকার ফলে হয়েছে কী, সহযোগিতা না করলেও মাঝে মাঝে অসহযোগিতা পেয়ে যাই, আর তখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।

কামালউদ্দিন কবির

[নাট্যজন– জন্মসূত্র, নির্দেশক– অহরকগুল, মঞ্চ পরিকল্পক– সময়ের প্রয়োজনে]

মামুনভাইয়ের কথা প্রসঙ্গে বলি, হ্যাঁ, শিল্পসৃজনের ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের অবশ্যই বিভেদ না রাখাই ভালো, কারণ শিল্পকর্মই তার নতুনত্ব, সৌন্দর্য, সৌকর্য প্রকাশ করবে। তারপরও একটি নাট্যকর্ম নিয়ে যখন একজন মামুনুর রশীদ, একজন সৈয়দ হক বা একজন আতাউর রহমান কথা বলেন, তখন অবশ্যই সেটা আমাদের জন্য একটি বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতে চাই– সম্প্রতি একটি নাট্যপত্রে দেখলাম, শ্রদ্ধেয় আতাউর রহমান ভাই লিখেছেন– '... আরেকটি প্রবণতা বাংলাদেশের মঞ্চে ইদানিং লক্ষ করছি। তা হল, ন্যারেটিভ থিয়েটারের নামে বেশ কয়েকটি নাটকের
দল ঢাকা থিয়েটারের এবং সেলিম আল দীনের নাট্য-রচনাকে অযোগ্য অনুসরণ করছেন।... ।' এখন এই লাইনটি পড়ে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, শ্রদ্ধেয় আলোচক এই সময়ের যে-সমস্ত তরুণ নাট্যজন ন্যারেটিভ থিয়েটারের চর্চা করছেন, তাদের সব কাজগুলোকেই দেখেছেন। কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, আমার *অহরকগুল* নাটকটি, যেটি কিনা বর্ণনাত্মক রীতিতে নির্মিত সেটি উনি দেখেননি। তো এই যে না দেখেই ঢালাও মন্তব্য করা, এটা কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, ওনার মন্তব্য কিন্তু অন্যান্য দর্শকদের উপর প্রভাব ফেলবে। ধন্যবাদ।

হাসান শাহরিয়ার

কিছু কথা হল যেগুলো ঠিক *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকের উপর ভিত্তি করে না, তবুও বিষয়গুলো জরুরি ছিল বলে সময় দিলাম। তো আমি আশা করছি এই সময়টুকু *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকের বরাদ্দ থেকে কাটা যাবে না। আমি এই নাটকের উপর প্রশ্ন চাইছি।

ঠাণ্ডু রায়হান

[নাট্যজন– আরণ্যক নাট্যদল, আলো পরিকল্পক– স্বদেশী]

আমার প্রশ্ন বারীর কাছে, যদিও প্রশ্নটা আলো বিষয়ক, সেটা হল *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকে আম্বার কালার বলে একটি আলো মঞ্চে বারবার এসেছে ... সেটা যুদ্ধের সময়ে এসেছে, দুঃখের সময়ে এসেছে ... একই রঙ বারবার এসেছে। আরেকটি আলো ছিল, গোবো লাইট ব্যবহার করা হয়েছে, প্রথমেই যে পর্দাটা থাকে মঞ্চের সামনে এর উপর, যেটা হলে ঢুকেই চোখে পড়ে। কিন্তু নাটকের আর কোথাও সেই আলোটি ব্যবহার করা হয়নি। এটা কেন?

মোহাম্মদ বারী

আসলে লাইট ডিজাইনার নাসিরুল হক খোকন এটার ভালো উত্তর দিতে পারতেন। উনি এই অনুষ্ঠানে আসতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন, তো আমি নির্দেশক হিসেবে এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি ডিজাইনারের সাথে প্রথম আলাপকালেই বলেছিলাম যে, টোটাল নাটকেই আমি একটা মৌন ছবি চাই, উজ্জ্বলতাটা একটু কম চাচ্ছিলাম। তো টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে যেটা বললেন যে, আম্বার কালারের ব্যবহার এগুলো আমি খুব একটা বুঝি না। আর শুরুতেই পর্দার উপর যে লাইটের কথাটা বললেন, সেটা আমি যুদ্ধের পটভূমির জায়গাটা স্বচ্ছ পর্দার ব্যবহার করেছিলাম আর মূল নাটকটা অর্থাৎ ক্যাম্পের সময় পর্দাটা উঠিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অনেকের কথায় বোঝা গেল যে, এই শুরুর লাইট ফেলাটা তেমন কিছু তৈরি করছে না, ফলে এটা এখন বাদ দিয়ে দিয়েছি। তবে গোবো লাইটের ব্যবহার আমরা পরেও করেছি, নাটকের শেষের দিকে যখন সুশীলের মৃত্যুসংবাদ আগে তখন রক্ত ঝরার জায়গাতেও আমরা ব্যবহার করেছি ... মানে ভেতরের ক্ষরণটা বোঝাবার জন্যই গোবো ব্যবহার করেছি। ধন্যবাদ।

ফয়েজ জহির

[নাট্যজন– আরণ্যক নাট্যদল, মঞ্চ পরিকল্পক– স্বদেশী]

আমি মনে করি একজন ডিজাইনার হিসেবে নাটক দেখতে যাওয়ার আগে একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে নাটক দেখতে যাওয়া উচিত। তো আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে সেট ডিজাইনার কবির ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন রাখছি– নাটকের নাম যেহেতু *সময়ের প্রয়োজনে* এবং বারীভাই যেভাবে বললেন যে, মানুষের শান্তির প্রয়োজনে, মুক্তির প্রয়োজনে যুদ্ধ হয়েছে, তো সেই জায়গাটা উপলব্ধি করে আপনি আপনার ডিজাইনে এই সময়টা কীভাবে দেখেছেন?

কামালউদ্দিন কবির

ধন্যবাদ জহির ভাই। যে-কোনো নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করার সময় আমরা প্রথমেই যে কাজটা করি, সেটা হল, নাটকের প্রেক্ষাপটটি কী বা ঘটনাটি কোথায় ঘটছে, কোন সময়ে ঘটছে, সেটা মাথায় রাখা। *সময়ের প্রয়োজনে* একটি বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নাটক। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এটাতে বাস্তবানুগভাবে মঞ্চ পরিকল্পনা করব না। এরপর কী করলাম এটা একটু বলি, তাহলে তরুণ নাট্য-শিক্ষার্থী যারা আছেন, তারা উপকৃত হতে পারেন। আমি এই কাজটির জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সচিত্র তথ্যগুলো খোঁজা শুরু করলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পেইন্টিংস দেখা শুরু করলাম। আসলেই একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্পের ঘটনা এবং এতই বাস্তব ঘটনা যে, ক্যাম্পের যাবতীয় উপকরণ দিয়েও করা যেত, কিন্তু এই যে প্রশ্ন করা হল– সময়ের প্রয়োজনটা আমি কীভাবে দেখেছি, সেজন্যই আমি খুঁজতে থাকলাম এ-সময়টাকে কীভাবে সামনে আনা যায়। তো এই খোঁজাখুঁজির মধ্যেই পেয়ে যাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পী শাহাবুদ্দিনের একটি পেইন্টিং, যেটির নাম 'মুক্তিযোদ্ধা'। তো এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনায় বলা যায় যে, শাহাবুদ্দিনের ঐ চিত্রকর্মটিরই একটা ত্রিমাত্রিক অবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তবে নিশ্চয়ই শিল্পী শাহাবুদ্দিনের পেইন্টিং-এ যে গতিশক্তি, যে ফোর্স, সেটি হয়তো আনা সম্ভব হয়নি, কেননা পেইন্টিং-এ রঙ-এর যে নানা ব্যবহার, নানা বৈচিত্র্য, সেটি মঞ্চে থ্রি-ডাইমেনশনালি তৈরি করাটা বেশ কঠিনই হয়ে পড়ে। তবে চেষ্টা করেছি ঐ গতিটা কোনোভাবে আনা যায় কিনা। কিন্তু আপনি ডিজাইনার হিসেবে নিশ্চয়ই বোঝেন যে, কোনো ডিজাইন এককভাবে হয়ে উঠতে পারে না। সব ডিজাইনের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক থাকতে হয়। এবং সেটের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক থাকতে হয় আলোর। এক্ষেত্রে আমার সাথে লাইট ডিজাইনারের যেটুকু আলাপ আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, সেটা ঠিক করে উঠতে পারিনি আমরা। এটা যে-কারো কারণেই হতে পারে, তবে আমি আমার সেট নিয়ে কিছুটা অসন্তুষ্ট এই আলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে না পেরে। আবার পেছনে সেটে যে রেখাগুলো তৈরি করেছিলাম, যে উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলাম, সেটাও আলোর সমন্বয়ের অভাবে হয়ে ওঠেনি। তো *সময়ের প্রয়োজনে*-র নাটকের সেটে আমি চেয়েছিলাম– মুক্তিযুদ্ধের যে গতিশক্তি, ফোর্স এখন থাকা দরকার, যেটা শাহাবুদ্দিনের পেইন্টিং-এর আছে, সেটাকে তুলে ধরতে। আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে সেই গতিটার এখন বেশি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

হাসান শাহরিয়ার

সময়ের প্রয়োজনে-র নির্দেশককে আমি আবার পরে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাব। এখন আপাতত মঞ্চের সবাইকে দর্শক-সারিতে বসতে এবং দর্শক-সারি থেকে প্রাঙ্গণে মোর-

র *স্বদেশী* নাটকের সাথে জড়িত নির্দেশক ও ডিজাইনারদেকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে আসবেন– নূনা আফরোজ, ঠাণ্ডু রায়হান ও ফয়েজ জহির। আমরা জানি জগলুল আলম অসুস্থ। সে এই নাটকের সঙ্গীত পরিকল্পক। কিন্তু ডাক্তারের বারণ আছে জনসমাগমে তার আসতে।

ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এখন *স্বদেশী* নাটকের উপর প্রশ্ন চাচ্ছি।

কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন
[নাট্যজন– প্রাচ্যনাট]
রবীন্দ্রনাথের নাটক বলতেই আমরা একধরনের ছবি দেখি, আবার একধরনের নস্টালজিয়াও কাজ করে বা আমরা আগে যা দেখেছি, সেই জিনিসগুলোও কাজ করে। তো আমি নির্দেশকের কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনি নির্দিষ্ট কোন ভাবনা থেকে কাজটি হাতে নিয়েছেন?

নূনা আফরোজ
অভিনয়ের দিক থেকে আমি সম্পূর্ণই রবীন্দ্রনাথকে মাথায় রেখে ... মানে সেই সময়, সেই ভাবনা মাথায় রেখেই কাজটা করেছি। রবীন্দ্রনাথের বাইরে যদি গিয়ে থাকি তবে সেটা অবচেতনভাবেই গিয়েছি। কিন্তু আমার ভাবনা পুরোটাই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই ছিল। আপনি যে নস্টালজিয়ার কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথের কাজের ব্যাপারে, আমার মনে হয় আমিও সেখান থেকে খুব একটা বের হয়নি।

কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন
কিন্তু এই সময়ে আপনি *স্বদেশী* নিয়ে কাজ করেছেন, সে-ক্ষেত্রে একটু অন্য কিছু ভাবা যেত কিনা? আমরাতো কোলকাতায় যারা করেছে তাদেরটা কেউ কেউ দেখেছি, আর আমরা অডিও-তে শুনে থাকি। তো আপনার কি মনে হয় নি, ঐ জিনিসটা রিপিট না করে অন্য কিছু বা অন্য ভাবনায় এখানে কাজ করা যেত?

নূনা আফরোজ
আপনি কি আরেকটু পরিষ্কার করবেন, ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন?

কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন
আমি স্পেসিফিক্যালি বাচিক অভিনয়টার কথা বলছি। মানে সেই একই পুরনো ভঙ্গিটা না রেখে আমরা এখন যেভাবে কথা বলি, সেরকম কিছু কি করা যেত না?

নূনা আফরোজ
আমার তো মনে হয় আমরা পুরোপুরি সেই বাচনিক ভঙ্গি থেকে বের হওয়ার চেষ্টাই করেছি। আপনি বোধহয় শম্ভু মিত্র যেটা করেছিলেন, সেটার কথা বলছেন, মানে ওঁর বাচনিক ভঙ্গির কথা ... আমরা কিন্তু ওটা মাথাতেই রাখিনি। ফলে ওদের চেয়ে আলাদা কিছু করতে হবে সেই ভাবনা নিয়ে কাজই করিনি।

কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন
না, সংলাপ শুনে কিন্তু মনে হয়েছে এক ধরনের আর্টিফিসিয়াল জিনিস কাজ করেছে। সংলাপ বলার ধরনে এক ধরনের মেকি ভাব ছিল বলে মনে হয়েছে।

নূনা আফরোজ
যদি মেকি ভাব মনে হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আরো চেষ্টা করবো পরবর্তী সময়ে ওটা কাটিয়ে উঠতে।

তানসেন নিকলী
[নাট্যজন– দৃশ্যপট]
চার অধ্যায় উপন্যাস অবলম্বনে নাটক করলেন, নাম দিয়েছেন– *স্বদেশী*। কেন, নামটি *স্বদেশী* করলেন কেন?

নূনা আফরোজ
হ্যাঁ, নামটি *চার অধ্যায়*ও রাখা যেত। উপন্যাস হিসেবে চার অধ্যায় নামটি আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু এর মঞ্চরূপ দিতে গিয়ে ঐ নামটি আর আমার ভালো লাগেনি। তাই আমি স্বদেশী নাম দিয়েছি।

গোলাম শফিক
নাটকটি দেখার পরপর আমি কিছু দর্শক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে অভিনয় নিয়ে। নূনা আফরোজ যখন দীর্ঘ সংলাপ বলছিলেন, তখন এটাকে কেউ কেউ বলেছে যে, শ্রুতিনাট্যের আদল চলে এসেছে। এ ব্যাপারে নূনা আফরোজের কী মনে হয়?

নূনা আফরোজ
আসলে এই নাটকটিতে এত বেশি কথা আছে যে, সে-কারণেই এমন মনে হল কিনা কী জানি। কিন্তু এটাকে শ্রুতিনাটক মনে হোক এটা নিশ্চয়ই আমরা চাইনি। ফলে আমরা এখন থেকে এ ব্যাপারটা সচেতনভাবে লক্ষ্য করব।

গোলাম শফিক

আমার যেটা মনে হয়েছে, শারীরিক অভিনয় এই নাটককে তেমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

নূনা আফরোজ

সেটা না হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ, এটা মূলত সংলাপনির্ভর নাটক, বাচিক অভিনয়নির্ভর নাটক। আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছি, সেখানে শারীরিক অভিনয় সেভাবে ডিমান্ড করে কি? আমি পরিকল্পিতভাবেই ব্লকিং ও মুভমেন্ট কম রেখেছি, কারণ, গভীর কথাবার্তার সময় মানুষ তো মুভ কম করে, তাই না? আমরা বাচনিক জায়গাটাতে জোর দিয়েছি বেশি।

নাহিদ সুলতানা স্বাতী

[নাট্যজন– প্রাচ্যনাট, পোশাক পরিকল্পক– কথা'৭১]

আমার প্রশ্নটাও অভিনয় নিয়ে। আমার মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথের নাটক শুধুমাত্র কথা - সর্বস্ব। শুধু শোনার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাটক না। তাহলে থিয়েটার দেখতে আসব কেন? *স্বদেশী*-তে মনে হয়েছে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী খুব বেশি সতর্ক ছিলেন ওনাদের উচ্চারণ নিয়ে, বাচনিক জায়গাগুলো নিয়ে। যার ফলে রিয়েলিস্টিকের বাইরের মনে হয়েছে। তো এখন যদি রবীন্দ্রনাথ করি তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, কেন করব? কীভাবে করব? বিশেষত অভিনয়টা। *স্বদেশী*-র ক্ষেত্রে মনে হয়েছে আরো বেশি সময় নিয়ে, চর্চা করে চরিত্রটা নিজের মধ্যে এ্যাডাপ্ট করে করা উচিত।

নূনা আফরোজ

আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সাজেশনগুলো মনে থাকবে। আর একটা কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক মানেই মুভমেন্ট কম বা এ্যাক্টিং অন্যরকম তা কিন্তু আমি বলিনি। আমি বলেছি, *স্বদেশী* যেভাবে ডিজাইন করেছি সেখানে বাচনিক জায়গাটতে জোর দিতে চেয়েছি। তবে হ্যাঁ, যদি এর ফলে এটাকে শ্রুতিনাটক মনে হয়ে থাকে, তবে আমরা তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করব। কারণ, আমরা এটাকে শ্রুতিনাটক বানাতে চাইনি।

কুমার প্রীতীশ বল

[নাট্যজন– ঢাকা পদাতিক, নাট্যকার– কথা'৭১]

আমি জানতে চাচ্ছি, ২০০৫-এ দাঁড়িয়ে কেন আপনি রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* নিয়ে *স্বদেশী* নাটক করার কথা ভাবলেন। রবীন্দ্রনাথের তো আরো উপন্যাস বা নাটক ছিল?

নূনা আফরোজ

চার অধ্যায় ১৯৩৪ সালে লেখা স্বদেশী আন্দোলনের উপর, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লেখা এই নাটক। আমরা কি আজকে, এই ২০০৫-৬ সালে, ঐ জায়গা থেকে সরে আসতে পেরেছি? এই উপন্যাস বা গল্প কি এখনও প্রাসঙ্গিক না? আর তা ছাড়া যদি বলেন কেন করলাম, সেটা হল এই উপন্যাস আমার পছন্দের উপন্যাসগুলোর একটি। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাস পছন্দ করতেন না– সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উনি এটা লিখেছেন। এই সময়ে চারিদিকে এমন সন্ত্রাসের সময় এটাকে মঞ্চে আনতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

কুমার প্রীতীশ বল

সেই সময় তো সন্ত্রাসী বলা হত যারা স্বদেশী ছিলেন, তাদেরকে। এবং এই সন্ত্রাসবাদ শব্দটা স্বদেশীদের উপর ব্রিটিশরা চাপিয়ে দিয়েছিল। সূর্যসেনকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছিল। আজকে কিন্তু সন্ত্রাসবাদ আর সেদিনের সন্ত্রাসবাদ-এর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে।

নূনা আফরোজ

নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথেরই একটি কথায় আছে ... এটা সম্ভবত ১৯০৮ সনে বলেছিলেন যে–দেশীদের নাম করে অন্যায়কেও ন্যায় বলিয়া ধরিয়া নিই, তাহলে সেই পতন ঠেকাইবে কে?।' আসলে যেটা অন্যায় সেটাকে অন্যায় হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিত। সেই সময়ের সন্ত্রাস আর এই সময়ের সন্ত্রাস এক না কিন্তু সন্ত্রাস তো? আমার কথা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

ফয়েজ জহির

এই নাটকে আমি এবং ঠাণ্ডু রায়হান একই সাথে কাজ করেছি। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াও ছিল। তারপরও নাটকটি যখন দেখি, তখন একধরনের প্রশ্ন মনে থেকে যায় এবং আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলো দর্শকের মাঝেও বিদ্যমান। তো ঠাণ্ডু রায়হানের কাছে আমার প্রশ্ন–*স্বদেশী* নাটকের যে প্রেক্ষাপট নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে যে টানাপোড়েন, যে সংগ্রাম, সেই জায়গার রঙটাকে উনি কীভাবে দেখেছেন, এটা যদি একটু বলতেন।

ঠাণ্ডু রায়হান

স্বদেশী নাটকের লাইট করার জন্য নূনা যখন আমাকে ফোন করল, আমি এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, *চার অধ্যায়* আমার আগেই পড়া ছিল, আর তরুণ নির্দেশকদের সাথে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। তো আমি ওদের মহড়া দেখতে গেলাম। আমরা যারা নেপথ্যে কাজ করি, মানে ডিজাইনের সাথে যুক্ত, তাদের প্রথমত নাটকটা ভালো লাগতে হবে নিজের কাছে এবং একটা ধাক্কা পেতে হবে। কারণ, ধাক্কা

না পেলে কোনো কিছু বের হয় না। তো আমার মহড়া পছন্দ হল। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমি এই নাটকে ব্লু এবং হলুদ দুটি কালার বেশি ব্যবহার করেছি। মানে ধূসর একটা কালার আনার চেষ্টা করেছি। আর একটু আগেই দর্শকদের কাছ থেকে যেটা বলা হয়েছে যে, এই নাটকে কথা বেশি– হ্যাঁ, আমিও চিন্তা করলাম, কথাই যেহেতু বেশি, তাই বেশি আলোর মধ্যে থেকে যদি এত কথা বলে, তাহলে দর্শকের ভালো লাগবে না। তাই জোন জোন ভাগ করে আলোগুলো ব্যবহার করেছি এবং লক্ষ করলে দেখবেন এক জোন থেকে অন্য জোনে যাওয়ার সময় পেছনে একটা সবুজ কালার ব্যবহার করেছি– দিস ইজ দ্য সিম্বল অব স্বদেশী। এই নাটকে মিউজিকও চমৎকার করেছে, জগলুল বরাবরই ভালো করে। তো নাটকের শুরুতেই ও যে মিউজিকটা দেয়, নূনা আমাকে বলল– ঠাণ্ডুভাই এটার সাথে আমি কিছু একটা চাচ্ছি। তো আমি করলাম কী, যখন বন্দে মাতরম দিয়ে নাটক শুরু হয়, সেখানে মঞ্চের পেছনে একটা আগুনের ইফেক্ট তৈরি করলাম। এবং নাটকটা শুরু করলাম প্রচণ্ড একটা ব্রাইট আলো দিয়ে। এবং শেষ করেছি কিন্তু আবার ছোট্ট একটা আলো দিয়ে। যখন দুজনই মারা গেল, ওদের ছোট্ট একটা আলোতে ফেলে দিলাম। আর প্রেক্ষাপট যেহেতু অনেক আগের তাই আমি হলুদের ব্যবহার করে ধূসরকে ধরতে চেয়েছি। ধন্যবাদ।

আবদুল্লাহ আল মামুন তাজু

[নাট্যদর্শক, বাম রাজনীতির সাথে জড়িত]

আসলে চার অধ্যায় যে উপন্যাস, তৎকালীন সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটো ধারা ছিল– একটা হল মহাত্মা গান্ধীজীর ধারা এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ধারার লোক ছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র যখন *পথের দাবী* লিখলেন তখন তারই জবাব হিসেবে *চার অধ্যায়* লেখা হয়েছিল। আমার মনে হয় সেদিনের যে প্রেক্ষাপট এবং আজকের বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট সেখানে সন্ত্রাসবাদের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য এ নাটকে সেটাকেও গ্রাস করে ফেলা হয়েছে। আজকে মৌলবাদীদের সন্ত্রাসবাদের যে প্রভাব তাকে কীভাবে ফেস করা যায় এই জায়গাটা আনা দরকার ছিল।

নূনা আফরোজ

ধন্যবাদ আপনাকে। সন্ত্রাস আসলে এই নাটকের মূল বক্তব্য না, এটি একটি প্রধান বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ আসলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি প্রেমের উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন– *চার অধ্যায়* তাঁর একটি প্রেমের উপন্যাস। আমিও কিন্তু সেদিকটাই ধরবার চেষ্টা করেছি। সন্ত্রাস একটি বিষয় হিসেবে এসেছে, মূল বিষয় নয়।

বিপ্লব বালা

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সন্ত্রাস আর এখনকার সন্ত্রাস এক না– এ কথাটা ঠিক আছে, কিন্তু এই সময়ে কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে সেটা দেখতে হবে। যেমন ধরা যাক, ইন্দ্রনাথ যে চরিত্র সে যে পর্যায়ের তাত্ত্বিক, তার বুদ্ধির যে ক্ষমতা ... সেই জায়গায় এখনকার যারা সন্ত্রাসী তাদের মধ্যেও কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ থাকে এবং তার মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের আদর্শবাদও থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে, ওটা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হতে পারত যদি আমরা ইন্দ্রনাথকে দেখতাম এখনকার কোনো সাংঘাতিক ব্যক্তি যে মানুষকে মটিভেট করতে পারে। এমন প্রচুর লোক কিন্তু এখনও আছে যাদের আমরা খারাপ বলছি, কিন্তু আসলে তারা সমাজের জন্যই কাজ করছে। সেটা পোশাকে, অভিনয়ে সব মিলিয়েই করা সম্ভব ছিল। এমনকি ডায়লগ না পাল্টিয়েও করা সম্ভব ছিল। সেই আইডেন্টিফিকেশনের সমস্যাটা বোধহয় ছিল এই নাটকে। রবীন্দ্রনাথের লেখা, অনেক আগের ব্যাপার ... এগুলো ঠিক ভালো লাগে না, আমাদের চেনা চেনা মনে হতে হবে তো। অতিন, ইন্দ্রনাথকে তো চেনা চরিত্র লাগে না এখন। মানে এগুলো ভেবে করলে হয়তো আরো ভালো কাজ দাঁড়াতে পারত।

নূনা আফরোজ

ধন্যবাদ বিপ্লব দা'। আপনি অবশ্য কোনো প্রশ্ন রাখেননি। মতামত দিয়েছেন। আসলে আমি এই নাটকে সন্ত্রাসবাদ বা ঐ সময়টাকে ধরা, এ-ধরনের কোনো ভিউ থেকে দেখিনি। আমি এক হচ্ছে প্রেমের জায়গাটা ধরতে চেষ্টা করেছি আর হচ্ছে সব গল্প বা উপন্যাসকে এখনকার সময়ের মতো করে করতে হবে, সেভাবেও ভাবিনি।

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। আমরা পরে আবার *স্বদেশী* নাটকের নির্দেশককে মঞ্চে ডাকব। এখন আপাতত মঞ্চের সবাইকে দর্শক-সারিতে গিয়ে আসন নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি আর দর্শক-সারি থেকে ঢাকা পদাতিকের *কথা'৭১* নাটকের নাট্যকার-নির্দেশক সহ সব ডিজাইনারদের মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। কুমার প্রীতীশ বল, দেবাশীষ ঘোষ, মঞ্জুর আহমেদ (অনুপস্থিত), সাইদুর রহমান লিপন (অনুপস্থিত), আবদুল হালিম প্রামাণিক (অনুপস্থিত), নাহিদ সুলতানা স্বাতী আপনারা মঞ্চে চলে আসুন।

ধন্যবাদ। *কথা'৭১*-এর ওপর প্রশ্ন করবার জন্য অনুরোধ করছি।

আকতারুজ্জামান
[নাট্যজন– সময় সাংস্কৃতিক দল]
কথা'৭১ নাটকটা দেখতে মিলনায়তনে ঢুকেই যেটা দেখি যে, একটা রাজনৈতিক মঞ্চ এবং সেখানে ভাষণ দিচ্ছে– ... এই হবে, সেই হবে। কিন্তু এই ভাষণটা সরাসরি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে না দিয়ে অন্য কিছু ব্যবহার করা যেত কিনা। এটা আমার নির্দেশকের কাছে প্রশ্ন।

দেবাশীষ ঘোষ
[নাট্যজন– ঢাকা পদাতিক, নির্দেশক– কথা'৭১]
ধন্যবাদ আকতারকে এবং সেই সাথে *থিয়েটারওয়ালা*-কে ধন্যবাদ এরকম একটি অনুষ্ঠানে ঢাকা পদাতিককে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। *কথা'৭১* নাটকের ডিজাইনটা আমি যেভাবে করেছি যে, দর্শক টিকেট কেটে যখন এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের লবিতে ঢুকবে তখন থেকেই যেন নাটকটার সঙ্গে ইনভলব হতে শুরু করে। এজন্য তারা যখন হলের লবিতে ঢোকে তখন বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখতে পায়, আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন টার্নিং পিরিয়ডগুলোর প্রদর্শনী ... সেই '৪৭ থেকে '৫২ বা তারপর এক এক করে আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুর প্রদর্শনী, যাতে করে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে যে, সে একটা সমাবেশে যাচ্ছে। তারপর সে যখন হলে ঢোকে তখন দেখতে পায় একটা সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ততক্ষণে কিন্তু অন্যান্য দর্শকও ঢুকছে। ঢুকছে আর বুঝতে পারছে যে, সে একটা সমাবেশে এসেছে, সেই পরিবেশটা যেন পায় সেকারণেই এটা আমি এভাবে ডিজাইন করেছি।

বিপ্লব বালা
হ্যাঁ, সেটা বোঝা গেছে। তবে রিয়েলিস্টিকভাবে যে-সব শ্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে– সেগুলো এখনকার বাস্তবতায় যান্ত্রিক বা মিথ্যা মনে হয়েছে। এখনকার থিয়েটারে সেই শ্লোগানকে সত্য ভাবাতে গেলে অন্যরকমভাবে আনতে হবে। এই জনসভাও-তো এখন আর নেই। এই বাস্তবতাটা তো মনে রাখতে হবে। মনে রেখে তো কাজটা করতে হবে। সেখানে বোধহয় কোথাও কিছু মিস হয়েছে। আমার মনে হয় টোকেন হিসেবে সব আছে কিন্তু এই টোকেন বর্তমান বাস্তবতায় কী ক্রিয়া করছে এটা কোথাও মিস হয়েছে বলে মনে হয়, যার ফলে উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়েছে।

দেবাশীষ ঘোষ
স্পেসিফিক্যালি কোন জায়গাটার কথা বলছেন, জনসভার জায়গাটা?

বিপ্লব বালা
সব মিলিয়েই বলি তাহলে। শুরুতে যে পিসগুলো করা হয়েছে, লবিতে, ওগুলোর একটা-দুটো ছাড়া বাকিগুলো খুবই মেকানিক্যাল, প্রথাগত। এমন সরলভাবে করা হয়েছে যে, কোনো ক্রিয়া করে না। এবং হলে ঢুকেই যে ভাষণ শোনা যায় সেটা কোনো ক্রিয়া করে না ভেতরে। এই ভাষণ দিয়ে একধরনের করুণা আদায় করতে চাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রটি, সেটা খুব লজ্জাও লাগে।

দেবাশীষ ঘোষ
বিপ্লব দা, আমি যেটা করতে চেষ্টা করেছি, সেটা হল, সাধারণত মিটিংগুলোতে কী দেখা যায় ... দেখা যায় যে, মূল বক্তারা আসার আগে অনেকেই বক্তৃতা দিয়ে মানুষ জমিয়ে রাখে। সেগুলো হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কথা না-ও হতে পারে। তো আমিও চাচ্ছিলাম যে, দর্শক টিকেট নিয়ে নিজ আসনে বসতে বসতে এই কথাগুলো চলতে থাকুক, যাতে মনে হয় যে, একটা সমাবেশেই এসেছে। এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমি চাচ্ছিলাম-ও না।

বিপ্লব বালা
কিন্তু সেটা তো আমার সিরিয়াসনেস নষ্ট করছে। একটা টিপিক্যাল সমাবেশের বাজে পরিবেশ আনছে। সেটা কি এই নাটকে আমরা চাইছি?

দেবাশীষ ঘোষ
না, তা চাইছি না।

কাজী চপল
[নাট্যজন– ঢাকা পদাতিক, অভিনেতা– কথা'৭১]
আমি নাটকের একজন অভিনেতা এবং ঐ সমাবেশে আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বক্তৃতা করি। পিতা এবং পুত্রের একটা দ্বন্দ্ব তো চলে এই নাটকে ... তো আমি এখানে একজন হতাশ পিতা, যে '৭১ সালে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু আজকের সমাজে সে পরাজিত। অভিনেতা হিসেবে আমার উপলব্ধিটা ছিল এরকম।

বিপ্লব বালা
কিন্তু হতাশ মুক্তিযোদ্ধা যেভাবে বলছে, সেই বলাটা দর্শক হিসেবে আমার কাছে সত্যি লাগছিল না এবং এই বলা কথাগুলো এত ব্যবহৃত, ক্লিশে, এত নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে যে, সেগুলো আর টানে না।

অপূর্ব
[জনৈক দর্শক]
টিকেট কেটে দর্শক হলে ঢোকার পর তার সময় নষ্ট না করার যে মনোভাব, সেটা ভালো লেগেছে এবং দর্শককে যে আপনারা বিচ্ছিন্ন ভাবেননি, এটাও ভালো লেগেছে। আমার দুটো প্রশ্ন– প্রথমটা রচয়িতার কাছে– এই নাটকে '৭১-এর সরাসরি ঘটনা চলে এসেছে ৭৫ ভাগ আর ২০০৫ সালে পিতা-পুত্রের মুখোমুখি বিষয়টি ২৫ ভাগ। প্রশ্ন হচ্ছে, পিতা-পুত্রের যে কন্ট্রাডিকশন, এটাই কি বেশিরভাগ সময় জুড়ে আনা যেত না? আনলে কি ভালো হত না? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি নির্দেশকের কাছে– আপনি *কথা*'৭১-এর ডিজাইন যেভাবে করেছেন, তাতে করে এক্সপেরিমেন্টাল হল ব্যতীত অন্য কোথাও কি এটার মঞ্চায়ন সম্ভব? বরিশাল বা চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও করার ব্যাপারে আপনি কী ভেবেছেন?

ফয়েজ জহির
আমি এই সাথে একটা প্রশ্ন করে নিই। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের বা সংকটের যে ব্যাপারটা
এসেছে, সেখানে পিতাকে দেখানো হয়েছে হতাশাগ্রস্ত, কেন? পুত্র গিটার কিনছে, পুত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে, পুত্র ইংরেজিতে গান গায় ... তো এতসব ব্যাপারে কি পিতা কনসার্নড না? এদ্দিন পর এসে সে হতাশ হচ্ছে কেন? আর এতদিন ধরে একজন মুক্তিযোদ্ধা কী করে তার পুত্রকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শোনায়নি? তাহলে কি পিতা দায়িত্বহীন? তার মানে তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পিতাও লালন করেনি। এ বিষয়গুলো আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

এম. এ. সবুর
[নাট্যদর্শক, নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক]
আমিও এরই সাথে একটি প্রশ্ন করে দিতে চাই, তাহলে উত্তর দিতে সুবিধা হবে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য একটা ভীষণ শিক্ষণীয় বিষয়, একটা কষ্টের বিষয়, একটা স্মৃতিচারণের বিষয় এবং আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। এই নাটকে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয়েছে ... নির্যাতন, তখনকার অনেক ছবিসহ, আরো অনেক কিছু। কিন্তু এটার জন্য তো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বা জাতীয় জাদুঘরই আছে। এখানে তো সেগুলোকে ব্যবহার করে থিয়েটার তৈরি করতে হবে। তা হয়নি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ফয়েজ জহিরের সাথে একমত হয়ে বলতে চাই, কোনো মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের বয়স যদি হয় ২০/২২ বছর, আর সেই পিতা যদি তাকে এতদিনেও মুক্তিযুদ্ধের কোনো গল্প বা চেতনা বা বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই না

বলে থাকে, তাহলে ঐ পিতার আহাজারিতে আমাদের কিছু যাবে-আসবে কি? আমার কাছে এগুলো বেশ আরোপিত মনে হয়েছে। এ বিষয়গুলো নাট্যকার কী ভেবেছেন একটু জানতে চাই।

কুমার প্রীতীশ বল

ধন্যবাদ। তিনজনের প্রশ্নের আমি একসাথেই জবাব দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি আসলে যে জায়গাটা ধরতে চেয়েছি সেটা হল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সন্তানদেরকেই তৈরি করতে পারেননি, নিজের ঘরকেই ঠিক করতে পারেননি। নিজে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বা মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী চার মূল নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু সে তার পরের জেনারেশনকে তৈরি করতে পারেননি, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই যে চলে যাচ্ছে, সেটাও তারা খেয়াল করেননি। বরং তারা বাইরে মাঠে বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের কথা বলছেন। নাটকের শুরুতে দেখতে পাই একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন যুদ্ধাপরাধী সাংসদের বিচার চাইতে এক সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এবং বাসায় ফিরে দেখছেন তার ছেলেই মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনার জায়গায় নেই। তখন সে তার ছেলেকে মটিভেট করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ছেলের সামনে তুলে ধরেন। আমি চেয়েছিলাম, যারা এখন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন অথচ তার নিজের ঘরই ঠিক নেই, তাদেরকে একটু জাগিয়ে তুলতে।

দেবাশীষ ঘোষ

আমি প্রীতীশ দা'র সাথে একটু যোগ করতে চাই, সেটা হল– *কথা* '৭১ নাটকের মূল ভাবনাটা মুস্তফা ভাইয়ের (দলের সিনিয়র সদস্য, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী) মাথায় এসেছিল, এবং তা পিতা-পুত্রের বাস্তব দ্বন্দ্ব থেকেই। সেটা হল কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়াতে ওয়াজ করতে যাওয়ার কথা ছিল সাঈদীর। তো ওখানে যারা মুক্তিযোদ্ধা আছেন বা পক্ষের প্রগতিশীল লোকজন আছেন, তারা এটার বিরোধিতা করলেন। এবং কোনোভাবেই যেন এই যুদ্ধাপরাধী সেখানে ঢুকতে না পারে তার সেজন্য ক্যাম্পেইন করতে নামলেন। তো যখন তারা বাঙালি পরিবারগুলোতে ক্যাম্পেইন করছেন, দেখা গেল সেখানকার তরুণ ছেলে-পেলেরা সাঈদীর পক্ষ নিল। তাদের ভাষ্য হচ্ছে– সাঈদী কখন কী করেছে তা তাদের জানার দরকার নাই, সে এখন নির্বাচিত সাংসদ, এটাই তার বড় পরিচয়। আর সে যদি '৭১ সালে বিরোধিতা করে থাকে বা ধর্ষণ করে থাকে তাহলে তার বিচার করতে পারতেন, যেহেতু বিচার করেননি, সেহেতু নিশ্চয়ই ঐ বিরোধিতা বা ধর্ষণের যৌক্তিক কারণ ছিল। ... তো যে ছেলে এ-কথাগুলো বলেছিল, তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনি ওখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনেক বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। তো এমন পিতার এমন সন্তান ... মানে *কথা*'৭১-এ আমরা এই ব্যাপারটাই আনতে চেয়েছিলাম।

ফয়েজ জহির

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা ভিন্ন। ঐ পিতার মধ্যেই তো স্ববিরোধিতা আছে। সে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, এখন দেশ ছেড়ে চলে গেছে, এবং এতদিন ধরে সেখানে বক্তৃতা দেন কিন্তু নিজের ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধের কিছুই শেখাননি ... এটা তো স্ববিরোধিতা। যে পিতার মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে, সে নিজের ঘরের জন্যও কিছু করতে পারেন না, সমাজের জন্যও কিছু করতে পারেন না। এধরনের বাবাদের জন্য যে ধরনের শ্লেষ বা ঘৃণা জন্মানোর প্রয়োজন ছিল, সেটা এই নাটকে উচ্চারিত হয়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখলাম সবাই খুব আবেগে আপ্লুত এবং অনেকেই কাঁদছে। তো কান্না কি আমাদের ক্ষোভকে বা ঘৃণাকে প্রশমিত করে দেয় না?

কুমার প্রীতীশ বল

জহির ভাই, কান্না কিন্তু মানুষের ক্ষোভকে আবার বাড়িয়েও দিতে পারে। আমাদের সব শো-তেই দেখি লোকজন কাঁদে। তো একদিন এক দর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম যে– আপনার এই ইমোশনের কারণ কী? উনি বললেন যে, আমার দুটো রুমাল ছিল, দুটোই ভিজে গেছে। বললাম কেন? তিনি বললেন– আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছিল ঐ পিতাটা আমি নিজে।

এম. এ. সবুর

বাহ্! মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম, স্বাধীন করে দেশ থেকে চলে গেলাম অস্ট্রেলিয়াতে ... এটা হচ্ছে স্কেপিজম। যে-দেশের জন্য যুদ্ধ করলাম সেদেশে চাওয়া পাওয়া মিলল না, তখন ঐ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে নিজে বাঁচতে চলে গেলাম ... সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ওনার কাছে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের জায়গায় নাই, এখন ছেলে-পেলে নিয়ে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে মুখ্য। সেজন্যই কিন্তু তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধে কেউ গেছেন বুঝে, আর কেউ গেছেন আবেগে। আবেগে যে গেছেন সে আজকে হতাশাগ্রস্ত হতেই পারেন। কিন্তু যে বুঝে গেছেন, সে কিন্তু আজকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, এই প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায়। যে শ্লোগান নিয়ে '৭১-এ যুদ্ধ করেছিলেন, সেই একই শ্লোগান দিয়ে এখনকার বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি দেবেন– এটা অলীক বিষয়। সুতরাং এই অলীক জায়গায় থেকে মুক্তিযুদ্ধকে ভাসা-ভাসাভাবে কো-রিলেট করা আমার মনে হয় উচিত না।

দেবাশীষ ঘোষ

তা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা দেখাতে চেয়েছি– আমাদের সন্তানদের আমরা সঠিক পথ দেখাইনি। আর অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেবার কথা যেটা বললেন, সেটা হল একেজনের

বাস্তবতা একেক রকম। অস্ট্রেলিয়ায় অনেকের এমনও সন্তান আছে যারা 'মেড ইন পাকিস্তান' দেখলে সেই পণ্য কেনে না। তো আসলে সন্তানকে কে কীভাবে নিজের সংস্কৃতি বোঝাবে তার উপর নির্ভর করবে সেই সন্তানের বেড়ে ওঠা। আমরা সেটাই ধরতে চেয়েছি।

কুমার প্রীতীশ বল

আপনারা যেটা তুললেন যে, আজকের দিনে কেন এই *কথা*'৭১ করা ... তো আমি বলব, আজকের যে মৌলবাদীদের উত্থান, তাদের ক্ষমতায় যাওয়া, এ-সব কিছুর যদি সঠিক বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে ঐ '৭১ সালেই ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকেই বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে। এ-জন্যই আমি এটাকে এ-সময়ে প্রাসঙ্গিক মনে করেছি।

জনৈক

না, এখানে কেউ কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বোধহয় বলতে চায়নি। বলা হচ্ছে, যে ভাষায় বা ডিজাইনে আপনারা এটাকে উপস্থাপন করেছেন, সেটা দিয়ে নতুন করে কোনো দাগ কাটা যাবে না।

মাহফুজ

[নাট্যজন– প্রাঙ্গণে মোর]

আমার দুটো প্রশ্ন। একটা আগে একজন করেছেন, কিন্তু উত্তর পাইনি ... সেটা হলো নাটকটি কি কেবল এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে করবেন বলেই এমন ডিজাইন করেছেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল– এত বড় বা বিশাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের ফলে নাটকের অভিনয়ের জায়গাটা কমে গেছে বলে মনে হয়েছে। নির্দেশকের কী মত?

দেবাশীষ ঘোষ

কথা'৭১ ডিজাইন করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে নয় মাসের কথা আমি বলছি ... বিশাল ক্যানভাস! এটা যখনই ভাবছিলাম, আমি এটাকে কোনোভাবেই প্রসেনিয়ামে ঢোকাতে পারছিলাম না। তো যখন এক্সপেরিমেন্টাল হলের সুবিধাটা বা হলের সুযোগগুলোর কথা আমি জানলাম, তখন জায়গাগুলোর ব্যবহারের লোভ আমি সামলাতে পারি নি। এই ব্যাপারে শিল্পকলায় কর্মরত বন্ধু জসীম আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। সুতরাং, মূলত বলা যায়, এই নাটকটি ঐ হলের কথা মাথায় রেখেই করা। আর অভিনয়ের কথা যদি বলেন, আমি মনে করি যদি কেউ পারফরমেন্স করতে পারেন, তবে তা ছোট বা বড় স্পেস কোনো ব্যাপার না। তবে যদি আপনার মনে হয়ে থাকে যে অভিনয়ের দিকটার ঘাটতি ছিল, তাহলে দর্শক হিসেবে আপনার কমেন্টকে

অবশ্যই গুরুত্ব দেব। তবে আমার মনে হয় ওরা যথাসাধ্য ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে।

কামালউদ্দিন কবির
আমি ডিজাইন নিয়ে একটু বলতে চাই। *কথা'*৭১-এর সামগ্রিক উপস্থাপনা, যেটা মিলনায়তনের লবি থেকে শুরু হয়ে ভেতরে পর্যন্ত বিস্তৃত, এই সামগ্রিক উপস্থাপনা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কেন না, সমগ্র ব্যাপারটিতে একটি থিয়েট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন আছে। যেটা আমার ভালো লেগেছে। তবুও আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই, প্রথমত– সেট ডিজাইনে, বিশেষ করে সেট প্রপস হিসেবে নাটকের এক পর্যায়ে অনেক মৃতদেহের ডামি ব্যবহার করা হয় ... যেটা কিনা অনেক ব্যয়-সাপেক্ষ। এটার কতটুকু প্রয়োজন ছিল? দ্বিতীয়ত– কস্টিউম ডিজাইনে কোনো নাট্যিক উপস্থাপনা করা যেত কিনা ... যেহেতু সমগ্র উপস্থাপনাটাই নাট্যিক ছিল। মানে বাস্তব কস্টিউম ডিজাইনে কেন যাওয়া হল?

দেবাশীষ ঘোষ
আমি আমার অংশটুকুর জবাব দিচ্ছি ... ২৫ মার্চে '৭১-এর জগন্নাথ হলের ঘটনাটা ভিজ্যুয়াল করার চিন্তাটা যখন মাথায় আসল তখন ডিজাইন করতে গিয়ে ৮/৯ জন পারফরমার পাচ্ছিলাম, যারা দলের এবং নাটকের ঐ সময়ের জন্য ফ্রি। তো বিশাল এই ঘটনাটা এই কয়জন দিয়ে ডিজাইন করাটা আমার মনপুতঃ হচ্ছিল না, আমার মতো করে ছবিটা বানাতে পারছিলাম না। তাই এর ভয়াবহতা বোঝাবার জন্য অনেকগুলো ডামি ব্যবহার করতে হয়েছে।

নাহিদ সুলতানা স্বাতী
আমি কস্টিউমের ব্যাপারে নির্দেশকের সাথে অনেক কথা বলেছি। আমিও চাচ্ছিলাম সাজেস্টিভ কিছু করার, কিন্তু ডিরেক্টর বললেন যে– না আমি যেহেতু ডকুমেন্ট্রির মতো কাজ করছি, সেজন্য রিয়েলিস্টিক ডিজাইনই চাচ্ছি। তখন আমি ঐ সময়ের পোশাকের উপর ভাবনা-চিন্তা করে, ঐ সময়টাকেই ধরতে চেয়েছি।

দেবাশীষ ঘোষ
হ্যাঁ, স্বাতীকে আমি কস্টিউম ডিজাইনের ব্যাপারে জ্বালিয়েছি। ও চাচ্ছিল পাকিস্তানি আর্মির পোষাক র‍্যাবের সাথে মিলিয়ে কালো করতে। কিন্তু যেহেতু এটা একটা ডকুড্রামা, সেহেতু এখানে ঐ সময়টাকে ধরা খুব জরুরি, তা না হলে এখনকার প্রজন্মের কেউ ভুল বুঝতে পারে।

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। আমি এখন অনুরোধ করব *কথা'৭১*-এর কলাকুশলীদের গ্যালারিতে আসন নেবার জন্য এবং পরে আমি এই নাটকের নির্দেশককে আবার মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাব। আর সেই সাথে অনুরোধ করছি জন্মসূত্রের প্রথম প্রযোজনা *অহরকণ্ডল* নাটকের কলাকুশলীদের মঞ্চে আসবার জন্য। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি– কামালউদ্দিন কবির, অসিত কুমার ও ফরিদা আকতার লিমাকে।

ধন্যবাদ। আমি *অহরকণ্ডল* নাটকের উপর প্রশ্ন চাচ্ছি।

গোলাম শফিক

আমি নির্দেশকের কাছে জানতে চাইবো, তিনি *অহরকণ্ডল*-এ প্রচলিত কোনো প্রপস ব্যবহার করেননি কেন? এই প্রপস ব্যবহার না করার পেছনে বিশেষ কোনো চিন্তা কাজ করেছিল কিনা? অথবা উনি কি মনে করেন অভিনয়ের মাধ্যমে প্রপসের ঘাটতিটা পূরণ হয়েছিল?

কামালউদ্দিন কবির

অহরকণ্ডল-এর পাণ্ডুলিপিটা বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত হয়েছে। এটা উপস্থাপন করতে গিয়ে আমরা প্রধানত আমাদের যে দেশজ নাট্যরীতি যা যা আছে এবং যেখানে বর্ণনা এবং অভিনয় একাকার হয়ে থাকে, সেই দিকটাতেই আমার মূল মনোযোগ ছিল। এবং এই উপস্থাপনার প্রতিটি জায়গায় আমরা চেয়েছি আমরা যেন আমাদের নিজস্ব নাট্যরীতির একটি আধুনিক নাগরিক নাট্য-পরিবেশন তৈরি করতে পারি। যেহেতু আমরা নাগরিক শিল্পীরা নাগরিক দর্শকদের সামনে এটা উপস্থাপন করছি। তো লোকজ নাটক বা দেশজ নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ন্যূনতম উপাদান সহযোগে অনেক কিছু উপস্থাপন করা। এই শিল্পশক্তিটি মনে রেখেই আমরা হুবহু কোনো দেশজ উপাদান বা দেশজ আবহ তৈরির চেষ্টা করিনি, বরং ঐ যে শিল্পশক্তি, সেটি কথা এবং অভিনয় দিয়েই দর্শকের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। তো এখানে বলে রাখা ভালো যে, জন্মসূত্রের প্রথম প্রযোজনা *অহরকণ্ডল*, আমাদের দিক থেকে একটা নিরীক্ষা ছিল যে, এই কথা, এই বর্ণনা দিয়ে দর্শকের সাথে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারি। তো এখনো সেই নিরীক্ষা শেষ হয়নি। প্রতিটি প্রদর্শনীতেই আমাদের এক ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে মনে করি প্রচলিত কোনো প্রপস ব্যবহার না করেই ঐ মুহূর্তটির নাট্যগুণ বের করা গেছে।

এম. এ. সবুর

নাটকটাতো একটা রাতের ঘটনা। সেখানে আলোক প্রক্ষপণেও রাতের আবহ তৈরি হয়েছে কিন্তু নাটকটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আরো যে-সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হয়, সেখানে মিউজিক একটা বড় ব্যাপার। রাতে তো সাধারণত ঝিঁঝিঁ পোকা বা শেয়াল ডাকে। তো কিছু কিছু জায়গায় মনে হয়েছে যে, এগুলো যদি ভাবা হত, তাহলে পরিবেশটা আরো গ্রহণযোগ্য হত। এটা নির্দেশক বা সঙ্গীত পরিকল্পক বলবেন যে, এটা কি সচেতনভাবেই বাদ গেছে না অবচেতনভাবে? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে– দানিউল চরিত্রটা নিয়ে। সমাজে দানিউল শ্রেণিটা হচ্ছে একটা বঞ্চিত শ্রেণি এবং এই বঞ্চনাটা এত বেশি যে, কিছু পেতে তারা কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তো দানিউলের বঞ্চনার জীবনের যে ক্ষোভ এটা বর্ণনার ভেতর দিয়ে যা বলে, তা কোনো এ্যাকশনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হত। বর্ণনার ভেতর দিয়ে যখন যায়, তখন মনে হয় তার ভেতরে ক্ষোভ-যন্ত্রণা, তার ভেতরে সত্য চেনার যে প্রয়াস, সেটার শক্তিটা বোধহয় নাটকের মধ্যে কমে যায়। এই বিষয়টি দর্শক হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে। তো যদিও নির্দেশক একটু আগে রীতির কথা বলেছেন, তবুও আমার কাছে মনে হয়েছে, বর্ণনার জায়াগুলো এ্যাভয়েড করে কোনো নাট্যক্রিয়ার দ্বারা দৃশ্য তৈরি করা যেত কিনা?

মোহাম্মদ বারী

সঙ্গীত বিষয়ে আমারও একটা প্রশ্ন আছে, এখনই বলে ফেলি, তাহলে একসাথে উত্তর দিতে পারবেন। আমি *অহরকণ্ডল*-এর তিনটি প্রদর্শনী দেখেছি, তো প্রথম দিকের শো-তে আবহসঙ্গীতটি আমার কাছে পরিমিত বা সঙ্গত মনে হয়েছিল, একটা নীরবতার মধ্যে ধ্বনির যে ভাষা, সেটা পেয়েছিলাম। কিন্তু একেবারে লাস্ট শো-টা দেখে মনে হল সাউন্ড কিছু বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে রাতের নীরবতার মধ্যে বাতাস দেয়ার জন্য একটা সাউন্ড ইফেক্ট দেয়া হয়েছে, যেটা খুবই ডিস্টার্বিং মনে হয়েছে। এখন এটা তৈরি করা না যান্ত্রিক গোলযোগ বুঝতে পারলাম না।

অসিত কুমার

প্রথমে সবুরভাইয়ের প্রসঙ্গটা নিয়ে বলি যে, রাতের আবহে শেয়ালের ডাক, ঝিঁঝিঁ, প্যাঁচার ডাক, এগুলো প্রাথমিক ভাবনায় এসে যায়। আমাদেরও এসেছিল, কিন্তু টেক্সট-টা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখি যে– নিশীথরাতের এ-সব শব্দাবলি বদিউজ্জামান আলমগীরের হাতে কবিতায় রূপান্তরিত হয়। যখন এ-সব শব্দ কবিতারূপে আসে টেক্সট-এ তখন সঙ্গীত আয়োজনের জায়গায় একটা সংকট তৈরি হয়। আমি সেই সংকটে পড়েছিলাম। চরিত্রের বর্ণনায় এসে যায়– রিনিকি ঝিনিকি ঝিনিকি (টেক্সট থেকে উদ্ধৃত) ... তো রাতের আবহ উপস্থাপনে এ শব্দগুলো তো অসাধারণ। এই

নাটকের আবহ সঙ্গীত করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমার আসলে কিছু করার নেই। সঙ্গীত আপনাতেই এই নাটকের অর্ন্তনিহিতরূপে উপস্থিত ভীষণ শক্তি আর কাব্যিক মাধুর্য নিয়ে। তো রাতের আঁধারে আপনি যে আবহ সঙ্গীত চাচ্ছেন সেটা মূলত রিয়েলিস্টিক। কিন্তু এই নাটকের ডিরেক্টরিয়াল ডিজাইন রিয়েলিস্টিক না, অভিনয় রিয়েলিস্টিক না, এবং নাটকটাও সেই অর্থে রিয়েলিস্টিক না ... সেখানে আমি রিয়েলিস্টিক সাউন্ড থ্রো করি কীভাবে? প্রতি শো-তেই আমি একটু একটু ভিন্ন করছি, মানে নিরীক্ষা শব্দটি ব্যবহার করতে একটু ইয়ে লাগে, কিন্তু আসলে নিরীক্ষাই বোধহয় চলছে এবং চলবে। অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও নৈঃশব্দ এবং শব্দের একটা ইন্টার প্লে আছে, যেজন্য আমি খুব সাবধান থাকবার চেষ্টা করেছি যে নৈঃশব্দের সম্ভাবনাকে আমি ব্যাহত করছি কিনা। এই নাটকের তিনটি চরিত্রের যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট আছে সেটা কিন্তু আমাদের কাছে আসে উল্টো পথে। তারাতো সংকটগুলো নিয়েই বড় হয়েছে, তারা মিথ, বিভিন্ন লোক-উপাদান শ্রবণে বড় হয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষই তাদের সংস্কৃতির, তাদের লোকজীবনের, তাদের বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। আমরা নাটকের এই মানুষগুলো দেখি উল্টো জায়গা থেকে। প্রকৃতি, সমাজ, পরিবারের মধ্যে তার কন্সট্রাকটেড হয়েছে, আমরা তাদের ডি-কন্সট্রাকশনটা দেখি। ফলে আমাকে এই ডি-কন্সট্রাকশনটা ধরার চেষ্টা করতে হয়েছে। এবং ধরতে গিয়ে কিছু কিছু কাজ করতে হয়েছে। এখন বারীভাইয়ের প্রশ্নের ব্যাপারে বলি– উনি যে বিষয়টা নিয়ে দর্শক হিসেবে ডিস্টার্ব ফিল করেছেন, সেটা প্রথম থেকেই ছিল, সব শো-তেই ছিল। কিন্তু বিশেষ করে সর্বশেষ শো-তে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এটা হয়েছে, বিশেষ করে সাউন্ড বক্সগুলো কাছাকাছি যারা ছিলেন তারা বোধহয় বেশি সমস্যা ফিল করেছেন। আর ককশিটের শব্দের মতো যেটা মনে হয়েছে সেটা আসলে এক ধরনের পেভলস ছিল, তো ঐ দিন সাম হাউ মাইক্রোফোন শব্দটা বেশি টেনেছে, ফলে সাউন্ড বক্সের কাছাকাছি বসা দর্শকদের অসুবিধা হয়েছে। সেজন্য আমি দুঃখিত।

হাসান শাহরিয়ার

দানিউল চরিত্রটা নিয়ে সবুর ভাইয়ের একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা আমার মনে হয় রতন দেব দিতে পারবেন, কারণ উনিই দানিউল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উনাকে দর্শকসারিতে দেখতে পাচ্ছি। আমরা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

রতন দেব

[নাট্যজন– উদীচী, অভিনেতা– অহরকণ্ডল]

দানিউলের যে চরিত্র বা ক্রাইসিস, এটা দানিউল যেভাবে উপস্থাপন করে, সেটা শুধুমাত্র কথা না বলে আরো কোনো জেশ্চার বা আরো কোনো ক্রিয়া দিয়ে করা যেত কিনা, সেটা অবশ্য নির্দেশকের ব্যাপার। আমি, কেবল আমি না, এই নাটকের সবাই প্রথম

থেকেই বুঝে নিয়েছি যে, এই নাটকের মূল শক্তিটা হচ্ছে টেক্সট। এই টেক্সটটা যত কম প্রপস, যত কম কোরিওগ্রাফি বা কম মিউজিক দিয়ে ভিজ্যুয়াল করে দর্শককে শোনানো যায় ততই ভালো হবে বলে আমরা মনে করেছি। তো দানিউলের যে ক্রাইসিস সেটা বর্ণনার ভেতর দিয়ে তার শরীরটা ব্যবহার করে করতে চেষ্টা করেছি, হতে পারে কোনো দর্শকের হয়তো ভালো লাগেনি। আবার অন্য দর্শকের হয়তো এই কারণেই ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।

পায়েল আজাদ

[নাট্যজন– পালাকার]

আমার প্রশ্নটা রতন দা'র কাছে। উনি ভালো অভিনয় করেন, সেটা আগেই শুনেছিলাম, এবং শুনেই *অহরকণ্ডল* দেখতে গিয়েছিলাম। তো সেখানে ওনার অভিনয় ভালো লেগেছে। কিন্তু তার পরপরই আমি ওনার নিজের দলের নাটক *বৌবসন্তী* দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি ওনার অভিনয় অনেকটাই দানিউল চরিত্রের মতো হয়ে যাচ্ছে ... মানে সংলাপ বলার ধরন বা জেশ্চার এসব মিলে যাচ্ছে। তো এটা আমার কাছে অভিনেতা হিসেবে একটা সীমাবদ্ধতা মনে হয়েছে। দুই চরিত্রের মুভমেন্ট, কাউকে খোঁজা, কিছু কিছু লুক, প্রায় একই রকম। তো এটা কি আপনি সচেতনভাবে করেছেন, নাকি হয়ে গেছে?

রতন দেব

নিজেকে খুব সম্মানিত মনে হচ্ছে, কারণ, আমি ভেবেছিলাম কেবল ডিজাইনারদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। এখন দেখছি অভিনেতাদেরকেও করা হচ্ছে। যাক, আমার উত্তর হচ্ছে, একজন সাধারণ অভিনেতা যখন একই সাথে কয়েকটি নাটকে কাজ করেন, তখন তার অনেক কিছুই অন্য চরিত্রগুলোর সাথে মিলে যায়। তবে আমি চেষ্টা করি যেন না মিলে। এবং আমি মনে করি খুব বড় মাপের অভিনেতা এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি যদি কাটিয়ে উঠতে না পারি, সেটা অবশ্যই আমার সীমাবদ্ধতা। তবে আমি সচেতনভাবে মিল রাখি না। নিজের অজান্তেই হয়তো হয়ে যায়। এরপর থেকে এ-ব্যাপারে সচেতন থাকব। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ বারী

আমার একটা বিষয় জানার আছে, এখানে তিনজনের ব্যক্তিজীবনের আখ্যানভাগটা ব্যক্ত করতে গিয়ে ... বিশেষ করে আকমলের অংশে তার পেরিমা নিয়ে যে প্রসঙ্গটা এসেছে, সেটি আমাকে দর্শক হিসেবে ভীষণভাবে অন্যদিকে টার্ন করাচ্ছিল। অন্য একটি গল্পের দিকে মনোযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। বাকি দু'জনের গল্পটা কিন্তু নাটকের

সাথে মিশে গেছে স্বাভাবিক গতিতেই, কিন্তু আকমলের পেরিমার গল্পটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে। সেটাকে কোনোভাবে ব্যালেন্স করা যেত কিনা?

হাসান শাহরিয়ার
কে উত্তর দিবে, নির্দেশক না অভিনেতা?

কামালউদ্দিন কবির
অভিনেতাই দিক। উনি এখানে উপস্থিত আছেন।

হাসান শাহরিয়ার
দীলিপ চক্রবর্তী।

দীলিপ চক্রবর্তী
বারীভাই যে প্রশ্নটা করেছেন, সেটা টেক্সট-এর জায়গা থেকে। নাটকের শুরু হচ্ছে তিন মদ্যপ যুবকের বিক্ষিপ্ত কিছু কথা দিয়ে। তাদের ভেতরকার চিন্তাগুলোর কিছু প্রকাশ পায় মাত্র। সেই চিন্তাগুলো নাটকে পরবর্তী পর্যায়ে আর কন্টিনিউ করে না। এই বিক্ষিপ্ত চিন্তারই একটা প্রকাশ আকমলের পেরিমা সংকট ... দানিউলেরও আছে, বাহারেরও আছে সেগুলো অন্যরকম। সে-ক্ষেত্রে পুরো নাটকে এই বিষয়টা টানা যেত কিনা, সেটাতো ভিন্ন বিষয়, কিন্তু টানা হয়নি তাতে কোনো সমস্যা আমি পারফরমার হিসেবে বোধ করিনি। ধন্যবাদ।

তানসেন নিকলী
আমার একটি প্রশ্ন আছে। তার আগে জন্মসূত্র-কে ধন্যবাদ, এরকম একটি ভালো প্রযোজনা আমাদেরকে উপহার দেয়ার জন্য। প্রশ্নটা হল, নাটকের ঘটনা হল চরের মধ্যে, সেখানে আমরা মঞ্চে দুটো মোড়া দেখতে পাই, বেতের তৈরি। চরের দৃশ্যে বেতের মোড়া ব্যবহারের কারণ জানতে চাই।

কামালউদ্দিন কবির
সেটা আসলে বেতের মোড়া ছিল না, মেটাল দিয়ে তৈরি ... যাই হোক দর্শকের কাছে যদি বেতের মনে হয় তাহলেতো ভাবনার বিষয়ই। মেটালের উপর কাগজের ব্যবহার করে ওটা করা হয়েছে। আর এগুলো ঠিক মোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, আমাদের উপস্থাপনায় বাস্তবানুগ কোনো জায়গা নেই। আমরা থিয়েট্রিক্যাল একটা স্পেসই তৈরি করতে চেয়েছি। মূলত পারফরমারদের সুবিধার জন্যই এই উপাদানগুলো তৈরি করা, এটা গাছের গোড়াও বোঝানো হতে পারে, আবার উঁচু

কোনো জায়গাও বোঝানো হতে পারে ... মানে আমরা কোনোভাবেই চরের বাস্তব দৃশ্যায়ন করিনি, কারণ, টেক্সট-এ সব বর্ণনাই আছে, সেগুলো আবার রূপায়ণের প্রয়োজন বোধ করিনি।

সুদীপ্ত

[শিক্ষার্থী– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

কবির স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন ... আমরা দেখতে পাই নাটকটি খুবই সামাজিক এবং রিয়েলিস্টিক নাটক। কিন্তু এর ভেতরে কিছু অলৌকিক অবস্থার মঞ্চায়ন হয়েছে, এটা কি তিনজনের মদ্যপ অবস্থার জন্য হয়েছে? আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে তিনজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হচ্ছে বাহার, অথচ এক-সময় তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হল খুন করার। আবার পরে দেখা গেল তিনজনই বলছে– আমি খুন করব। এই ব্যাপারটা কন্ট্রাডিক্ট করছে না?

কামালউদ্দিন কবির

প্রথম কথাটা ছিল যে, অলৌকিক বিষয়গুলো যে আসে সেটা নিয়ে। আচ্ছা আমরা যে মানুষ, সেই মানুষ যে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে সে তার পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা নিয়েই বেড়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতাগুলো মধ্যে কেবলই লৌকিক বা চাক্ষুস অভিজ্ঞতা নিয়ে সে বড় হয় না, এর বাইরেও তার একটা জীবন, জগৎ তৈরি হতে থাকে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদের মানুষকে দেখবেন তাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় নানান উপমা, নানান প্রতীক, ব্যঞ্জনা তৈরি হয় যেটা কিনা আমাদের নাগরিক মানুষের মধ্যে অনেকটাই কম। তো এই নাটকের তিনটি চরিত্রেও সেটা আছে– তাদের ছোটবেলায় মায়ের কাছে শোনা গল্প এখনও পরিণত বয়সে এসে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া তৈরি করে। সেখান থেকেই এই 'অলৌকিক' বিষয়গুলো এসেছে। আরেকটা প্রসঙ্গ যেটা এসেছে, শেষে খুন করার ব্যাপারে ... শুরুতে তিনজনের মধ্যেই বিক্ষিপ্ততা থাকলেও শেষে একটা বিন্দুতে এসে তিনজনই এক হয় যে খুনটা তারা করবে। প্রত্যেকটা মানুষের আচার-আচরণ-বৈশিষ্ট্য-সাহস ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানে তিনজনের মধ্যে বাহার অপেক্ষাকৃত দুর্বলচিত্তের মানুষ, সেজন্য দানিউল তাকে একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে যায় এবং সেভাবেই তাকে তৈরি করে। দানিউল তার আঙ্গুর কাকুর কথা বলে, অহরকগুল পাখিটার কথা বলে ... বলে যে, অহরকগুল পাখি সব পারে। আজকে এই পাখিই নিয়ামুলকে আমাদের কাছে এনে দেবে। তো তখন তিনজন অবচেতনভাবে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে– হ্যাঁ খুন করব। অতএব এখানে আমার মনে হয় কন্ট্রাডিকশন নয়, তাদের ট্রান্সফরমেশন ঘটে। ধন্যবাদ।

দেবাশীষ ঘোষ

কবির ভাইয়ের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। আপনাকে আমরা দেখি বিভিন্ন দলে নির্দেশনা দিয়েছেন, ডিজাইন করেছেন। তো *অহরকণ্ডল* করতে আপনাকে একটা নতুন প্লাটফর্ম তৈরি করতে হল কেন? অন্য কোনো দল না করে জন্মসূত্র করার পেছনে কোনো কারণ আছে কিনা?

কামালউদ্দিন কবির

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে *অহরকণ্ডল* করার জন্য জন্মসূত্র করেছি আমরা। এর আগে *অহরকণ্ডল* করার জন্য একটা প্লাটফর্ম খুঁজছিলাম। কেন খুঁজছিলাম? কারণ, আমাদের এই সময়ে, বিশেষ করে ১৯৯০ থেকে বাংলা নাটকে একটা বিরাট বাঁক বদল হয়েছে। সেটি হয়েছে সেলিম আল দীনের কল্যাণে। উনি সুনির্দিষ্টভাবে, সুচিন্তিতভাবে ওনার রচনারীতিতে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, সেটা হচ্ছে বর্ণনাত্মক নাট্য-রচনারীতি। ওনার *চাকা* নাটক দিয়ে সেটা শুরু হয়েছে। এরপর থেকে অনেক তরুণ নাট্যকার এই বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে নাটক রচনা শুরু করেছেন। যদিও আমরা সাইনবোর্ড ঝোলাতে চাই না যে, আমরা বর্ণনাত্মক নাটক করছি। আমরা মূলত থিয়েটারই করছি। তো আমি অনেক দলের সঙ্গেই কাজ করেছি কিন্তু *অহরকণ্ডল* করার জন্য যে চিন্তা-ভাবনা করেছি সেই ভাবনাটা শেয়ার করার জন্য সে-রকম অন্তরঙ্গ বন্ধুতা দরকার, সেটা হয়তো কোনো দলের সাথে গড়ে ওঠেনি। ... আমি দেখছি দর্শকসারি থেকে দীলিপের হাত উঠেছে, সে বোধহয় বলতে চায় ...

দীলিপ চক্রবর্তী

আমাদের ভেতরকার যে আলাপ-আলোচনা বা ভাব আদান-প্রদান হয়েছিল, সেটা একটু বলতে পারি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের মতো করে থিয়েটারটা করতে চেয়েছি বা চাই। যেমন– কবির ভাই, আমি, রতন দা’, আনোয়ার, লিমা এরকম আমরা ক’জন বন্ধু আমাদের মতো করে ভাবতাম যে, আমরা এভাবে থিয়েটারটা করতে চাই। এখন প্রশ্নকর্তাকেই যদি জিজ্ঞাসা করি– আপনি কি আপনার দলে আপনার মতো করে থিয়েটারটা করতে পারছেন? আমাকে উত্তর দেবার দরকার নেই, আমি বলতে চাইছি, এরকম প্রতিবন্ধকতা আমাদের প্রতিটি দলেই আছে। আমরা সেই জায়গা থেকে সমমনা ক’জন বন্ধু চেয়েছিলাম যে, আমাদের মতো করে থিয়েটারটা করতে ... এবং এজন্য আলাদা প্লাটফর্ম তৈরি করেই করা যায় কিনা। তো আমি বলতে চাই, জন্মসূত্র কোনো গ্রুপ থিয়েটার না, এটি একটি থিয়েটার প্লাটফর্ম এবং একটা ওপেন প্লাটফর্ম।

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। *অহরকণ্ডল*-এর সময় শেষ। মঞ্চের সবাইকে দর্শকসারিতে বসবার জন্য অনুরোধ করছি। এবার আমি চার নাটকের চারজন নির্দেশককে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করব এবং এই পর্বটি হবে উন্মুক্ত। আপনারা যে-কোনো সময় যে-কোনো নাটকের উপর প্রশ্ন করতে পারেন। নির্দেশক বা সংশ্লিষ্ট কেউ এগুলোর উত্তর দেবেন।

ধন্যবাদ। প্রশ্ন চাচ্ছি দর্শকদের কাছ থেকে।

রতন দেব

আমার প্রশ্নটা *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকের উপর। দুটি নাটকের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ। তো এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নাটক করা আসলেই সাহসের বিষয়। বারীভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন– বর্তমান সময়কে মাথায় রেখেই কি এই নাটক এখন করলেন, নাকি মুক্তিযুদ্ধ সবসময়েই প্রাসঙ্গিক এই ভেবে এখন নাটকটি করলেন? আরেকটি কথা হল– জহির রায়হানের *সময়ের প্রয়োজনে* গল্পটি আমরা স্কুলে পাঠ্য হিসেবে পড়েছি। তখন একটা ইমেজ চোখের সামনে ভেসেছিল, কিন্তু নাটক দেখতে গিয়ে বিশাল সেট, ক্যাম্পের নানা ঘটনা, নানা চরিত্র সব মিলিয়ে ইমেজটা বাধাপ্রাপ্ত হয় ... এই বিষয়ে বারীভাইয়ের মত কী?

মোহাম্মদ বারী

এটা হয়তো আমার ব্যর্থতাই, যে ইমেজটার কথা রতন বলছেন, আমি নাট্যরূপায়ণ করতে গিয়ে ঐ ইমেজটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেইনি। কারণ, জহির রায়হান তাঁর গল্পটা ফিল্মের ভাষায় লিখেছেন– দূরে একটি গ্রাম ... লং শটে দেখছেন উনি ... একটি লাউয়ের মাচা, ক্লোজ শট ... একটি লাউ, ভেরি ক্লোজ শট ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমার মনে হয়েছে যদি কথাসাহিত্যকে উনি ফিল্মের ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন, তাহলে তাঁর ফিল্মের ভাষাটাকে থিয়েটারের ভাষায় রূপান্তর করলে কী দাঁড়ায় দেখা যাক ... এ ধরনের একটা 'বোকামি' চিন্তা আমার মাথায় আসল। এবং দলেও যখন আলাপ করলাম, তখন অনেকেই বলল যে– এটাকে কীভাবে করবেন? এমনও আলাপ হয়েছে যে– প্রথমে আমরা সতীর্থ কিছু বন্ধু নাট্যজনদের দেখব তারা যদি বলে যে– হ্যাঁ এটাকে দর্শকদের কাছে নেয়া যায়, তবেই আমরা সেটা মঞ্চে আনব। তো শেষ পর্যন্ত দেখা গেল – হ্যাঁ একটা কিছু দাঁড়িয়েছে এবং এবং এখনও আমরা সেটার প্রতিক্রিয়া পাই। আপনি যে বললেন- আপনার ইমেজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটা আমার সাফল্যও হতে পারে, ব্যর্থতাও হতে পারে। আর প্রথম যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে, এখন এই নাটক কেন? আসলে পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এই নাটকটা করা যায়। সে-ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ সব সময় প্রাসঙ্গিক বলেই করলাম, এই সময়কে মাথায় রেখে ধরিনি।

অনন্ত হিরা

বারী ভাই যে দলে কাজ করেন– থিয়েটার আর্ট ইউনিট ... সে-দলের আরেকটি নাটক আছে মুক্তিযুদ্ধের উপর– *কোর্ট মার্শাল*। ওটাতে আপনি অভিনয়ও করেন। আর মুক্তিযুদ্ধের উপর *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকের আপনি হলেন নির্দেশক-অভিনেতা। তো আমার প্রশ্ন, আপনার কী মনে হয়– *কোর্ট মার্শাল* নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা মূল্যবোধ এ-সব বিষয়গুলো যেভাবে নাড়া দেয়, *সময়ের প্রয়োজনে* কি সেই জায়গাটা স্পর্শ করতে পেরেছে? আরেকটি প্রশ্ন হল– আমরা মঞ্চে বা টিভি নাটকে অনেক মুক্তিযুদ্ধের নাটক দেখি, যেগুলো কল্পনা, আবেগের বাড়াবাড়ি বা রোমান্টিসিজমে ভরা। তো আপনি কি মনে করেন– *সময়ের প্রয়োজনে* নাটকে এব্যাপরগুলো উৎরিয়ে গেছে?

মোহাম্মদ বারী

শেষেরটা দিয়েই শুরু করি; আমারতো মনে হয় আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শুধু শুধু আবেগ বা অতিরঞ্জন এসব একেবারে কমিয়ে করেছি। দর্শক যেন বিরক্ত না হয় সেদিকটা অবশ্যই আমি লক্ষ রেখেছি। এবং এ-নিয়ে দর্শকদের কমেন্টও পজেটিভ। আর প্রথম যে প্রশ্নটা করা হল, দুই নাটকের তুলনা দিয়ে, তার প্রেক্ষিতে বলব *কোর্ট মার্শাল* অবশ্যই একটি অত্যন্ত সফল নাটক। কেবল আমার দলেরই না, বাংলাদেশের মঞ্চের একটি অন্যতম ভালো নাটক *কোর্ট মার্শাল*। ভালো নাটক এবং পাশাপাশি জনপ্রিয় নাটক। তবে *কোর্ট মার্শাল* যে জায়গাটা ধরেছে *সময়ের প্রয়োজনে* কিন্তু আবার অন্য জায়গা থেকে করা ... মানে এটা অনেকটা মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য উপস্থাপনা বলব।

সাইফুল

[নাট্যজন– প্রাঙ্গণে মোর]

আমার প্রশ্ন না, মতামত, *কথা'৭১* নিয়ে ... সেটা হল এই নাটকের এত বিশাল আয়োজন দেখে আমার মনে হয়েছে, এতটা প্রয়োজন ছিল কিনা? আমার মনে হয়েছে মঞ্চে বেশি বেশি বীভৎসতা দেখানো হয়েছে। একটু আগে প্রীতীশ বল দা' বললেন যে– একজন দর্শকের দুটো রুমাল ভিজে গেছে, তো সেটা এই বীভৎসতা দেখার ফলেও হতে পারে।

দেবাশীষ ঘোষ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই প্রজন্মের কতটুকু স্টাডি আপনার আছে আমি জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি আমি বীভৎসতার কিছুই দেখাতে পারিনি। যারা এই বীভৎস কাজ করেছে, তারা আজ কোথায় আপনি জানেন?

মাহফুজ
আপনি যাদের কথা বলছেন, আমরা কি তাদেরকে মহিলা সমিতিতে এনে সেটা দেখাতে পারছি?

দেবাশীষ ঘোষ
দেখা না দেখা দর্শকের দায়িত্ব। আমার-আপনার দায়িত্ব না তাদেরকে এনে দেখানো। আর তাদের দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেই বীভৎসতার স্বরূপটা আমাদের জানা দরকার। এবং আমরা দেখছি কিনা সেটাই হল আসল কথা।

ঠাণ্ডু রায়হান
আমার কবির বা দিলীপের কাছে একটু জানার আছে, সেটা হল– জন্মসূত্র কি একটা প্রফেশনাল গ্রুপ?

দিলীপ চক্রবর্তী
এই উত্তরটা আমিই দিতে চাই, যদিও আজকের অনুষ্ঠানে এটা প্রাসঙ্গিক কিনা আমার জানা নেই। আমাদের দলটি প্রফেশনাল কিনা জানি না, কিন্তু আমরা প্রফেশনাল হতে চাই। আপনার সহযোগিতা চাই। এবার আমি *কথা'৭১* নাটক নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হল *কথা'৭১* নাটকের বাইরে যে-সমস্ত খণ্ড খণ্ড দৃশ্য দেখানো হয়েছে, সেগুলো দর্শককে কতটুকু আলোড়িত করেছে? আর পুরো নাটকটাতে মেলোড্রামা বেশি করে ভর করেছে বলে আমার মনে হয়েছে, নির্দেশক হিসেবে আপনার কী মনে হয়েছে?

দেবাশীষ ঘোষ
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই, সারাদিন ব্যস্ত সময় কাটিয়ে নাটক দেখতে এসে থার্ড বেল পড়লেই হলে ঢুকে নাটকে বসে যাওয়া, এই চিরাচরিত আয়োজন থেকে আমারটাকে আলাদা করতে চেয়েছি। দর্শক বাইরের খণ্ড চিত্রগুলোতে বেশি করে ইনভলব হবে এমন আশা আমিও করিনি। তবে যে দর্শক যতটুকু নেবে, সেটাও আমার কাছে কম নয়। আর মেলোড্রামার ব্যাপারে বলতে চাই, নিশ্চয়ই আপনার কাছে মনে হয়েছে বলেই আপনি বলছেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়নি।

আনোয়ার ইব্রাহিম
[সাংবাদিক]
কথা'৭১-এর ব্যাপারে আমি বলতে চাই, যে বাবাকে আপনি সৎ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে আমার তাকে ভণ্ড মনে হয়েছে। যে তার নিজের

সন্তানকে ৫/৬ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধের কথা না বলে, ২২ বছর বয়সে এসে শোনায়, তাকে ভণ্ড ভাবা ছাড়া আর কী থাকে?

রতন দেব

আমিও একটু বলে নিই, একই প্রসঙ্গে ... সেটা হল নাটকের ক্রাইসিসটা হল ছেলে মুক্তিযুদ্ধ বোঝে না, বাবা বলছে, আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি, তুই কেন বুঝবি না .. ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এখনকার প্রজন্মকে যদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জানাতে চাই, তাহলে আপনি যেভাবে করেছেন, সেভাবে হবে না। এই বাবা-ছেলের সংলাপ অত্যন্ত ক্লিশে। এগুলো উপরি উপরি কথাবার্তা এবং একসময় বিরক্তিও তৈরি করে। এখানে থিয়েটারি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে। এই সময়ের ভাষা তৈরি করতে হবে।

হাসান শাহরিয়ার

যেহেতু সংলাপ নিয়ে কথা উঠেছে, আমার মনে হয় এখানে দর্শকসারিতে নাট্যকার আছেন, আপনি উত্তর দিন।

কুমার প্রীতীশ বল

আমার মনে হয় এটাই দরকার ... মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কথা বলা দরকার। এখানে একেকজন একেকভাবে দেখছেন, বলছেন, এটাকেও আমি পজিটিভ মনে করি। নাটকে আমরা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস দিতে চাইনি। আমরা চেয়েছি, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তারা যেন বুঝতে পারেন যে– যুদ্ধের পরপরের প্রজন্মকে কীভাবে গাইড করা উচত ছিল। সেখানে কেন বাবাকে ভণ্ড মনে হবে তা আমার বোধগম্য নয়।

যশ যায়েদী

[নাট্যজন– দৃশ্যপট]

কবির ভাইকে আমার প্রশ্ন ... আমি অবশ্য প্রথমে নাটকের নামটিও ভুল বুঝেছিলাম, যাই হোক প্রশ্নটি হল– আমার মনে হয় সব দর্শক আপনি নাট্যকলা বিভাগের বা ঐ মানের পাবেন না, আমার মতো সাধারণ দর্শকও নাটকটি দেখতে আসবে। সে-ক্ষেত্রে আমার কাছে নাটকটি একটু বেশি মাত্রায় কঠিন মনে হয়েছে।

কামালউদ্দিন কবির

নাটকটির নাম নিয়ে সমস্যা থাকতেই পারে। এটি একটি অপরিচিত নাম। বাংলাদেশেরই লোককাহিনীর গল্পের একটি পাখির নাম ‘অহরকণ্ডল’। মানিকগঞ্জ এলাকাতে এটা পরিচিত। আর নাটকটির কঠিনত্ব নিয়ে যেটা বললেন, সেখানে আমি একটু বিনীতভাবেই বলতে চাই, যে-কোনো শিল্প উপভোগের জন্য একধরনের একটা

চর্চা থাকতেই হয়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে বোধহয় আমরা একটু বেশিই আবদার করে ফেলি যে– নাটকটা একটু সহজ-সরল উপস্থাপনা করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি, দর্শক যেহেতু থিয়েটারের অন্যতম উপাদান, সেহেতু নাট্যদর্শকেরও একটা চর্চার জায়গা থাকা উচিত।

গোলাম শফিক

কবির একটু আগে বর্ণনাত্মক রীতির নাটক নিয়ে যেটা বললেন, সেটা শেষ করেননি। এই বিষয়টা ইতোমধ্যেই একটা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আমরা যারা এই রীতির কাজ করছি তারা খুব বুঝে-শুনেই কাজ করছি, স্টাডি করে নিজেকে পরিষ্কার করেই কাজ করছি। সেলিম আল দীন-কে একবার প্রশ্ন করেছিলাম– আপনি যেটা করছেন, সেটা আমরা কেন করব? জবাবে তিনি বলেছিলেন– মধ্যযুগের বাংলানাটক সেলিম আল দীনের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, এখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। তো উনি যেটা করেছেন, সেটা হল একটি ছিন্ন সূত্রকে ধরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমার মনে হয় যে, বর্ণনাত্মক নাটক কোনো দলের বা ব্যক্তির নয়, সকলেরই সম্পত্তি। এই নিয়ে কোনো বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই বলে আমার মনে হয়।

জনৈক

কবির ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন– অহরকগুল নাটকে যে ভাষারীতি, সেখানে সংস্কৃত এবং তৎসম শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এই আধুনিক সময়ে ভাষার মানের চর্চার চলতি রীতি উপেক্ষা করে সেই সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের ব্যবহার এখনও বর্তমান দর্শকদের কাছে পৌঁছা বা সফল হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা? নাকি এই ব্যবহাররীতিটির মধ্যে আপনার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা কৌশল বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে?

কামালউদ্দিন কবির

প্রশ্নকর্তাকে ধন্যবাদ। এই ধরনের প্রশ্নই আসলে আশা করছিলাম। সংক্ষেপে দুটো কথা বলি– একটা হচ্ছে ভাষা, শিল্প সব-কিছুর একটা বিবর্তিত রূপ থাকে। আমরা বারবার নিজস্ব নাট্যরীতির কথা বলছিলাম ... তো সে-রকম নিজস্ব শিল্পের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কথাসাহিত্যের যে ঐতিহ্য, সেটার একটা নিজস্ব গঠন, শব্দ-চয়ন আছে। এখন আমরা যদি মনে করি আমাদের অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা, তাহলে সেই ভাষা-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা কোন ভাষায় আমাদের শিল্প উপস্থাপন করব? এই চিন্তা নিয়েই কিন্তু কবিতা বা পেইন্টিংস-এ আমাদের লোক-ঐতিহ্যের যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে তারা আধুনিক শিল্প নির্মাণ করছেন। সেখানে আমাদের বাংলা নাট্যরীতিতে যদি কেউ দাবি করি বা চেষ্টা করি গবেষণা করার যে, নিজস্ব ভাষা যেটা আছে সেটা আধুনিক দর্শকদের সামনে কীভাবে উপস্থাপন

করা যায়, সেটা কেমন হয়। আর যেহেতু অনেক-দিনের একটা গ্যাপ আছে বা গ্যাপ হয়েই আছে, সেহেতু মনে হতে পারে যে, এগুলো অচেনা শব্দ বা ভাষা। আমি প্রযোজনায় যাবার আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় নাট্যজন থেকে শুরু করে কবি, পেইন্টার, সাংবাদিক অনেককেই পাঠ করতে দিয়েছিলাম পাণ্ডুলিপিটি। তো সবারই প্রায় একই মন্তব্য ছিল যে– না এই ভাষায় আমাদের দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব না। এরকম মন্তব্য নিয়েও আমরা কাজটা শুরু করেছিলাম, এখনও চালিয়ে যাচ্ছি এবং আশার কথা আমরা নিজেদের মধ্যে কন্‌ফিডেন্সটা পাচ্ছি। ধন্যবাদ।

রানা
[নাট্যজন]
আমার প্রশ্নটা সম্পাদককে যিনি এখন সঞ্চালকের ভূমিকায় আছেন ... প্রশ্নটা হল আমরা অনেকেই নিয়মিত 'থিয়েটারওয়ালা' পড়ি, এবং অনেকেই এটার সম্পর্কে জানি। প্রকাশনার বাইরে এখন দেখছি আপনারা নাট্যকর্মীদের একটা ভাবনার জায়গা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এটায় আপনারা কতটুকু সার্থকতা অর্জন করেছেন বলে মনে হয়? মানে ঐ জায়গাটা তৈরি করা গেছে কিনা?

হাসান শাহরিয়ার
এখন তো দেখছি সঞ্চালকই সরাসরি মুখোমুখি দর্শকের, হাঃ হাঃ ... যাক, আসলে আপনি লক্ষ করে থাকবেন যে, আমরা সবাই বলি যে– 'আমি কিন্তু সমালোচনা পছন্দ করি। যে-কোনো ধরনের সমালোচনা'। তো তারপর দেখবেন আপনি যখন সমালোচনা করবেন, তখনই উনি রেগে যাবেন, এবং আপনি যে কিছুই বোঝেন না, সেটা তিনি আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। তার মানে আমরা সমালোচনা ততটুকুই পছন্দ করি, যতটুকুতে প্রশংসা আছে। তাই আমরা চেয়েছি আমরা যেন পরস্পরের সাথে খোলামেলা আলোচনা-সমালোচনার পরিবেশটা তৈরি করতে পারি। নাটক বা সাহিত্য নিয়ে বা নিজেদের কাজ নিয়ে আড্ডা, মিথষ্ক্রিয়া এসব যেন বেশি বেশি করতে পারি সে-জন্যই এই আয়োজন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বহুদিন এ ধরনের চর্চা ছিল না, এবং আমরাও মোটে ৩টি অনুষ্ঠান করেছি। আশা করি এভাবে করতে করতে প্রলপ্রসূ কিছু পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ।

ফয়সাল রাজিব
[সম্পাদক– চরৈবেতি, নাট্যজন– নাট্যকেন্দ্র]
কবির স্যারের কাছে একটু জানতে চাই, আপনি 'জন্মসূত্র' এবং *অহরকণ্ডল* নাটক করলেন। তো জানলাম যে, এটা গ্রুপ থিয়েটার না। তো আপনি অভিনেতা কীভাবে নির্বাচন করেন? ৫ জন ডেকে বাছাই করে ৩ জন, নাকি অন্য কোনোভাবে?

কামালউদ্দিন কবির

প্রথম উদ্যোগ হিসেবে আসলে নিজ থেকেই ৩ জনকে নিয়ে নিয়েছি। আশা করছি পরবর্তী সময়ে নাটকের প্রয়োজনে বেশি চরিত্র লাগলে বাছাই করে নেব।

হাসান শাহরিয়ার

আমাদের সময় প্রায় শেষ। শেষ প্রশ্নটি করার জন্য অনুরোধ করছি। যেহেতু অনেকক্ষণ

তিনি কোনো প্রশ্ন করছেন না, এবং বিপ্লব দা'র প্রশ্ন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম, তো আমার মনে হয় শেষ প্রশ্নটি বিপ্লব দা' আপনিই করুন।

বিপ্লব বালা

অহরকণ্ডল নাটকের নির্দেশক একটু আগে পেইন্টিংস বা কবিতার রেফারেন্স দিয়েছেন, ভাষার ব্যাপারে বলতে গিয়ে, বলেছেন– আধুনিক থিয়েটারেরও একটা নিজস্ব ভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের কিন্তু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা মনে রাখতে হবে। পেইন্টিংস, কবিতা একভাবে এক্সপ্রেস করে, মঞ্চ আবার অন্যভাবে এক্সপ্রেস করবে। সেই মঞ্চের ভাষার জায়গা থেকে আপনাকে ভাবতে হবে টেক্সট-এর ভাষাটা কী হবে। কারো সাথে পাল্লা দেয়ার তো কিছু নেই, প্রত্যেকটা মাধ্যম আলাদা আলাদা। প্রত্যেক মাধ্যমের সীমাবদ্ধতাও কিন্তু আলাদা আলাদা। তো সেদিক থেকে বিবেচনা করে আপনার টেক্সট-এর ভাষা ঠিক করতে হবে। বুঝতে হবে, এটা মঞ্চের জন্য করছেন, মঞ্চের দর্শকদের জন্য করছেন। সেদিক থেকে *অহরকণ্ডল* নাটকের ভাষাটা কিন্তু মঞ্চে আনার ব্যাপারে একটু গোলমেলেই বোধহয়।

কামালউদ্দিন কবির

মাধ্যমগত যে ভিন্নতার কথা বললেন, সে-বিষয়ে অবশ্যই আমি আপনার সাথে একমত। নাট্যরীতি *অহরকণ্ডল* নিয়ে নানা কথা উঠেছে বলে প্রসঙ্গগুলো বলছিলাম। আমি আবারো বলছি যে, কবিতা-পেইন্টিংস যদি আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আধুনিক রূপায়ণ করতে পারে, তো নাটক কেন পারবে না? নাটকের ক্ষেত্রে কেন শুধু গৎবাঁধা একটা জায়গায় বসে থাকব? দর্শককে একটা নতুন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কেন নিয়ে যাব না? এতে দর্শক শুধু একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমকে একটা ফর্মকে থিয়েটার ভাববে না, তারা নতুন নতুন থিয়েটার শিল্প-ভাষার মুখোমুখি হবেন। ধন্যবাদ।

হাসান শাহরিয়ার
ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে ... চার-নাটকের সবাইকে, সুধী দর্শকদের এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য আরেকটি সরাসরি মুখোমুখি অনুষ্ঠান দেখার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি।

[উৎস: হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত 'থিয়েটারওয়ালা' পত্রিকা। সংখ্যা: উল্লেখ করা গেল না]

নি ব ন্ধ

বাংলাদেশের প্রথম সচল 'স্টুডিও থিয়েটার'

বি প্ল ব বা লা

[স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪বছরের নাগরিক থিয়েটার নিয়ে কথা উঠলে তাবৎ পাতা জুড়ে থাকে ঢাকা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা। দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাট্যচর্চার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঢাকার বাইরে কতটুকু হয়েছে, তার কতটুকু খবরই-বা আমরা রাখি? থিয়েটারটাকে নিয়ে এখন যদি কিছু ভাবতে হয়, নতুন কিছু ভাবতে হয়, তাহলে প্রয়োজন দেশের যেখানে যেখানে থিয়েটার নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা ইতোমধ্যেই এসেছে, তার সবগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এ লক্ষ্যেই *থিয়েটারওয়ালার* পক্ষ থেকে ড. বিপ্লব বালা এবং সম্পাদক হাসান

শাহরিয়ার উপস্থিত হয়েছিলেন বরিশালে, 'শব্দাবলী'র স্টুডিও থিয়েটার দেখতে। ছোট্ট পরিসরে বড় স্বপ্ন নিয়ে ১৫ বছর ধরে যে স্টুডিও থিয়েটার পরিচালনা করে যাচ্ছে 'শব্দাবলী', তার সংবাদই জানাতে চাই দেশের সব *থিয়েটারওয়ালাদের*। সেখান থেকে ফিরে এসে থিয়েটারওয়ালা'র পাঠকদের জন্য প্রবন্ধলিখেছেন ড. বিপ্লব বালা। – **সম্পাদক, থিয়েটারওয়ালা**]

১.

রাষ্ট্রের চরিত্রই এরকম বুঝি; একটি কোনো ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত হয় তাবৎ ক্রিয়াকর্ম– রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সব কাজ। একটি কোনো বিশেষ নগর, যার নাম হয় রাজধানী, হয়ে ওঠে সেই কেন্দ্র। সারাদেশের মানুষ বাধ্যতই বুঝি অভিমুখী হয় সেই ক্ষমতাকেন্দ্রের। তার ফলে দেশের আর কোনো ভারসাম্য থাকে না। একটি কোনো নগরের সঙ্গে এক ভেদাভেদের সম্পর্কই দাঁড়িয়ে যায় দেশের আর সব অঞ্চলের, নগরের শহরের। তবে সমাজের সেই চরিত্র নয়। ইতিহাসের ধারায় একেক অঞ্চল একেক ক্রিয়াকর্মে অগ্রণী থাকে। সেটা থাকাই তো স্বাভাবিক। ব্রিটিশ আমল পর্যন্তও সমাজের একটা জোর ছিল। তার ফলে কলকাতা বা ঢাকার বাইরেও নানা শহরে মানুষ বিচিত্র কর্মে লিপ্ত ছিল। ক্রমে তার ভাঙন ধরে। পাকিস্তান আমল থেকেই ঢাকা কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকাই হয়ে ওঠে দেশের মূল ক্ষমতাকেন্দ্র। তাই আর সকল শহরের সঙ্গে তার উচ্চ-নিচ ভেদাভেদের সম্পর্ক। ঢাকায় যা হয় কেবল তারই নাম হয় 'জাতীয়'। কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় লালন উৎসবও 'জাতীয়' হয় না। কখনো সখনো এক-দুইজন ঢাকার বাইরে থেকে প্রতিনিধি 'জাতীয়' কোনো কাঠামোতে নেয়া হলেও কর্তৃত্ব থাকে ঢাকার হাতে। আশ্চর্য, যারা এই ক্ষমতা-বিভেদ লেখায় ধারণায় মানে না, কাজের বেলায় তারাও দেখি একই মনোভাব পোষণ করেন, একই আচরণ করেন। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনে তো ঢাকা আর মফস্বল বলে ভিন্ন ক্ষমতা-বলয়ই আছে। ভোটের জন্য যা নিয়ে বেশ রাজনীতি চলে। নির্বাচনের আগে সবাই তাই ছুটে যায় জেলা শহরে– রাজনীতির বেলায় নেতারা যেমন যায় গ্রামে। আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের এক সম্মেলনে অনেক দিন আগে দেখেছিলাম– কীভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য নগণ্যভাবে অন্য শহরের এক-দুজনকে রাখা হয়েছিল কমিটিতে। আর তাদেরও নিশ্চয় হতে হয়েছিল মূল ক্ষমতাবলয়ের অনুগামী। অদ্ভুত লাগছিল, এটা যে বেশ তথাকথিত অগণতান্ত্রিক সেটা কারোই চোখে পড়ছিল না যেন– অথচ সকলেই তো মহা-গণতন্ত্রী, স্বৈরাচারবিরোধী। ক্ষমতাকাঠামোর ব্যাপারটাই এরকমই বুঝি। অজান্তে, প্রতি একক কাঠামোয় তার একই পদ্ধতি প্রক্রিয়া চলে।

চট্টগ্রামে আর রাজশাহীতে বুঝি ধীরে ধীরে একটা সচেতনতা এসেছে। ঢাকা থেকে সব সময়ই যে এক হাত-তোলা-সমর্থনই চাওয়া হয়, যেন তাদের ভিন্ন কোনো

মতামত থাকতেই পারে না– এটা প্রশ্ন করা শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামে আলাদা নাট্য সমন্বয় পরিষদ আছে। এমনকি অনেক ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে ভিন্ন অবস্থানও নেয়া হচ্ছে। যেমন বাংলা মাসের তারিখে নতুন সুবিধাজনক যে হিসাব বার করা হয়েছে, যাতে পঞ্জিকার সঙ্গে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে– তার ফলে গ্রামসমাজের সঙ্গে শহরের আরেক ধাপ ভেদ ঘটে গেল; এতকালের নানা হিসাব সমন্বিত বিবেচনা বাতিল করা হল এত সহজে আর তাতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও বাংলা সন দিন-তারিখের হিসাব ভিন্ন হয়ে গেল। রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা শহরের সংস্কৃতিজন এটা মানেনি। এর মধ্যেও যে থাকতে পারে এমন রাজনীতি, যাতে কিনা আলাদা করে ফেলা যায় সবকিছুই পশ্চিমবঙ্গ থেকে– একথা মনে করা হয়েছিল। ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা যে এটা লক্ষ করছেন না, তাতেও বেশ আহত দেখেছিলাম তাঁদের।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের একটি জাতীয় কমিটি আছে। তার এক সম্মেলনে বেশ ক'বছর আগে কথা উঠেছিল এনজিও-র সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে। একসঙ্গে কাজ না করারই প্রস্তাব নাকি উঠেছিল। সেইমতো অনেক জেলা শহরে অনেকে সেটা মানেন, অনেকে মানেন না। অথচ জোটের অনেক কেন্দ্রীয় নেতাই যে নানাভাবে নানা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত তা-ও হয়তো জেলা শহরের জানেন না সকলে। জোট-ভুক্ত অনেক সংগঠনও নানা সময়ে এনজিও-দের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেয়। অথচ জেলাতে তাদের শাখা সংগঠন প্রবল এনজিও-বিরোধিতা করে চলত। এ নিয়ে একটা হ্যস্তন্যস্ত কিন্তু তারা করতে পারছেন না ঢাকার সঙ্গে। তার ফলে কোনো কোনো জেলা ঢাকার কেন্দ্রীয় কমিটি বা জোটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আর মানছেন না। এটা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। দেশময় কোনো মিলিত সংস্কৃতিকর্ম সংগঠিত করার ব্যাপারে এটা বাধা হবে।

আসলে ঢাকার সঙ্গে একটা নেতাকর্মীর সম্পর্কই তো দাঁড়িয়ে গেছে জেলা শহরের। এটাই বুঝি গোলমেলে। ঢাকার ক্ষমতা, যোগাযোগ, প্রচার বেশি। জেলার সবাই প্রায় তাই তাদের সঙ্গে যোগ রাখতে চায়, সুযোগ-সুবিধা বা নামের জন্য– নিশ্চয়ই একটা ঐক্যবদ্ধ আদর্শের জন্যও। সেটাই আসলে টাল খায়। প্রতি জেলা শহরের নিজস্ব একটা ভাবনা চিন্তা কাজ-কর্ম তাতে ব্যাহত হয়। একটা নির্ভরশীলতার সংস্কৃতিই দাঁড়িয়ে যায়– ঠিক সশ্রদ্ধ বিনিময়টা ঘটে না। সুলতানের মতো মর্যাদাবোধ অর্জনের দায় নেয়া হয় না। নিজের কাজটা করে গেলে ঢাকা বা গোটা দেশই যে বাধ্য হবে তাঁকে বরণ করে নিতে– এই আত্মনির্ভরতা পায় না সকলে। অথচ আরজ আলী মাতুব্বর সেই কোন গণ্ডগ্রামে বসে কাজ করে গেছেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, ঢাকা তাঁদেরকেই মর্যাদা দেয় যারা নিজের কাজটার একটা মূল্যমান নির্মাণ করেছেন, করতে পেরেছেন। হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা, আলী আনোয়ার, অনুপম সেন, প্রয়াত সাধন সরকার, আবুল মোমেন, যতীন সরকার, শান্তনু কায়সার, নিখিল সেন, প্রয়াত নাজিম মাহমুদ– ঢাকার বাইরে মফস্বল শহরে বসে কাজ করেই তো জাতীয়

মর্যাদা অর্জন করেছেন। কাজটা শেষ পর্যন্ত গুণমানেই তো বিবেচিত হয়। ঢাকার পিছে পোঁ ধরার ওপর নয়। অবশ্য ঢাকার সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ যারা রাখেন তাঁদের অন্য ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যই থাকে– যা ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বলিত, ঠিক কাজ-আদর্শ প্রণোদিত তত নয়। অথচ কাজের মতো কাজ ঢাকাও অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। চট্টগ্রামের বিজয় মেলা বা যশোরের পয়লা বৈশাখের র‍্যালি এখন ঢাকায় শুধু নয়, দেশজুড়েই করা হচ্ছে। জেলা শহরে শহরে এই স্বাধীন স্বয়ংভর মর্যাদা-সম্পন্ন কাজ হোক– তাতেই সারা দেশের মুক্তি। ঢাকা শহর তো ক্রমে একটা বাজারি গঞ্জে পরিণত হচ্ছে। বিশেষ বাণিজ্য বিজ্ঞাপন প্রচারের ধান্দা ছাড়া কাজ কিছু বোধহয় আর হবার নয় ঢাকায়। প্রকৃত কাজের দায় আর ভার আজ ঢাকার বাইরে দেশময় ছড়িয়ে গেছে। মুক্তবাজারের গ্রাসের অনেকটা বাইরে এখনও আছে বুঝি জেলা শহর। কাজেই দায়দায়িত্ব পড়েছে এখন সেখানকার কর্মোদযোগী মানুষজনের ওপর। এখনও তো প্রতি জেলায়ই- প্রায় কাজের নানা যোগ্য মানুষ আর দল-সংগঠন আছে। হয়তো বেশ খানিকটা দিশাহারা অবস্থা তাদের তবুও সব একেবারে নিঃশেষ হয়ে তো যায়নি। এই সুযোগটা, দায়টা নেয়া চাই। তার প্রথম শর্ত হল: ঢাকার মুখ চেয়ে না থেকে নিজেদের সাধ্যমতো কাজগুলো করে যাওয়া। যেন ঢাকাও একদিন আবার চেতন-হুঁশ ফিরে পায়– তাদের বাজার-দৌড় ক্ষান্ত করার মতি অর্জন করে। দেশের কাছে হারানো মান ফিরে পেতে কেউ কেউ নিশ্চয়ই একদিন উদযোগী হবে। ঢাকার এই বেহুঁশকালে জেলা শহর তার দায়টা সাধ্যমতো পালন করুক।

২.

কত ঘটনাই তো ঘটে ঢাকার এই ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে।

আচ্ছা, যদি প্রশ্ন করা যায়, বাংলাদেশে প্রথম কোথায় মোটের উপর এখনও এক স্টুডিও থিয়েটার চলছে নিয়মিত, সপ্তাহের একদিন এক স্থায়ী স্টুডিও মঞ্চে? আমরা নিশ্চয়ই প্রথমটায় কিছু ঠিক হাতড়ে পাব না। কারো কারো হয়তো মনে পড়বে আমিনুর রহমান মুকুলের কথা, ওরা তো বছর কয়েক ধরেই না করে চলেছে এক স্টুডিও থিয়েটার, দিলু রোডে আর এখন তো নাটক সরণিতেই। তা সেই আমিনুর রহমান মুকুলও নাকি আগে থেকে ভাবনা থাকলেও, দেশের আর এক জায়গায় দেখে, উৎসাহী হয়ে এটা করে চলেছে। সেই 'আর এক' জায়গা হল বরিশাল। বরিশাল 'শব্দাবলী' নামের গ্রুপ স্টুডিও থিয়েটার করে চলেছে নিয়মিতভাবেই, প্রায় পনের বছর ধরে, সেই ১৯৯১ সাল থেকে। দলের জন্ম ১৯৭৮।

কেউ হয়তো বাঁকাভাবে বলতে পারে– আমরা পারিও বটে। বাজারে নতুন মাল কিছু আইলে হয়, আইসে বইলা শুনলে হয়, আর দেখলে তো কথাই নাই, একেবারে ঝাঁপায়া পড়ুম নে। সেই উপনিবেশকাল থেকে এই ট্র্যাডিশন সমানে চলতাছে– এখন আর কোলকাতা ভায়া হইয়া নকলের নকল মাল না– একেবারে ডাইরেক্ট। মডার্ন-

পোস্টমডার্ন-এ্যাবসার্ড-এপিক-পোস্ট কলোনিয়াল। চ্যাম্পিয়ন বাজারির কোনো জরিপ নাই– দুর্নীতি প্রথম হওয়ার মতো– তা হইলে দেখায় দিতাম। তবে এসব কথা বলার লোক কমেও আসছে– এমন আকাল পড়েছে নাট্যবাজারে। অথচ সেই আলী যাকের, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর থেকে বাচ্চুভাই-মামুনভাই হয়ে জামিল-নীলু-তারিকভাই হয়ে আশীষ, আজাদ আবুল কালাম পর্যন্ত যা কিছু করেছে এমন সব বিপ্লবী কি আধুনিক বুলিস্পৃষ্ট হয়েই করেছে। পরিবেশ থিয়েটার, ন্যারেটিভ, এপিক রিয়েলিজম, কমন স্কাই. স্টুডিও থিয়েটার, কম্যুনিটি থিয়েটার, নিও এথনিক থিয়েটার– আরো কত কী– যার একটাও আমাদের মাথা থেকে বের হয়নি। তবে কেউ কি আর অস্বীকার করতে পারি– বাংলাদেশে নাটকে যা-কিছু বলার মতো তেমন হয়েছে নাটকে, এরাই করেছেন। এরাই তাই এখন পর্যন্ত আমাদের হিরো, রোল মডেল, স্থায়ী স্টার। তাদের নস্যাৎ করলে তো নাট্যচর্চা কি গ্রুপ থিয়েটার খতম।

বরিশালের 'শব্দাবলী' কোথায় পেল এই স্টুডিও থিয়েটারের ধারণা? ১৯৮৭ সালে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এক নির্দেশক-কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালা নামটাই তো দারুণ। কামারশালা থেকেই কি কথাটা এসেছে? কামারের জ্বলন্ত আগুনে লোহার উপর লোহা পেটানোর ভিজ্যুয়াল এ্যাকশনটা তো লাগসই এক নাটকীয় দৃশ্যকল্প। যদিও লোহা পেটালে সোনা হয় না, পুড়িয়ে খাঁটি সোনা তৈরি করতে ঐরকম ভয়ানক পেটাপেটিও করতে হয় না, সেটা ভিন্ন ধরনের কাজ। তবে তখনও তো চলছিল এক হাতিয়ার যুগ– সমাজ বদলের, শ্রেণীসংগ্রাম। সবাই তা না ভাবলেও শ্রমক্রিয়ার এক অভিঘাত ভেতরে একটা পুলক জাগাতই– অন্তত নান্দনিক এক চেতাবনি সঞ্চার করত বুঝি। থাক সে কথা। শব্দাবলীর সৈয়দ দুলাল করে সেই কর্মশালা। সেখানে তারিক আনামের কাছ থেকেই শোনে কথাটা– স্টুডিও থিয়েটার। তখন তো 'আমাদের মঞ্চ আমরা গড়ব' বলে আন্দোলন-নাটক চলছে। মিটিং-মিছিল চলছে। তারিক ভাই হয়তো বলেছিলেন– কবে যে আমরা গড়ব আমাদের মঞ্চ, তারচেয়ে বরং এখনই শুরু করা যায়, যে-কোনো বড় এক ঘরের মধ্যেই এক নাট্যশালা– 'স্টুডিও থিয়েটার'। সৈয়দ দুলালের মনে লাগে কথাটা। তিনি ফিরে গিয়ে দলকে বলেন আইডিয়াটা। দল রাজি হয়। তারপর খুঁজে পায় সরকারি এক বাড়ির বড় এক ঘর। সরকারের অনুমতি পাওয়ার জন্য যা যা লাগে তা একটু একটু করে সৈয়দ দুলাল করে ফেলে ক্রমে। কাজের লোক সে। বরিশালের নাম রেখেছে।

তাদের এই নিয়মিত নাট্যচর্চায় আর একটি বিশেষ লক্ষণ। তারা নাট্য নির্দেশনা দেয়ার জন্য একের পর এক নাট্যকলায় শিক্ষিতদের নিয়ে যায় দলে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্বে অনার্স (পরে এম. এ) সাজেদুর রহমান চঞ্চল ১৯৯১ সালে প্রথম কর্মশালা করায়। তবে প্রথম স্টুডিও থিয়েটার প্রযোজনা মনোজ মিত্রের *মেষ ও রাক্ষস* এর নির্দেশনা দেয় সৈয়দ দুলাল। কর্মশালা করিয়ে তারপর নাটকের রূপায়ণ করা হয়। এরপর থেকে কর্মশালা প্রশিক্ষকই সাধারণত নাটকের

নির্দেশনা দেয়। আমিনুল ইসলাম দুর্জয় ও পঙ্কজ ১৯৯৪ সালে মলিয়েরের *তার্তুফ* অবলম্বনে *তিনি মুক্তিদাতা* নির্দেশনা দেয়। এ নাটকের অভিনয়কালে মঞ্চে হামলা-ভাঙচুর করা হয়। নাটকে ধর্মীয় লেবাসধারীর কীর্তিকলাপ ছিল। এরপর আবার সাজেদুর রহমান চঞ্চল ব্রেশটের *সেনোরা কারারের রাইফেল* নিয়ে কর্মশালা করায়– নাটকটির নির্দেশনা অবশ্য দেন সৈয়দ দুলাল। চঞ্চল পরে ভারতের পণ্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণাকালে শব্দাবলীর স্টুডিও থিয়েটার-এ নির্মাণ করে কলরিজের কবিতা *দ্যা রাইম অব দ্যা এনসিয়েন্ট ম্যারিনার* এর নাট্যভাষ্য *একজন নাবিক ও একটি শঙ্খচিল*। এর আগে ১৯৯৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের শিক্ষক দিল্লির এন.এস.ডি. স্নাতক ড. ইস্রাফিল শাহীন সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নির্দেশনা দেন। ১৯৯৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ব্যাচের এম.এ কামালউদ্দিন কবির ৪০ দিনের এক কর্মশালা করান। এবছরই নাট্যচক্রের আলোক পরিকল্পক ও নির্দেশক দেবপ্রসাদ দেবনাথ স্থানীয় লোকগাথা *গুনাই বিবি* রূপায়ণ করেন। নাট্য রচনা করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলায় এম. এ ড. বিপ্লব বালা। একই বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের নাট্যকলায় এম. এ জসীম উদ্দিন রূপায়ণ করেন ময়মনসিংহ গীতিকা *কাজল রেখা*। পোশাক পরিকল্পক একই বিভাগের এম. এ এনাম তারা সাকি।

২০০২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যতত্ত্বে এম. এ আমিনুর রহমান মুকুল রূপায়ণ করেন, গোলাম শফিক-এর নাটক *শিলারী*। পোশাক পরিকল্পক একই বিভাগের এম. এ আলী আহম্মেদ মুকুল। আলোক পরিকল্পনা ঢাকার দেশ নাটকের ইসরাত নিশাত। স্টুডিও থিয়েটারের আলোক ব্যবস্থাপনার নব পরিকল্পনাও তিনি করেন। ২০০৪ সালে শেক্সপিয়ারের *রোমিও এন্ড জুলিয়েট*-এর সায়মন জাকারিয়া-কৃত নবভাষ্য *এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও জুলিয়েট*, নির্দেশনা দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ থেকে নাট্যকলায় এম. এ সাইদুর রহমান লিপন।

এইসব নির্দেশনা পরিকল্পনা পেশাদারি ভিত্তিতেই হয়েছে। জেলা শহরের একটি দলের পক্ষে যা মোটেই সহজকর্ম নয়। করিৎকর্মা সৈয়দ দুলালের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই ব্যয়ভার সামলানো। শুনেছি, স্টুডিও থিয়েটার করা হয় পেশাদারি থিয়েটার গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে। বাংলাদেশে অবশ্য এই কাজ দূর-অস্ত এখনো পর্যন্ত। সেই মনোভাব ও দায় নেয়ার স্বাবলম্বন নাট্যজনের চরিত্রে অনায়ত্তও বুঝি। আমরা কেউ সে-ভাবে নাটক করতে চাই-ওনি আসলে। এটা আমাদের কাছে অবসরকালীন বিনোদনই শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তাকেও জীবিকা বা ক্ষমতার নানা বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবহার করা গেছে যুৎসই প্রয়োগনৈপুণে। নাটক আমাদের কাছে বাঁচা-মরার বিষয় ঠিক নয় যেমন কিনা ব্যক্তিগত চাকুরি বা ব্যবসার বেলায় বলা যায়। তার জন্য অন্য ধ্বক লাগে।

যতই কেন বিজ্ঞাপনি বা মিডিয়া ব্যবসায় আমাদের মেধা লাগসই বাজার বিপণনে দুরন্ত সফলতা অর্জন করুক। তবে ক্রোড়পতি বন গিয়া ক'জন আর!

শব্দাবলী এতদিনে স্বাবলম্বী হতে চাইছে। চেষ্টা অবশ্য আগে থেকেই করছে তারা। ১৯৯৪ সালে সফোক্লিসের *আন্তিগোনে* অবলম্বনে *দর্পহারী* রচনা করেন দলীয় কর্মী সৈয়দ আওলাদ, বর্তমানে খ্যাতিমান মিডিয়া-চিত্রগ্রাহক। নির্দেশনা সৈয়দ দুলালের। ১৯৯৮ সালে শান্তনু বিশ্বাসের *ইনফরমার* নির্মাণ করেন যৌথভাবে খোকন মুখার্জি ও শহীদুল ইসলাম। বছরের সেরা দশটি নাটকের একটি বলা হয় একে।

২০০৬ সালে তাদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন*। একই নাম রেখে নাট্যভাষ্য করে সুনন্দ বাশার আর নির্দেশনা দেন সৈয়দ দুলাল। ঢাকার দর্শক শব্দাবলীর ৩ টি প্রযোজনা দেখেছে *গুনাই বিবি, শিলারী* আর *এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও জুলিয়েট*। শিলারী অধিক প্রশংসিত। জেলা শহরে নির্দেশনা কর্মটি এত কর্মশালা করে, ঢাকার নাটক দেখেও তত দাঁড়াচ্ছে না। কোনো কোনো শহরে দু-একজনের কাজ অবশ্য আশা জাগায়। জেলা শহরের বেশিরভাগ নেতা-সংগঠক-নির্দেশক তাবৎ মেধা ফেডারেশনের ক্ষমতাবাজিতে খরচ করে দেউলিয়া ফকির প্রায়। তবে শব্দাবলীর নতুন নাটক *নীল ময়ূরের যৌবন* দেখে উৎসাহী হতে হয়। এতদিনের শিক্ষিত নাট্যজন-নির্দেশকের কাজের ফল ফলেছে। এমনকি এ নাট্যে তারা পূর্ববর্তী শিক্ষানবিশি কালপর্বের সব কাজকে ছাড়িয়ে গেছে। চর্যাপদ-কালীন আখ্যান সঙ্গত এক নাট্যভাষায়, শারীরমুদ্রা ও বাচন বিশিষ্টতায় রূপায়ণ করেছেন। এমত সৃজনসামর্থ্য তারিফযোগ্য– বিস্ময়করই লাগে এমনই এক থিয়েটার-ইডিয়ম উদ্‌ভাবনায়। এমনই এক নাট্য-স্বাবলম্বন তারা আয়ত্ত করেছে যার জন্য কর্মশালা আর স্টুডিও থিয়েটারের চর্চা নিজেদের পিঠ চাপড়াতে পারে। নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটিয়ে ফাটানোর আগে আমাদের উচিত একটু অন্তত ওদের ঢাকটা পেটানো– ফাটিয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত। ক্ষমতা-কেন্দ্রের চরিত্রমতো ঢাকার আমরা তো সহজে কেউ কারো, বিশেষত জেলা শহরের কাজ নিয়ে সহসা উচ্চবাচ্য করি না, যদি-না বিশেষ কোনো লেনদেন কিংবা ফেডারেশন বা আইটিআই-এর ক্ষমতা ছকে মেলে। এ বিষয়ে ঢাকাকে উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা চট্টগ্রামেরই আছে। অন্যেরা বড় বেশি 'ঢাকা ঢাকা ডাক পাড়া'য় পারঙ্গম। ঢাকার পিঠ চাপড়ানোর মুখাপেক্ষী। দিল্লি, কোলকাতার পরেই তারা ঢাকাবাদী। ক্ষমতা বলে কথা, সাধ্য কি কেউ মান্য না করে?

এই হয়তো আমাদের মৌলিক সংকটস্থল। অথচ সৃজনকলাটি তো স্বাধীন স্বাবলম্বনের এক স্বতোস্ফূর্তি। একসময় তো একে ঈশ্বরের সমকক্ষ ক্রিয়া বলা হত। ঠিক সেই তাগদটারই বুঝি অভাব ঘটে প্রায়শ। কাউকে সামনে না রেখে ঠিক ভরসা জাগে না। পীর মুরশিদ গুরুবাদী এক ঐতিহ্য যে আমাদের। অথচ সেই নাকি আসল গুরু যে কিনা শিষ্যের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারে আত্মদীপনের এক চেতাবনি, বিচিত্রবীর্য

সৃজনফুলকি। *মহাভারতে* শরশয্যায় অর্জুনকে ভীষ্ম নাকি এমনই বলেছিলেন– তেমন শিষ্যই নাকি শিক্ষকের গুরুর আদর্শ! আচ্ছা, থিয়েটার শুনি নির্দেশকের এক স্বৈরক্রিয়ায় সম্পাদ্য। তারা কি তবে এমন অনুসারী চান না, যে কেবলি মাথা নত করে, নাকে খত দেবে না? তা কেমন হয় আমাদের নাট্য-রূপায়ণ-প্রক্রিয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণপদ্ধতি। নির্দেশক-শিক্ষকের এক ক্ষমতারতির হাত-পা বাঁধা উপায়-কল বা ক্রীড়নক হয়েই ওঠে নাকি শিক্ষার্থী নাট্যজন? তারপর তারাও একদিন আবার এমন দাপটের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠে। সমমর্যাদার এক পারস্পরিক বিনিময়ের মিথষ্ক্রিয়ায় কি কোনো শিক্ষা বা নাট্য রূপায়ণ হয়? যৌথ কোনো সৃজনস্ফূর্তি নাট্যক্রিয়ায় কখনো কি ঠিক জাগে? এত যে বলা হয়– থিয়েটার একটি যৌথ শিল্প-মাধ্যম, – তাহলে? মুখে মুখে তো ডায়লগের গুণগানে মুখর আমরা। এটাতো আজ সর্বশেষ আমদানি-বুলি! যত ক্ষমতার মুখেই তো আজ এই এক রা– ডায়লগ চাই, ডায়লগ। ধ্বনিবিন্যাসটাই তো লাগসই। স্মার্ট, ক্ষমতা-বাজার মাত করা। একদিন যেমন 'বিপ্লব' কথাটার ছিল বিশ্বজোড়া বাজার। আজ তা কেবল মিডিয়া-প্রযুক্তির পত্রিকা-হেডিং-জোড়া ক্যাপশন, –'বদলে গেছে দিন, ঘটে গেছে বিপ্লব'।

সত্যই কিন্তু তাই ঘটেছে– বাজারের বিশ্ববিপ্লব। জেলা শহর এ জায়গায় বুঝি পিছিয়ে আছে। সেটাই হয়তো তার একমাত্র সম্বল হতে পারে। নিজেদের অনেকখানি স্বাধীন আত্মমর্যাদায় কিছু করার। বাজারে মুখ ডুবিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঢাকা কি নিজের অজান্তেই চেয়ে আছে না অনেকখানি বাজার-গ্রাসমুক্ত জেলা শহরের দিকে? এখনও হয়তো সম্ভব শহরে শহরে তেমন কিছু করার যা ঢাকায় বসে আর করা যাবে না। মিডিয়া-সংস্কৃতি বাজার পুরোটা এখনো হয়তো গিলে ফেলতে পারেনি গোটা দেশ, মানব-মনের সবটা। জীবন্ত, বাজারবিষে অজর্জর মানুষ, দর্শক আছে সেখানে। – জানি না এ-ও হয়তো নিরুপায় উদভ্রান্তির এক কল্পবিলাস!

তবু যে, শব্দাবলী এখনও পর্যন্ত নিজেদের ছোট স্টুডিও থিয়েটারে নিয়মিত এক নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে, গাঁটের বা নানাভাবে জোগাড় করা পয়সায়– সেটা বড় গলায় বলার মতো ঘটনা বটে। নাট্যজন যে যেখানে যেমন করে যতটা পারে এমন এক সৃজন-স্পৃহা দেখাতে পারে না কি?– কী বলেন সতীর্থ ভাই-ভগ্নী সকল?

[লেখক: নাট্যজন, শিক্ষক ও সমালোচক ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত

ম ম তা জ উ দ্দী ন আ হ ম দ

১.১

মহাকালের বিবেচনায় সাম্প্রতিককাল বড়ো সামান্য। সামনে বিপুল পরিধি ভবিষ্যৎ, পেছনে তিন হাজার বছরের নাটকের পরিজ্ঞাত ইতিহাস। সাম্প্রতিককাল বলতে কোথায় দাঁড়িয়ে পেছনের শক্তি নিয়ে সামনের আকাঙ্ক্ষাকে জন্ম দেব। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিণতি ১৯৭১-এর ডিসেম্বর। কিন্তু এর ভৌগোলিক অবশ্যম্ভাবিতা অনেককাল আগের কথা। প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা– বহু ভাষা গোষ্ঠী, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার আর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বহু বিচিত্র সম্মেলনে পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গভূমির বাঙালি জাতির মানুষ গ্রথিত। তা হলে এ নব্য পলিমাটি সিক্ত বাংলাদেশের সমভূমির কোন বর্তমানে দাঁড়িয়ে সাম্প্রতিককালের কথা বলব।

১৯৭১-এর পরে কী? মাত্র তিন বছর– 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' থেকে 'সুবচন নির্বাসনে', নাট্যচক্র থেকে থিয়েটার? তাই যদি করি তা হলে পেলাম কী?– 'জল্লাদের দরবার', 'খুনে রাঙা বাংলা', 'বাংলার বীরাঙ্গনা'– এসব উষ্ণ প্রগলভ সাময়িক চিৎকার আর অন্য হাতে 'তৈল সংকট' হাইজ্যাকার কবলিত 'সোনার হরিণ', 'নিঃশব্দ যাত্রার' প্রত্যাশী বাংলার 'সংবাদ কার্টুন'। সংখ্যা খুব সামান্য নয়, শতাধিক। কিন্তু পল্লবগ্রাহিতা আর পুচ্ছগ্রাহিতার আবর্তে বন্দি কয়েকজন অভিমন্যু নাট্যকারের পরিচয়।

সাম্প্রতিক নাট্যচর্চাকে স্বল্প সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন অনুচিত হবে, খণ্ডিত পক্ষপাত দৃষ্টির ফলে একচক্ষু হরিণের যা হয়।

অথচ এক সময় তা-ই হয়েছে। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের নাট্য জরিপের দৃষ্টান্ত সে কথাই বলে। তালিকার মীর মোশাররফ, কাজী নজরুল উল্লেখিত আর মধুসূদন, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। কৈফিয়ত ছিল মোশাররফ-নজরুল আমাদের ঐতিহ্য। কী অদ্ভুত যুক্তি। সে সময় যুক্তির নামে ঘোড়া খোঁড়া করা সুলভ ছিল।

১.২

সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ক্ষেত্র গ্রহণে চারটি সন-তারিখের কথা উল্লেখ করছি–

ক. ১৭৯৫-১৫ নভেম্বর; লেবেডেফের প্রযোজনায় বাংলায় রূপান্তরিত ‘ছদ্মবেশী’ নাটকের অভিনয়; নারী-পুরুষ সম্বলিত অভিনয় প্রদর্শনীতে টিকিটের মূল্য ছিল ৮ টাকা এবং ৪ টাকা (পরে একটি সোনার মোহর)।

খ. ১৮৫৯ - ৩ সেপ্টেম্বর; মধুসূদন দত্তের ‘শর্মিষ্ঠা’র অভিনয়; বাঙালির প্রথম আধুনিক নাটক।

গ. ১৮৭২ - ৭ ডিসেম্বর; সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দু’টাকা ও এক টাকার টিকেটে দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়।

ঘ. ১৯৫৩ - ২১ ফেব্রুয়ারি; মঞ্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি কক্ষ। সময় - রাত্রি ১০টা; আট-দশটি হ্যারিকেনের আলোয় মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটকের অভিনয়।

লেবেডেফ বলেছিলেন : ‘আমি লক্ষ করিয়াছি যে, এদেশীয়রা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধি ভাবনার– তা যতই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবেই বলা হোক-না কেন– তা অপেক্ষা ভ্যাঙচানি ও ভাঁড়ামি বেশি পছন্দ করে, তাই আমি এই দুইটি নাটক নির্বাচন করিয়াছিলাম।’

মধুসূদন ‘শর্মিষ্ঠা’র ভূমিকায় লিখেছেন :

‘অলীক কু নাট্য রঙ্গে
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়
সুধারস অনাদরে
বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।’

‘নীলদর্পণ’ দেখে ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকা লিখল :

‘এ সেরূপ অভিনয় নহে, খোশ পোশাকি বাবুদিগের বৈঠকি সখের অভিনয় নহে। মাছের তেলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোশামোদ করিতে হইবে না। শুনিলাম, এ ন্যাশনাল থিয়েটার কোনো বড়ো মানুষের বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত নহে।’

মুনীর চৌধুরী স্মৃতিচারণে বলেছিলেন : ‘জেলখানাতে নাটক মঞ্চস্থ করার অসুবিধা অবশ্যই ছিল। ওই অসুবিধাটুকু সামনে ছিল বলেই তো *কবর* নাটকটির আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে হয়েছে। আট-দশটি হ্যারিকেন দিয়ে মঞ্চ সাজাতে হবে সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই ‘কবর’ নাটকটিতে আলো-আঁধারি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমি সে জন্যেই জেল থেকে ফিরে এসে এদেশে মঞ্চের অভাবের কথা বলি না।’

উপরিউক্ত চারটি সময় ও উক্তি আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী– ঘরের সন্ধান দেয়া– চারটি স্তম্ভ।

২.১

চর্যাপদের বুদ্ধ নাটক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঞ্চালিকা, চৈতন্যদের অভিনীত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক, ভারতচন্দ্রের অসমাপ্ত চণ্ডী নাটক, গোপালউড়ের যাত্রা, দাসুরায়ের পাঁচালীর মধ্যে বাংলা নাট্য পিপাসার ঐতিহ্যের কথা আপাতত আলোচনা থেকে স্থগিত রাখা গেল।

ইংরেজ আমলের বহুজন কথিত আধুনিক বঙ্গদেশে আসা যাক– ১৭৫৩ সাল; প্রবাসী ইংরেজদের নির্মিত 'দি প্লে হাউস'; চৌরঙ্গী থিয়েটার। ১৮৩১ সাল, প্রসন্ন ঠাকুরের বাড়িতে *উত্তর রামচরিত* ও *জুলিয়াস সিজারের* অভিনয়। ১৮৩৫ সাল– নবীন বসুর অভিনব মঞ্চে নারী চরিত্রে অভিনেত্রী আমদানিসহ *বিদ্যাসুন্দরের* অভিনয়। ১৮৪৮ সাল– বাঙালি সন্তান বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের ওথেলোর ভূমিকায় ইংরেজ অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে অভিনয়। বাঙালি নাট্যচেতনাকে ধাপে ধাপে সাম্প্রতিককালের দিকে প্রভাবিত করার এক-একটি বিশিষ্ট সংবাদ।

এরপর এলেন মৌলিক নাট্যকারবৃন্দ। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন, দীনবন্ধু ১৮৭৩ থেকে নারী চরিত্রে নিয়মিত অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ শুরু হল। ১৮৭৬-এ 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস কারারুদ্ধ হলেন। ১৯২১-এ শিশির ভাদুড়ী অধ্যাপনা ছেড়ে নাট্যমঞ্চে এলেন। ১৯৪৪-এ বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করল। আর ১৯৪৭ সাল। বঙ্গদেশ ভাগ হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববাংলা। ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলা হয় বাংলাদেশ।

উপরিউক্ত তথ্যপঞ্জির সংক্ষিপ্ত বিবরণীর সাহায্যে বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে কোন বিশেষ ঘটনা বা সময়ের ভূমিতে রেখে সাম্প্রতিককালের যাত্রাকে নির্দেশিত করা যাবে?

দশম শতাব্দীর চর্যাপদ থেকে একাত্তরের বাংলাদেশ– হাজার বছরের বিস্তৃতি। সংস্কৃত নাটক থেকে চৈতন্যলীলা। কালীয়দমন থেকে যাত্রা। বিদেশি চৌরঙ্গী থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার। *নীলদর্পণ* থেকে *নবান্ন*। নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী, থেকে সেলিম আল-দীন, আল-মনসুর, আবদুল্লাহ-আল-মামুন। মিনার্ভার গিরিশ ঘোষ, শ্রীরঙ্গমের শিশির ভাদুড়ী, বহুরূপীর শম্ভু মিত্র থেকে নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার, থিয়েটার। ব্যক্তির অভিনয়-সৌকর্য থেকে দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষ। স্থির অনড় দৃশ্যপট থেকে অধ্যায় নির্দেশিত মঞ্চসজ্জায় জাদুকরি আলোর নিয়ন্ত্রণ কার্জন হল, মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট থেকে মহিলা সমিতি মঞ্চ।

ইতোমধ্যে আমরা ঈজিয়ান সাগরতীরের তিন হাজার বছর আগের এথেন্সের নাট্যকলার অভিজ্ঞান লাভ করেছি। শেক্সপিঅর ও তার গ্লোবের দিবাভিনয়ে, এক পেনির দর্শক আমাদের পরিচিত। স্তানিস্লাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটার, জার্মানের

পিসকাতর, ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটার আমাদের অনুশীলিত। আয়োনেস্কো স্যামুয়েল বেকেটের ‘অসম্ভব নাটক’ আমাদের বিদগ্ধ নাট্যকর্মীদের অনুশীলন-চৈতন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভ করেছে।

সাম্প্রতিককালের নাট্যকাররা এপিকের, অসম্ভবের আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে কখনো অনুসরণের অর্বাচীন আনন্দে, কখনো অভিনবত্বের প্রবল আগ্রহে। আমরা ছোট্ট একটি দেশের অসংখ্য মানুষের ঘনবসতি এলাকায় বাস করে সম্ভব-অসম্ভবের অনুশীলন, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাকার হয়ে বাস করছি। ইলিয়াড-ওডেসি, রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-পুরাণ, বাইবেল ঘনঘন উচ্চারণ করি। আমাদের সাম্প্রতিককাল ক্যালেন্ডারের পাতায় সামান্য কিন্তু বিরামহীন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের জোরে বহু দীর্ঘ অতীত আর বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিস্তৃত সময় আমাদের জীবনবিন্যাসে পরিচিত হয়ে উঠছে।

২.২

তাহলে বিতর্কিত জেনেও ‘সাম্প্রতিককাল’-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপস্থিত হই।

বাংলাদেশের বর্তমান ভূ-খণ্ড ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল।

আমি ১৯৪৭-১৯৭৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের চেতনাকে নাট্যচর্চার জন্যে নিম্নরূপভাবে ভাগ করতে চাইছি :–

১৯৪৭-৫২ : পাকিস্তানি যুগ।
১৯৫২-৫৮ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্বোধনের যুগ।
১৯৫৮-৬৮ : প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরাবির্ভাব ও প্রতিহত হওয়ার যুগ।
১৯৬৮-৭২ : বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্বোধনের যুগ।
১৯৭২– : অস্থির যুগচেতনা ও নবজীবন জিজ্ঞাসার নবীন যুগ।

এ পর্বভাগ এখনকার আলোচনার সুবিধার জন্যে একটি নিমিত্তমাত্র হলেও আমার দুঃখ নেই। কেননা চিন্তা ও চৈতন্যকে কোনো বিশিষ্ট সন ও তারিখের দ্বারা চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়, একথা আমিও বিশ্বাস করি। তবু সাম্প্রতিকালের একটা সীমানায় দাঁড়াবার জন্যে আমি প্রথমাবধি একটা আশ্রয় খুঁজে মরছি। আমার বিবেচনায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে মূল ধরে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা-সূচি নির্মাণ করা সম্ভব হবে। সেখানে দাঁড়িয়েই আমরা সফোক্লিসের ‘অইদিপাস’, শেক্সপিঅরের ‘ম্যাকবেথ’, ইবসেনের ‘ডলস হাউস’, ব্রেখট-এর ‘সাহসিকা জননী’, গোর্কির ‘নীচুতলার মানুষ’, ও নীলের ‘সম্রাট জোনস’, রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ দেখব। আর সামনে থাকলেন পিরানদেলো, আনুঈ, আয়োনেস্কো, স্যামুয়েল বেকেট, উৎপল দত্ত, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, বাদল সরকার। আর নবচেতনায় সংরাগক্ষুব্ধ, উল্লসিত, জীবনসংক্ষুব্ধ অধিকাংশই তরুণ, নাট্যকারবৃন্দ। তাহলে ১৯৫৩-এর ‘কবরের’ ওপর

আমাদের প্রস্তরফলক নির্মাণ করি। সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার প্রথমসূর্যের রক্তিম আলো এসে পড়ুক মুনীর চৌধুরীর উপর।

'এ লাশের গন্ধ অন্যরকম,
ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের
গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না।
বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, যত
নিচেই, চাপা দাও না কেন,
এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে,
বেরিয়ে আসবে, উঠে আসবে।'

কবর, মুনীর চৌধুরী

সম্পূর্ণ নতুন সংলাপ। অভিনব চরিত্র চিত্রণ। অন্ধকার বিদীর্ণ করা কলাকৌশলের আহ্বান। নুরুল মোমেনের 'রূপান্তর', ইব্রাহিম খাঁয়ের 'কাফেলা', আবুল ফজলের 'কায়েদে আজম' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের সংলাপ। চরিত্র বিন্যাস, অনুভূতির তীক্ষ্ণতার গুণে, মঞ্চ নির্দেশনার বিশাল সম্ভাবনার জোরে বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্রথম নাটক নির্মাণ করে গেছেন রাজবন্দি মুনীর চৌধুরী। এরপর আর পেছোবার পথ নেই। 'প্রফুল্ল', 'সীতা', 'পথের শেষে'র গাড়ি বোঝাই মৃত্যু দিয়ে বাঙালি শিক্ষিত দর্শককে আর বিমুগ্ধ করা যাবে না। কিন্তু সে প্রত্যাশা আমাদের সে সময়ের নাট্যকাররা চরিতার্থ করেননি। ১৯৫০ থেকে '৫৪-এর মধ্যে মুসলিম লীগওয়ালাদের চোখরাঙানি আর সেন্সরশিপের মধ্যেও বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ এবং চট্টগ্রামের প্রান্তিক, কৃষ্টিকেন্দ্র, রেলওয়ে ক্লাবের উদ্যোগে 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার', 'দুঃখীর ঈমান' প্রভৃতি নবনাট্য-আন্দোলন বক্তব্য ও অনুশীলন-সমৃদ্ধ নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নবনাট্যান্দোলন বিচ্ছিন্ন অলৌকিক কিছু রসবিলাসী নাটক নয়। উদ্বুদ্ধ-চৈতন্য, প্রস্তুত দর্শক 'কবর'কে লাভ করে প্রসারিত হল অথচ 'কবর'-এর পরে তেমন দৃষ্টিউন্মোচনকারী নাটক আর লেখা হল না। মুনীর চৌধুরীর হাতে ইতিপূর্বে 'মানুষ', 'নষ্টছেলে' লেখা হয়েছে। তেমনটি আর পাওয়া গেল না। রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন মুনীর চৌধুরী তখন অনুবাদ আর রূপান্তরে নিয়োজিত।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা হল, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হল; প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারাল– এত সুযোগ আর স্বাধীনতাকে প্রগতিশীল নাট্যকর্মীরা উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারল না। কেন? সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বহুবিতর্কিত সেসব তথ্যপঞ্জির মধ্যে প্রবেশ করে বিফলতার বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রসঙ্গকে আহ্বান করবে।

২.৩

সেদিন সেই ভুল ও যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণে ব্যর্থ দায়িত্বশীল নেতৃত্বের শৈথিল্যকে অন্যতম কারণ ভেবে সেই ভুলের মাশুল কীভাবে নাট্যকর্মীদের দিতে হয়েছে তার কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করছি।

এরকম একটি সময়ে প্রধানত সংস্কৃতি পরিষদের নাট্যসচেতন কর্মীদের নিয়ে ড্রামা সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা যারা প্রথম দিকের সদস্য ছিলাম– আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এদেশের জীবন ও মানুষকে নিয়ে লেখা এদেশের নাট্যকারের, জীবনসম্পৃক্ত নাটক করব। আমরা সৎ, প্রগতিশীল, অন্ধত্বমোচনকারী অনুশীলন ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ নাটক চাই। আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' পাওয়া গেল। আমাদের সর্ব আকাঙ্ক্ষা পরিবহনকারী যদিও নয়– তবু আমাদের ভালো লেগেছে। ড্রামা সার্কেল 'রক্তকরবী' করল। তারপর অনুবাদ আর অনুবাদ। তখন আকাঙ্ক্ষিত নাটক দুর্লভ ছিল। তখন সামরিক শাসনের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা শত হাত প্রসার করে অক্টোপাসের মতো মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সুলভস্বাচ্ছন্দ্য-শিকারি বুদ্ধিবাদীদের চরিত্র বিনাশ করতে স্বর্গমৃগয়া ছেড়ে দিয়েছে। পুরস্কার আর প্রচারের, প্রাপ্তি আর প্রকাশের প্রবল উত্তাপে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে সে কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধমহিমা ঘোষণার উন্মত্ততা। বেতার-টেলিভিশনে চুটকি-চটকদার প্রদর্শনে উলম্ফন। সর্ব উদ্যোগ বিনাশকারী সেই শূন্যতার পর্বে যারা ফাঁকা মঞ্চে অনিবার্যভাবে ফুটে উঠল– তাদের শক্তি, শিক্ষা আর চৈতন্যের সম্পদ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। কতক 'বস্তাপচা মেলোড্রামা' বাংলাদেশের রঙ্গালয়সমূহকে ব্যাকুল করে রেখেছে। যদিও যথার্থ রঙ্গালয় বলতে বাংলাদেশে বলতে বাংলাদেশে কোনো কিছুর অস্তিত্ব অদ্যাবধি কোথাও কিছু নেই।

কোলকাতার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের হালকা রগরগে উল্লাস আর রুগ্ন বক্তব্যের অক্ষম অনুকারী এইসব নাট্যকারদের কাছে শিক্ষক মানেই দরিদ্র বিদ্যাভারবাহী-করুণ জীব; পকেটমার মানেই সমাজতান্ত্রিক, শ্রমিক মানেই জাতীয় নেতা এবং ধনীর দুলালিকে বিবাহ করে মিলের ম্যানেজার হওয়ার যোগ্য নায়ক, আর বদ্ধ মাতাল মানেই মস্তবড়ো দার্শনিক। কোলকাতার *শ্যামলীর* পাঁচশো রজনী, *ক্ষুধার* ছয়শো, *উল্কার* সাতশো আর *সেতুর* হাজার রজনী অভিনয়যোগ্য দেখে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্মের অনুসরণের মহৎকর্ম সাধন করার দুর্বল অনুকরণবৃত্তি এসব নাট্যকারকে আচ্ছন্ন রেখেছিল।

তখন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির লেনদেন বন্ধ, আদমজি পুরস্কারের ছড়াছড়ি, অপাঠ্য আক্ষরিক অনুবাদের জন্যে বিপুল অর্থাগম, মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ-মধুসূদন তথা পশ্চিমবঙ্গীয় নাট্যকার নির্বাসিত, এদেশের নাট্যকারেরা টেলিভিশনে স্বয়ম্বরপ্রাপ্ত। তখনকার সেই শূন্যমঞ্চে ওইসব প্রগলভ রগরগে নাটকের নামে ঊনবিংশ শতাব্দীর নির্বাসিত মেলোড্রামা পুনরায় উদিত হল।

জনৈক নাট্যবেত্তা বলেন : 'তাদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে, কেননা এতদসত্ত্বেও এরা নাট্যপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।' আমাদের মনে হয় সে প্রদীপের শিখায় নাট্যমঞ্চের দেয়ালে এবং দর্শকের চোখে এত ঝুল আর ধোঁয়া লেগেছে যে, সাম্প্রতিককালের নাট্যকর্মীদের জন্য বিঘ্ন শুরু হয়েছে। ঝুল ঝেড়ে দর্শকের চোখ থেকে ধোঁয়া মুছে নতুন নাট্যরসের স্বাদ তুলে ধরতে সময় নিচ্ছে। দর্শকরুচি যথার্থ উন্নত করতে সময় লাগবে। নবনাট্যকর্মের ধারাবাহিক প্রয়োগে দর্শকরুচি সৃষ্টির যে দুঃসাহসিক উদ্যোগ এদেশের সচেতন নাট্যকর্মীরা গ্রহণ করেছিলেন– তাদের কর্মশৈথিল্যের ফলে সৃষ্ট শূন্যতার পর্বে এইসব তথাকথিত নাটক এসে আমাদের দর্শককে পশ্চাৎমুখীন করেছে। জিজ্ঞাসাবিমুখ, পরীক্ষাবিমুখ, চিন্তাশূন্যতার এই পর্বে দু' একটি দুঃসাহসিক, অচলায়তনভেদকারী নাটক রচিত হয়েছে : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু', এম.এ. আজমের 'এই শতাব্দী ও তারপর', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'মরক্কোর জাদুকর', রামেন্দু মজুমদারকৃত 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। কিন্তু আমরা জানি এসব নাটকের কয়েকটি আজ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়নি। অন্যগুলোর মঞ্চায়নে সচেতন উদ্যোগের অভাব দেখা গেছে।

'তরঙ্গভঙ্গ' আমাদের বিবেচনায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি শক্তিশালী পালাবদলকারী রচনা। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত এ নাটকটি বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের আলোড়ন তোলা অসম্ভব নাট্যসাধনার সমান্তরাল একটি সৃষ্টি। পশ্চিম বাংলার বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস' তখনো রচিত হয়নি। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কিছুটা নির্লিপ্ত বেদনায় বলেছিলেন : 'তরঙ্গভঙ্গ'-এর জের টেনে আর কী হবে। 'উজানে মৃত্যু' নাটিকাটির ইতালীয় এবং ফরাসি রূপ সেসব দেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে জানলুম এ নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়া দূরে থাক অনেকেই পড়েও দেখেননি। আর পড়লেও মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করতে চাননি। আমার ইচ্ছা ছিল– এই ফর্মে আরো আটটি নাটিকা লিখে পাঠাব।

যুদ্ধকালীন সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রবাসে মারা গেছেন।

এখনকার নাট্যচর্চায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাট্যক্ষমতার যথোপযুক্ত পরিচয় করলে দেখা যাবে তাঁর নাট্যক্ষমতা শুধু বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের থেকে অগ্রগামী ছিল না, আমাদের জীবনসংযুক্ত বাণীবিন্যাসের প্রতি আধুনিক, শিক্ষিত, অনুশীলনদক্ষ প্রয়াসও ছিল।

৩.১

এমনি ঘোলাটে আলো আর নিরুত্তাপ অন্ধকারের মধ্যে প্রবল আকারে ঝড় এল, যুদ্ধ শুরু হল। ১৯৫৪ সালের ক্ষমতা বদলের যুদ্ধ নয়, সর্বপ্রকার স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৯৭০-এর নভেম্বরের জোয়ারে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানুষ সমুদ্রের লোনা জলে ডুবে মরেছে।

১৯৭১-এর মার্চে জোয়ারের টানে এদেশের মানুষ দেশ ছেড়েছে, না হয় রুদ্ধশ্বাস শঙ্কায় অথবা অস্থির বিপন্নতায় রুদ্ধকক্ষের অন্ধকারে বসে আলোর তপস্যা করেছে। সেইসব বিপন্ন দিনগুলোতে নাট্যজগতের কর্মীরা নিজ নিজ কামনা-বাসনা অথবা উদ্বেল উৎকণ্ঠা না হয় অভিজ্ঞান অনুশীলন সততা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন অথবা বিকশিত হয়েছেন।

কামনা-বাসনার স্বরূপে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের আশ্রয় ছিল সে সময়ের রেডিও পাকিস্তান, পাকিস্তান টেলিভিশন এবং সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ সেই সময় এই সোসাইটির উদ্যোগেই চৌদ্দটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্বেল উৎকণ্ঠা নিয়ে যারা পথে প্রান্তরে ঘুরেছেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত চরমপত্র আর জল্লাদের দরবার শ্রবণ করেছেন তাদের কাছে আমরা পরবর্তীকালে 'জল্লাদের ফাঁসি', 'বীর বাঙালি' জাতীয় নাটকগুলো পেয়েছি।

আর সেইসব অনুশীলন, অভিজ্ঞান-সচেতন বিশেষত তরুণ নাট্যকার যারা কলিকাতার মুক্তাঙ্গন, লিটল থিয়েটার, নান্দীকার প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর নাটক দেখে দেশে ফিরে এলেন, তাদের কাছে পেলাম নতুন নাটক। কেউ বলেছেন এবার সত্যি সত্যি রাজার পাগলা হাতি এসে পড়ল। আমরা এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করছি।

এখন কয়েকটি তথ্যপঞ্জি উপস্থিত করছি :

১. স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত নাটক। আমাদের আলোচনায় যাকে 'উদ্বেল উৎকণ্ঠিত', 'স্বাধীন বাংলা বেতার আশ্রয়ী' নাট্যকারদের রচনা বলে বিবেচনা করেছি :

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত নাটক

নাট্যকার	নাটক	সংখ্যা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	নিঃশব্দ যাত্রা	১
আবদুল জলিল	খুনে লাল বাংলা	১
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	রক্ত কমল	১
আবদুল হাকিম (বি.এ)	বাংলার রক্ত মঞ্চে	১
আ.স.ম. মাহবুবুল হোসাইন	রক্ত দিয়ে লেখা	১
আবু হাসান যশোরী	স্বাধীন বাংলা	১
আবদুল্লা ইউসুফ ইমাম	বাংকার	১
এম.এ. মজিদ	জল্লাদের দরবার	১
এম.এ. বারি	সোনার বাংলা	১
কাজী জাকির হোসেন	শান বাঁধানো ঘাট	১
কল্যাণ মিত্র	একটি জাতি একটি ইতিহাস জল্লাদের দরবার	২

কালীপদ দাশ	জয় বাংলা	
	সোনার বাংলা	
	বীর বাঙালি	
	বাংলার মাটি	৪
চমক রতন	বাংলার বীর বীরাঙ্গনা	১
চৌধুরী জহুরুল হক	পটভূমি	১
জালাল উদ্দিন রুমী	সংগ্রামী বাংলা	১
টি. আহমদ	রক্তস্বাক্ষর	১
তা.ম. আসাদুজ্জামান	জল্লাদের পতন	
	এক নদী রক্ত	২
নীলিমা ইব্রাহিম	যে অরণ্যে আলো নেই	২
দিলীপ সরকার	বাংলার বিজয়	
	বাংলার বীরাঙ্গনা	
	অনেক রক্তের পরে	৩
ফিরোজ আল মুজাহিদ	মুক্তিপাগল বাঙালি	১
ভাস্কর	বিদ্রোহী বাঙালি	১
মিয়া আবদুল গণি	রক্ত যখন দিয়েছি	১
মমতাজউদদীন আহমদ	এবারের সংগ্রাম	
	স্বাধীনতার সংগ্রাম	
	বর্ণচোর	৩
মাহবুবুর রহমান এবং		
অলোক দাশ	জল্লাদের ফাঁসি	১
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জাগ্রত বাঙালি	১
মোহাম্মদ জালালউদ্দিন	রক্তে রাঙা বাংলাদেশ	১
মোমেন খান	কাল রাত্রি	১
মুশতারী শফি	বিধ্বস্ত বাসনা	১
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন	ধানের শীষে আগুন	
	রক্ত দিয়ে আনলাম	২
রণেশ দাশগুপ্ত	ফেরী আসছে	১
লুৎফুর রহমান	বঞ্চিত বাংলার উপাখ্যান	১
শহীদুল হক খান	রক্ত শপথ	১
শাহজাহান ঠাকুর	অমর নির্দেশ	১
শেখ হাবিবুল্লাহ	রক্তের বিনিময়ে	
	বীর বাঙালি	

	মুজিবের বাংলা	
	রক্ত সূর্য	
	জল্লাদের কারসাজি	৫
শেখ নুরুল ইসলাম	মানুষ বাঙালি	১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক ছত্রিশজন নাট্যকারের ঊনপঞ্চাশটি নাটকের সন্ধান পেয়েছি। অধিক তৎপর হলে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। এসব নাটক বাহাত্তর-তেহাত্তরে রচিত। পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দিদশা গ্রহণ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তীকালে রচিত এসকল প্রকাশ-উন্মাদন নাটকের মূল্যও কালের বিচারে অক্ষয় থাকবে না। এমন চিহ্নিত, উন্মুক্ত এবং উদ্বৃত্ত বাণী যোজনাকারী নাটকের কাছে শিল্পকুশলতা দাবি করা নিরর্থক। এসব নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, নারীধর্ষণের চিত্র অঙ্কনের জন্যে প্রমত্ত উন্মাদনা আছে, মাঠের করতালি নিনাদিত জনপ্রিয়তার জন্যে ব্যাকুল সর্বস্ব সংলাপ আছে। নাট্যকারদের উষ্ণ ধিক্কারে শত্রুপক্ষ মর্মান্তিকভাবে বিধ্বস্ত। জাতীয়তাবাদী প্রবল অনুরাগের উচ্ছ্বাসে বাঙালিমাত্রই দুর্দমনীয় দেশপ্রেমিক হিসেবে রূপায়িত। ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাসের জোয়ার নেমে যাওয়ার সাথে সাথে এসব নাটক ভাটার টানে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব নাটক একটি সমুত্থিত জাতির জাগরণের তথ্যপঞ্জি হিসেবে উল্লেখিতমাত্র হতে পারে। এ দোষ শুধু একালের নয়। পুচ্ছগ্রাহিতার অনুরাগ ঊনবিংশ শতাব্দির নাট্যকারদের মধ্যেও ছিল। 'নীলদর্পণের' অভূতপর্ব জনপ্রিয়তার পর শুধু 'দর্পণ' নামে চৌদ্দখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন : 'জমিদার দর্পণ', 'জেলদর্পণ', 'চাকর-দর্পণ' ইত্যাদি। এখানেও তাই 'জল্লাদ', 'বাঙালি', 'রক্ত', 'স্বাধীনতা', 'সংগ্রাম', 'বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি নাম আর সংলাপের শব্দ সহস্রবার এসব নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে। টিক্কা খান, নিয়াজি কখনো স্বনামে, কখনো অন্য নামে উর্দু বা বাংলা সংলাপে নির্মমভাবে প্রকটিত হয়েছে।

এসব নাটকের একজন নাট্যকার বলেছেন : নাটক লেখার অভিপ্রায় বহুদিনের কিন্তু আধুনিক জনজীবনের উপযোগী নাটক লিখতে গিয়ে এতকাল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। আজ স্বাধীন বাংলায় মুক্তকণ্ঠে এ নাটক লিখতে পেরে আমি ধন্য।

এরূপ একটি নাটকের একটি সংলাপের নমুনা :

'হামলোগ, ত পুরো তাকতসে কাফের কা সাথ লড় রাহা হো। লেকিন সালে লোগ, এতনি খতরনাক হ্যায় ক্যা উসকো কোঁই ঠিকানা হ্যায় নেহি মিল রাহেঁ। লেকিন গাদ্দার লোগগো হাম ছোড়া নেহি। ওয়াপস আনেকা টাইম মে আগ লাগাকে দাবা কর দিয়া। উসকা সাথ সাথ যেতনা আদমি হামকারা নজরুমে আয়ে, সালে কো হালাক কর দিয়া।'

আরেকটি নাটকের একটি দৃশ্য পরিকল্পনা :

ফিলিপ : বন্ধুগণ। এবর আপনাদের সামনে বিগত ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের টেপ বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে।

(টেপে সম্পূর্ণ ভাষণ শেষ হলে মুশতাক টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বক্তৃতা দেয়ার জন্যে নয়। আরো তিনজন বক্তাকে ভাষণ দানের আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। সে তিনজনের ভাষণ শেষ হল। তারপর মুশতাক তার বক্তৃতা শুরু করল।)

এসব নাটকের মধ্যেও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ব্যতিক্রমী যথার্থ নাটক লেখা হয়েছে। যেমন আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা', নীলিমা ইব্রাহিমের 'যে অরণ্যে আলো নেই।'

৩.২

'নিঃশব্দ যাত্রা'র নাট্যকার আলাউদ্দিন আল আজাদ ভূমিকায় বলেছেন :'আধুনিক নাটকে দুঃসাহসী না হয়ে উপায় নেই। সেজন্যে আটপৌরে বাহবা নেয়ার বদলে অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নিতে নাট্যকার সদাজাগ্রত। বর্তমান নাটকে ত্রৈমাত্রিক উপস্থাপন কতখানি সার্থক হয়েছে জানি না তবে সেই দুর্লভ সামঞ্জস্যকে আয়ত্ত করার জন্যে আমি পাষাণ প্রতিম।'

আধুনিক নাটকে দুঃসাহসী না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু দুঃসাহস কীসের জন্যে? বিন্যাসে না বর্ণনায়? সংলাপে না উপস্থাপন? কৌশলে না বক্তব্যে? ইউরিপিদিস তার কালে দুঃসাহসী বক্তব্যকে ভূমিসংলগ্ন করার জন্যে। শেক্সপিঅর সেকালের অভিনব। ঐক্যকে অস্থির করার জন্যে, ঘটনাকে চরিত্রের কাছে পদনির্ভর করার জন্যে, ঘটনাকে চরিত্রের কাছে পদনির্ভর করার জন্যে ব্রেখট আর এক বিস্ময় এপিক পোয়েম ফর্মকে এপিক থিয়েটারে সমুপস্থিত করার জন্যে। আয়োনেস্কো, বেকেট আরেকটি মোড়– সব ফর্মের বিনাশ করে চেতন-অবচেতনকে একাকার করে সব নিরর্থক হাস্যকর করার জন্যে। আমাদের আধুনিক নাট্যকাররা কী অর্থে দুঃসাহসী হতে চান? অবশেষে রাজার মত্ত হস্তী এসে নলবন দলন করে যা কিছু ইউরিপিদিসীয়, শেক্সপিরীয়, স্টানিস্লাভস্কীয়, রাবীন্দ্রিক– সব তছনছ করে কোনো নতুন বীজ বপন করতে চাইছেন? একথা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য যে, শতবর্ষব্যাপী বাংলা নাটকের সামাজিক বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ চরিত্র-আদর্শ ও সংলাপের কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু নাট্য উপস্থাপন রীতির প্রচলিত নিরাপদ পথ থেকে ট্রাডিশনাল প্রয়োগকর্তারা নড়েচড়ে এগুতে চাননি। মধুসূদনের নাটক আর আনিস চৌধুরীর নাটকের কালের ব্যবধান শতবর্ষ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগকর্তার স্থবির ধ্যান-ধারণার জন্যে বুঝবার উপায় থাকবে না, আনিস চৌধুরী একশো বছর আগে জন্ম নিলে কী অন্যায় হত। এ অপরাধ নাট্যকারের নয়– উপস্থাপনকারীর। ব্রেখট-এর হাতে পুরাতন একটি কাহিনী তিন পয়সার পালা নতুন রূপ পায়। আয়োনেস্কো সম্প্রতি আরেক দৃষ্টির আলো দিয়ে শেক্সপিঅরের ম্যাকবেথকে মঞ্চে তুলেছেন। ককতের হাতে এসে সফোক্লিসের অইদিপাস সম্পূর্ণ অভিনবত্ব পেয়েছে।

আমাদের কাছে নবনাট্য আন্দোলন ও প্রয়োগরীতির অভিনব চর্চা উপস্থিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুনীর চৌধুরী এক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এক্ষেত্রে শক্তিধর নাট্যকার। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এ ধারায় প্রবল আগ্রহ ও উদ্যম সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আঙ্গিক, সংলাপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাট্যরচনার একটি তালিকা নিচে দেয়া হল। আমাদের নবীন এবং প্রবীণ নাট্যকারবৃন্দ আন্তর্জাতিক নাট্যান্দোলনের সঙ্গে কমবেশি সম্পর্ক রাখার যে প্রয়াস রেখেছেন তালিকায় বিধৃত মৌলিক, অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটকের পরিচয় সে কথার নিদর্শন বহন করছে :

সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনে রচিত নাটক

নাট্যকার	নাটক	সংখ্যা
আল মনসুর	হে জনতা আর একবার	৪
	রোলার ও নিহত এল-এম-জি	
	বিদায় মোনালিসা	
	রেভ্যুলিউশন ও খ্রিস্টাব্দ সন্ধান	
আবদুল মান্নান সৈয়দ	না ফেরেশতা না শয়তান	
	বিশ্বাসের তরু	২
আব্দুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে	
	এখন দুঃসময়	২
আজমিরী ওয়ারেশ	উন্মোচন	১
আখতার কমল	রংহীন সিগন্যাল	১
আনোয়ার তালুকদার	দাঁড়াব শুধুই	
	উৎস থেকে সমুদ্দুর	২
আলাউদ্দিন আল আজাদ	নরকে লাল গোলাপ	
	নিঃশব্দ যাত্রা	
	জোয়ার থেকে বলছি	
	সংবাদ শেষাংশ	৪
আহমেদুজ্জামান	নিঃসঙ্গ এ যাত্রা	১
আবুল হোসেন	অথচ অন্ধকার	১
আনিস চৌধুরী	যেখানে সূর্য	
	হাইজ্যাকার	২
আসকার ইবনে শাইখ	অনেক তারার হাতছানি	
	প্রচ্ছদপট	২

এম.এ. আজম	এই শতাব্দী ও তারপর	১
এহসানউল্লাহ	কিংশুক যে মরুতে	১
কবীর আনোয়ার	পোস্টার	
	রূপের পসরা	
	জনে জনে জনতা	৩
গগন তানু	দুঃশাসনের বেড়াজাল	১
জিয়া হায়দার	শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ	১
নাজমুল আলম	উপরে উঠা সিঁড়ি	
	সারেং	২
নিরঞ্জন অধিকারী	কালো অশোক লাল ফুল	১
নির্মলেন্দু গুণ	আপন দলের মানুষ	১
নুরুল করিম নাসিম	সোনার হরিণ	
	বিজন বাড়ি নেই	
	সম্রাট সাবধান	
	মহারাজ আসবেন	৪
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	
	রূপান্তর	২
সাঈদ আহমদ	কালবেলা	
	তৃষ্ণায়	২
সিকান্দার আবু জাফর	শকুন্ত উপাখ্যান	১
বুলবন ওসমান	পাণ্ডুলিপির আড়ত	১
ফরহাদ মযহার	প্রজাপতির লীলালাস্য	১
মামুনুর রশীদ	পশ্চিমের সিঁড়ি	১
মমতাজউদদীন আহমদ	স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা	
	ফলাফল নিম্নচাপ	
	রাজা অনুস্বারের পালা	
	হরিণ চিতা চিল	৪
মুনীর চৌধুরী	কবর	
	দণ্ডকারণ্য	
	মর্মান্তিক	৩
মাহবুব তালুকদার	হ্যারিকেন	১
রশীদ তালুকদার	তৈল সংকট	১
রবিউল হাসান	জননীর মৃত্যু চাই	১
শাহনূর খান	পেন্ডুলামে খুন	

	সভাপতি বলবেন	২
সাযযাদ কাদির	সাড়ে সাতশো সিংহ	১
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	উজানে মৃত্যু	
	তরঙ্গভঙ্গ	২
সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি	অস্থির সুস্থিতি	১
সালে আকরাম	নিরঞ্জন ফিরে এসো	১
সেলিম আল দীন	লিব্রিয়াম	
	জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন	
	এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা	
	সংবাদ কার্টুন	
	অনিকেত অন্বেষণ	
	করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা	
	নীল শয়তান	
	তাহিতি ইত্যাদি	
	মশারী '৭৩	
	সর্প বিষয়ক গল্প	
	চাবির দুঃখ	১১
হাবিবুল হাসান	সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ	
	কৃষ্ণচূড়ার লাল কিংবা রজনীগন্ধার সাদা	
	আরেকটা শহর চাই	৩
হাবিব আহসান কোহিনুর	পলাতক পালিয়ে গেছে	
	তরুণ ও বহমান ক্ষত	
	সাক্ষাৎকার	
	ব্যক্তিগত পৃথিবী	৪

বিদেশি নাটক/নাটিকার রূপান্তর

নাট্যকার	নাটক	সংখ্যা
আলী যাকের	বিদগ্ধ রমণীকুল	
	এই নিষিদ্ধ পল্লীতে	২
আবুল ফজল	ছদ্মবেশী	১
আবদুন নূর	হুতোম প্যাঁচার দেশে	১
আবদার রশীদ	দরবেশ	১

আতাউর রহমান	ভেঁপুতে বেহাগ	১
কবীর চৌধুরী	শত্রু	
	শহীদের প্রতীক্ষায়	
	অচেনা	৩
জিয়া হায়দার	প্রজাপতি নির্বন্ধ	১
মুনীর চৌধুরী	ললাট লিখন	
	গুর্গনখাঁর হীরা	
	জমা খরচ ইজা	
	জনক	
	রূপার কৌটা	
	কেউ কিছু বলতে পারে না	৬
মমতাজউদদীন আহমদ	দখিনের জানালায়	
	সূর্যের আলো চেয়ে	২

অনূদিত নাটক

নাট্যকার	নাটক	সংখ্যা
আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ	শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস	১
আতাউর রহমান	মাইলপোস্ট	১
আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা	শ্বেতকুন্তলা	১
আব্দুল্লাহ আল মামুন	ডক্টর ফস্টাস	১
কবীর চৌধুরী	সম্রাট জোনস	১
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	স্যামসন অ্যাগনিসটিজ	১
জিয়া হায়দার ও		
আতাউর রহমান	দ্বাররুদ্ধ	১
ফতেহ লোহানী	একটি সামান্য মৃত্যু	
	বিলাপে বিলীন, আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান	
	সবাই আমার ছেলে	
	সপ্তসুরের থিবী আক্রমণ	
	কালবেলা	৪
মুনীর চৌধুরী	মুখরা রমণী বশীকরণ	১
লায়লা সামাদ	লাল লণ্ঠন	১
শওকত ওসমান	ডাক্তার আব্দুল্লার কারখানা	১

সৈয়দ আব্দুল হাই	ছারপোকা	১
সৈয়দ আলী আহসান	ইডিপাস	১

উপন্যাস, ছোটগল্পের নাট্যরূপান্তর

নাট্যকার	নাটক	সংখ্যা
আকবর ইমাম	বৃষ্টি	১
আহমেদুজ্জামান	পৃথুলা	১
এম.এ. আজম	বিভ্রান্ত অতীত	১
নূরজাহান হাবীব	ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি সি	১
মমতাজউদদীন আহমদ	ঝরা পাতা	১
রামেন্দু মজুমদার	ক্রীতদাসের হাসি	১
সুনীল দত্ত	দানব	১
সোলেমান ও মোজাম্মেল হোসেন	মা	১
সদরুল পাশা	ম্যাসাকার	১

তালিকায় মৌলিক, রূপান্তরিত এবং অনূদিত নাটকগুলোর মধ্যে মৌলিক নাটকের সংখ্যা আশিটি। নাট্যকার পেয়েছি উনচল্লিশজন। পরলোকগত বয়ঃপ্রবীণ এবং নাট্যরচনায় একাগ্র নন এরকম ষোলোজনের সংখ্যা বাদ দিলে তেইশজন তরুণ এবং দুঃসাহসী বলে বিবেচিত নাট্যকারকে তিন বছরের মধ্যে লাভ করা আমাদের জন্যে দ্রুত আশাসঞ্চারী বিস্ময়। তেইশজনের সকলেই ভবিষ্যতে নাট্যকর্মে নিয়োজিত থাকবেন তেমন দুরন্ত আশাও করি না। যদি পাঁচজনও শেষ পর্যন্ত প্রয়োগকর্মে সিদ্ধি লাভ করেন– তবু এ নাটকদরিদ্র দেশ সম্ভ্রমে দাঁড়াতে পারবে।

আমি ব্যক্তিগত কৌতূহলে কয়েকজন নাট্যকর্মী, (আধুনিক রসবিমুগ্ধ, অথবা প্রবীণ) নাটকপ্রলুব্ধ দর্শক এবং সাধারণ আনন্দপ্রত্যাশী দর্শক অথবা দর্শিকার সঙ্গে এসব নাট্যউপস্থাপনরীতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

একজন বলেছেন : অভিনব উপস্থাপন ভালো লেগেছে। কিন্তু সংলাপ সহজবোধ্য হতে হবে।

আর একজন : এই তো চেয়েছিলাম। ওসব ঘ্যানঘেনে কান্না আর দেশপ্রেমিক চিৎকার শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে। নাটক দেখে বাড়িতে এসে বসে বসে ভেবেছি এমন কেন হয়। তবে অভিনয় দেখে তৃপ্তি পাইনি। অভিনেতা কোথায়।

একজন মহিলা : বাঃ কী চমৎকার আলো। এখন লাল, এখনই সবুজ। রঙের খেলা দেখতে যা ভালো লাগছিল। যতক্ষণ দেখছিলাম পাগল হয়ে দেখছিলাম। তবে কী বলতে চায় কিছুই বুঝলাম না। মনে হল সবাই খুব রেগেমেগে আছে।
অন্য একজন : যে কোনো প্রয়াসকে তা যদি সৎ হয়, আমি অভিনন্দিত করি। কিন্তু কথা কী জানেন, এরা বড়ো দূর থেকে কথা বলে। ভালোবাসা, প্রেম, দুঃখ আর আনন্দকে ঘোষণা করতে এরা বড়ো যান্ত্রিক। মনে হয় এদেশে কোনোকালে এসব ছিল না। These people are very fast. কিন্তু সে হিসেবে তো আমাদের দর্শক তৈরি হয়নি। দর্শক না পেলে এরা মার খাবে।

আর সাক্ষাৎকার বাড়াব না। একটি নাটকের সংলাপ উদ্ধৃতি দিচ্ছি :
বিমল : আই ডোন্ট বিলিভ। তোমাদের ওই একটা কথা। দর্শক নেই। পাঠক নেই। ভালো নাটক কেউ বোঝে না। আরে শালা, তোমরা বোঝাতে চেষ্টা করলে তো বুঝবে। ভালো দর্শক কি হঠাৎ সৃষ্টি হবে?
নাফিস : ট্রাডিশনাল নাটক করে কী হবে। পশ্চিমের লেখকরা– সিঞ্জ, আয়োনেস্কো যখন অ্যাবসার্ড ড্রামা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে, আমরা তখন–
বিমল : এখানেই তোরা ভুল করিস। কোন দেশেই, পশ্চিম বলো, আর কোলকাতাই– রাতারাতি ট্রাডিশনাল ড্রামা থেকে জাম্প করেনি। ইট ওয়াজ এ গ্র্যাজুয়াল ইভল্যুশান। সোনার হরিণ : নুরুল করিম নাসিম

১৯৬৫ সালের একটি নিবন্ধে মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন :
'এই আধুনিক নাটকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। তবু পৃথিবী প্রতিদিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সংস্কৃতির দুনিয়াতে তো বটেই। পশ্চিমি নাটকের এই নবরূপের আস্বাদন কি আমাদের চেতনায়ও বিবর্তন ঘটাবে। সে বিবর্তন কি আমাদের জন্যে সত্য হয়ে উঠতে পারবে। পারলে কি তা কাম্য বলে পরিণত হবে। কেবল প্রশ্নই করা যায়, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ না করা অবধি উত্তর অনিশ্চিত হতে বাধ্য।'

১৯৭৪-এ এসে সেই সৃষ্টির কিছু মুখ আমরা দেখেছি। আধুনিক নাটক করার জন্যে দলগত প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। সকলেই আধুনিক নাটক চান। ঢাকাতে এখন নাটকের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রামেও ঢেউ গিয়ে লেগেছে।

আধুনিক নাটকের দুর্গম এবং অভিনবত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা বিতর্ক চলছে। আমরা অবশ্যই আধুনিক নাটক চাই, সর্বঅর্থে আধুনিক। কিন্তু আধুনিক নাটক মানে যদি ভঙ্গিসর্বস্ব অনুকৃতি আর সংলাপ মানে পুরাণের সত্যভঙ্গ এবং সাম্প্রতিক

দ্রুত অপসৃয়মাণ জীবনের একমাত্র নিঞ্ার্থক নৈরাশ্যের প্রতিফলন হয় তা হলে সে সৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যতই থাক, কালক্ষয়ী স্রোতে সে নাটক হারিয়ে যাবে বলে ভয় লাগে।

৪.১

সাম্প্রতিক নাট্যপ্রচেষ্টার পিছনে রাজধানী ঢাকার ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঢাকা শহর কেবলমাত্র আজকের ভূমিকা প্রতিপালনের জন্য নয় নাট্যান্দোলনের সঙ্গে ঢাকার শতবর্ষব্যাপী যোগাযোগ বিদ্যমান। শতবর্ষের ইতিহাসে ঢাকার নাট্যকর্ম ভূমিকার উপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জি দিচ্ছি :

ঢাকা তথা বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এক শতাব্দীর কিছু বিশিষ্ট ঘটনা

সাল **ঘটনাবলি**

১৮৬০ রামচন্দ্র ভৌমিকের বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রে (বাংলাবাজার, ঢাকা) দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী ‘নীলদর্পণং নাটকং’ প্রকাশিত।

১৮৬২-৭২ ঢাকা হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘ম্যাঁও ধরবে কে’, ‘শুভস্য শীঘ্রং’, ‘জানকী নাটক’, ‘জয়দ্রথ বধ’, ‘আগমনী’, ‘প্রহলাদ নাটক’, ‘হতভাগ্য শিক্ষক’, ‘ঘর থাকতে বাবুই ভজে’ প্রভৃতি নাটক-প্রহসনসমূহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হরিশচন্দ্র মিত্রের ছদ্মনাম ‘ব্যোমকেশ বাঙাল’।

১৮৬৩ দুর্গাপ্রসাদ করের পঞ্চাঙ্ক নাটক ‘স্বর্ণশৃঙ্খল’ ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৮৫৫ সালে বরিশালে উক্ত নাটকটি রচিত ও অভিনীত)।

১৮৬৫ ঢাকাতে ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’র প্রতিষ্ঠা– স্থায়ী রঙ্গমঞ্চসহ।

১৮৭১ নবাবপুর এমিটিএর থিয়েটার কোম্পানির নিজস্ব নাট্যকার কর্তৃক ‘শকুন্তলা’ অনূদিত ও মঞ্চস্থ। ধরণীনাথ বসাক এবং একই পরিবারের চোদ্দজন বসাক এ নাট্যগোষ্ঠীর সর্বকর্মে উদ্যোগী পুরুষ।

১৮৭২ ৩০ মার্চ ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’র বাঁধা মঞ্চে ৪, ২ ও ১ টাকার টিকিটের বিনিময়ে ‘রামাভিষেক’ অভিনীত। ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’র জীর্ণ অবস্থা সংস্কারের জন্যে ঢাকার জনসাধারণ কর্তৃক ৮০০০ (আট হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান।

১৮৭৩ ‘তাঁতীবাজার থিয়েটার দল’ প্রতিষ্ঠা।

কোলকাতার ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল থিয়েটার’ ও ‘হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার’-এর ঢাকা আগমন। ‘নীলদর্পণ’ নাটক অভিনয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামপুর ‘জানকী থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা।

১৯২১ পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী ইসলামপুর ‘জুবিলী থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা।

১৯৩১ রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত।

১৯৩৮-৩৯ প্রমথনাথ বিশীর ‘ঘৃতংপিবেৎ’ (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল কর্তৃক মঞ্চস্থ) নাটকে নায়িকার ভূমিকায় মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর অভিনয়। তখন মুহম্মদ আব্দুল হাই প্রথম বর্ষ বাংলা অনার্সের ছাত্র।

১৯৫১ ঢাকা শহরে প্রথম সহ-অভিনয়ের প্রচলন–
হাবিব প্রোডাকসন্সের ‘মেঘমুক্তি’নাটকে, মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃক ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ নাটকে, এবং জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ‘নীলদর্পণ’ নাটকে।

১৯৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সহ-অভিনয়।
প্রযোজনা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ।
মঞ্চ : মেহবুব আলী ইন্সটিটিউট হল।
নাটক : *জবানবন্দী*।

১৯৫১-৫২ চট্টগ্রামের কক্সবাজারে রক্ষণশীল ধর্মীয় অভিভাবক কর্তৃক নাট্যমঞ্চ আক্রমণ। কারণ– সহ-অভিনয়। মিছিলের স্লোগান–‘মাগির গুষ্টি ধ্বংস হোক’।

১৯৫৩ জানুয়ারি মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটক রচনা।

১৯৫৬ ড্রামা সার্কেলের প্রতিষ্ঠা।
কোলকাতার ‘বহুরূপী’র ঢাকা সফর। ‘রক্তকরবী’ ও ‘ছেঁড়াতার’ অভিনীত। আনিস চৌধুরীর ‘মানচিত্র’ নাটকের অভিনয় প্রদর্শনের জন্যে ড্রামা সার্কেলের কোলকাতা সফর।

১৯৫৮ মিনার্ভা থিয়েটার্স কর্তৃক পেশকৃত জসীমউদ্‌দীনের-এর ‘বেদের মেয়ে’ নাট্য অনুমতিপত্রে সরকার কর্তৃক শর্তারোপ–‘That no girl participate in the play’.
ফেব্রুয়ারি মাসে মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটক মঞ্চায়নে কার্জন হলে বিবাদ। নেতার ভূমিকায় শেরওয়ানি-পায়জামা পরতে দেয়া বারণ। অজুহাত– পাকিস্তানের তাহজিব ধ্বংস হবে।

১৯৬০ বাঙলা একাডেমী পুরস্কারের প্রবর্তন

নাটকের জন্যে পুরস্কার প্রাপ্তি :
১৯৬০– আসকার ইবনে শাইখ
১৯৬১– নুরুল মোমেন
১৯৬২– মুনীর চৌধুরী
১৯৬৩– ইব্রাহিম খাঁ
১৯৬৪– আকবরউদ্দিন
১৯৬৫– ওবায়দুল হক
১৯৬৬– সিকান্দার আবু জাফর
১৯৬৭– আ.ন.ম. বজলুর রশীদ
১৯৬৮– আনিস চৌধুরী
১৯৭০– ইব্রাহিম খলিল
১৯৭১– (যুদ্ধকালীন সময়ে পুরস্কার দেওয়া হয়নি)
১৯৭২– কল্যাণ মিত্র
১৯৭৩– পুরস্কার দেয়া হয়নি
১৯৭৪– ঐ

১৯৬১ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সামরিক শাসনের তীব্র বাধা ও নিষেধ সত্ত্বেও ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনমনীয় শিল্পীবৃন্দের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান উদযাপন ও রবীন্দ্রনাটকের (রাজা ও রানী, মুক্তধারা, শেষরক্ষা, রক্ত করবী, তাসের দেশ প্রভৃতি) অভিনয়।

১৯৬১ বাংলা একাডেমীর 'নাট্যমৌসুম' প্রচলন।
নাট্যকার 'বিরস রসনা' (সৈয়দ আব্দুস সাত্তার) 'কবিদা' নাটকের জন্যে আদমজি পুরস্কারে পুরস্কৃত।

১৯৬৩-৬৪ মুনীর চৌধুরী প্রযোজিত মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান তাতে নাখোশ। সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পাঠক্রম থেকে 'কৃষ্ণকুমারী' প্রত্যাহার।

১৯৬৪ ঢাকা টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৫ বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রবর্তিত 'নাট্যমৌসুম' বন্ধ।

১৯৭১ স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের নাট্যকর্মীবৃন্দ কর্তৃক খোলা ট্রাকে, খোলামঞ্চে, বিশাল জনতার উপস্থিতিতে গণ- নাট্যের অভিনয় প্রদর্শন।

১৯৭১ যুদ্ধ চলাকালে প্রবাসে নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যু। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-

বিরোধী শত্রু কর্তৃক নাট্যকার মুনীর চৌধুরী নিহত।

১৯৭২ নভেম্বরে বাংলাদেশের প্রথম নাট্যপত্রিকা 'থিয়েটার'– নাট্য ত্রৈমাসিক প্রকাশিত। ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নাট্যচক্রের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্রছাত্রী

বিরচিত আন্তঃহল নাট্য প্রতিযোগিতা উদ্বোধন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃক নাট্য সপ্তাহ পালন।

১৯৭৩ স্বাধীনতা-উত্তরকালে নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন শুরু।

১৯৭৪ জুলাই-আগস্ট মাসে ঢাকায় ইউ.এস.আই.এস-এর উদ্যোগে অধ্যাপক টম ইভান্সের নেতৃত্বে আগত চার সদস্যবিশিষ্ট আমেরিকান থিয়েটার ওয়ার্কশপের পাঁচদিন প্রশিক্ষণ চর্চা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রায় একশত নাট্যকর্মীর ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ।

১৯৭৪ ডিসেম্বরে (১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর) ঢাকার দুইটি নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়মঞ্চে পুলিশসহ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের আগমন এবং নাট্যকর্মের উপর জিজ্ঞাসাবাদ। পরিণামে নিয়মিত নাট্যাভিনয় বন্ধ।

৫.১

আলোচনার শুরুতে সাম্প্রতিককাল সম্পর্কে আমি একটা সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছি। ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশে নাট্যরচনার মোটামুটি একটা সংখ্যা নিম্নরূপ হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রেণিভাগ	নাটকের সংখ্যা	নাট্যকারের সংখ্যা
ক. সামাজিক নাটক	২৮৪	১৬৮
খ. ঐতিহাসিক নাটক	৫৩	৩৫
গ. লোককাহিনীভিত্তিক নাটক	৬	৪
ঘ. শিশু-কিশোরদের জন্য নাটক	৬২	৩৭
ঙ. অনূদিত নাটক	৬৩	৩৫
চ. অনুসৃত (রূপান্তর) নাটক	২৫	১১
ছ. গল্প/উপন্যাসের রূপান্তর	২১	১৬
জ. স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে নাটক	৪৯	৩৬
ঝ. নবনাট্যরীতি নাটক	৮০	৩৯

উপরিউক্ত সংখ্যা আক্ষরিক অর্থে নির্ভুল নয়। নাট্যাতালিকা সংগ্রহের জন্য আমি শুধুমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থকেই গ্রাহ্য করিনি। লিখিত, মঞ্চস্থ বা বেতারে টেলিভিশনে প্রচারিত

হওয়া সত্ত্বেও তালিকাভুক্ত প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নাটক এখন পর্যন্ত মুদ্রণভাগ্য লাভ করেনি। প্রকাশনা ব্যবসার বা ব্যবস্থার যে রীতিনীতি এদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত তাতে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় অমুদ্রিত নাটকগুলোর অধিকাংশই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করবে না। আমি আরো নিশ্চিত যে, যথাবিহিত অনুসন্ধান চললে উপরিউক্ত সংখ্যা প্রতিস্তরেই বৃদ্ধির দাবি জানাবে। বলাবাহুল্য, উদ্ধৃত সংখ্যা অথবা দাবি জানানো বর্ধিত সংখ্যার সবগুলো যথার্থ নাট্যরচনা বলে বিবেচিত হবে না। এদেশের দুটি প্রধান নাট্যচর্চার স্থল– রাজধানী ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। প্রধানত নবনাট্য আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করবার জন্য এ দুটি শহরের যেসব নাট্যপ্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী ১৯৫১ সাল থেকে সচেষ্ট ছিল– বর্তমানে নীরব হয়ে গেছে এবং যেসব নাট্যগোষ্ঠী তাদের নিজের নিয়মে নিয়মিত নাট্যকর্মকে সচল রেখেছে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীর নাট্যকর্ম প্রচেষ্টার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল :

ঢাকা ও চট্টগ্রামের কতিপয় নাট্যগোষ্ঠীর নবনাট্যচর্চার পরিচয়

ক্রম	প্রতিষ্ঠা সাল	নাট্যগোষ্ঠীর নাম	অভিনীত নাটক
১.	১৯৫১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ	জনাববন্দী
			মেঘনাদবধকাব্য
			কবর,
			বিসর্জন
			একদা এক ব্যাঙ্কে
			শপথ
			তাসের দেশ
			রক্তকরবী
			আবর্ত
			মুক্তধারা
			লেট দেয়ার বি লাইট।
২.	১৯৫১	প্রান্তিক (চট্টগ্রাম)	জবানবন্দী
			পথিক
			অরুণোদয়ের পথে
৩.	১৯৫৫	জাগৃতি (চট্টগ্রাম)	শেষরক্ষা
			এক পেয়ালা কফি
			এরাও মানুষ
			পার্কের কোণ থেকে
৪.	১৯৫৬	ড্রামা সার্কেল	কেউ কিছু বলতে পারে না

			মানচিত্র
			রক্তকরবী
			সবাই আমার ছেলে
			বহিপীর
			রাজা ও রানী
			তাসের দেশ
			ইডিপাস
			কালবেলা
			আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান
			সপ্তসুরের থিবী আক্রমণ ।
৫.	১৯৫৮	মিনার্ভা	এই তো সমাজ
			মাটির মানুষ
			গাঁয়ের বধূ
			সিরাজউদ্দৌলা
			আবু হোসেন
			বেদের মেয়ে ।
৬.	১৯৫৮	রূপশ্রী	
৭.	১৯৬৩	ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	ক্রীতদাসের হাসি
			দণ্ড
			দণ্ড ধর
			কৃষ্ণকুমারী
			ভ্রান্তিবিলাস
			দুয়ে দুয়ে চার
			লালন ফকির ।
৮.	১৯৬৪	সাতরং	প্রচ্ছদপট
			মাইলপোস্ট ।
৯.	১৯৬৯	নাগরিক	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
			বাকি ইতিহাস
			তৈল সংকট
			বিদগ্ধ রমণীকুল
			ক্রস পারপাস
			এই নিষিদ্ধ পল্লীতে

			ভেঁপুতে বেহাগ
			বহিপীর।
১০.	১৯৭০	পারাপার	পোস্টার
			জনে জনে জনতা
			রূপের পসরা।
১১.	১৯৭১	আরণ্যক	কবর
			পশ্চিমের সিঁড়ি
১২.	১৯৭২	থিয়েটার	কবর
			সুবচন নির্বাসনে
			এখন দুঃসময়।
১৩.	১৯৭২	নাট্যচক্র (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা
			রেভ্যুলিউশান এবং
			খ্রিস্টাব্দ-সন্ধান
			অস্থির সুস্থিতি
			সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ
			কালো অশোক লাল ফুল
			পেন্ডুলামের খুন
			জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন
			রোলার এবং নিহত-
			এম.এল.জি.
			উন্মোচন
			দাঁড়াব শুধুই
			রংহীন সিগন্যাল
			দানব
			চাবির দুঃখ
			করিম বাওয়ালীর শত্রু-
			অথবা মূল মুখ দেখা
			ম্যাসাকার
			সংবাদ শেষাংশ
			উৎস থেকে সমুদ্দুর
			কিংশুক যে মরুতে।
১৪.	১৯৭২	ঢাকা থিয়েটার	জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন
			সংবাদ কার্টুন
			বিদায় মোনালিসা

			সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ
১৫.	১৯৭২	স্বরলিপি ড্রামা সার্কেল	সোনার হরিণ
			সম্রাট সাবধান
			মহারাজ আসবেন।
১৬.	১৯৭৩	বহুবচন	সর্প বিষয়ক গল্প
			সভাপতি বলবেন
			সাড়ে সাতশো সিংহ
			বিপন্ন ধারাপাত
			নিরঞ্জন ফিরে এসো।
১৭.	১৯৭৩	থিয়েটার '৭৩ (চট্টগ্রাম)	ম্যাসাকার
			স্পার্টাকাস বিষয়ক
			জটিলতা
			তরুণ ও বহমান ক্ষত
			শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী-আনন্দ পলাতক পালিয়ে গেছে
			হরিণ চিতা চিল
			ব্যক্তিগত পৃথিবী
			ফলাফল নিম্নচাপ
			সাক্ষাৎকার।
১৮.	১৯৭৪	নাটক	যেখানে সূর্য
			স্পার্টাকাস বিষয়ক
			জটিলতা
			আগুন চতুর্দিক।
১৯.	১৯৭৪	অনির্বাণ	স্যুটকেস
			দুঃশাসনের বেড়াজাল।
২০.	১৯৭৪	চট্টগ্রাম থিয়েটার	সেমসাইড।
২১.	১৯৭৪	সমকাল (চট্টগ্রাম)	ভূমিকম্পের পরে
			ভোরের মিছিল।
২২.	১৯৭৪	অরিন্দম (চট্টগ্রাম)	যামিনীর শেষ সংলাপ
			ফলাফল নিম্নচাপ।
২৩.	১৯৭৪	তির্যক (চট্টগ্রাম)	আয়না
			জননীর মৃত্যু চাই
			অথচ অন্ধকার।

৬.১

এ প্রসঙ্গ কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রশ্ন বিবেচনার জন্য রাখছি। বাংলাদেশে অতি সাম্প্রতিককালে নাট্যপ্রচেষ্টার ঢল নেমেছে। বিপুল প্রাণবন্যার প্রভূত স্রোত বিশেষত নতুন জীবনচৈতন্য অনুরাগী যুবকদের উদগত করেছে। এতকাল রুদ্ধদ্বার সংকুচিত আলোর মধ্যে যারা মঞ্চের আশেপাশে আগ্রহে, তাড়নায়, মোহে অথবা লিপ্সায় ঘুরতেন তাদের নাট্যভাগ্য অপেক্ষা সাম্প্রতিককালের তরুণ নাট্যকর্মীদের ভাগ্য অধিক প্রসন্ন এবং বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সাম্প্রতিককালের নাট্যকর্মীদের দায়িত্ব বোধকরি সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালের জীবনের ভাষা ভিন্ন, অনুভব সুতীব্র এবং প্রকাশ অবিশ্বাস্যরকম তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে এসে এখন চারিদিকে এত আলোর বৈভব যে, ঘোর অন্ধকার অপেক্ষা এ আলোর বন্যায় পথ চলা অধিক বিপদসংকুল। পালাবার বা পিছু হঠবার পথ নেই, একমাত্র সম্মুখের মহাসড়ক ছাড়া চলবার গলিপথও হারিয়ে গেছে।

এখন আমাদের দর্শক সচেতন। জীবনের ক্ষুরস্যধার জিজ্ঞাসা এবং বক্তব্যে স্পষ্টবোধ্যতা ছাড়া নাটকের দর্শককে আহ্বান করা অসম্ভব।

এখনকার নাটক সে কারণেই দুরূহ শিল্পকর্ম। একদিকে শিল্পচৈতন্য অন্যদিকে জীবনজ্বালায় সম্মিলন ঘটাতেই হবে। দীনবন্ধু মিত্রের অপরিণত গদ্যনাট্য সংলাপ, গিরিশ ঘোষের অক্লান্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মুনীর চৌধুরীর নাট্যরূপান্তর কর্ম অথবা নুরুল মোমেনের হালকা বাক্যচমক এখন অচল, প্রায় অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের তরুণ নাট্যকর্মীদের সপ্রশংস উদ্যোগকে ইতিমধ্যেই শিক্ষিত দর্শকবৃন্দ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা আরো অধিক সে কারণেই প্রশ্ন উত্থাপন :–

ক. সাম্প্রতিকালের নাট্যরচনা কি স্বল্প আয়তন নাটক? ক্ষেত্রবিশেষে নাটিকার চেয়েও ক্ষুদ্র। মঞ্চাভিনয়ের সময়সীমা কোনো নাটকের জন্য মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট, একটি তীক্ষ্ণ অনুভবের ত্বরিত প্রদর্শনমাত্র।

সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার যাঁরা উদ্বোধন করেছেন– আয়োনেস্কো, অ্যালবি, অনুঈ– তাদের নাটকের পরিধি আরো কিছু দীর্ঘ। আমাদের জীবনবোধের চিত্রায়ণ এত স্বল্পসীমায় যথার্থ হচ্ছে কি?

খ. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অস্থির ও বিপন্ন জীবন দারুণ উত্তেজনা নব মূল্য সন্ধানে টগবগ করছে। বিশেষত তরুণের কাছে চিরায়ত জীবন-যাপন অযথা পুরাণচর্চার মতো।– হয়তো সে কারণেই নাটকে যুদ্ধ, লুণ্ঠন, অস্ত্র, ছিনতাই বার বার ঘুরে ফিরে আসছে। কিন্তু আরো কোনো গভীর বিপন্ন বিস্ময় এদেশের বধূ, যুবতী অথবা বৃদ্ধকে নিয়ে খেলা করে না কি? বাঙালি জীবনের গৃহগত নির্মল ক্লান্ত হৃদয়ে আরো অনেক সংবাদ নাটকের বিষয় হতে পারে– সেদিকে আমাদের সাম্প্রতিক নাটক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে না কেন?

গ. সাম্প্রতিককালের নাট্যচর্চা নগরের সীমাবদ্ধ আবাসে আশ্রয় পেয়েছে। নাটকের দর্শক বোধসম্পন্ন মধ্যবিত্ত। শুধুমাত্র তাদেরই জন্য নির্মিত নাট্যচর্চা একসময়ে বৃহৎ জনসমষ্টির আগ্রহবিচ্ছিন্ন হয়ে ভঙ্গিসর্বস্ব আন্দোলন হিসেবে সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। নবনাট্য আন্দোলনের সূচনায় *নবান্ন*, *ছেঁড়াতার* এক সময় সকল স্তরের দর্শককে সমভাবে আকর্ষণ করেছিল। এখনকার নাটক সেই পরিণত জীবনের বাসনাকে অধিকাংশের গ্রহণীয় করে নির্মিত হয় না কেন?

ঘ. নাট্যকর্মকে যথার্থই একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে বর্তমান নাট্যকর্মীরা স্থায়ী থাকতে পারবেন কি? আমাদের নাট্যকর্মীরা পেশায় ভিন্ন অবস্থানের, নেশায় রঙ্গমঞ্চের কাছে ছুটে আসেন। একান্তভাবে নাটকের লোক প্রায় দুর্লভ। দর্শকসংখ্যা সীমিত, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা শূন্য, বৃহৎ জনসমষ্টির অন্তরঙ্গ আগ্রহ থেকে দূরে অবস্থানরত অবস্থার মধ্যে বসবাস করে বর্তমানের আগ্রহী ও প্রাণবন্ত নাট্যকর্মীদেরকে যথাযোগ্য আশ্রয় দিয়ে ধরে রাখা যাবে না। এমতাবস্থায় আবেগের জোয়ার একদিন নেমে যাবে। তখন কী হবে? আবার শূন্যতা। না-হয় ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ। এরকম বহুবার হয়েছে।– এসব থেকে স্থায়ী পরিত্রাণের উপায় নাট্যকর্মীরা কীভাবে স্থির করবেন? রাজধানী অথবা নগরকেন্দ্রিক নাট্যান্দোলন সমগ্র দেশের সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা নিয়ে একটি সামগ্রিক সফলতা অর্জন করতে পারবে না। নাটককে শৌখিন মজদুরি করে নাটকের সঙ্গে সর্বক্ষণের সম্পর্ক রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু তা না হয়ে সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার তরুণ ঢেউ যথাযথভাবে অবিরাম বইবে না। আমাদের বর্তমানের অতিউৎসাহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ একসময় স্তিমিত হয়ে আসবে। সাম্প্রতিককালের নাট্যকর্মীদের প্রসন্নভাগ্য উজ্জ্বল থাকতে থাকতেই এসবের একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা ভালো হবে।

৭.১

বর্তমানের নাট্যাগ্রহকে আরো বিস্তৃত ও গভীরে প্রোথিত করবার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের অবিরাম কর্মরত কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী তাদের বক্তব্য রেখেছেন :

১. **নাগরিক বলছে :** দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার অভ্যাস করুন। আওয়াজ তুলুন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ

২. **নাট্যচক্র :** নতুন প্রতিভার বিকাশের পথ করে দিতে হবে। সম্ভাবনাময় নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, কুশলী এঁদের নবতর প্রচেষ্টা উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাফল্যের পথে।

৩. **থিয়েটার-এর লক্ষ্য :** ভালো নাটক প্রযোজনা করা, নাট্যপত্রিকা প্রকাশ করা, নিয়মিত নাটক করা।

৪. ঢাকা থিয়েটার : আমরা সৎ সমাজ চাই। নাটকের মাধ্যমে আমরা সৎ সমাজের বক্তব্য রাখব। নাটকে সুস্থ বক্তব্য থাকবে– শিল্পসম্মত হবে। বাংলাদেশের লেখা নাটক করব।

৫. অরিন্দম বলছে : নাটক আমাদের শিল্প, শিল্পেই আমাদের ঈশ্বর।

৬. পারাপার : শিল্পের জন্য জনগণ নয়। জনগণের জন্য শিল্প। পারাপার গোষ্ঠী গণনাটক চায়।

৭. থিয়েটার '৭৩-এর বক্তব্য : সমঝদার দর্শক গড়ে তুলব উপযুক্ত দর্শনীর মাধ্যমে। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ চাই, তার সঙ্গে চাই প্রতি অঞ্চলে রঙ্গমঞ্চ।

একমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই বর্তমানে সতেরোটি নাট্যগোষ্ঠী আছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ইতোমধ্যে কিছু কিছু নাট্যগোষ্ঠী সচল হয়ে উঠেছে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটকের দর্শক গড়ে উঠছে। অথচ যথার্থ অর্থে বাংলাদেশে একটিও রঙ্গমঞ্চ নেই। বাংলাদেশের নাট্যামোদীদের বহুদিনের প্রত্যাশা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও এদেশের নাট্যপিপাসা অদম্য উৎসাহ্য ও উদ্যমের জন্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ রসপিপাসাকে যতখানি সম্ভব নিজেদের সীমিত শক্তির জোরে নাট্যকর্মীরা সন্তুষ্টিদান করছেন। প্রত্যেক নাট্যগোষ্ঠীর নিজস্ব বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি আছে। মূলত সকলেই চাইছেন, এদেশে অনুকূল প্রতিবেশে জীবনের শিল্পরূপ ক্রমেই জনম লীর সম্মুখে অনুশীলিত পরিমার্জনায় উপস্থাপন করতে।

৮.১

এমন উদ্যমসংযুক্ত সুদিন শতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জন্য আগে আসেনি। প্রাণের পল্লব এত আগ্রহ নিয়ে ফুটতে চায়নি। উদ্যোগীদের আশ্রয় কত সামান্য– রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে সংগৃহীত এক হাজার, বড়োজোর দু হাজার দর্শক একটি শ্রমসিদ্ধ নাটকের একমাত্র ভরসা। লাভ-লোকসানের অংক যারা কষেন তাদের কী মনে হয় জানি না– এদেশের নাট্যকর্মীরা কেউ এক-একটা প্রাসাদ নির্মাণের জন্য নাটক করতে নামেনি– মহড়া দিতে দিতে শুষ্ক কণ্ঠে এক কাপ লেবু-চা ঢালার পয়সা বাঁচে না যাদের, তারা যে এতদিনেও নাট্যচ্যুত হয়নি এই তো বড়ো কথা। গরিবের ঘরে ঘোড়ারোগ হলে আর যাই হোক নাট্যকর্ম সাধন করা যায় না। বহু বাঙালি নটের রক্তাক্ত জীবনপরিণতি তার প্রমাণ। সাম্প্রতিককালের নাট্যকর্মীদের নাট্যসংগঠন-সচেতন হওয়া দরকার। ১৮৭৬-এর ব্রিটিশ আইন বড়ো অসহায় করে রেখেছে নাট্যকর্মীদের। ব্রিটিশরাজের লর্ড চেম্বারলিন সেন্সরশিপ অনুশাসন খেয়ালখুশিতে নাট্যকর্মীদের প্রয়োজনবোধে গাছে তুলে নিচ থেকে মই টেনে নিত।

প্রমোদকর, সেন্সরশিপের বিধি-বিধান গুণগ্রাহিতার দৃষ্টি দিয়ে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হওয়ার প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালের নাট্যান্দোলনকে সফল করবার জন্য সেই দিকে আলোকপাত করতে হবে সকলকে।

৯.১

পরিশেষে একটি বিবেচনার কথা বলি :

নাট্যকর্মীদের আকাশে সারারাত শুকতারা জ্বলে না। পূর্ণিমার আলোতে নরম ঘাসে আয়েসি পদচারণ নাট্যকর্মীদের ভাগ্যবিধাতা দিওয়ানুসুস্ রচনা করে যাননি। এদেশে রাহুকবলিত অবজ্ঞাত শত শত নাট্যকর্মীর ভাগ্য বড়ো নিদারুণ হতাশায় অকালে ঝরে গেছে। মধুসূদন-দীনবন্ধু, মলিয়ের-ইবসেন, ব্রেখট-এর জীবনসায়াহ্ন মধুময় হয়নি। নাটক কবর আছে, নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর কবর নেই। উঃ কী মর্মান্তিক। এই কি জীবন!

যুবরাজ অইদিপাস থিবসকে প্রহেলিকার অভিশাপমুক্ত করলেন। আর রাজা অইদিপাস ভয়াবহ অন্ধত্ব নিয়ে নির্জনে নির্বাসিত হলেন। কী নির্মম ভাগ্যবিধাতার বিধান। জীবন বড়ো দুর্বিষহ।

নাট্যকর্মীদের একটি স্বাধীন ফেডারেশন গঠন করুন। নিরাপত্তার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য। প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতায় সকলের বন্ধুত্ব নির্মিত হোক। কে করবে এ দায়িত্ব পালন? আমি, আপনি– আমরা। বাংলাদেশ নাট্য ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রতি শীত প্রতি বসন্তে জাতীয় নাট্যোৎসব প্রতিপালিত হবে। যেমন হত আড়াই হাজার বছর আগে এথেন্সে। হাজার হাজার উন্মুখ উৎসাহী দর্শক ইস্কাইলাস-সফোক্লিসের নাটক দেখতে আসতেন। এদেশে হাজার বছরব্যাপী নাটক-নাটগীতিকা-যাত্রা-পালাগান-থিয়েটারের পর্যায়ক্রম ধরে প্রস্তুত নাট্যরসপিপাসু দর্শকের এখন অনন্ত রসসিদ্ধির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এমন জীবনবাদী মৃত্তিকাসম্পৃক্ত আগ্রহী, উন্মুখ হাজার হাজার দর্শককে উন্মুক্ত মঞ্চে অথবা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে নাটকের জন্য আহ্বান জানালে পাদপ্রদীপের আলো কখনোই নিভবে না। জ্বলবে অনির্বাণ তাদের ভালোবাসা ও সমাদরের পৃষ্ঠপোষকতায়।

আমরা যথার্থ নাটক চাই আর চাই সর্বমুহূর্তের একনিষ্ঠ নাট্যকর্মী।

উৎস: থিয়েটার, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

[লেখক: নাট্য-ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপক, বাংলা, তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ (অবসরপ্রাপ্ত)।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের নাটক : অন্তর্গত উপলব্ধি

অ সী ম সা হা

নাটক দৃশ্যমাধ্যমী জীবনব্যাখ্যা। দৃশ্যের মাধ্যমে জীবনের শৈল্পিক প্রকাশ রচনার মৌল প্রেরণা। সেদিন থেকে নাটক সাহিত্যেরও অঙ্গীভূত। ফলে শুধুমাত্র মঞ্চসংযুক্ত উপস্থাপনায় তার সার্থকতা স্বীকৃত নয়, ভিন্নজাতীয় আর্টের মতোই তার একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গও মূল্যায়িত। নির্দিষ্ট নিয়মের আওতাকে অস্বীকার করে সিদ্ধতাবিরোধী নিরীক্ষা অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু কতগুলো স্বাভাবিক বহির্বৃত্তি আওতা সমপৃতি অনিবার্যভাবে অবশ্যই স্বীকৃত যে আওতা-গ্রাহিত-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রশাখা। একটি সীমাবদ্ধতার ভেতরে জীবনের প্রকাশ এবং চেতনাগত উত্তীর্ণতায় ক্ষেত্র অবশ্যই সীমাবদ্ধ, যদিও সৃষ্টির প্রেক্ষিত সে সিদ্ধতা বিদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ ‘সীমার মধ্যে অসীমের’ যে প্রকাশকে শিল্পসৃষ্টির চেতনা জাগার অভিব্যক্তি বলেছেন, পৃথিবীর সব যুগের সার্থক সাহিত্যের স্বীকৃতিতে এ সত্য স্থিরিত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। এক্ষেত্রে অনুভবের গভীরতার সাথে প্রকাশের সার্থকতা গ্রথিত। অতএব এ সত্য থেকে বিচ্যুতি কৌণিক প্রতিফলনের চমকিত প্রতিক্রিয়া হতে পারে, শিল্প হিসেবে তা অবশ্যই স্বীকৃত হতে পারে না।

নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকমানসের গ্রহণ-বর্জনের পতন-প্রতিরোধ নির্ভরতা যেহেতু প্রধানতম প্রসঙ্গ এবং যেহেতু প্রত্যক্ষতা, নাটকের গৃহীত বৈশিষ্ট্য, সেহেতু এ শিল্পমাধ্যমে জরংশ শব্দটি অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বিশেষ শ্রেণির দর্শক- নন্দিত নাটকই সার্থক নাটকের বিজয়মাল্য ভূষিত হবার যোগ্য। নাটকে যেমন, নাট্যামোদী দর্শকসমাজের মধ্যেও তেমনি বিভিন্নতা থাকে। অর্থাৎ দর্শকদের শ্রেণিচরিত্রের মধ্যেও একটা পার্থক্য থাকে। আর এটি নির্ভর করে সমাজকাঠামোর ভিত্তিভূমির ওপর। একটি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব থাকে। সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এই শ্রেণিবিভিন্নতার জন্ম দেয় এবং সে অনুসারেই মানুষের চেতনার নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হয়। মানুষের চেতনার ভিন্নতরকে অনেকে ব্যক্তিক অনুভূতির উত্থান-পতন প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ব্যক্তিক

অনুভূতি নয় বরং সামাজিক অস্তিত্বই অনুভূতির নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই শ্রেণিচরিত্রের বিভিন্নতার সাথেই চেতনার বৈচিত্র্য সংযুক্ত। ফলে একটি অশিক্ষিত সমাজে আধুনিক নাটকের প্রতিবেদন যতখানি সংবেদ্য হবে তার চেয়ে যাত্রা বা সমজাতীয় সৃষ্টিকর্মের উপস্থাপন তাদের কাছে অনেক বেশি গ্রাহ্য। তেমনি একটি শিক্ষিত সমাজে এর বৈপরীত্য স্বাভাবিক নিয়মনির্দিষ্ট। অবশ্য সমপর্যায়ী সমাজব্যবস্থার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও, ব্যক্তিক অনুভূতির ভিন্নতা অস্বীকৃত নয়। আর শ্রেণিচরিত্রের বিভাজনের পরেও অন্তর্গত অনুভব অবশ্যই এক থেকে অন্যের পৃথক হতে বাধ্য। সেখানে দেখার দৃষ্টির মধ্যে ভিন্নতা প্রধানত উপাস্থিত। আর এ ভিন্নতাবোধ নাটকের অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। সৃষ্টিকর্মের অন্যান্য উপস্থাপনাও অবশ্য সহজসাধ্য না হলেও নাটকের মতো দুঃসাধ্য সৃষ্টিকর্ম নয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাসের উপস্থাপন পরোক্ষ বলেই নিন্দা অথবা প্রশংসা যাই হোক-না কেন, তা নেপথ্য চারিতায় অবহেলিত। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার এবং দর্শক মুখোমুখি। ফলে যে কোনো রকম দুর্বলতার যথার্থ পুরস্কার নগদপ্রাপ্য। অবশ্য সাময়িক বিভ্রান্তি অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারকে আশাহত করতে পারে, কিন্তু নাটক যদি যথার্থই জীবন সম্পর্কিত যোগ্য প্রতিফলন হয়, তা হলে আপাতত বিভ্রান্তি নাটকের মৌলিকতা রোধে ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনসংবেদী সৃষ্টিকর্ম অন্তত সমসাময়িক মানসে গ্রাহ্য না হলেও একদিন তার সার্থকতা নির্ণায়ন অবশ্য অনিবার্য। তেমনি এ সত্যও অনস্বীকার্য, জীবনের যথার্থ রূপায়ণে ব্যর্থ সৃষ্টিকর্ম তাৎক্ষণিক ঝলকে চমকিত করতে পারলেও, তা স্বাভাবিক নিয়মেই বৃন্ত-বিচ্যুত হতে বাধ্য।

একজন নাট্যকার সমাজবিচ্যুত মানসপ্রবণতার অধিকারী নন বলেই, তাঁর সামাজিক কতগুলো দায়িত্বও নির্ধারিত। সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়াপ্রবাহী চেতনার প্রতিফলনে তাঁর নাট্যরচনাও সে দায়িত্ব পালনের যথার্থতায় সমৃদ্ধ হলে নাটকের সার্থকতা স্বীকৃত। অনেকে বলেন, সৃষ্টির প্রেরণা আনন্দপোলব্ধিজাত। আর এ আনন্দ ব্যক্তিক অনুভবের প্রতিক্রিত প্রতিফলন। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এ-জাতীয় ভাবন্ধঅন্ধতামুক্ত নয়। ফলে আদিম উৎস-অভিমুখী স্মৃতি-চারণায় আনন্দ-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া গেলেও তাতে করেও তার সমাজবিচ্ছিন্নতা স্বীকৃত হয় না। তা ছাড়া বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জটিলতার সাথে সামাজিক মানুষের জীবন এমনভাবে সংযুক্ত যে নিছক আনন্দের প্রকাশ হিসেবে সৃষ্টিকে চিহ্নিত করার মধ্যে শোষণ করার বুর্জোয়া প্রবণতা সেখানে অনিবার্যভাবে স্মরণ্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের নাট্যআলোচনা প্রসঙ্গে এ-জাতীয় প্রবণতার প্রাধান্য অতিমাত্রিক বলেই বর্তমান নিবন্ধের সূচনার দীর্ঘসূত্রিতা।

এ সত্য এখন সহজগ্রাহ্য যে, বাংলাদেশের অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের তুলনায় নাটকের দুর্বলতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। পঁচিশ বছরের পরিক্রমণে উল্লেখ করবার মতো নাটক নেই বললেই চলে। নাটকের ক্ষেত্র প্রসারণে নাট্যিক নিরীক্ষাতে অকল্পনীয়। আবার যে দু'একটা নাটক বাংলাদেশের সার্থক সৃষ্টি হিসেবে এখন পর্যন্ত গৃহীত, নতুন পরিবেশে

নতুন ভাবনায়, বিশ্লেষণে সে সম্পর্ক নতুন বক্তব্য উপস্থাপিত হতে বাধ্য। যে কোনো নাটকের সার্থকতা যেমন শুধুমাত্র সংলাপ, কাহিনী অথবা তার আনুষঙ্গিক উপস্থাপনার খণ্ডিত সার্থকতায় নয়, সেহেতু এ সত্য প্রায় সোচ্চার শব্দ নিঃস্মরণে বলা চলে যে, বাংলাদেশে আজও কোনো সার্থক নাটক লিখিত হয়নি। বিশেষত পঁচিশ বছরের নাট্যপরিক্রমায় এ সত্যের স্বীকৃতি দুর্লভ নয়। এর কারণ অনুসন্ধান দূরায়ত প্রেক্ষণে অন্বিষ্ট নয়। যে সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা এবং মন ও মননের মানসাধিকারী স্রষ্টার হাতে একটি সার্থক নাটকের জন্মলাভ সম্ভব, সে-জাতীয় মানস বাংলাদেশে সম্পূর্ণ দুর্লভ ছিল, এটা সত্যতাসম্পৃক্ত নয়। তা সত্ত্বেও এখানে সার্থক নাট্যকারের আর্বিভাব হল না কেন? হয়তো রাষ্ট্রীয় আলোড়ন প্রতিটি মুহূর্তে বাংলাদেশকে একটি অস্বাভাবিক পরিবেশে প্রোথিত করে রেখেছিল যা স্রষ্টার মানস -ভুবনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ফলে সুস্থির সম্ভবিত সৃষ্টিকর্ম অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কৈফিয়ত কি সামগ্রিকভাবে গৃহীত? পৃথিবীর স্মারণ্য ইতিহাসে, এ স্বীকৃতি দুর্লভ নয় যে, যে কোনো মহৎ সৃষ্টি, প্রতিকূলতা প্রতিরোধী বিস্ময়ের প্রোজ্জ্বল। বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা তো মহৎ স্রষ্টার অবলম্বিত লক্ষণ। এ কারণেই দেখা যায়, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্যকর্মের চেয়ে বিপ্লবপূর্ব সাহিত্যকর্মের সমৃদ্ধি অনেক বেশি ঋজুরেখ। অতএব বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক অস্বাভাবিকতার অজুহাত অস্বীকৃত না হলেও, অনিবার্য যে নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। আসলে বাংলাদেশের নাট্যকারদের ভেতরে সেই অনুশীলন নেই, সেই সাধনা নেই, যা তাকে একটি মহত্তর রচনার প্রতি প্রভাবিত করতে পারে। শুধুমাত্র নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যকর্মের প্রতিটি অঙ্গনেই একই ধরনের বিমুখতা আমাদের সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের সমৃদ্ধির সাথে সংযোজনে প্রয়োজনীয় অগ্রগামিতায় সাহায্য করেনি। নাটকের এ ব্যর্থতা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটি তীব্রতম প্রবাহ লক্ষ করা গেলেও, তা আপাতত চমকে যতখানি আলোড়নে সমর্থ, নাট্যিক গুণাগুণের যথাযথ প্রতিফলনে ততখানি নয়। বিশেষত টেকনিক্যাল প্রয়োগনিপুণতার দিকে বর্তমান নাট্যকারদের আগ্রহ অত্যন্ত বেশি বলেই মনে হয়। অবশ্য আশার কথা বাংলাদেশের নাটক রচনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণদের আগমন। কিন্তু তাদের নাট্যরচনার মৌল আদর্শ নির্ণায়নের ব্যর্থতা অবশ্যই পূর্বসূরিদের অনুসরণের দুঃখজনক পরিণতি অভিমুখী। তরুণদের শক্তি আছে, কিন্তু দিক নির্ণয়ের স্থিরতা নেই। অনুশীলন আছে, কিন্তু আদর্শ নির্ণয়ের উৎসাহ নেই। পৃথিবীর যে কোনো মহত্তর রচনা তার দেশ-কাল-সমাজ-জীবনবিচ্ছিন্ন অযৌক্তিক প্রতিভাস নয়, বরং সমসাময়িকতা ধারণের মাধ্যমে সময়-অতিক্রমী প্রতিফলনে বদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তরুণ নাট্যকারদের রচনা একটি সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনচেতনার আরোপিত আন্তর্জাতিক হতাশার প্রতিফলন প্রচেষ্টামাত্র! যা যথার্থভাবে আমাদের মৃত্তিকা বুর্জোয়া মানস বিলাসপ্রবণতা অঙ্গিত।

তা ছাড়া প্রায় সকল নাট্যকারদের ভেতরই একটি তীব্রতম হতাশার প্রতিভাস্বযা মূলত আমাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া নয়। বর্তমান বিশ্বে যে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অসমতার পরিণত হিসেবে হতাশার আর্বিভাব, সে হতাশা আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। অতএব দেশ, মাটি, মানুষের সাথে সম্পর্করহিত অনুভব অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আঙ্গিক গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্যামুয়েল বেকেট, ব্রেখট, ইউজিন ইউনেস্কো এমনকি পশ্চিম বাংলার বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবও এত বেশি যে, সে প্রভাবকে সহজে গ্রহণ করতে বাধে।

নাটক দৃশ্যমাধ্যমী বলেই একটি বৃহত্তর সংখ্যার কাছে তার আবেদন ভিন্নধর্মী। আর প্রত্যক্ষধর্মী বলেই দর্শকমানসে তার প্রতিক্রিয়া যত প্রবল, অন্যান্য উপস্থাপনায় তা ততখানি নয়। অবশ্য চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া আরও তীক্ষ্ণ আবেদনসম্ভবা। কিন্তু তা আমাদের দেশে যেহেতু সমগ্র বিস্তৃতময় এবং ব্যয়বহুল সৃষ্টিকর্ম বলেই তা এখনও নাটকের মতো সর্বগ্রাহ্য হয়নি। সেদিক থেকে নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তরুণ নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশেষ আওতায় সংস্থিত বলেই, এক শ্রেণির বিশেষ দর্শকের মনোরঞ্জনের দিকে তাদের লক্ষ্য যত বেশি, সমগ্র পরিক্রমায় ততখানি বিস্তৃত নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সমগ্র শ্রেণির দর্শকমানসকে সমভাবে আন্দোলিত করা কোনো নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু দুটো শ্রেণির মাঝামাঝি একটা সরলরেখায় নাটকের চেতনায় উপস্থাপন কি সত্যিই সম্ভব নয়, যা উভয় শ্রেণির দর্শককে সমভাবে না হলেও, অন্তত একটা স্বাভাবিক আলোড়নে মোহনাসংযুক্ত করতে পারে? হয়তো এ প্রয়াসে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতা থাকতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির পেছনে এ কোনো না কোনো উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকে তা হলে শৈল্পিক রীতিকে বিনষ্ট না করেও একটা স্বাভাবিক মোহনায় সৃষ্টির প্রচেষ্টা অবশ্যই তার সার্থকতাকে বহন করতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে দর্শক সম্পর্কে একটা উন্নাসিক মনোভাবই তরুণ নাট্যকারদের নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করতে পারছে না, যতখানি পারছে প্রভাবিত করতে। স্মরণ্য যে, পশ্চিম বাংলাতে যে সমস্ত নাটক রচিত হচ্ছে তার সবগুলো যে ভালো এমন নয়, তবু নিরীক্ষাধর্মী নাটকগুলোতেও দর্শকসমাজের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক নয়। এমনকি বছরের পর বছর যে সমস্ত নাটক প্রদর্শিত হচ্ছে সে নাটকগুলো কি অর্বাচীন বলে উপেক্ষা করা চলে? তা হলে প্রায় সমগ্র শ্রেণির নাটকদর্শক সেগুলোকে নির্বিবাদে দেখে যাচ্ছে কী করে? আসলে ওখানে যে কোনো ধরনের নাটকই দর্শকনন্দিত হবার যোগ্যতা রাখে। এবং সেটার জন্য দীর্ঘ বৎসর ধরে দর্শকমানস প্রস্তুত করতে হয়েছে। বাংলাদেশেও দর্শনমানসের প্রস্তুতির জন্য নাট্যকারদের দায়িত্বকে যেমন অস্বীকার করা চলে না, একই সঙ্গে সরকারি প্রচেষ্টার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। নাট্যমঞ্চের অভাবে বাংলাদেশে নাটকের ক্ষেত্রে বিশারণেও যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছে। যদিও এ বাধা কোনোমতেই প্রধানতম বাধা নয়।

তবে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, যদি বিভ্রান্তিমুক্ত আদর্শবাদের সাশ্রয়ে তরুণ নাট্যকারেরা সচেষ্ট হন, তবে বাংলাদেশে সার্থক নাটক রচনা দুঃসাধ্য হবে না। তবে একটা কথা অবশ্যই স্মর্তব্য : নাটকের যেমন একটি মঞ্চ-সম্পৃক্ত দিক রয়েছে, তেমনি তার শৈল্পিক দিকও একটি রয়েছে। ফলে শুধুমাত্র প্রচারসর্বস্ব নাটক সৃষ্টি যেমন গৃহীত হবে না, তেমনি শৈল্পিক গুণের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে সমাজ, জীবন, দেশ, কাল, মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন প্রয়াসও গ্রাহ্য হবে না। দ্বৈতের সম্মিলনে নতুন পথ নির্মাণের মাধ্যমে যুগের নাটককে যুগাতিক্রমী করে তুলতে পারলেই তরুণ নাট্যকারদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে। পঁচিশ বছরের নাট্যিক বন্ধাত্ব দূরায়নে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখিতার প্রয়োজন তাই অনস্বীকৃত।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে নিছক আনন্দের প্রয়োজনে সৃষ্টির কথা যারা বলেন, তাঁরা শুধু জীবনকে প্রতারণা করেন মাত্র। আর বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকারদের ভেতরে এ-জাতীয় আরোপিত আনন্দ-প্রকাশের উল্লেখ নিজেদের চেতনার সাথে জীবনের সংযোগহীনতাকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করার নামান্তর, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিচরিত্র অনুসারে তারা তা নন। স্বীয় চরিত্রবিরোধী সৃষ্টি কখনও আন্তরিক হতে পারে না। বাংলাদেশের আগামী দিনের নাটক রচনায় এই আন্তরিকতার সাথে যুক্ত করতে হবে অনুশীলনের। তা হলেই বাংলাদেশে সার্থক নাটক সৃষ্টি হবে, অন্যথায় নয়।

উৎস : থিয়েটার, নভেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা।

প্র ব ন্ধ

আজকের নাটক এবং দর্শক-সমস্যা

নূ রু ল ক রি ম না সি ম

আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটক নিয়ে বেশ পরীক্ষা চলছে। সেইসব খবর যদি আমরা ঠিকমতো রাখতাম, তাহলে অনেকদিন আগেই আমাদের নাটকে বিবর্তন আসত। অনেকদিন আগেই দর্শকের রুচির পরিবর্তন ঘটত এবং নাট্যকার ও দর্শকের মাঝখানে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি না হয়ে, গড়ে উঠত সুন্দর সম্পর্ক। এসব কিছুর ফলাফল হত : নাট্য আন্দোলন। কিন্তু তা হল না। সত্যিকারের নাটক ও নাট্যআন্দোলন আজও এদেশে গড়ে ওঠেনি। কে জানে, স্বাধীনতার পরেও কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে!

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বিভিন্নরকমের সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের কুচক্রী প্রতিরোধ এখানে প্রগতিমূলক সাহিত্য আন্দোলনকে যেমন বার বার দমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, তেমনি নাট্যসাহিত্য বা নাট্যআন্দোলনকেও অন্য খাতে প্রবাহিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলেছিল। যেহেতু, নাটক, চলচ্চিত্রের পর, সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম তদানিন্তন সরকার এবং সরকারি বুদ্ধিজীবীরা এ মাধ্যমকে এক্সপ্লয়েট করেছে খুব দক্ষতার সাথে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল টেলিভিশন এবং বেতারের পদলেহী কয়েকজন। অথবা বলা যায় সরকার এ দুই মাধ্যমকে সরকারি স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এই সময়কার নাট্য-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাব, তখন সবচেয়ে বেশি অনূদিত নাটক সৃষ্টি হয়েছে, সৃজনশীল নাটকের সংখ্যা ছিল মারাত্মক রকমের নিরাশজনক। এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলা একাডেমীও সৃজনশীল নাটকের মাধ্যমে সমাজের সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত না করে অনূদিত নাটকের দিকে আগ্রহ দেখিয়েছে। আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাচ্ছে। সেই সব প্রতিরোধ হয়তো নেই হয়তো-বা থেকেও থাকতে পারে, কেননা মানচিত্র বদল মানে ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন নয়। এ ছাড়া মুখোশ পাল্টে নিতে কতক্ষণ। যদি তাই হয়, উল্লেখিত সন্দেহ সত্যতায় পর্যবসিত হয়, তা হলে নিরাশ হতে হবে। আর নিরাশ

না হয়েই-বা উপায় কী, স্বাধীনতার পর এক বছর অতিবাহিত হল, অথচ বেতার ও টেলিভিশন, দুই-একটি ছাড়া এমন কোনো ভালো নাটক উপহার দেয়নি যার জন্য আমরা গর্ব করতে পারি। অভিজ্ঞ ও ভালো নাট্যকারেরা বেতার- টেলিভিশনে কেন লিখছেন না? সময় এবং শক্তির অক্ষমতা নাকি সেই পুরনো প্রতিবন্ধকতা? হয়তো শেষেরটাই সঠিক কারণ; কেননা সত্যিকারের সৃজনশীল প্রতিভা কখনও সীমাবদ্ধতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে বিকশিত হয় না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বহু নতুন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত পুরনো গোষ্ঠী পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেই অন্তত ১৭টি নাট্যগোষ্ঠী আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার, তেমনি নাট্যআন্দোলনেরও সূচনা হবে সেখান থেকে। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাহিত্য বা শিল্পআন্দোলন দুটো বিপরীতধর্মী বিষয়। একটি আবেগকে পুঁজি করে, বিশেষ একটি সময়কে ভিত্তি করে, কিছু ছলাকলা আশ্রয় করে, রাজনীতির আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, কিন্তু সাহিত্য বা নাট্যআন্দোলন নয়। সাহিত্য বা নাট্যআন্দোলনে নিছক আবেগ নয়, আন্তরিকতা, অভিজ্ঞতা এবং আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ প্রয়োজন।

যতদিন ছাত্র ইউনিয়ন ক্ষমতায় আছে, ততদিন হয়তো নাট্যচক্র থাকবে। এরপরে এর অস্তিত্ব থাকবে কি না তা বিতর্ক ও ভাবনার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য দুই অরাজনৈতিক নাট্যগোষ্ঠী ‘স্বরলিপি’ ও ‘অবিধি’র যদি আন্তরিকতা থাকে এবং অর্থ সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, তা হলে, আশা করা যায় এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আন্দোলনে কতটুকু ভূমিকা পালন করবে এটা নির্ভর করবে তাদের মঞ্চস্থ নাটকের ওপর এবং তা নির্মিত হবে ভবিষ্যতে। রায় দেবে ইতিহাস। মূল্যায়ন করবে পরবর্তী বংশধর।

বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত-কয়েকটি গোষ্ঠীর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের ওপর এবং মঞ্চস্থ নাটকের ওপর নির্ভর করছে আন্দোলনের পূর্বাভাষ। এটা আনন্দের এবং আশার বিষয় প্রচুর নাটক হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আন্দোলন এখনও শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে আলোড়ন। এই আলোড়ন এবং আবেগ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে জানি না। নাটক সৃষ্টি হবে, না নাট্যকার, তা বলা কঠিন। নাটকের পাঠক, দর্শক এবং নাট্যসাহিত্য যদি সৃষ্টি না হয়, তা হলে আন্দোলন বলা চলে না।

আমাদের এখানে একসময় সাহিত্যজগতে কবিতার চেয়ে কবির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। তখন অ-কবিদের ভিড়ে আসল কবিকে চিনে নিতে একটু কষ্ট হত। এখন যেন সেইরকম একটা সময় এসে গেছে। অ-নাট্যকারদের ভিড়ে আসল নাট্যকার চিনে নিতে ভুল হয়। সীমান্তের বেড়াজাল খুলে যাওয়ার পর, আমাদের অনেকেই ওপার বাংলায় ঘুরে এসে এদেশের নাট্যআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ফলাফল হচ্ছে এই, আমাদের আজকের নাটক বিভিন্ন বিদেশি নাটকের (কোলকাতার বাংলা নাটক ও বিভিন্ন দেশের নাটক) সুচারু সংকলন হয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য, যে কোনো শিল্প ও

শিল্পীকে প্রথমাবস্থায় একটা কিছু মডেল রেখে এগোতে হয়। এমনকি শেকসপিয়র ও আজকের নাট্যকার বেকেট, সিঙ বা আয়োনেস্কোও এ থেকে মুক্ত নন। প্রশ্ন হচ্ছে, মডেল রেখে আঁকা আর বিখ্যাত কোনো শিল্পীর ছবি থেকে হুবহু কপি করা এক কথা নয়।

নাট্যআন্দোলনের প্রারম্ভেই যদি আমাদের ওপর চৌর্যবৃত্তির অপবাদ এসে যায়, তা হলে এটা শুধু ব্যক্তির জন্য লজ্জাজনক হবে না, সমগ্র জাতিকে যুগ যুগ ধরে এর মূল্য দিতে হবে। নাট্যইতিহাসে তো আর স্বজনপ্রীতির সুবর্ণ সুযোগ নেই। ঐতিহাসিক কাউকে ক্ষমাও করেন না। বিদেশি নাটক আমরা অবশ্যই বেশি করে দেখব এবং পড়ব। প্রয়োজন হলে আঙ্গিক আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ধার করব, আমাদের পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে নেব। আমাদের মনোভাব হবে : 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, কেহ নাহি যাবে ফিরে।' কিন্তু আমাদের প্রয়োজন প্রবল পুরুষ, প্রতিভাবান নাট্যকার যে শুধু নিবে না কেবল, দিবেও। এ প্রবাদ অস্বীকার করার উপায় নেই, 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর'। অল্প বিদ্যা থেকেই আসে দুর্বিনীত ভাব। এ মুহূর্তে অবশ্যই প্রয়োজন একজন বিদ্রোহী নাট্যকার, যে শুধু শূন্যগর্ভ জ্ঞান নিয়ে সবাইকে অস্বীকার করবে না, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে আস্থা রাখবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যআন্দোলন, আমাদের দেশের নাট্যইতিহাস, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে নির্ণয় করতে হবে নাটকে কী এবং কতটুকু হয়েছে, কোথা থেকে আমাদের এগোতে হবে। একজন বিদ্রোহী নাট্যকার, শিল্পকলার সবগুলো মাধ্যম সম্পর্কে যার মোটামুটি ধারণা রয়েছে এ মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন। এ মুহূর্তে প্রয়োজন ব্যবসায়িকদের মঞ্চ নির্মাণে পুঁজি বিনিয়োগ করা। যতদূর মনে হয় ব্যবসাগত দিক দিয়ে প্রথম পর্যায়ে কিছুটা ঝুঁকি নিলেও, যোগ-বিয়োগ করে ফলাফল শূন্য হবে না, পুষিয়ে যাবে। আর প্রয়োজন মননশীল সাংবাদিক, যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সুদূরতম পল্লিবাসীর কাছে পৌঁছে দেবে নাট্যসংবাদ ও নাটক সম্পর্কে ধ্যানধারণা এবং সবচেয়ে যা বেশি দরকার তা হল নাট্যপত্র। দুটো গোষ্ঠী থেকে সম্প্রতি দুটো নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আরও বেশি সংখ্যায় এবং নিয়মিত নাট্যপত্র প্রকাশ হওয়া দরকার। দর্শক এবং পাঠকদের মনোভাব নাট্যকারকে জানতে হবে। দর্শক এবং নাট্যকারের মাঝে কমিউনিকেশন হতে হবে।

দর্শকদের অনেকেই একথা বলে থাকেন আমাদের আজকের নাটক স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক বীরগাঁথা হবে। আবার কেউ কেউ, অতীতের দুঃখময় ইতিহাসের নৈরাশ্যজনক ছবির পুনরাবৃত্তি নাটকে দেখতে আগ্রহী নন। স্বাধীনতার পরবর্তী সমাজ, সাম্প্রতিক যন্ত্রণা ও জ্বালা থেকে আমাদের উত্তরণের পথ বলে দেবে আজকের নাট্যকার এ ধরনের দাবিও করেন অনেকে। আজাকের নাটক ও নাট্যকারের কাছে আজকের মুক্ত দেশবাসীর অনেক আশা। নাট্যকার ভাবছে আরও বেশি 'কেবল কোলকাতা নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বেও আমাদের নাটককে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

দর্শক এবং নাট্যকার, মাঝখানে শূন্য একটা ফাঁকা। দুজন পরস্পরের মুখোমুখি, কিন্তু কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারছে না। নাট্যকারের বক্তব্য ; দর্শকের দিকে তাকিয়ে ভালো নাটক লেখা সম্ভব নয়। দর্শক বলছে : আজকের নাট্যকার যে দুর্বোধ্য নাটক লিখছেন তা বুঝতে পারছি না। হয়তো দুজনের বক্তব্যের মাঝেই কিছুটা সত্যতা আছে।

সমস্যার উৎসমুখ, সঠিক কারণ, খুঁজে বের করতে হবে। আসলে নাট্যকার যেমন এর জন্য দায়ী নয়, তেমনি দর্শককেও সমস্ত দোষের বোঝা চাপিয়ে দেয়া চলে না।

সময়টা এখন বিরূপ। অনেক রক্ত এবং অশ্রুর পর দর্শকদের মানসিকতা এখন ছিন্নভিন্ন। এখানকার রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার একটি 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' চলছে। মানুষ অস্থির। কোথাও স্থিরতা নেই। কোথাও নিশ্চয়তা নেই। এইরকম এক সময়ে নাট্যকারকে কিছুটা সময় ভাবতে হবে। একটু ধীরে এগোতে হবে।

আজকের নাটক কী হবে, তা ঠিক করবেন পথিকৃত প্রতিভাবান নাট্যকার। সাধারণ দর্শকের রুচি কী হবে, তা গড়ে তুলতে বেতার ও টেলিভিশন। কেননা গণমাধ্যম হিসেবে আজকে এ দুটোকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বেতারযন্ত্র যখন সুদূরতম পল্লিতেও পৌঁছে গেছে। এখন যদি পুরনো প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে হয়, তা হলে একজন বিদ্রোহী নাট্যকারকে এগিয়ে এসে তা ভাঙতে হবে। নাট্য-ইতিহাসে একথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে, কনভেনশনকে না ভেঙে কখনও নতুন কিছু দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে নাট্যগোষ্ঠীগুলোকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। এ কথা সহজেই বোঝা যায়, আজকের দর্শকদের এহেন রুচিবোধের জন্য দায়ী বেতার ও টেলিভিশন এবং তদানীন্তন কালচারাল পলিসি।

দর্শক-সমস্যা বিষয়কে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক পড়ে, শেকসপিয়রের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাটক পড়ে, অ্যারিস্টটাল পড়ে, কার্লমাক্সের ইকনমিক থিওরি পড়ে, এদের অনেকের রুচিবোধও ভীষণভাবে নিম্নমানের। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষিত দর্শকের যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে সাধারণ দর্শক কোন স্তরে আছে, তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের অবশ্যই এর উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

আজকের নাটকের উদ্ধার ও উত্তরণ নির্ভর করবে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধানের মাধ্যমে। তা না হলে এদেশে নাট্যআন্দোলন গড়ে উঠবে না। ভালো নাটক হবে না।

উৎস : থিয়েটার, মে ১৯৭৩ সংখ্যা।

বিষয় মুনীর চৌধুরী

সি রা জু ল ই স লা ম চৌ ধু রী

মুনীর চৌধুরীকে যেমন জীবন্ত দেখেছি আমি তেমন খুব কম মানুষকে দেখেছি তাঁর সমসাময়িকদের ভেতর। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি তার ছাত্র হবার, তার পরিচিত হবার অনেক আগে, সেই কালে, পাকিস্তান হবার পর পর পাকিস্তানের 'স্বপ্নদ্রষ্টা' কবি ইকবালের ইসলামি সুখ্যাতির যখন প্রবল পরাক্রমে ছিল সেই সময়ে ইকবালের ওপরই বক্তৃতা করছিলেন তিনি। অন্যরা বললেন পাকিস্তানের নতুন মাটিতে জিন্দা ইসলামের কথা, মুনীর চৌদুরী শুধু বললেন ভিন্ন কথা, জীবন্ত কথা। তিনি বললেন ইকবালকে তিনি পছন্দ করেন ইকবাল শোষণের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন বলে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আমি, মুনীর চৌধুরী স্পষ্ট করে বলেছিলেন মনে পড়ে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে এই কবিকে তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের কবি হিসাবে। আজ থেকে বাইশ বছর আগের কথা, সমাজতন্ত্রের লোকখ্যাতি তখন অতটা উঁচুতে ওঠেননি আজ যতটা উঠতে পেরেছে। কিন্তু তিনি একা একাকী সমাতন্ত্রের কথা, ব্যথিত মানুষের নিষিদ্ধ কথা অনায়াসে নিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানিদের সেই বদ্ধ জলসায়। তাঁর বক্তব্য ও বক্তৃতা ছাপিয়ে উঠেছিল অন্য সকল কথার তোতাপাখি কলকাকলিকে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। বাসায় ফিরেছিলাম ইকবালের ছবি নিয়ে নয়, সভার ছবিও নয়, ফিরেছিলাম মনের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর ছবি নিয়ে। অতিশয় জীবন্ত, প্রাণবন্ত মানুষের মুখচ্ছবি।

তারপর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, বয়স বেড়েছে, সময় পার হয়েছে, মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু সেই প্রথম দিনের ছবির বদল হয়নি। সেই ছবি বরং আরও স্পষ্ট হয়েছে পূর্ণ হয়েছে দিনকে দিন। যেমন, তিনি নাটক লেখেন এটা জানা ছিল না প্রথমে, পরে যখন জেনেছি, পড়েছি তাঁর নাটক তখন মনে হয়েছে এই নাটকীয় প্রাণশক্তি সেই বক্তার মধ্যে ছিল যাকে স্কুলের ছাত্র আমি বক্তৃতা করতে শুনেছি ইকবালের ওপর। সমাজতন্ত্রের পক্ষে ওই বক্তব্য শুধু বক্তৃতার মঞ্চেই উত্থাপন করেননি মুনীর চৌধুরী। জীবনেও কাজ করেছেন সমাজতন্ত্রের পক্ষে, ছাত্রজীবনে তো বটেই, সে জীবন পার হয়েও। কাজ করেছেন আন্তরিকতা নিয়ে, উদ্দীপনা নিয়ে। আন্তরিকতা ও উদ্দীপনা একত্র মিশেছিল তাঁর কর্মে। কর্মী আরও ছিলেন নিশ্চয়ই। আন্তরিকতাও কম ছিল না তাঁদের। কিন্তু অতটা উদ্দীপনা সকলের

মধ্যে ছিল কিনা আমি জানি না। জেল অনেকে খেটেছেন বাংলাদেশে, যারা সাম্যবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন জেল-জুলুম কম ভোগ করতে হয়নি তাঁদের, কিন্তু মুনীর চৌধুরীর জেল খাটাকে অন্যরকম মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নৃশংস সরকার উদ্দীপ্ত প্রাণবন্ত উদ্বেলিত একটা প্রাণশক্তিকে খাঁচার মধ্যে পুরে রেখেছে। কিন্তু সেই প্রাণকে বিনষ্ট করবে, তাঁর শক্তিকে নিঃশেষিত করবে এমন শক্তি কারাপ্রাচীরের ছিল না। এবং দেখি ওই প্রাচীরের অবরোধের ভেতর থেকেই মুনীর চৌধুরী ‘কবর’ নামে নাটক লিখছেন, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ডিগ্রি নিচ্ছেন। জেল তাঁর জীবনের ধারায় একটা পরিবর্তন এনেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আরও বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী কতটা জীবন্ত বোঝা যাবে যারা তাঁর সহপাঠি ছিলেন, ছিলেন তাঁর সহকর্মী অধ্যাপনায়, তাঁদের পাশে তাঁকে দাঁড় করালে। ব্যস্ত তাঁরাও ছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল উন্নতি করা, গুছিয়ে নেওয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মুনীর চৌধুরী ভিন্ন একটা পথ ধরে চলেছেন, যে-পথে উন্নতি আসে না আসে কারাভোগ, যে পথে প্রতিষ্ঠা আসে না, আসে দুর্গতি। সেইখানে সেই পরিশ্রমের প্রায় নির্জন, সম্পূর্ণ বিপদজ্জনক ও অনেকটা নিঃসঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে চলার দুঃসাহসী স্পর্ধার মধ্য দিয়ে জীবনের যতটা প্রকাশ ঘটেছে এমনকি তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও ততটা প্রকাশ ঘটেনি, যদিও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বক্তা।

পরে আরও পরে মুনীর চৌধুরীকে দেখেছি বদলে যাচ্ছেন। জীবন্ত মানুষটি দেখেছি ক্রমশ জীবনের প্রতি আসক্ত মানুষের পরিণত হচ্ছেন। এই পরিবর্তনের খবর তিনি নিজেও রাখতেন। জীবনের মোহের কাছে আমি হেরে গেছি এই কথা তিনি নিজেই বলেছেন। ওই যে বলেছেন, বলতে পেরেছেন ওইখানে তিনি স্বতন্ত্র জীবনের প্রতি আসক্ত আর পাঁচটা মানুষ থেকে। আসক্তি কার নেই? চর্তুদিকে পিলপিল কিলবিল করছে সামান্য সামন্য মানুষ। এই মানুষদের দীনতা লোভ ইতরতা কখনও স্পর্শ করেনি মুনীর চৌধুরীকে। জীবনের প্রতি আসক্ত হয়েও জীবন্ত ছিলেন তিনি। লেখায়, বক্তৃতায়, শিক্ষকতায় সর্বোপরি সাধারণ মানুষের বেদনাকে বুঝবার ক্ষমতায়, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তিনি আশপাশের মানুষকে ছাড়িয়ে উঠেছেন।

মুনীর চৌধুরীর পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে হয়েছে। বলা যায় বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের একটি ইতিহাস অভিনীত হয়েছে মুনীর চৌধুরী জীবনে। আদর্শবাদী তরুণ একদিন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তারপর সমাজ তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে নিঃশব্দে, প্রতিশোধ নিয়েছে তার দুষ্ট মূল্যবোধগুলোকে এই বিদ্রোহীর ধারণার মধ্যে চেতনার মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে। কিন্তু নাটকের আরও একটি পর্যায় আছে। স্বাধীন বাংলাদেশের যে আন্দোলন তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, সেই আন্দোলনে মুনীর চৌধুরী বন্দি হয়েছিলেন কারাগারে। উনিশ বছর পরে বাংলাদেশের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৭১-এ, সে আন্দোলনের কালে মুনীর

চৌধুরী শহিদ হয়েছেন। সূত্রপাতের যিনি কর্মী ছিলেন পরিণতিকে তিনি দেখে যেতে পারলেন না। আল বদরেরা এই দেশের প্রাণকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তাদের পক্ষে মুনীর চৌধুরীর মতো প্রাণবন্ত জীবনকে হত্যা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু তবু আমি ভেবে শিউরে উঠি কেমন করে হাত তুলেছে তারা, ঘাতকেরা, মুনীর চৌধুরীর ওপর। পাঞ্জাবি হানাদারদের আচরণটা বুঝি, তারা এসেছিল অন্ধ প্রাকৃতিক যান্ত্রিক শক্তির মতো, যাকেই তারা প্রতিবন্ধকতা মনে করেছে তাকেই গুড়িয়ে দিতে চেয়েছে মাটির সঙ্গে। কিন্তু যারা মুনীল চৌধুরীকে চেনে, জানে কে তিনি, কেমন করে মানুষ তিনি তারা কেমন হরে হাত তুলেছে তাঁর ওপর! কাজটার মধ্য দিয়ে যে নৃশংসতা উন্মোচিত হয়েছে তা আমাকে অনেক আতঙ্কগ্রস্ত করে অন্য যে কোনো নৃশংসতার চেয়ে। ভুলতে পারি না এই হন্তারা আমাদের মধ্যেই আছে, আমাদের আশপাশেই ছিল এবং তারা শিক্ষিতও। অন্য কিছু না হোক, অন্যসব গুণের কথা বাদ দিই, মানুষ হিসাবে মুনীর চৌধুরীর শ্রেষ্ঠত্ব তো ঘাতকদের অজানা থাকবার কথা নয়। শুনেছি তারা ছাত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়েরই। 'স্যার' বলে ডেকেছিল তাঁকে্ তিনি স্যার ছিলেন আমারও, শিক্ষক ছিলেন আমাদের অনেকেরই। কিন্তু ক্লাসের বাইরে ভাই ছিলেন আমাদের। অর্থাৎ যেই গুণটা ছিল তাঁর যা থাকলে একজন শিক্ষক ছাত্রের ভাই হয়ে ওঠেন। শিক্ষকতা আমরাও করি, অনেকেই করেন, কিন্তু আমরা ভাই হতে পারিনি তেমনভাবে তেমন সংখ্যক ছাত্রের যেমন তিনি ভাই হয়েছিলেন আমাদের সময়ের, আমাদের আগের সময়ের অনেক অনেক ছাত্রের। যারা তাঁর গায়ে হাত তুলতে পেরেছে তাদের অসাধ্য দুনিয়াতে কিছুই হৈন এ কথা আমার বার বার মনে হয়।

একবার এক সঙ্গে হোটেলের এক কামরায় ছিলাম আমরা। ঢাকার বাইরে। সকালে উঠেছেন মুনীর ভাই, আমি বিছানায় শুয়ে টের পাচ্ছি। অল্প অল্প শীত পড়েছে, গায়ের চাদরটা টেনে নিলে ভালো, কিন্তু টানতে আমার আলস্য। দেখি মুনীর ভাই বাথরুমে যাচ্ছেন। আমার বিছানার পাশে এসে আস্তে থামলেন, ঝুঁকে পড়ে আলগোছে চাদরটা টেনে দিলেন গায়ে। সেই ঘটনাটা অনেক দিন অনেক সময় মনে পড়েছে আমার। মনে হয়েছে তার স্নেহের প্রকাশ ওই রকমই। তিনি মানুষের উপরকার করতে ভালোবাসেন। অন্যেরা যেখানে ছিদ্র খুঁজতেন মুনীর চৌধুরীকে সেখানে দেখেছি প্রশংসা করার মতো গুণ খুঁজছেন। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যটা ছিল মৌলিক। কিন্তু চাদর টেনে দেওয়ার ঘটনাটা আমার মনে দাগ কেটে আছে আরও এক কারণে। আমার মনে হয়েছে মুনীর চৌধুরী জগৎ রূঢ় সংসারটা বীভৎস। কিন্তু মুনীর চৌধুরী হাস্যকৌতুক করেন, হাসির নাটক লেখেন এই জগতের মধ্যে, এই পরিবেশের মধ্যে বসে। তাঁর হাসি কৌতুক হাসির নাটক লেখা মনে হয়েছে আমার চাদর টেনে-দেওয়া বাস্তবের নৃশংসতার ওপর, দীনতার ওপর। আমরা যেখানে উত্তেজিত হতাম, হাত পা ছুঁতাম, রুষ্ট কথা বলতাম সেখানে তিনি দেখতাম হাসছেন। ঘটনার অসংগতি তাকে ক্রুদ্ধ করছে না, তাকে হাসাচ্ছে। শক্তির পাশবিকতা তাকে উত্তেজিত করছে না, বরং তিনি যেন পাশবিকতার

অন্তরালবর্তী সামান্যতাকে ধরে ফেলেছেন। এও বিদ্রোহ এক প্রকারের। সামান্যকে তিনি তাঁর কথায় তার লেখায় অসামান্য করে তুলেছেন, কিন্তু অসামান্য বলে যে লাফঝাঁফ দিচ্ছে সেও যে ভেতর ভেতরে অতি সামান্য এই সত্যটা তিনি প্রকাশ করতেন হাসিতে কৌতুকে। তাঁকে তিনি মান্য করতেন না, মনে করতেন ক্রোধ উদ্রেকের যোগ্যতা তাঁর আছে।

মুনীর ভাই চলে গেছেন, আমরা আছি, কিন্তু আমরাও সেই আমরা নেই যাদের জীবনের একটা অংশ জুড়ে ছিল তার কথার লেখার হাস্যকৌতুকের অতি দ্রুত সংক্রামক প্রাণশক্তির উচ্ছল উপস্থিতি। অন্যলোকে চলে গেছেন তিনি যিনি আনন্দলোকের খোঁজ রাখতেন। বঞ্চনাটা আমাদের।

উৎস : থিয়েটার, নভেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা।

আ ড্ডা

কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক

স ঞ্চা ল ক: হা সা ন শা হ রি য়া র

[২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর ভেতর ও বাইরের প্রাঙ্গণ ঘিরে আয়োজিত হল– রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলা ২০০৭। প্রথমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করেছিল নাট্যপত্রিকা 'থিয়েটারওয়ালা'। দিনব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন নাট্যদল তাদের নিজস্ব স্টলে পরিবেশন করেছিল তাদেরই এতদিনকার কর্মযজ্ঞ। মেলায় সবার সরব উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আয়োজকদের উৎসাহিত করেছে নিঃসন্দেহে। মেলার অংশ হিসেবে দুপুরে আয়োজন করা হয়েছিল এক উন্মুক্ত বৈঠকের। বৈঠকের শিরোনাম ছিল– এই বাজারে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক। বৈঠকটির সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন *থিয়েটারওয়ালা* সম্পাদক হাসান শাহরিয়ার।

নাট্যজন-নাট্যদর্শক-সমালোচকের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হওয়া বৈঠকের অনুলিখন ছাপা হল পাঠকদের জন্য।]

হাসান শাহরিয়ার

শুভেচ্ছা সবাইকে আজকের এই বৈঠকে অংশ নিতে আসায়। আমরা এটিকে বৈঠক বলছি, সেমিনার বলছি না, কারণ, এখানে মূলত কোনো প্রধান বক্তা নেই, কেউ পেপার পড়বে না। এখানে আজকের বিষয় ধরে সবাই নিজেদের মতামতগুলো জানাব। আজকের বৈঠকের বিষয়– এই বাজারে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক। তো কাউকে না কাউকে তো শুরু করতে হবে– তাই আমি প্রথমে মাইক্রোফোন দিতে চাই কামালউদ্দিন কবিরকে। মূলত আজকের এই রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলার বৈঠকটির বিষয় নিয়ে ভাববার জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে কবির একজন। এবং এই শিরোনামটিও সে-ই ঠিক করেছে। তাই প্রথম বলাটা তাকে দিয়েই শুরু হোক।

কামালউদ্দিন কবির

আমরা আসলে একটু খোলামেলাভাবেই আলোচনা করতে চাই। এর আগেও *থিয়েটারওয়ালা* কিছু কিছু মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, দর্শক-নাট্যজন সবার সাথে সরাসরি কথা বলবার জন্য। তো সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট নাটক ধরে ধরে। আজকের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি এ কারণে যে, আজকে আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে কথা বলে বের করতে চাচ্ছি, আসলে আমরা করবটা কী, কীভাবে, কেন। সে-জন্যই আমি অনুরোধ করব যে, আপনারা একটু খোলামেলা কথা বলবেন। আমরা একটু নিজেরা বোঝার চেষ্টা করব, আমরা যে নাটক করে যাচ্ছি, নানাবিধ বাস্তবতার মধ্যে থেকে, সেখানে ভাবনার দিক থেকে আমরা কতটুকু ভাবছি। আমরা যে মঞ্চে নাটক করছি, সেখানে বিষয় হিসেবে কোনটিকে ভাবছি। যদি নির্দিষ্ট বিষয় ভেবে থাকি তাহলে কেন ভাবছি। আর এই ভাবনাটা দর্শকের কাছে আজকের এই বাজারে উপস্থিত থেকে কীভাবে উপস্থাপন করব। দেশ-কালের বিচারে যে সময়টাতে আমরা কাজটা করছি, তখনকার সামগ্রিক বাস্তবতাটা আসলে কী সেটা আমাদের মাথায় থাকে কিনা, সেগুলো বের করার চেষ্টা করব। তো শুরুতে একটা কিউ দিয়ে রাখতে পারি এভাবে, আজকের যে সময়, এই সময়টায়, দেশ-কালের মধ্যে থেকেও অনিবার্য কিছু বাস্তবতা অনবরত আমাদেরকে আক্রান্ত করছে। এবং এই যে বাস্তবতা, সেটির একটা নাম এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধ হয়েছে, সেটি হচ্ছে 'বাজার'। বিশ্বব্যাপী মানুষের সব কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ডটা এখন বাজারি সংস্কৃতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। আমাদের এই দেশ উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত ছিল ২০০ বছর। সেই ২০০ বছরে আমাদের সব কিছু, চিন্তা-ভাবনা, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ

করত, প্রভাবিত করত উপনিবেশিক শক্তি। তো আজকে দেখা যাচ্ছে দৃশ্যমান কোনো উপনিবেশিক শক্তি আমাদের সামনে নেই, কিন্তু আমরা সবাই নিশ্চয়ই অনুভব করছি, বুঝতে পারছি আজও আমরা কোনো না কোনো শক্তি বা প্রভাব বা ক্ষমতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বাইরে না। এবং সেই ক্ষমতাটা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা মানছে না। তাহলে সেই ক্ষমতাটা কার, কী দিয়ে হচ্ছে, সেই বিষয়গুলোই একটু বের করতে চাচ্ছি আজকের বৈঠক থেকে। সেই বাজারি সংস্কৃতির মধ্যে আজকে যে বিষয়টা আমরা উপস্থাপন করব, মঞ্চে, যে নাটকটা উপস্থাপন করব, সেটার সাথে আমার যোগসূত্র কতটুকু, কেনই-বা এই পারফরমেন্সটা করছি, এই সময়ে, সেই বিষয়টা নিয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করা দরকার।

আলী হায়দার

[নাট্যজন– সুবচন নাট্যসংসদ]

আমার মনে আছে, আমি প্রথম যখন সুবচনে যোগ দিই, ১৯৯১ সালে, তখন থেকেই দেখেছি দর্শক আনার ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা ছিল যে, আমরা পুশিং সেল করতাম। পরে এক সময় সেটা বন্ধ করে দিই। বন্ধ করে দেয়ার পরে দেখা গেল দর্শক কমে যাচ্ছে। তো এখন যেটা করি যে, প্রত্যেক শো'র আগে প্রচুর এসএমএস করি, ই-মেইল করি। আমার কথা হচ্ছে, এই যে শিরোনামে আছে কী নিয়ে নাটক, তো যা নিয়েই নাটক হোক-না কেন, দর্শককে সেটা দেখতে হবে বা দেখাতে হবে। কিন্তু সেই দর্শকতো কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়া দর্শক বাড়াতে আমরা এই বাজারকে ব্যবহার করেত পারি কিনা? মানে এই যে মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইল, এ-সব তো বাজারের কারণেই আমাদের হাতে এসেছে। এই বাজারটাকে ব্যবহার করা যায় কিনা। আমরা প্রত্যেকের নাটকের আগেই যদি বন্ধু-বান্ধব বা যার যার ই-মেইল আছে, তাদের কাছে মেইল পাঠাই তাহলে তারা আবার মঞ্চমুখি হতে পারে। শুরুতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কিনা বুঝতে পারছি না। তবে আমি আমার একটা বিক্ষিপ্ত ভাবনার কথা বললাম। ধন্যবাদ।

শহীদুল মামুন

[নাট্যজন– প্রাচ্যনাট]

প্রথম প্রশ্নটি জাগতে পারে যে, শিল্পের কি আসলে বাজার আছে? শিল্প তো আসলে বাজারের জন্য না। আবার কথা থাকে যে, যদি শিল্প বাজারি পণ্য হয়, তাহলে কি সে তার শৈল্পিক ব্যাপারটা হারিয়ে ফেলবে? দু-একটা তথ্য দিই। শেক্সপিয়র কিন্তু গ্লোব থিয়েটারের শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে একজন ছিলেন। ৩৫ ভাগ শেয়ার তাঁর হাতে ছিল। উনি নাট্যকার ছিলেন, জীবনবিমুখ ছিলেন না। টাকা-কড়ির হিসাবটা খুবই ভালো বুঝতেন। উনি কখনো কোনো অর্থকষ্ট পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আরেকটা তথ্য দিই উনবিংশ শতাব্দীর। বলা হয়ে থাকে, কবিদের পকেট নাকি ফাঁকা থাকে। কারো কারো থাকতে পারে, সবার না। যাদের ফাঁকা থাকে না, তাঁরাও বিশ্বখ্যাত কবিই ছিলেন। উদাহরণ– কবি বায়রন। বায়রনের একটি কবিতার বই ছাপা হওয়ার সাথে সাথে, ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ফরাসি, স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হত। বিনিময়ে তিনি কী পরিমাণ অর্থ পেতেন তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথে চলে আসি। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব কিন্তু তিনি হাওয়ায় উড়িয়ে দেননি। উনি যে বক্তৃতাগুলো দিতেন, সেগুলো অর্থমূল্যে বিক্রি হত। তো এটা কোনো লজ্জার ব্যাপার না যে, শিল্পীরা নিজেদের পণ্যের বাজারটিকে চিনতে পেরেছিলেন। শিল্প একটি উন্নতমানের ভোগ্যপণ্য এবং এটার ভোক্তা সবকালেই বাজারে ছিল। সুতরাং শিল্প বাজারি হয়ে যাচ্ছে কিনা, এই ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। এখন আপনাদের মতামত শুনতে চাই। ধন্যবাদ।

টুটুল
[নাট্যজন– সিরাজগঞ্জ থেকে আগত]

আমার মনে হয়, নাটক এবং বাজার দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টিই তার বাজার খোঁজেনি। বাজারই সৃষ্টিকে খুঁজেছে। নাটকের যে ট্রেন্ড আমরা দেখি, সেটা হল, এখানে সবাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করি। নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে কাজ করি, মানুষের জন্য, দেশের জন্য। সেক্ষেত্রে আমার মত হচ্ছে, নাটকে বাজারের চেয়ে কমিটমেন্টটা বেশি থাকা দরকার। আজকের এই যে মেলা, সেই মেলা যাঁকে নিয়ে করা হচ্ছে, সেই এস.এম.সোলায়মান বাজারি নাটক করেননি। ওনার ভেতরে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছিল, সেই কমিটমেন্ট দিয়ে যখন উনি নাটক করেছেন, সেখানে দর্শক আন্দোলিত হয়েছে, বাজার আপনাতেই সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে, নাটক করতে হবে দায়বদ্ধতা থেকে। মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি, এই মাটির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। ইদানিং যারা নাটক লিখছেন, তাদের ভেতরে একটা প্রবণতা আমি লক্ষ করি, তারা লেখার আগেই বাজারটা নিয়ে চিন্তা করছেন। এই যে আজকের বিষয়ে আছে কী নিয়ে নাটক করবেন– আমি বলতে চাই, এই মাটি নিয়ে, এই মাটির মানুষ নিয়ে নাটক করলেই নাটক টিকবে, নতুবা নাটক আপনাতেই বাজারি হয়ে উঠবে। ধন্যবাদ।

সামিনা লুৎফা নিত্রা
[নাট্যজন– সুবচন নাট্যসংসদ]

বাজার, রাষ্ট্র, রাজনীতি এসব প্রসঙ্গ এসেছে। সেই প্রসঙ্গ ধরে বলছি– বাজারটা আসলে কী? আমরা কেউতো বাজারের বাইরে নই, যেমনটি কিনা এই মুহূর্তে রাষ্ট্রের বাইরেও আমরা কেউ নই। এখন কথা হচ্ছে রাষ্ট্রটা কার বা কাদের দ্বারা পরিচালিত? সেই পরিচালনার যে শক্তিগুলো তাদের দেখলে কি মনে হয় যে আমরা একটি সার্বভৌম

রাষ্ট্রে বাস করছি? আমার তো মনে হয় না। এই রাষ্ট্রটাও কিন্তু একটা বাজার দ্বারা পরিচালিত। সাদা চোখে আমরা এটা দেখতে পাই না। পুরো পৃথিবীতে এখন যে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য, সেই বাজারের কবলে তো এই বাংলাদেশও। বাংলাদেশ কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে, সেটার উপর যদি এই দেশের জনগণের কোনো হাত না থাকে, বিপরীতে বলতে হয় বিশ্ববাজারের হাতে যদি এই শক্তি পরিচালিত হয়, তাহলে সে এখানকার মানুষ যে শিল্প সৃষ্টি করবে, তার বিপক্ষেই দাঁড়াবে। এবং সব সময় দাঁড়িয়েছেও। তো এমন একটা অবস্থায় এখানে যারা আমরা নাটক করছি, তারা তো কোনোভাবেই বাজারের বাইরে যেতে পারব না। আমার মনে হয় যারা নাটক করছি, তাদের আগে জানতে হবে আমাদের অবস্থানটা বিশ্বপুঁজির সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত। এবং কোন অবস্থানে দাঁড়ালে এই পুঁজির বিপ্রতীপে দাঁড়ানো হবে। এখানকার মাটি-মানুষের শোষিত হওয়ার ব্যাপারটা অনুধাবন করেই ফাইট দিতে হবে। সেখানে আমি বাজার খুঁজব না, বাজারকে ফেইস করার উপায় খুঁজব? এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা সফল হবে যদি আমি বুঝতে সক্ষম হই, বিশ্বপুঁজির কী ধরনের নিয়ন্ত্রণে আমাকে চলতে হয়। ভাসা ভাসা অবস্থানে থেকে, কেবল ঢাকা শহর বা বাংলাদেশ পর্যন্ত দেখে সফলতা আনা যাবে না। ধন্যবাদ।

তানসেন নিকলী

[নাট্যজন– দৃশ্যপট]

প্রথমেই বলে নিই যে, বাংলা ভাষার একটা আয়রনি আছে, আমরা ইন্ডাস্ট্রি-র বাংলা করেছি 'শিল্প' এবং আর্টেরও বাংলা করেছি 'শিল্প'। এই দুই শিল্পের দ্বন্দ্বটা এই বাজারে, এই বর্তমান সময়ে আমাদেরকে ভোগাচ্ছে। নাটক আসলে কী করে? সমাজের যারা বাসিন্দা, তাদের সামনে সে উপস্থাপন করে বর্তমান সময়ে কী ঘটছে, কেন ঘটছে– এই সব। তো এসব দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু নাটকের হয়তো শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয়, স্লোগান হয়ে যায়, সেটা নির্মাতাদের ব্যর্থতা বলা যেতে পারে– কিন্তু নাটকের মূল উদ্দেশ্যই হল সময়কে ধরে সময়ের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা। তাই যদি হয়, তাহলে আজকে আমরা কী নিয়ে নাটক করব? আমাদের আজকের যে বাংলাদেশ বা বিশ্ব, বাংলাদেশ তো আর বিশ্ব থেকে আলাদা কিছু না, সেই বাংলাদেশে যা ঘটছে, বিশ্বে যা ঘটছে, তার প্রতিফলন থাকা চাই আজকের নাটকে। আজকে যারা দেশ চালান, বিগত ৩৬ বছরে যারা দেশ চালিয়ে গেছেন, তাদের কর্মকাণ্ডের ধরনই নাটকের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কেন? কারণ, সমস্ত সংকটের মূলে তো হল এই চালিকাশক্তি। এখন কীভাবে করব সেই নাটক? আমরা কি এই চার দেয়ালের ভেতরেই করব নাকি ছড়িয়ে যেতে হবে? আমাদের সামনে মুক্তনাটকের অভিজ্ঞতা আছে, গ্রাম থিয়েটারের অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায় কিনা দেখতে হবে। নিজেদেরই বের করতে হবে কীভাবে পৌঁছাব আমাদের বার্তা, দর্শকের কাছে। ধন্যবাদ।

খালিদ

[নাট্যজন– সুবচন নাট্যসংসদ]

প্রথম কথা হচ্ছে, বাজারটাকে আমরা কীভাবে দেখছি। থিয়েটারের বোধহয় একটা বাজার আসলেই প্রয়োজন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশে থিয়েটার চর্চার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা কিছু মৌলিক সমস্যা নিয়েই আছি। তখন বলতাম দর্শকসংকট, এখনও বলি দর্শকসংকট। তখন বলতাম মঞ্চসংকট, এখনও বলি মঞ্চসংকট। এখন কথা হচ্ছে, আবেগ দিয়ে নাটক করলে এক ধরনের আউটপুট আসবে, আবার প্রফেশনাল এ্যাটিচ্যুড নিয়ে করলে আরেক ধরনের কাজ হবে। এখানে আমার ক্লায়েন্ট যদি হয় দর্শক, সেক্ষেত্রে দর্শক বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা প্রফেশনাল এ্যাটিচ্যুড নিয়েছি কিনা। আমার মনে হয় না নিয়েছি। আজকের যে বিষয়, আমরা কেন নাটক করব, সেটা আমার মনে হয় নিজেদের মধ্যে আসলেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। সবকিছু বাদ দিয়ে নাটক করতেই হবে, এমন দায় তো কেউ আমাদের দেয়নি। আর যদি নাটক করিই তখন প্রশ্ন আসবে কী নিয়ে নাটক করব। আজকাল যেসব নাটক হয় সেগুলো দেখলে আসলে মনে হয় না যে, খুব ভেবেচিন্তে নাটকটা হাতে নেয়া হয়েছে। আমরা সেই নাটকই এখন করব যে নাটক এখন না করলেই নয়। সেটা অবশ্যই বিষয়ের দিক থেকে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটের দিক থেকে। তো আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি, যদি নাটক করতেই হয়, পরিশ্রমটাকে যদি সার্থক করতেই হয়, তাহলে মানসিকতার দিক থেকে হলেও আরেকটু প্রফেশনাল হতে হবে। ধন্যবাদ।

হাবিবুর রহমান খান

[চলচ্চিত্র প্রযোজক, নাট্যদর্শক]

আমি নিয়মিত নাটক দেখি, যদিও বলা যেতে পারে আমি চলচ্চিত্রের মানুষ। মূলত আমি প্রযোজক। *তিতাস একটি নদীর নাম*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *হঠাৎ বৃষ্টি*– এগুলো আমার প্রযোজিত ছবি। *পদ্মা নদীর মাঝি*-র কুবের চরিত্রের অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের সাথে অনেকদিন কথা হয়েছিল যে, সোলায়মানের সাথে দেখা করব। আজকে যে ডকুমেন্টারিটা দেখলাম, সোলায়মানের উপর, সেটা দেখার পর আমার চোখে পানি এসে গেছে। আপনারা অনেকে কমিটমেন্টের অভাবের কথা বললেন। আমি একটা কথা বলি, আপনারা যা করছেন, সেটা অনেক বড় কাজ। আপনারা যে কাজটি করেন, দর্শকের সাথে সরাসরি কথা বলেন। দর্শক আপনার কথায় রিএ্যাক্ট করেন আবার আপনি দর্শকের কথায় রিএ্যাক্ট করেন। এটা কিন্তু অনেক বড় কাজ। আমাদের সিনেমায় কিন্তু এটা হয় না। কমিটমেন্ট আছে বলেই আপনারা মঞ্চে কাজ করেন, এত বড় আয়োজন করতে পারেন। এতগুলো মানুষকে এই সময়ে একসাথে

করা কি চাট্টিখানি কথা? আপনাদের কমিটমেন্টের অভাব নেই, আর কমিটমেন্ট থাকলে বাজার নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান। ধন্যবাদ।

ফিরোজ
[নাট্যদর্শক]

আমি এখন মূলত কেবল দর্শক। ছাত্রাবস্থায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম। আজকের বিষয়– এই বাজারে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক, এর প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, নাটকের মূল কাজ হল সমাজটাকে এগিয়ে নেয়া। আর এই এগিয়ে নিতে হলে সমাজের অসংগতিগুলো দূর করতে হবে। তাহলে এখন যারা থিয়েটার করছেন, নির্মাতা আছেন, তারা সেই নাটকই করবেন, যে নাটকে সমাজের অসংগতি দূর করার ব্যাপারটা থাকবে। ধন্যবাদ।

আমিনুর রহমান মুকুল
[নাট্যজন– পালাকার]

আমি কিছু বিষয় শেয়ার করতে চাচ্ছি। আজকের বিষয়ের ‘বাজার’ এবং ‘কী নিয়ে’–টাকে আমরা আপাতত যদি না-দেখি, তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে। আমাদের জানা দরকার ‘কেন’ করব আর ‘কীভাবে’ করব। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা-উত্তরকালে যখন নাগরিক থিয়েটার চর্চার শুরু হয়, তখনই ‘কেন’ নাটক করবেন, এই বিষয়টি পরিষ্কার ছিল না। আমরা একেকজন একেক ভিশন নিয়ে নাটক করি। কিন্তু কোনো ভিশনেরই স্থিরতা নেই। কেন নাটক করব এটা কারো কাছেই পরিষ্কার না, ফলেই সংকটটা তৈরি হয়েছে। বাজারের জন্য করব, নাকি শিল্পের জন্যই করব এটা পরিষ্কার না। বা মুখে বলছি শিল্পের জন্য, আসলে করছি বাজারের জন্য– এধরনের হঠকারিতাও বোধহয় কারো কারো মধ্যে আছে। তাই আগে ঠিক করি কেন করব, আর যদি করি, কোন কৌশলে করব অর্থাৎ কীভাবে করব। আমরা তো আসলে একটা গ্লোবাল বাজারের ভেতরেই আছি, তাহলে এখানে কৌশলটাই হল মূল। বাজারকে অস্বীকার তো করতে পারছি না। আর সবসময় বাজার খুঁজতে চাইলে নাটকটা আর করা হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। বরং আমরা কাজ করতে থাকি, বাজারই আমাদের খুঁজে নেবে। সুতরাং আজকের বিষয়ের পুরোটা না নিয়ে যদি ‘কেন’ করব ঠিক করতে পারি, তাহলেই আপাতত একটা কাজ হবে। ধন্যবাদ।

শামীম সাগর
[নাট্যজন– পালাকার]

এতক্ষণের কথা থেকে মনে হল, থিয়েটারের সাথে 'বাজার' শব্দটা আসলেই আমরা হোঁচট খাচ্ছি। ভাবছি এই বুঝি সব গেল। আসলে এটা আমাদের এ্যামেচারি ভাব থেকেই এসেছে। আমাদের 'বইয়ের বাজার' আছে, 'অডিও বাজার' আছে, 'চলচ্চিত্র বাজার' আছে, তাহলে 'থিয়েটার বাজার' থাকলে অসুবিধা কোথায়? অনেক সময় মনে হচ্ছিল বাজারি বললে বোধহয় কমিটমেন্টের অভাব মনে হয়। আসলে কিন্তু ঠিক উল্টো। বরং বাজারকে মনে রাখলে কমিটমেন্ট আরও বাড়বে। এস.এম. সোলায়মানকেও আমার মনে হয়েছে বাজার দেখে নাটক করতেন। *এই দেশে এই বেশে*, *ইঙ্গিত* এসব নাটক ঐ সময়ের চাহিদা ছিল এবং সেই চাহিদা মতোই তিনি এসব নাটক করেছেন। 'কী নিয়ে' নাটক করব, এটা তো পরিষ্কার থাকার কথা। আমরা সময়কে ধরে নাটক করব। ধন্যবাদ।

রতন দেব
[নাট্যজন– উদীচী]

অনেকের কথায় মনে হচ্ছে 'এই বাজারে' কথাটার অর্থ বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি বিষয়টাতে যা বুঝেছি সেটা হল এই বাজারে মানে– এই সময়ে, এই অবস্থায়, এই পরিস্থিতিতে। সেটা বিশ্ব প্রেক্ষাপটের ব্যাপারেও হতে পারে। কারও কারও কথায় মনে হচ্ছে নাটক বাজারকে ধরতে চাচ্ছে বা নাটককে বাজারে বিকাতে হবে সেটা বলা হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বিষয়টাতে বলা হয়েছে যে 'এখন' কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক– এটা বোঝানো হয়েছে। এই 'এখন'টাই হল বাজার, 'এখন'টাই হল রাজনীতি ইত্যাদি। আজকের এই জরুরি অবস্থায় আমরা সোলায়মান মেলা করছি। কেন করছি? নিজেদের তাগিদ থেকেই করছি। আমরা থিয়েটার করি, থিয়েটারের মাধ্যমে অনেক মেসেজ আমরা দিই, এই মেলার আয়োজনের মধ্য দিয়েও আসলে আমরা মেসেজই দিচ্ছি। সেটা হল যে-কোনো অবস্থাতেই আমরা দাঁড়াতে জানি। এই মেলার আয়োজনে 'কেন' 'কী নিয়ে' কীভাবে' এই ৩ টা ব্যাপারই আছে। সোলায়মান কী নিয়ে নাটক করেছেন? *কোর্টমার্শাল* করেছেন। কারণ, এই সময়ে এমন নাটকই প্রয়োজন ছিল। কীভাবে করেছেন? তার দলের মাধ্যমে করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা কীভাবে করব? এই গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমেই করব নাকি প্রফেশনাল দল তৈরি করে করব নাকি স্টুডিও থিয়েটারের মাধ্যমে করব? মঞ্চে করব নাকি পথে করব? 'বাজার' মানে আমার সামনে যে প্রতিকূলতা আছে সেটাকে বোঝানো হয়েছে। এবং সেই প্রতিকূলতা কীভাবে ফেইস করব সেটা বলার জন্য এই বৈঠক। আমার কাছে অন্তত তাই মনে হয়েছে। ধন্যবাদ।

সেতু

[নাট্যজন– শব্দাবলী, বরিশাল]

এই বাজারে কী নিয়ে নাটক যদি বলতে হয় তাহলে বলব, যেহেতু নাটক করছি, থিয়েটার করছি, তাই আমাদের অবশ্যই শিল্পবোধ থাকতে হবে, দর্শন থাকতে হবে, এবং একটা রাজনীতি থাকতে হবে। আর এই শিল্পবোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে যদি প্রথমেই বাজারের কথা চিন্তা করি, তাহলে বোধহয় একটু সমস্যা দেখা দেবে। আমার মনে হয়, আগেও যারা বলে গেছেন, তাদের কথা ধরেই বলি, বাজার যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা যেন বাজারকে নিয়ে চিন্তা না করি। এখন কথা হচ্ছে বাজার আমাদের কাছে কেন আসবে? আমাদের ভোক্তা হচ্ছেন আমাদের দর্শক। দর্শক যেন নাটক দেখতে আসে, সেই মানের নাটক আমরা তৈরি করতে পারছি কিনা সেটা দেখার বিষয় আগে। আমরা পারছি না বোধহয়। কেন পারছি না? তার কারণ হতে পারে, স্বাধীনতার পর থেকে যে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল, সেটা কখনোই এ ব্যাপারটার দিকে নজর দেয়নি। মানে আমাদের যাত্রাশিল্প যেমন তার দর্শক খুঁজে নিয়েছিল এবং প্রফেশনাল হয়েছিল, আমরা সেটা করিনি। এখানে অনেকেই বলবেন যে, না থিয়েটারকে প্রফেশনালি নেয়া সম্ভব না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সম্ভব কি সম্ভব না, সেটা পরীক্ষাও করা হয়নি, দু-একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ছাড়া। ভারতের প্রবীর গুহের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তো তারাও প্রথমেই বাজার খুঁজেছে তা না। তাঁরা প্রথমে থিয়েটারটাকে কমিউনিকেটিভ করতে চেয়েছেন। রুট লেভেলে গিয়ে, প্রান্তিক মানুষদের সাথে কাজ করেছেন। জেলে, ফেরিওয়ালা– এসব লোকদের নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রামে গ্রামে থেকেছেন, থেকে নাটক করেছেন। এখন তাদের নাটক দেখার জন্য অনেক আগে থেকেই টিকেট কাটতে হয়। পিটার ব্রুক তাদের নাটক দেখার জন্য ১ মাস আগে টিকেট কাটেন, এরকম উদাহরণও আছে শুনেছি। তো আমরা কী নিয়ে করব, কেন করব, কীভাবে করব এর উত্তর বোধহয় এ কাজগুলোর দিকে নজর দিলেই পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ।

ফয়েজ জহির

[নাট্যজন– আরণ্যক নাট্যদল]

আজকের দেশের যে অবস্থা বা পৃথিবীব্যাপী যে অবস্থা, সেখানে বাজার কেবল অর্থনীতি না, রাজনীতিও বটে। আজকে প্রতিনিয়ত যে সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা, সেখানে কী নিয়ে নাটক করব এটা কি বলে দিতে হবে? আমার দাঁড়াবার জায়গা দেখলেই তো হয়, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশের পরিস্থিতি কী সেটা দেখার চোখ থাকলে কী নিয়ে নাটক করব সেটা আর খুঁজতে হয় না। আসলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা নিয়েই ভাবছি না। কেউ কেউ ফাঁকা বুলিও আওড়াচ্ছি,

কিন্তু আসল জায়গাটাতে যেতে চাই না। দাঁড়াবার সাহসও নেই। প্রথমেই হয়তো মনে হয় যে দাঁড়ালে তো রাষ্ট্রের বিপ্রতীপে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কী কী প্রতিরোধের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি, সেটাকেই বলা হচ্ছে 'বাজার'। 'বাজার' মানে আমার নাটক কত টাকায় বিক্রি হল সেটা না। একজন যাত্রাশিল্পের কথা বলেছেন। তারা তাদের বাজার খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র তাদেরকে কী করেছে? তাদের পথচলার জায়গাটাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। থিয়েটারের কী অবস্থা? আজকেও আমার সাথে মফস্বলের এক নাট্যজনের কথা হয়েছে। সেখানে নাটক করতে হলে প্রশাসন পাণ্ডুলিপি আগে জমা দিতে বলেছে। কেন? আমার তো অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন উঠে গেছে। তাহলে এখনো পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে কেন? এই কেন বা কাকে জমা দিতে হবে, সেগুলোই হল 'বাজার'। এই বাজারকে মাথায় রেখে আমরা সবসময় এগিয়েছি, এখনো এগুতে হবে। তারপর কথা আসবে কীভাবে করব। সেটা হল শিল্পের জায়গা। নাটক যেহেতু করছি, শিল্পমান নিয়েই দর্শকের কাছে আসতে হবে, নয়তো বক্তৃতা হয়ে যাবে বা পোস্টার থিয়েটার হয়ে যাবে। সুতরাং এই বাজারে মানে এই বন্ধ্যা সময়ে, এই বন্ধ্যা অস্থির সময়ে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক করব সেটা ভাবতে হবে। কাউকে দোষারোপ করে নয়, নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, কতটুকু করলাম বা কতটুকু করতে পারব। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ বারী
[নাট্যজন– থিয়েটার আর্ট ইউনিট]

কী নিয়ে নাটক হবে সেটা যদি বের করি, তাহলে পরের কথাই হল কেন এই নাটক। আমি একবার মামুন ভাইয়ের (মামুনুর রশীদ) সাথে কথা বলেছিলাম। উনি নাকি একটা হিসাব বের করেছিলেন যে, একটা নাটক নামাতে একটা দলের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই খরচটা প্রায় ৪০/৫০ জন কর্মীর প্রতিদিনের সময়ঘণ্টা যে ব্যয় হয়, যাতায়াত ভাড়া লাগে, সেটাকে যদি ৪/৫ মাসের হিসাব করি সব মিলিয়ে এই টাকাটা লাগে একটা নাটক তৈরি করতে। তারপর প্রতি শো'তে যদি ৫ হাজার টাকাও উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে এই ৫০ লক্ষ টাকা তুলতে কতগুলো শো করতে হবে এবং সেটা কত বছরে! কথাটা বললাম এই জন্য যে, আমরা একটা কথা প্রায় মেনেই নিয়েছি যে, থিয়েটার করা মানে এই সময়ে সবচেয়ে বিলাসী একটা কাজ করা। বিলাসিতা করার সময় যেমন টাকার হিসাব করলে হয় না, তেমনি থিয়েটার করার সময় টাকার হিসাব করা যাবে না। কমিটমেন্ট তো পরের কথা। এই বাজারে আপনি এই বিলাসিতা করার জন্য প্রস্তুত কিনা সেটা আগে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। কেন থিয়েটার করব? আমি তো জানি এই থিয়েটার আমাকে আর্থিকভাবে কিছু দেবে না। তারপরও যদি থিয়েটার করি তাহলে বুঝতে হবে জেনেশুনেই ঝাঁপ দিয়েছি, সুতরাং তখন কী নিয়ে এবং কীভাবে নাটক করব সেটা বেরিয়ে আসবে। ধন্যবাদ।

আছাদুল ইসলাম আসাদ
[নাট্যজন– সুবচন নাট্যসংসদ]

অনেক ধরে চেষ্টা করছি। এবার সুযোগ পেলাম। আমার দিকে সুদৃষ্টি দেয়ায় মিষ্টি ভালোবাসা গ্রহণ করুন। এই যে 'বাজার' বলা হচ্ছে, সেটা হল খোলা বাজার। খোলা বাজারের ধর্ম হচ্ছে, যে উপযুক্ত সে টিকে থাকবে। যদি তাই হয়, আমার বিবেচনায় আমাদের এই থিয়েটার টিকে থাকার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এই বাজারটাকে যদি অর্থনৈতিক বাজার হিসেবেও কেবল দেখি, সেই বাজারে টিকতে হলে বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন ছাড়া আপনি আপনার পণ্যকে ক্লায়েন্টের কাছে নিতে পারবেন না। আমাদের থিয়েটারকে কেউ বিজ্ঞাপন দেয় না। টোপ দিয়ে দিয়ে পেছনে ঘোরায় কিন্তু শেষমেশ বিজ্ঞাপন দেয় না। প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বহু জায়গায়, কিন্তু থিয়েটারকে বিজ্ঞাপন দেয় না। বিপরীতে আমরাও বিজ্ঞাপন দিই না। অর্থাৎ প্রচারের জন্য পত্রিকায় বা অন্যান্য মিডিয়াতে যেভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া দরকার আমাদের সাধ্যে তা কুলোয় না। যেহেতু সাধ্য নেই, তাই এটা টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না। আরেকটা জিনিসের প্রয়োজন, সেটা হল অবকাঠামো। আমাদের থিয়েটারের সেটাও নেই। উপর থেকে ঢাকা শহরের ছবি তুললে দেখা যাবে, কেবল অট্টালিকা আর অট্টালিকা। কিন্তু একটি অট্টালিকাও থিয়েটারের জন্য না, নাটকের জন্য না। স্বাধীনতার পর অনেকের অট্টালিকা হয়েছে, নাটকের মানুষদেরও হয়েছে, কিন্তু নাটকের হয়নি। আমাদের থিয়েটারের ঘরবাড়ি নেই, তাই (আমাদের) থিয়েটারের টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু আমরা যারা এখানে একত্রিত হয়েছি, তাদের জন্য ভরসার কথা হচ্ছে, থিয়েটারের নিজস্ব একটা শক্তি আছে। সেই শক্তি দিয়ে সে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এই হাজার বছরেও নানা রূপে নানাভাবে 'বাজার' ছিল। সেই বাজারকে ফেইস করেই সে যেহেতু টিকে এসেছে, এখনো সে টিকবে। থিয়েটার তার নিজের শক্তি দিয়েই টিকবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন
[নাট্যজন– প্রাচ্যনাট]

বিষয়টা হচ্ছে– এই বাজারে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক। এটাকে সবাই কেন এভাবে বিশ্লেষণ করছেন যে নাটককে বাজারি হতে বলা হচ্ছে? এই বাজারে, মানে এই সময়ে, এখন, এখন মানে প্রতিক্ষণ যে আমরা প্রতিকূল সময় পার করছি, সেই সময়ে আপনার নাটকটা কী নিয়ে হবে? সবাই হিসাব করছেন নাটকটা কত দামে বিক্রি করবেন। সেটাও হতে পারে, কিন্তু আজকের বিষয় সেটা না। বিষয়টাতে যেতে পারিনি বলে আসলে কিছু জানাই গেল না। আজকে আমরা একেকটা নাট্যদলের প্রতিনিধি এখানে আছি, আমরা ফিল করছি কিনা যে এই অস্থির সময়ে, কেবল দেশের বিবেচনায় না, বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই অস্থির সময়, সেই সময়ে নাটক কী নিয়ে দাঁড়াবে, কীভাবে দাঁড়াবে।

একটা কথা হচ্ছে, যে সময় আমরা পার করছি, সেই সময় কি এর আগে কখনো আমরা পাইনি? অবশ্যই পেয়েছি। আমরা সবসময়েই এই বাজারের প্রতিপক্ষ হয়েই নাটক করেছি। বাজারটা আমাদের সামনে একেক সময় একেকভাবে এসেছে। এখন জরুরি অবস্থা মানে এই না যে, আগে খুব ভালো অবস্থায় ছিলাম। কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে আপনাদেরকে ৩/৪ টা অডিটোরিয়াম বানিয়ে দিয়েছে? কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে আপনাকে প্রশাসনের মুখোমুখি করেনি। একেবারে মসৃণ সময় পার করে কবে আমরা থিয়েটার করেছি? কখনোই করিনি। এবং কখনোই ভাবিনি কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক করব। প্রতিকূল শক্তিকে চিহ্নিত না করেই, বা বুঝতে না পেরেই থিয়েটার করে গেছি। আরেকটা কথা সবসময় ওঠে, আজকেও উঠেছে– কমিটমেন্টের কথা। পত্রিকা খুললেই দেখি আজকাল যারা টেলিভিশন মিডিয়ায় কিছু একটা হয়ে গেছে, তারা সাক্ষাৎকার দিচ্ছে– 'আমার তো কমিটমেন্টের একটা জায়গা আছেই থিয়েটারে। এখন একটু ব্যস্ত আছি, তবে দেখি মনের টান যেহেতু থিয়েটারে, থিয়েটারে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব'। কিসের কমিটমেন্ট! কমিটমেন্টকে একটা হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গেছে সবাই। যে চলে গেছে, থিয়েটার কি তার জন্য হা করে বসে আছে নাকি? থিয়েটার করছি, করব এবং সারাদিন ধরে করব। আমি অন্য যেকোনো কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন, ভাবনা-চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে এই থিয়েটার নিয়ে। থিয়েটার করলে এভাবেই করতে হবে। তাদের এত স্পর্ধা হয় কী করে যে– সময় হলে আবার আসবে? সুতরাং এই আচরণ, এই স্পর্ধাগুলোও কিন্তু এই বাজার-এর মধ্যে পড়ে। যারা থিয়েটার করছি, তাদেরকে এধরনের স্পর্ধাকেও ফেইস করে থিয়েটার করতে হচ্ছে। সুতরাং আপনারা অনেকেই আজকের বিষয়টা বুঝতে পারেননি বলেই আমার মনে হয়েছে। কেন থিয়েটার করি আমরা? বড় বড় কথা যদি না বলি তাহলে বলতে হবে, প্রথমত আমার ভালো লাগে, সেজন্যই থিয়েটার করি। দেশের জন্য, সমাজের জন্য আমার আবেগ উথলে পড়ছে বলে থিয়েটার করছি তা না। সেসব আবেগ অনেক পরের কথা। প্রথম কথা হচ্ছে আমার নিজের কাছে থিয়েটার করতে ভালো লাগে, তাই থিয়েটার করি। ধন্যবাদ।

আজাদ
[নাট্যদর্শক]

এখানে 'বাজার' বলতে সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং আয়োজকরা যদি শিরোনামে 'এই বাজারে' না লিখে 'এই সময়ে' লিখতেন তাহলে আর এই সমস্যাটা থাকত না।

হাসান শাহরিয়ার

অনেকের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ তো তাদের বক্তব্যে দেখিয়েছেন যে, এই বাজার বলতে প্রকৃত অর্থে কী বোঝানো হচ্ছে। যাদের মধ্যে বোঝার ঘাটতি আছে, তারাও কিন্তু থিয়েটারই করেন, এবং থিয়েটার করতে গিয়ে যদি কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরতে ব্যর্থ হন, সেখানে আয়োজকদের দোষ দিলে হবে না। আরেকটা কথা হচ্ছে 'এই সময়ে' যদি ব্যবহার করতাম তাহলে অনেকে মনে করতে পারতেন যে, এই যে বর্তমানে বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা চলছে, সেটাকে বোঝাচ্ছি। তা কিন্তু না। আমাদের এই মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন সব মিলিয়ে হচ্ছে 'এই সময়'। এবং 'এই সময়' প্রকৃত অর্থেই 'এই বাজার' হিসেবে এসেছে এখানে। কামালউদ্দিন কবির প্রথমেই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করেছিল বলে আমার ধারণা। যাক, আমরা আবার কথায় ফিরে যাই।

খন্দকার এজাজ হোসেন
[নাট্যজন– গ্রন্থিক]

এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলাম তাতে মনে হল যে, অনেকেই বিষয়টা নিয়ে একটা অস্পষ্টতা নিয়ে আছি, যে কারণে বক্তব্যগুলো বিভিন্ন রকমের আসছে। 'বাজার' বলতে আমার কাছে মনে হয়েছে– একটা সময়, পরিবেশ বা অবস্থা। এখন কথা হচ্ছে এই সময়ে, এই কালে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কী নাটক করব বা করা উচিত। সেটা ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে বা অন্য কোনো বিষয় নিয়েও হতে পারে। বিষয় নির্বাচনের পর হল সেটা কীভাবে উপস্থাপন করব। কিন্তু মনে রাখা উচিত আমরা এ-সময়ে নাটক করছি, ফলে সময়টা যেন উঠে আসে। বারী ভাই একটা কথা বলেছিলেন– থিয়েটার করাটা বিলাসিতা। আমার কাছেও তাই মনে হয়। শিল্পচর্চা বোধহয় সবকালেই বিলাসিতার জায়গাতেই ছিল। সবাই এটা করতে পেরেছে তা না। উন্নত চিন্তার মানুষগুলোই তো এটার সাথে যুক্ত থাকে। আর যারা যারা যুক্ত থেকেছে, তাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে– অর্থনৈতিক ত্যাগ তো বটেই। তো আমার কথা হচ্ছে আগে উদ্দেশ্যটা ঠিক করব, কী নিয়ে নাটক করব, তারপর হল কীভাবে করব। যেভাবে করলে আমার উদ্দেশ্যটা বোঝাতে পারব, সেভাবেই করব। ধন্যবাদ।

আনোয়ারুল হক
[নাট্যজন– উদীচী]

বিষয়টার শিরোনাম নিয়ে বিভ্রাট কেন হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের এখানে যে ব্যানারটা আছে, তার নিচে কিছু পেপারকাটিং আছে। সেই পেপারকাটিং-ই তো বলে দিচ্ছে এই বাজারে মানে কী। আমার দেশে এই সময়ে যখন সারের দাবির জন্য ১৮ জন কৃষককে হত্যা করা হয়– সেই বিষয় নিয়ে আমরা নাট্যজনেরা কোনো নাটক করেছি বলে আমার জানা নাই। পেপারকাটিংগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবেন, লাক্স ফটোসুন্দরীদের ছবি দিয়ে লেখা আছে 'এদের ভাগ্য এখন আপনাদের হাতে' বা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ অধ্যাপক ফের ৪ দিনের রিমান্ডে'। সেলফোনের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে– 'রাঙিয়ে দিন আপনার জীবন'। মানে একটা মোবাইল ফোনের সিমকার্ড কিনলে আপনার জীবন রঙিন হয়ে যাবে। এই যে বিষয়গুলো বুর্জোয়া মিডিয়া এবং বাজার তৈরি করে রেখেছে, তার কবলে থেকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কী নিয়ে নাটক করবেন, কীভাবে করবেন। অর্থাৎ যে পত্রিকার পাতায় সারের জন্য কৃষকের হাত বাড়িয়ে দেয়ার করুণ আকুতির ছবি আছে, ঠিক সেই পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন যাচ্ছে ডিজুস ফোন মানে স্বপ্নকে ছোঁয়া। আপনার অবস্থানটা তাহলে কী হবে? 'এই বাজার' মানে তো 'এই রাজনীতি'। যে রাজনীতির কবলে পড়ে প্রতিবাদ হারিয়ে গেছে। ভালো-মন্দের ভেদাভেদ হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের বোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। সেই বাজারে কি একটা দমফাটানো হাসির নাটক করে ঢেকুর তুলব নাকি সারের দাবিতে খুন হওয়া মানুষদের প্রতিবাদকে তুলে ধরব? বাজার মানে তো এই সময়। এই সময়ে আমরা যারা মঞ্চে কাজ করি, পত্রিকাগুলো তাদের কোনো বক্তব্য দেয় না বা মতামত ছাপে না। কার ছাপে? যে কিনা মঞ্চে আসে না গত ৫ বছর। কী ছাপে? তার মতামত ছাপে, মঞ্চের প্রতি তার কমিটমেন্ট ছাপে– একটু আগে ইমন ভাই বেশ চমৎকারভাবে এটা বলেছে। তো এটাই তো বাজার। বাজার বলে দিচ্ছে কে কমিটেড, কে ফালতু। আপনি যতই কমিটেড হন-না কেন, বাজারের স্বীকৃতি না পেলে আপনি শূন্য। আমার কাছে অবাক লাগছিল যে, আলোচনাটা ভিন্ন দিকে গেছে। মূলের দিকে থাকলে আরও কিছু শুনতে পেতাম। ধন্যবাদ।

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। আসলে এই বৈঠকের শিরোনামটা– এই বাজারে কী নিয়ে কেন কীভাবে নাটক– এটা বুঝতে না পারাটার 'কৃতিত্ব'ও 'বাজারের'। বাজার আমাদের মস্তিষ্ককেও নিজের মতো করে চালনা করে। কারণ, আমাদের মস্তিষ্ক আসলে এখন আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, 'বাজারের' নিয়ন্ত্রণে আছে। যাক, আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। সময় শেষ। সংক্ষিপ্তভাবে বলার জন্য রতন সিদ্দিকীকে অনুরোধ করছি।

রতন সিদ্দিকী
[নাট্যজন– উদীচী]

আমি অন্য বিতর্কে যাব না, সময় নেই। বাজার মানে যদি অর্থনীতি হয়, বাজার মানে যদি মার্কেট হয়, বাজার মানে যদি সময় হয়, তাহলে এই ৩ টি মানেই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। বাজার না জানলে শিল্পসৃষ্টি, বিপণন কোনোটাই হয় না। বাজার সবাই বুঝেছেন, সব কালের শিল্পীরাই বুঝেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি যখন 'বর্ণ বোধোদয়' বইটি প্রকাশ করেছেন, তখন এটার কাটতি দেখে তিনি বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখে বলেছেন– বই নেই, বই নেই। পরে ১ টাকা বাড়িয়ে বিক্রি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বাজার বুঝতেন। শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ হবেই। এখন সেই পুঁজির সাথে রুচির সম্পর্ক কে কতটা ঘটাচ্ছে সেটাই হল আসল ব্যাপার। আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, পুঁজির যোগান কিন্তু দিয়েছে বুর্জোয়ারা। কিন্তু সেই পুঁজি দিয়ে তিনি কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন? যে চলচ্চিত্র নতুন সমাজ নির্মাণে সাহায্য করে। এই বাজারকে কেউ ইতিবাচকভাবে নিতে পারে, কেউ নেতিবাচকভাবে নিতে পারে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, দেখব, রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটক করছেন আবার মনমোহন বসুও নাটক করছেন। একদল নাটক করছেন শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আরেক দল করছেন অর্থের প্রতি অনুরক্ত হয়ে– অসুস্থ রুচি নিয়ে। সুতরাং বাজার হচ্ছে এ-ই। তাকে ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে কে কী করছে। এখন দিন বদলে গেছে। এখনকার বাজারে কী নাটক হবে তা আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে। আগে ৬ নম্বর বাসে লেখা থাকত '৫/১০ টাকার ভাংতি নাই' আর এখন লেখা থাকে '১০০/৫০০ টাকার ভাংতি নাই'। বাজার চেঞ্জ হয়েছে। আপনাকেও চেঞ্জ হতে হবে। সুতরাং সময়ই নির্ধারণ করে দেবে আপনি কী করবেন বা আপনার কী করা উচিত। গোপাল হালদার খুব ভালো একটি কথা বলেছেন, কথাটা এরকম যে– 'সময় এবং সময়কে ধারণ করেই সংস্কৃতি তার আপন গতিতে এগিয়ে যায়'। সবাইকে ধন্যবাদ।

কামালউদ্দিন কবির

আসলে বুঝতে পারছি যে, 'সময় নেই কথাটা বলারও সময় নেই'। তবুও বলি, মানে, বাজারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, একেক জন যেভাবে ভিন্ন দিকে দৌড়াদৌড়ি করলেন, তা আসলে কাম্য ছিল না। আমি শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার লাইন বলছি, কবিতার নাম 'বোধ'– 'যে লেখে সে বোঝে না/যে বোঝে সে লেখে না/কখনও কখনও এই দুজনের দেখা হয় কিনারে/ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা/অর্থহীনতার পরপারে'। আজকে আমাদের আলোচনায় এটাও পরিষ্কার হয়েছে যে, আমাদের চিন্তা চেতনায় 'বাজার' কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে আছে। আজকের কথাগুলো অনুলিখন করে ছাপা হবে নিশ্চয়ই, মানে আমি *থিয়েটারওয়ালা* সম্পাদককে অনুরোধ করব যেন ছাপা হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে,

আমাদের বোঝার মধ্যেও কীভাবে 'বাজার' ঢুকে গেছে। আমি আর সময় নেব না। ধন্যবাদ।

মানস চৌধুরী
[শিক্ষক, লেখক]

আজকে এখানে আমার আসলে কিছু বলার কথা না। নাটকের উপর বলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, তাদের জন্যই এখানে আসা। একটা কথা বলতে হয় যে, আমার আর্ট-কালচারের চেয়ে বেশি উৎসাহ এর তৎপরতা নিয়ে। অর্থাৎ যা সৃষ্টি করলেন তা কতটুকু মানসম্মত বা শিল্পসম্মত, তার চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান হল এগুলো নির্মাণের তৎপরতা। আমার আগ্রহ হচ্ছে তৎপরতাগুলো কী কী অর্থ বহন করে, একটা বিশেষ সময়ে। সেক্ষেত্রে আজকের বিষয় হিসেবে 'বাজার'কে আনাটা আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে। সম্পর্কের যে পরিপূর্ণ মুদ্রাকরণ, সেটা তো আমি চোখ বুজে থাকলেই বদলে যাচ্ছে না। তো যদি সময়টা বদলে যেতে থাকে এবং নিরন্তর বদলমান হয়, তাহলে যারা কিনা 'তৎপর' সেটা সংস্কৃতিকর্মীই হন আর মৎস্যজীবীই হন, তাহলে এই বদলমান সম্পর্করাজির ভেতরে প্রতিক্রিয়াগুলো কী হবে। এখন যারা নাটক করেন, তারা সবচেয়ে ভালো জানেন কেন নাটক করেন। এবং তাদের মধ্যকার ভিন্নতাগুলোও তারা ভালো জানেন, তাদের মকসদ কী এবং তরিকাগুলো কীভাবে তারা নির্ধারণ করেন। যদি এই হয় যে, মকসদের দিক থেকে নাট্যকর্মীরা কেউ কেউ পাশাপাশি দাঁড়াতে পারেন, তাহলে একটা বড়সড় কাউন্টারএ্যাক্টিভ জায়গা তৈরি হওয়া সম্ভব। আমার সন্দেহ নাই, এখানে অনেক মিত্রদের আমি দেখছি, আমি জানি তারা এই কাজটা করে যাবেনই। আর বাজারটা আসলে সংকট না, এটা তো অব্ভিয়াস। বরং একত্রে নিজেরা যদি মকসদ ঠিক করে কোনো তরিকা বের করেন, তাহলেই কাজ এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ।

হাসান শাহরিয়ার

ধন্যবাদ। আজকের বৈঠক শেষ করতে হচ্ছে। *থিয়েটারওয়ালা* আয়োজিত রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলার অংশ হিসেবে এই বৈঠকে যারা আসলেন, কথা বললেন, কথা শুনলেন, তাদের সবাইকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমাদের শেষ বক্তা হিসেবে কথা বলবেন আজাদ আবুল কালাম, এবং সেই সাথে শেষ হবে আজকের বৈঠক। সবাই ভালো থাকবেন।

আজাদ আবুল কালাম
[নাট্যজন– প্রাচ্যনাট]

আমাদের আলোচনায় অন্তত এটুকু মনে হয়েছে যে, আমরা আসলে অনেক কথা বলতে চাই। সেটা হয়তো প্রাসঙ্গিক হচ্ছে না বা কেউ কেউ ভালো বলেছেনও, কিন্তু বলার আগ্রহটা সবার ভেতরেই আছে। কিন্তু হাতে সময় নেই, এটা একটা সমস্যা। ভবিষ্যতে যেন চেষ্টা করা হয় সময় বেশি নিয়ে শুরু করা। এখানে চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তি আলোচনা করেছেন, শিক্ষক করেছেন, সমাজকর্মী করেছেন, ঢাকার বাইরে থেকে আসা নাট্যজন আলোচনা করেছেন। এই যে অংশ নেয়া এটা প্রমাণ করে যে, আমরা একধরনের মত-বিনিময় করতে চাই। এই মত-বিনিময় কিন্তু থমকে আছে, এই সময়ে। আমাদের বৈঠক সুযোগ করে দিয়েছে সেই থমকে যাওয়া পরিস্থিতি ভেঙে জীবন্ত পরিবেশ তৈরি করতে। সুতরাং আমি বলব যে, আলোচনা যতই বিক্ষিপ্ত হউক-না কেন, যতই বলা হোক যে কিছুটা বিষয়ের বাইরে গিয়ে কথা হয়েছে– আমার কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই যে সবাই বলতে পারছি, সেই বলার পরিবেশ যে আজকের বৈঠক তৈরি করতে পারল সেটা। এখানে শব্দাবলীর এক বন্ধু বলেছেন যে, পিটার ব্রুক ১ মাস আগে টিকেট কেটে প্রবীর গুহের নাটক দেখেন। তো আমাদের যদি হাতে সময় থাকত তাহলে হয়তো আরেক বন্ধু আবার ব্যাখ্যা দিতে পারতেন যে, পিটার ব্রুক কোলকাতায় প্রবীর গুহের নাটক দেখতে আসে কিন্তু ঢাকায় প্রাচ্যনাটের নাটক হয়তো তাঁকে দাওয়াত দিয়েও দেখানো যাবে না। অর্থাৎ কথার পিঠে কথা আমরা বলতে পারতাম সময় থাকলে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কথার পিঠে কথা হয়তো বলা যায়নি, কিন্তু কথা শুরু তো হয়েছে– সেটা বেশ ইতিবাচক জায়গা। এই বাজারে বলতে যে 'সময়'টাকে বোঝানো হয়েছে, সেই বাজার বা সময় হচ্ছে একটা আততায়ীর নাম। যে আপনাকে খুন করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। সুতরাং এই আততায়ী আমার আপনার শত্রু, কিন্তু তার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারব না। তাই এখন আমাদের কাজ এই আততায়ীর বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্তব্য স্থির করা। এই কর্তব্য স্থির করার জন্য কী ধরনের নাটক করব-র চেয়ে এভাবে মুখোমুখি বসাটা হচ্ছে বেশি জরুরি। এখানে পেশাদারি থিয়েটারের কথা বলা হয়েছে। পেশাদারি থিয়েটারটা কী? থিয়েটার করে টাকা পেলেই কি পেশাদারি থিয়েটার হয়ে যাবে? টেলিভিশনে নাটক করে তো প্রচুর টাকা উপার্জন করছে অনেকে, তাই বলে কি সে পেশাদার অভিনেতা? না-ও হতে পারে। আবার পেশাদারি মনোভাব নিয়েও অনেক ক্ষতি করা সম্ভব। যারা ভেজাল পণ্য তৈরি করে, বাজারজাত করে, তারা কিন্তু পেশাদারি মনোভাব নিয়েই তা করে, কিন্তু সেটা সবার জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। কেউ কেউ নাটকের বিষয় কী হবে সেটা নিয়ে কথা বলেছেন। নাটকের বিষয় তো এমন হবে না যে, আমরা বসে ঠিক করে দেব যে এই বিষয়ে নাটক হবে। নাটকের বিষয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আপনার-আমার চারপাশে। যার চোখ আছে সে দেখছে, যার চোখ নেই

সে দেখতে পাচ্ছে না। তো সব শেষে আমি আন্তরিকভাবে বলতে চাই, এই থমকে যাওয়া সময়ে সোলায়মান মেলা হয়েছে, সবার ভেতরে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে এবং সেই মেলার অংশ হিসেবে এভাবে বৈঠক করে বুকের ভেতরে চাপা-পড়া কথাগুলো আমরা বলতে পেরেছি, সেটাই আমাদের সাফল্য। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের বৈঠক শেষ করছি।

উৎস: **হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত 'থিয়েটারওয়ালা' পত্রিকা। সংখ্যা:.....]**

সেলিম আল দীন চরিতমানস

ব দ রু জ্জা মা ন আ ল ম গী র

বহুবার নদীর কথা, শাখানদীর প্রসঙ্গও সেলিম আল দীনের লেখায়, কাজে ও কথায় ঘুরেফিরে আসে। যে-নদীর পক্ষে তিনি বলুন: তা কিত্তনখোলা হোক, কি যমুনার উদ্দামতায় উদ্বেগ, অথবা শ্রবণমুখর জলসুখা নদীর ওপর পিঠাপিঠি জল; তখন আসলে গাঙ্গের কল্যাণে আমরা পাই গভীর দীঘল একটি জীবনের চিত্রকল্প। আমাদের অরূপ মানসে নদী বা রাত্রিকালীন জ্যোৎস্নার সোনাটায় একটি নদীর বদলে বিপুল দিগন্তে আবির্ভূত হন সেলিম আল দীন নিজে। সোমেশ্বরী নদীর ঠিক কোনো অংশে যেমন আঙুল ঠেকিয়ে দেখানো যায় না খাপেখাপ এই জায়গাটির নাম সোমেশ্বরী, কিংবা ধরা যাক, এই ঘূর্ণিটির নাম কর্ণফুলী– সেলিম আল দীনও সেই রকম; আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না– এই বিন্দুটির নাম সেলিম আল দীন– এইখানে সবটুকু বৈশম্পায়ন ঘনীভূত, সেলিম আল দীন একটি বহমানতার নাম।

তিনি পূর্ববাংলার প্রতিটি ধুলার রঙ ও গন্ধ শোঁকার নিমিত্ত ব্যাকুল, কোন নদীর রাগ ও অভিমান কী, শীত দোরগোড়ায় আসি-আসি প্রায়, সাইবেরিয়ার অতিথি পাখিমণ্ডলীর জন্য তাঁর মন কেমন করে, পিঁপড়ারা কীভাবে পরিবার বাঁধে, শতমূলী গাছের ভেষজগুণ তাঁরই জানা সবচেয়ে বেশি, প্রজাপতির পাখায় পাখায় কত কিসিম

রঙের বাহার, এ-তো বৈশাখের কুড়ি তারিখ– উত্তরমুখী বাতাসের দমকা পাঠ করে বলে দেন কত বড় ঝড় আসবে কাল। তিনি প্রকৃতিখোর এক বিস্ময় বালকের ঔৎসুক্যে নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁকে তুল্য করা চলে উয়েরাহিউলুর কাঁধে স্থাপিত বর্ণবতী কাকাতুয়ার সঙ্গে যে নিসর্গের প্রতিটি বাঁকের মর্ম বোঝে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সেলিম আল দীনে পাই অভিমানী, ভালোবাসাসংকুল, ডুমুরপাতার নিয়মে ভঙ্গুর ও স্পর্শকাতর, নৈঃশব্দ্যে দেদীপ্যমান শতমুখী পেশার গ্রামীণ মানুষ, তিনটি ধূলিকণা কাঁপিয়ে সংবেদনশীল দুটি প্রথম পাতার কৌমার্য নিয়ে তাঁর চরিত্ররা জাগে– সেলিম আল দীন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর জীবনানন্দ দাশের এক অনির্বচনীয় যোগফল।

তাঁর অন্বেষণের কিনারা দেখি না: বরগুনার রাখাইন, পাহাড়ি মারমা, সখীপুরের মান্দাই, সুসংদুর্গাপুরের মুনীন্দ্র মারাককে ভুলে যায় কার সাধ্য? উপকূলীয় উপদ্রবসংকুল আনার ভাণ্ডারী কি দিয়ে যায় না জীবনে অপরাজয়ের অনির্বাণ সূত্র, টর্নেডোয় লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া হরগজ– খেজুরকাঁটায় বিদ্ধ তন্তুবায় রুমুনি, চুক্কুনি ঘুরেফিরে আসে। কালিন্দীর পাশ ঘেঁষে একবার দাঁড়াতে কার-না ইচ্ছা করে? সোনাই-এর জন্য নির্ঘুম জাগি, কেরামত প্রহরে প্রহরে দাঁড়ায় প্রতিটি বাঙালির পাশে, স্বর্গ থেকে নেমে আসা মনুরি, কেরামতমঙ্গল-এ সপ্ত নরকের ভয়াল বর্ণনা, শকুন্তলার ভাগ্য, লাশের প্রতিটি কণার প্রতি বেদনা ও সম্মান, শুকুর চানের ঘোর, সয়ফরের ক্রোধ ও ব্যাপ্তি, সুকি আর অনিলের প্রাকৃত মহাকাব্যিক প্রশ্রয়, দুই পাহাড় ধ্বংস হয়ে তার মাঝখানে আটকেপড়া মানুষ, শরীর-বেচা মঙ্গলি, ট্যাঁটায় বিদ্ধ সাঁঝমালা, জনম মাঝির চিরতরে হারিয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড সংক্ষোভে ঘুরে দাঁড়ানো যমুনাবতী আবছা, মানুষের চেয়ে অধিক দ্বন্দ্ব আর মানবিক বোঝাপড়া নিয়ে একটি প্রাণী ষণ্ড মহিষ সোহরাব-এর কোনো সাহিত্যেই দ্বিতীয়বার দেখা মেলা ভার, অসহায় ঢেউ এসে নদীকূলে আছড়ে পড়া-মাত্রই আমাদেরকে কি দখল করে নেয় না ডালিমন আর বনশ্রী? কী নেই তাঁর কাজে– এমন কোনো মানবিক দিক বা বিষয় প্রায় বলা-ই অসম্ভব যা সেলিম আল দীন স্পর্শ করেননি।

মোটা বাংলায় যাকে বলে কর্মবীর, তিনি আসলে তাই। তিনি প্রকৃতি ও মানুষের প্রতিটি অতল ভূমিময়তা খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী; স্বর্ণকারের নিষ্ঠা ও মেধার বিন্যাসে নির্মাণ করেন একেকটি জেওর, পরিপূর্ণ নাটকের স্থাপত্য। তাঁর তৃষ্ণা সর্বব্যাপী– বাংলা ভাষায় অধিকতর গতিশীলতা আনার মানসে ভাবেন নতুন বানানরীতি, অপ্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন কীভাবে আটকে দেয় প্রাণের ফল্গুধারা তা ভেবে চিকিৎসার উদ্যোগ নেন। ব্যবহার করেন নিজস্ব বানান ও যতিচিহ্নরীতি– ভাষায় নতুন বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলা আমদানির বিপদ তাঁকে দমাতে পারেনি। রচনা করেন নাটকের অভিধান, তাঁর অনুবাদে পাই নন্দীকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসকে পাঠ করি তাঁর ভাষান্তররূপে।

সবকিছুর পরও একটি সংশয় জাগে: নাটকের নতুন কাঠামো ও দর্শন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব, পুঁথিসাহিত্য থেকে তুলে আনা তারকাচিহ্নের ব্যবহার, থিয়েটারে উড়ুনির প্রথম প্রয়োগ, বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি এ-সব কিছুই কি তাঁর নিজেকে স্বয়ম্ভূ স্বকীয় একটি জায়গায় চিহ্নিত করার নিঃসঙ্গ অভিপ্রায়, নাকি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকা ব্যাপক জনপদের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকে?

বাংলা ভাষায় অধিকতর চলিষ্ণুতা বিধানের প্রচেষ্টা সবার মনোযোগ কেড়ে নেয় সত্য, কিন্তু এ-ভাষার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা যে ক্রিয়াপদ– তার শৈথিল্য ঘুচিয়ে দেবার প্রত্যয়ে তাঁর অভিনিবেশ প্রযুক্ত হতে দেখি না। মৌলে তিনি কবি– তার স্বাক্ষর জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন থেকে ধাবমান পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভা শিল্পযাত্রার প্রতি বাঁকে প্রোথিত। গীতলতা বাংলা কাব্যের এক স্বতঃসিদ্ধ অভিপ্রায়– এক অনাকাঙ্ক্ষিত মূলধন; কবিগণ তা অর্জন করেছেন বিপুল, কিন্তু অভিনন্দন পেয়েছেন যৌক্তিকভাবে সামান্য। বাংলা আধুনিক কবিতা যে নিজের পায়ে আপন ব্যক্তিত্বে অনেকাংশে উঠে দাঁড়িয়েছে তা কবিতা থেকে গীতলতানির্ভর পদ্যধর্মিতা পরিহার করে বাইরে আসার ফল। তিরিশের কবিতা প্রধানত উপনিবেশী দার্শনিক কাঠামোর অধীনে ম্রিয়মাণ; কিন্তু তিরিশি কবিতাই এমন একটি কাব্যকাঠামো বিনির্মাণ করে যার ফলে কবিতা গান এবং গীতলতার বাইরে স্বয়ম্ভূ হবার যাত্রা শুরু করে। আজো দেখি কেউ কেউ সেই বিশাল কর্মযজ্ঞে, যেমন– অরুণ মিত্র, রফিক আজাদ, কিংবা মোহাম্মদ রফিক বাংলা কবিতাকে গীতলতার বাইরে এনে একটি সার্বভৌম শিরদাঁড়া প্রযুক্ত করার চেষ্টা করে যান। অভিযাত্রার এই লগ্নে পুনর্বার সেলিম আল দীনের অতিগীতলতা কীভাবে গৃহীত হতে পারে? দ্বৈতাদ্বৈতবাদী লেখার দাবির মুখে তিনি আসলে নিজেকে একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেন। এ-কথা সত্য তাঁর লেখা দেখতে গায়েগতরে কবিতা বা নাটকের মতো লাগে না; দৃষ্টিসীমায় তারা বাঁধা পড়ে গল্প বা উপন্যাসের আদলে। বহুকিছুই দেখতে একাকৃতির মনে হতে পারে। গাবগাছ দেখে অশোকতরু বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে গাবগাছ অশোকতরু নয়। বৃক্ষ তোর নাম কী– যেমন ফলে পরিচয়, তেমনই শিল্পবিচারেও কী আকারে আদল তার থেকে মৌলিক ভিতরকার সারমর্মের স্বরূপ। সেলিম আল দীন বারবার দাবি করেন তাঁর লেখা নাটক নয়, বরং কবিতা, নাটক, মহাকাব্যিক আখ্যান, প্রায়শ প্রাবন্ধিক ব্যাখ্যা, গল্প, উপন্যাস সবকিছুর মহামিলনে মহাকাব্য-প্রয়াসী সার্বভৌম এক অবিসংবাদিত শিল্পখণ্ড। এই দাবি পুরনো আঙ্গিকবাদিতারই এক নতুনতর নাম। মহাকাব্যিক কথাটির আশেপাশে দাঁড়াতে-বসতে পারলে, বোঝা যায়, তাঁর আনন্দ। মহাকাব্য সাধারণভাবে দৈর্ঘ্য, ব্যাপ্তি এবং গভীরতার একান্নে মিল; ব্যাপ্তি এবং গভীরতাই মৌল দুই বাহু।

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ পাঁচ লাইনের কিছু কথা, কিন্তু এই পাঁচ লাইন কি আবুল কাশেম ফেরদৌসী রচিত শাহনামা-র ব্যাপ্তি ধরেনি? আযর নাফিসি শাহনামা সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, শাহনামা পারস্য সভ্যতার তেরশ বছরের

ঐতিহাসিক চিহ্ন নিয়ে এক পারিবারিক উপাখ্যান। ইরানিরা যতবার গৃহহারা হয় ততবার শাহনামা-র ভিতর ফিরে আসে; ঘোর দুর্দিনে তারা পরিবার কি পরিবার গোল হয়ে বসে শাহনামা পাঠ করে, অন্য সব সুফি কবিদের হীরকখণ্ডের জ্যোতি নেয়; শাহনামা আর গ্রন্থমাত্র থাকে না, চরিত্ররা সব বের হয়ে এসে তাদের অন্তর্লোকে আসন পাতে; ফলে তাদেরই কেউ কেউ বনে যায় রুস্তম, কেউ-বা তাহমিনা, অন্য একজন রূপান্তরিত হয় মেয়াবাশ, ইসফান্দিয়ার বা কাভুস-এ।

মহত্ত্বের দিক থেকে হয়তো দান্তে অ্যালিগিয়েরির ডিভাইন কমেডি ফেরদৌসীকৃত শাহনামা-র সমকক্ষ নয়, কিন্তু ব্যক্তির জাগরণে এক বিপুল সামষ্টিক আয়োজন ডিভাইন কমেডি। গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে লিপ্ত দান্তে সপ্ত দোজখের ভয়াল বর্ণনার ভিতর দিয়ে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিজয়সহ কীভাবে দুনিয়াকে পরিশুদ্ধ করা যায় তার কথাই বলেন। সপ্ত দোজখ আসলে দূরাভিগম্য কোনো পথযাত্রা নয়, বস্তুত সাত নরক মানুষেরই ভিতরমহলে প্রকীর্ণ সপ্ত রিপু ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, অহংকার, অসাড়তা, বিষয়লিপ্সা ও আতিশয্যবিলাস-এর নানা বিন্যাস। যদিও দান্তে এগিয়েছেন কর্তৃত্ববাদীর একরোখামি নিয়ে– এমনকি ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদকেও দোযখে নিক্ষেপ করতে পিছপা হননি; সক্রেটিস, এরিস্টটল কপালগুণে বেঁচে যান, কারণ তাঁরা জন্মেছিলেন যিশু-খ্রিস্টের আগে। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস মূল মন্ত্র হলেও তাঁর অভীষ্ট ব্যক্তিমানুষের ভিতর দিয়ে এক সামষ্টিক নৈতিক গন্তব্যের দিকে যাওয়া।

বাঙালির ঘরে আযর নাফিসির কেন্দ্রীয় পাঠে কোনো শাহনামা নেই যার সামনে ঘোরতর কালরাত্রি কালে গোল হয়ে বসতে পারি। কিন্তু আমরা যদি সামষ্টিক আত্ম-আবিষ্কারের কর্মযজ্ঞ ধরে আগাই তাহলে কাঠামো-শৃঙ্খলার বাইরে মহাকাব্যের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারি। বদরুদ্দীন উমর সংকলিত পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি কয়েক খণ্ডে ধারণকৃত এক মহাকাব্য– যার নায়ক পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষ। কিন্তু বাংলায় প্রকৃত মহাকাব্যের কথা যদি বলি তাহলে দেখি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মহাকাব্যের আয়োজন ও নিষ্ঠা নিয়ে শুরু করেন কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকালের মুখে উপন্যাসে এসে স্থির হয়। চোখ তুলে নেওয়া কেরামত চলে কোনো এক অন্ধ চক্রবর্তীর কুটিরে। ফলে যা কিছুই তিনি লেখেন মূলে তার নাম রাখেন উপাখ্যান। উপাখ্যানে চরিত্র থাকে, কিন্তু ব্যক্তি লাপাত্তা, গল্প নেই, বদলে পাই কিস্‌সা। পালাকারদের ভাগ্য খোলাশা ও নির্বিঘ্ন, কেননা তাঁরা কাব্য উপস্থাপন করেন প্রচলনের পক্ষে, সেলিম আল দীন কাঁধে তুলে নেন পিতৃঋণ ও সম্মুখগামিতার দায়। তিনি মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য নামে যে অমৃত অভিসন্দর্ভ রচনা করেন তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো কাজ বাংলায় নেই। এই অমূল্য গবেষণায় সেলিম আল দীন ১০টি অধ্যায়ে ভাগ করে মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতির পূর্বপটভূমি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি, পাঁচালি– পাঁচালির উদ্ভব ও আঙ্গিকগত

বৈশিষ্ট্য বিচার, ভাবগত পুরাণের অনুসৃতিমূলক গেয়কাব্য, চৈতন্য-চরিতাখ্যান কাব্যের পরিবেশনারীতি, প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য, প্রণয়মূলক পাঁচালি ও নাটগীত, পীর পাঁচালি, মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতির আলোকে পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং মধ্যযুগে বাংলা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার নাটক ও নাট্যরীতি নিয়ে সবিস্তার অনুসন্ধানের কৃত্যে যুক্ত থাকেন বহুদিন। এ আমাদের সম্মিলিত দুর্ভাগ্য– যে কাজ পেশাগত গবেষকদের করবার কথা থাকে, তা সম্পন্ন করতে স্বভাবের বাইরে গিয়ে একজন সৃষ্টিশীল লেখককে দায়িত্ব নিতে হয়। এ-কাজ করতে গিয়ে সেলিম আল দীন এক মহীয়ান ক্ষতির ভিতর দিয়ে যান। তাঁর মৌলিক লেখা আটকে যায় এক ঘেরাটোপের আঙ্গিনায়। ফলে, সব তিনপথের মাথায়-ই যেমন একটি ভূত থাকে, সেলিম আল দীনের লেখা মাত্র-ই হেঁকে বসে মধ্যযুগ। তাঁর শেষ লেখা পুত্র কি ধাবমান পর্যন্ত এ-অভিনিবেশ পূর্ণ দাপটে ক্রিয়াশীল।

আনুগত্য কোনো মৌলিক লেখকের গন্তব্য হতে পারে না, বরং শিল্পযাত্রায় সৃষ্টিশীল বেয়াদবিই কাম্য। সম্মাননা যদি অতিউচ্ছ্বাসে ভক্তির রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে নিষ্ফলা কাল হয়। প্রত্যেক কেজো লেখক মন্ত্রবীজ গ্রহণ করতে পারেন নানা উপায়ে, বিভিন্ন যোগসূত্র থেকে, কিন্তু তিনি তার উপর কর্তৃত্ব করবেন যিশুখ্রিস্টের মাহাত্ম্য আর শয়তানের দমনাধিক বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসায়। হোর্হে লুই বোর্হেসের অসামান্য কল্পনাপ্রতিভার কথা কে না জানে। তার মূলে দেখি প্রাচ্যদেশীয় ভাবসম্পদ সুফিবাদের প্রভাব। গিওবানা গ্যারায়েলডি হোর্হে লুই বোর্হেস: সোর্সেস অ্যান্ড এল্যুমিনেশন বই-এ ব্যাখ্যা করেন বোর্হেস-এর চিন্তাকাঠামোর সূত্র ও বিন্যাস। সুফিতাত্ত্বিক ইদ্রিস শাহ-র বয়াতে গ্যারায়েলডি বোর্হেস-এর লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে বস্তুর জড়তার ভিতর অদেখা রঙ ও দৃশ্যময়তার গহীনে অদৃশ্যের বহুধা বিস্তারের সঙ্গে সুফিতাত্ত্বিক জ্ঞানতত্ত্বের অমোঘ যোগাযোগ আলোচনা করে দেখান। সালমান রুশদিও তাই। প্রাচ্যদেশীয় মিথ, লোকাচার, লোকজীবনে ঐতিহাসিক কালপরম্পরা নিয়ে নানা কালজয়ী মাত্রার উপন্যাস ও চালচিত্র রচনা করেন। লোকজীবনে ঋষিবাক্যের স্তব্ধতা ভেঙে তাঁরা যুক্ত করেন সমসাময়িকতার গোনাগুনতি ও সৃষ্টিশীল গতির সংশয়।

দুঃখজনকভাবে পাই– মধ্যযুগীয় কবিদের দাপট ও লোকজীবনে বহমানকৃত্যের শক্তি সেলিম আল দীনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অধিকারের বদলে তিনি অধীনস্থ হয়ে পড়েন। বিচারের কষ্টিপাথর বয়ে যায় মধ্যযুগীয় কবিদের হাতে, তিনি যা-কিছুই লেখেন সবই আসে তাঁদের ছাড়পত্র নিয়ে। ফলে সমকালীন জীবনে যে নানামুখী সম্পর্ক, টানাপোড়েন, বিস্তার ও ব্যাপ্তি তার সবটুকুর ওপর তিনি অধিকার ও বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। সৃষ্টিতত্ত্বের এক অদৃশ্য ময়ূর আমাদের চৈতন্যের গহীন অন্তর্লোকে নিত্য শিস দেয়– খালি চোখে দেখা যায় না– বোর্হেস তা বোঝেন; কিন্তু সেলিম আল দীন সবকিছু তাঁর পাঠক-দর্শককে ইস্কুলের শিক্ষার্থী ভেবে মোটা দাগ দিয়ে দিয়ে বোঝান– দ্যাখো, এ-হচ্ছে প্রকৃত বাংলা নাটক, তার নাম দিতে হবে

পাঁচালির ঢং, এ-যে দেখছো তা' উপাখ্যানরীতির নাটক, কৃত্য নাটকের সঙ্গে তার তফাৎটা গুলিয়ে ফেল না আবার, খেয়াল করে দেখো ধ্রুপদী বাস্তববাদ, তার নাম দিই কথানাট্য, আরেকটু ভিতরে চলো গৃহাঙ্গন থিয়েটার দেখতে পাবে, হাতে সময় নিয়ে বসো বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, অভিনয়রীতি, নাট্য-আঙ্গিক, জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক সর্বোপরি দেশজ নাট্যরীতির ব্যাপারগুলো বোঝাতে চাই!

তাঁর প্রায় সব নাটকেই পাত্র-পাত্রীদের দেখা হয় যাত্রাপালার রাতে, তারা গান করতে জানে– বয়াতি না হয় দোহার, পৌষমেলা ছাড়া কলহাস্য করার আর জায়গা নেই, মনসার মন্দির পাশকাটানো তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, আদমসুরত পথ দেখায় নীল আসমানের কম্পাসে, একপর্যায়ে ভ্রূণহত্যার মর্মান্তিকতায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন থেকে ধাবমান অবধি একটা গ্রাফ টানলে দেখতে পাই সেলিম আল দীন তেমন বাঁকবদল করেননি।

যে প্রতীক সাংকেতিকতায় তার শুরু তা' কালপরম্পরায় চিত্রকল্পের শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। নাটকমাত্রই যে খাড়া খাড়া দ্বন্দ্বে মুখোমুখি চারিত্রিক সংঘর্ষে টানটান সেলিম আল দীনে সেরকম কখনো হয়নি। তাঁদের মার্গ একেবারেই ভিন্ন, কিন্তু একটা জায়গায় মিলের কারণে বাংলায় আরেকজন নাট্যকারের নাম করি, তিনি বাদল সরকার। দ্বন্দ্বের ঘনঘটার বদলে তিনি বুদ্ধির গতিময়তা মঞ্চে তুলে আনেন। সেলিম আল দীনের কিছুটা আগে, তিনিই প্রথম বাংলা নাটকে কল্পনার একটি সূত্র উপস্থাপন করেন। মঞ্চের উপর যা তুলে ধরা হয় সত্য ঠিক সেখানেই খুঁটি গেড়ে বসে নেই; সত্য তার বাইরে কিছু যা ঠিক ওই মুহূর্তে মঞ্চায়তনে মূর্ত নয়। কিত্তনখোলা-র আগে শম্ভু মিত্র লোকজীবন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেন, এবং রচনা করেন চাঁদ বণিকের পালা। লোকজীবনের ঘাম, কাম, বুনন ও উৎকণ্ঠা সেখানে নেই; বস্তুজীবনে ক্লেদ ও সামগ্রিক ডিটেইলে তাঁর আগ্রহ নয়, তিনি মনোনিবেশ করেন জীবনজিজ্ঞাসার দার্শনিক প্রকল্পে। লোক আঙ্গিকের ভিতর সেলিম আল দীন প্রথম কিছুটা রক্তমাংসের মানুষ, তাদের লেন-দেন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌগ স্থাপন করেন কিত্তনখোলা-য়। নাটক যে স্থবির নয় জীবনের রঙে সঞ্চরণশীল এক বাঙ্ময় প্রবহমানতা কিত্তনখোলা তার প্রথম ফলক। তার আগে শকুন্তলা এক আধাআধি নারী, সেলিম আল দীন শকুন্তলাসহ অন্যদের শনাক্ত করতে পারেন অর্ধেক; শকুন্তলার সমগ্র ও পারিপার্শ্বিক টানাপোড়েন ধরার অভিনিবেশ নাট্যকারের আওতার বাইরে। চক্রান্তদুহিতা শকুন্তলা বলামাত্র যে অভিমানী রঙরূপ, দ্বিধা ও সমর্পণের যৌগ চোখের সামনে ভাসে শকুন্তলা-য় সেটি মাঝপথে ঝুলে থাকে, সামূহিকতার জায়গায় আমরা একরৈখিক শকুন্তলাকে পাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেভাবে স্থানোত্তীর্ণ ব্যাপ্তির আশা করেন:

মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, 'তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যে রূপে হরিণগণকে তপোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনী নদীতে কেলি করিতে দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ও চিত্রিত

করিব; আর প্রথম দর্শনের দিবসে পিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব।'

সেভাবে লেখা হয়নি। কিন্তু সেলিম আল দীন বরাবর নারীচরিত্র অঙ্কনে দীক্ষায়, মমতায়, অজস্র শ্রদ্ধায় তিলতিল নিষ্ঠা যোগ করেন। তাঁর নারীরা মেন্দিপাতার অপর নাম, দেখতে সবুজ কিন্তু তার ভিতরে কি তীব্র আগুন! শকুন্তলা-য় গৌতমী আর শকুন্তলা, কিত্তনখোলা-য় ডালিমন কী বনশ্রী, কেরামতমঙ্গল কাব্যে শমলা, হাত হদাই কীর্তিমান হয়ে ওঠে চুক্কুনির অবস্থিতি নিয়ে, চাকা-য় রাতদিন শঙ্কাদীর্ণ রেহানা, হরগজ-এ পিয়ারুন্নেসা অথবা রুমুনী বহুদিন পাঠকের বাকরোধ করে রাখে, বনপাংশুল-এ সুকী অথবা সখীপুর মহাজনে গতর বেচা পতিত মঙ্গলি, প্রাচ্য-এ অভিমানী উল্টা লখাই নোলক, একটি মারমা রূপকথা-র মনুরি আমাদের ভেতরকার সব গ্লানি দূর করে দেয়, নিমজ্জন-এ ভাসমান ধর্ষিত যুবতী ও তার বুকে লেপ্টে থাকা শিশুর চেহারা দেখে শিউরে উঠি, স্বর্ণবোয়াল-এ সক্রিয়তার দীপ্তি দেখায় সাঁঝমালা, যৈবতী কন্যার মন-এ কালিন্দী অথবা পরী আদায় করে সবটুকু মনোযোগ, ধাবমান-এ বাঞ্জা মায়্যালোক সবতী, পুত্র'র যমুনাবতী আবছা আমাদের শক্ত পায়ে দাঁড়াবার শক্তি জোগান দেয়।

সর্বোপরি তাঁর নারী শাড়ির বদলে নদীর তরঙ্গ পরে নেয়, কান্না কোমলে মেঘের কোমর জড়িয়ে ওড়ে। ফলে তাদের ঠিক স্পর্শের নাগালে অনুভব করা যায় না; মনে হয় প্রত্যেকেই দ্বিতীয় রমণী যারা দীর্ঘশ্বাস আর প্রত্যাখ্যানে রঙিন পুনর্জন্মে মর্ত্যে আসে। কেননা, শিল্পে তিনি লুকোচুরি প্রতিপালনের পক্ষে, বাংলায় বাস্তবতার সমস্ত রূঢ় হাতে তুলে আনার যে উদ্যোগ তাকে তিনি রুগ্ন বাস্তবতা বলে জোর তিরস্কার করেন। সেলিম আল দীনের একটি কবিতাই আছে শিল্প নামে, সে-টি একবার শুনে নিই: যেরকম চঞ্চল চড়ুই/ চলে আসি– স্বাভাবিক। এভাবেই চলবে লুকোচুরি/ বিমুখ নদী ও তৃষ্ণার প্রতিদিন। সারাদিন সারাবেলা/ এই অবহেলা অবহেলা খেলা।।

শিল্পকে তিনি বাস্তবতার নামে নিমজ্জন-এ কান্দাহার থেকে দুশ কিলোমিটার উপশিরোনামে বর্ণিত মর্মান্তিক দম বন্ধ করা দশায় দেখতে চান না: ইনকা মিশরীয় নয় আফগান মমি, বোমার ভয়ে তারা লুকিয়েছিল গুহার আড়াল। ব্লক বাস্টার বোমা গুহামুখে, আরেক পাহাড় ভেঙে দিল আটকে। শিল্পের ভাগ্যে এমন বদ্ধদশা তাঁর অকাম্য– তিনি এখনো কিছু জানালা খোলা রাখতে চান, সবগুলো বাতি নিভিয়ে ফেললে চলবে ক্যান! বিশ্বাসের সবটুকু নির্ভরতা শেষ হয়ে যায়নি; সেলিম আল দীন জানেন প্রাচ্য অদ্যাবধি দুর্ভাগ্য আর বিপন্নতা ভাগাভাগি করে নেয়, একজনের নয়নে ঝরে অন্যের চোখের জল। প্রাচ্যতার এ-একক সৌন্দর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আরো ঘন কৃষ্ণ কাকচক্ষু জল পান করার দীক্ষায় তিনি কুয়ায় নেমে যান, ফলে সারা দুনিয়া চলে যায় তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে। পুরো পাশ্চাত্যকে দাঁড় করিয়ে দেন শত্রু প্রতিপক্ষে। মিশেল ফুকোর নাম শুনতেই সেলিম আল দীন তাঁকে নাকচ করে দেন এক মিনিটেরও কম সময়ে। মিশেল ফুকো-সহ যে কাউকে তাৎক্ষণিক অধৈর্যে বাতিল করে

দেবার দরকার পড়ে ক্যান? তিনি কেবল বলেছেন শোষণের প্রযুক্তির কথা, দেখিয়েছেন ব্যক্তি কীভাবে জানে না সে শৃঙ্খলার নামে অদৃশ্য শৃঙ্খলে আটকা। মিশেল ফুকো ব্যাখ্যা করেন ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের ব্যাকরণ, তার প্রাতিষ্ঠানিক বিধি ও প্রয়োগ; তিনি কার্ল মার্কসকে সম্মান করেছেন শতবার, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন মার্কসবাদীদের প্রয়োগকৌশল। শিউরে উঠতে হয় যখন দেখি প্রাচ্যতার শক্তি শেষ পর্যন্ত এক সর্বনাশা কানাগলির ভিতর মিলায়। সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদসংখ্যা ২০০৫-এ প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির একটি ছোট অংশ একবার দেখে নেয়া যাক:

এখানে কিছু মানুষের মুখে শ্বাপদের রোম হাতে বাঘনখ। অনৃত ভাষণ পটু স্নায়ুহীন মগজের কোষে জমাট রক্ত সেজন্য পৃথিবীতে আলো আর দেখে না কিছুতেই। তবু এখানেই কিছু কিছু প্রকৃত প্রার্থনার হাত নিত্য তোমাকে ডাকে শিউলি বকুলে ক্বাশিদায়। প্রাচ্যেই গভীরতর হও ঈশ্বর আপাতত প্রাচ্যেই থাকো।

ঈশ্বরের শুভৈষা একা ভোগদখল করার যে স্বার্থবাদী প্রকল্প তা' প্রাচ্যদর্শনের পরিপন্থী নয় কী!

আসলে ঝড়জলবৃষ্টিভাঙনমুখর মাতৃজরায়ু সদৃশ এই ছোট অঞ্চলে দুনিয়াজোড়া মহীরূহ বিস্তারের এক ছোট বীজ কোলেপিঠে মানুষ করার সাকল্য বোধি বিদ্যমান দেখতে পাই; বাংলা ছাড়া আর কোথায় পাবো হাজার বছর বাহিত বিবিধ ধর্ম ও কৃত্যের বিরোধ ও ঐক্য; গৌড়পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গাল, হরিকেল অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, পদ্মা, ভাগীরথী, মেঘনাবিধৌত পক্ষীস্বভাবী বঙ্গজন মিলে যে জনপদ প্রাচ্যের সকল রূপ ও চারিত্র্য তার প্রাণ। পূর্ব বলি কি পশ্চিম সবাই সংকটে দুর্ভাবনায় শীতার্ত; এই শৈত্যে ওম ছড়াতে পারে বাংলা– কিন্তু আমাদের আরও বহুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। প্রাচ্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ মূল আলো ফেলেন প্যালেস্টাইনে– সেলিম আল দীন প্রাচ্য বলতে বোঝেন পাঁচালি আর গাজীর গান। কেউ না কেউ তার মৌল মূল বহুদূর অন্বেষণ করবেন জানি।

সেলিম আল দীন মানতে চান না যে ঈশ্বর বধির। তাঁর মেয়ে অন্বিতা, কি সুকি, সোনাই অথবা ডালিমন, কেরামত অথবা সাঁঝমালা কি জনম মাঝির জন্য কল্যাণ কামনার আর্তি ঈশ্বরের চিরায়ত প্রাচীন অনড় চৌকাঠ থেকে আর্তচিৎকারে ফিরে আসে। কিন্তু তারপরও মানুষের পায়ে পায়ে যে অজস্র আগুন দানা বেঁধে ওঠে সেই আঁচ পাবার নৈকট্য তাঁর মধ্যে দেখি না।

মানুষের পাশাপাশি কি সমান্তরালে হেঁটে যাবার একটা ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে বরাবরই ছিল, তার নমুনা সবজায়গায় পাওয়া যাবে। একেবারে শেষের দিকের লেখা ঊষা উৎসব-ও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। এখানে তাঁর যাত্রাটি এক বিমূর্ততার ভিতর হারায়, ফলে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদও লুপ্ত হয়। ছু আর খ্রাম একত্র হলেই যেন ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়– এরকম একটি অর্থ কল্পনা করে ঊষা উৎসব লেখার কাজে আগান– এখানে রবীন্দ্রনাথ ও গ্যাটেকে একসঙ্গে মিলাবার একটি প্রয়াস জাগে।

ঈশ্বরের মানব সৃষ্টির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ, এবং ঈশ্বরদ্রোহী দ্বারা বস্তুর মৌল স্বভাবের পরিবর্তন-চেষ্টা এবং পরিশেষে ছন্দতালের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তি– এই হলো ঊষা উৎসব-এর মূল কথা। অন্যদিকে ইউরোপের অপেরা ও ব্যালে নৃত্যকে এক সঙ্গে মিলাবার চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু সর্বোপরি থাকে তাঁর কল্যাণবোধ; এভাবে অন্তিম ভটিমাগীতির প্রয়োগ দেখি:

মানবপুরাণ এই বলেছে ঊষাতে উৎসবে/ মানুষ প্রথম শিখেছিল শ্রমের যুগ্মতা। শস্যে এবং ছন্দে এবং কৃত্যকতার রঙে/ রাত পোহানোর পৃষ্ঠাতে রোদ সোনার অক্ষরে– যে রচে এই পুরাণ কথা সৃজন নদী রেখা/ নাট গীত নাচ আঙ্গিকে তার শিল্প স্বস্তি হোক।

সেলিম আল দীন এখানে শ্রমের যুগ্মতার কথাও বলেন কিন্তু তাঁর পুরো আয়োজনে একটি সাত্ত্বিক দূরত্ব দেখতে পাই। স্বর্ণবোয়াল বা পুত্র-এও একই রকম লাগে– আবছা বিপুলভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, কিন্তু তার পিছনে কোনো মৃত্তিকাসংলগ্ন বাস্তব কারণ দৃশ্যমান হয় না। যমুনার বিপুল ভাঙন ও ক্ষতি তাকে অস্থির করে তোলে, সে বালুমাটির ওপর দাঁড়িয়ে যমুনার প্রাবল্যের জন্য ছটফট করে, ধান্যের আহ্বানে ব্যাকুল হয়। তাকে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ঠেকে , কিন্তু তার স্বামী সিরাজের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠ দ্বন্দ্বের ভিত্তি কোথায়! স্বর্ণবোয়াল ও ধাবমান-এও প্রায় একই ব্যাপার দেখি। যদিও সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বাইরে এসে একটা গোটা সামাজিক শ্রেণীগোষ্ঠী লোকালয় জুড়ে জেগে ওঠে– রুখে দাঁড়াবার সংকল্প দেখায়। কিন্তু তার গোড়ায় নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক কি শেষ কথায় কোনো রাজনৈতিক শিকড় না থাকার ফলে স্বর্ণবোয়াল-এ ঘুরে দাঁড়ানোর পিছনে রক্তের প্রবাহ নেই; তাদেরকে নিকারির বদলে মনে হয় বিশেষ কাল্টসহ এক আধ্যাত্মিক উপাসক সম্প্রদায়।

ধাবমান-এ রাজনৈতিক দর্শনে মধ্যবিত্ততা থাকলেও সার্বিকভাবে এক অসামান্য রচনা। যদিও তার প্রারম্ভের বহুদূর পর্যন্ত হাসান আজিজুল হকের গল্প শোণিত সেতু পাঠকের ভ্রমণসঙ্গী হয়। অঢেল গোলাকার এক চাঁদের নিচে হাঁটতে থাকলে যেমন চন্দ্র ভ্রমণকারীর সঙ্গে সঙ্গে যায়, সেই রকম ধাবমান-এ সোহরাব ও অজগরের ক্ষিপ্র লড়াইয়ের মধ্যখানে হাঁসফাঁস করা প্রতিবন্ধী এসাক একান্তে হাসান আজিজুল হকের দুই ষাঁড় সাদা মানিক আর ছাইবর্ণ অবলার লড়াই ও তন্মধ্যে মৃত্যুমুখী কবিরাজ নিশানাথের সন্নিকটবর্তী হয়। কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাত হদাই পর্বের পর দীর্ঘ কথানাট্য পরিক্রমায় সেলিম আল দীনকে এই প্রথম ধাবমান-এ পাওয়া যায় নিবিষ্ট তুলাদণ্ড-সহ এক কথাকার প্রতিমুহূর্তে সমান দক্ষতায় কৃষকের সহজাত হিসেবে ক্ষেতের সবটুকুজুড়ে এক অনন্য ভারসাম্যে বীজ বপন করে যান। ধাবমান শুরু করার আগে তাকে একশতভাগ প্রাচ্যদেশীয় করার যে সংকল্প গ্রহণ করেন, তার মর্মার্থ পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও ভাষা, বর্ণনা আর বিন্যাসের যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হন তার তুলনা মেলা ভার। পাশ্চাত্যের একটি ছিটেফোঁটাও থাকবে না এই

স্বঘোষণাসহ ধাবমান রচনায় প্রলিপ্ত হলে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে– প্রায় সব কথানাট্যেই নানাভাবে বিভিন্ন সাঙ্গীতিক রাগের ব্যবহার করেন; সবচেয়ে বেশি দেখি বনপাংশুল-এ; তিনি ৭২টি রাগের উল্লেখ করেন– কিন্তু ধাবমান-এ একটিও রাগের প্রয়োগ নেই! এতদিন পর তিনি কি বুঝতে পারেন যে গদ্যভাষায় আমরা যাকে ঠাসবুনুনি বলি বারবার রাগের উল্লেখ করলে ওই ঘন বুননের ক্ষেত্রে একটা শ্লথগতি আসে? নাকি তিনি অধিকতর নিউ টেস্টামেন্ট-এর কাছাকাছি যেতে চান– যেখানে অন্তর্লীন একটি রাগের প্রয়োগ আছে যার উল্লেখ নেই মাত্র। বাইবেলের ভাষা স্থির ও অভিজাত এক ধরনের দূরত্ব তার মধ্যে সতত ধার্য; সেলিম আল দীনের ভাষা ধাবমান-এ এসে অনেক সংগঠিত ও তাজা। বার বার নিউ টেস্টামেন্ট-এর কাছ থেকে অনুমতিপত্র আনার দরকার পড়ে না। ধারণা করি– সেলিম আল দীনের শিল্প দীর্ঘ পথে সবচেয়ে বড় চরিত্র ষণ্ড মোষ সোহরাব। সোহরাব সবাইকে ছিঁড়েফুঁড়ে যায়– সোনাই-এর জন্য আমাদের একবার কিত্তনখোলার পাশ থেকে ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে, ডালিমন জানি কোনখানে হারায়, আনার ভাণ্ডারীর অভিযাত্রা কোনোদিন শেষ হবে না, বাতাস ও বেদনার কাজে কেরামত থাকে কিন্তু চারদিক থেকে অধিকার করে ষণ্ড মোষ সোহরাব জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে তার জীবনের ধ্বনি, সংগ্রামশীল ব্যাকুলতা সোহরাবকে এক অসামান্য আকুতি দিয়ে যায়, শত সংগ্রামশীল ধাবমানতার পর চারদিক থেকে মৃত্যু বর্শার মুখে ছোরার নির্লিপ্ত দাঁতে দাঁতে তাকে বেড় দিয়ে ঘন হয়ে আসার নিয়তি শতভাগ জানার পরও সোহরাব বাৎসল্যের ঠিকানায় হারে, স্নেহের কাছে ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করতে সোহরাব সহস্র বিগ্রহ, রক্তক্ষরণ ডিঙিয়ে আবার সুবতী ও নহবত আলীর কাছে ফিরে আসে, সে হয়তো ভাবে শেষমেষ প্রতিবন্ধী এসাকের সঙ্গে আরেকবার দেখা হোক! এতদিন বাংলা সাহিত্যে কোনো পশুর সংশ্রবের কথা উঠলেই গফুরের মহেশ-এ গিয়ে ঝুলে থাকতো– এখন তার সীমানা বেড়ে দিগন্তে মিলায়। সোহরাবের আগে দেখি সঙ্গমক্লান্ত কূলনাশী মহিষনী হামেলা তুরা দাহালা থেকে বন্য রাত্রির পরতে পরতে পাহাড়ি পথ বেয়ে অক্ষয় বীজ নিয়ে আসে নহবত আলীর ঘরে। বোবা মেয়ে এষা এক স্রোতস্বিনী ভাষা বপন করে, এসাক কেড়ে নেয় সবটুকু স্বস্তি, মুনীন্দ্র মারাকের দিব্যজ্ঞানে কল্যাণের সূত্রপাত, মান্দি এবং ম্রোঙদের সম্মিলিত ধ্বনিরূপ, পাহাড়ি- নগদী দ্বন্দ্ব লড়াই, রুয়া মিল্লাম নিয়ে গারোদের অবিনাশী প্রস্তুতি– তার সবকিছুসহ ধাবমান এক অবিসংবাদিত রচনা।

ধারণা করি সেলিম আল দীন এই প্রথম না-পূর্ব না-পশ্চিম, প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিল্পবোধের কাছে নিঃশর্ত নতজানু হয়ে বসেন। পশ্চিমে অনীহা আর প্রাচ্যপ্রিয়তার নামে যে মধ্যযুগীয় আঙ্গিকবাদিতা ওই দুই থেকেই নিজেকে খুলে এনে আপন সরোবরে ডুব দেন। সামাজিক বা কোনো নৃগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যে সেলিম আল দীন গৃহীত শিল্পরীতির অনুমোদন পেতে পারে তা’ প্রথম দেখি বনপাংশুল-এ। যে প্রতিরোধ চৈতন্যের গোড়াপত্তন হয় আতর আলীদের নীলাভ পাট, করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ

দেখা কি বাসন-এ। মৌলিক চাষাবাদে তিনি যত বেশি উদ্যোগী হন, প্রতিরোধ চেতনার নাট্যিক রূপায়ণ থেকে ততোটা দূরে সরে আসেন। সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত ঘরানার শিল্পপ্রয়াসীদের মধ্যে এমত ধারণার প্রচল থাকে যে প্রকৃত শিল্পে রাজনীতি ও প্রতিরোধ অঙ্গীভূত করে নিলে তা' সৃষ্টিশীলতা হারায়। অথচ এই উদাহরণ দুর্নিরীক্ষ নয় যে কেন্দ্রে রাজনীতি রেখেও কালোত্তীর্ণ শিল্প রচনা হতে পারে। আসলে তৃতীয় বিশ্বে যে-কোনো রচনা বা রচনা বিচারে রাজনৈতিক আভিমুখ্য এড়িয়ে যাওয়া অসঙ্গত, এবং তার জন্যই অসম্ভব। আবার রাজনৈতিক বোধ ও পরিণতি দাঁড়িয়ে থাকে শ্রেণীসত্যের ওপর।

হাস্যমুখরতায় শ্রেণী থাকে, প্রার্থনীয় শ্রেণী অতি প্রাচীন ও গভীরে, যৌনতার শ্রেণী চরিত্র চৌষট্টি কলা দিয়ে ঢাকা যায় না, যে-কোনো শোকসাংস্কৃতিক অবকাঠামোয়, কৃত্যে শ্রেণীর প্রকাশ টের পাওয়া সহজসম্ভব। যে-কারণে নগুগি ওয়া থিয়োঙও তাঁর ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড: দ্য পলিটিক্স অব ল্যাংগুয়েজ ইন আফ্রিকান লিটারেচার বইয়ের দ্য ল্যাংগুয়েজ অব আফ্রিকান থিয়েটার অংশে থিয়েটারে তাঁর সংযুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে লোকনাট্য রক্ষা করার উদ্যোগ, কার্যপ্রণালী ও সংগ্রামের ইতিচিত্র তুলে ধরেন। তিনি দীর্ঘ আলোচনায় ভেঙে ভেঙে দেখান সাম্রাজ্যবাদী থিয়েটারসমূহের আগ্রহ কোথায়, আর কেমন করেই-বা তাঁদের আঁকড়ে ধরতে হয় নিজস্ব নাট্যপ্রবাহ ও লোকনাট্যের আঙ্গিকগুলোকে জীবন্ত করে তোলার কাজে– তিনি বলেন তাদের সবকিছুর মূলে বাঁধা রাজনৈতিক প্রশ্ন। কোনো বিলাসিতার ঝোঁক নেই– তাঁদের নাট্য আঙ্গিক ও সাংগঠনিক কাজ সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানুষের জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সৃজনশীল প্রয়োগের ওপর। তাঁর বয়ানের কোথাও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পলাপলি খেলার মনোভাব নেই।

সেলিম আল দীন শিল্পশুদ্ধতার শুচিবাই-এর কারণে নিজের ব্যাপারেও বলবেন না যে তিনি মধ্যবিত্ত; বলুন আর না বলুন মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের শরীর ও ছায়া তাঁর সমগ্র রচনার খাঁজে খাঁজে বসানো– জন্মদাগের নিয়মে ঘষে তোলা যায় না। চাকা-র মতো অসামান্য কথানাট্য মধ্যবিত্ততার কারণে কোথাও ঝুলে পড়েনি, কেননা চাকা মানবিক সম্পর্কের যে-অঞ্চলটি নিয়ে বিকশিত হয় তাতে তাঁর মধ্যবিত্ততা বড় কোনো চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে নি। কিন্তু তিনি বেশুমার আটকে যান নিমজ্জন-এ।

রুক্ষবর্ণ নাম একটি অচল ও বাজেয়াপ্ত লেখার জের ধরে সেলিম আল দীন লেখেন নিমজ্জন। লেখার অন্তে দাবি করা হয় নিমজ্জন-এ কোনো প্রথাগত গল্প নেই– এখানে কোনো পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি। তাঁর নিজের জবানীতে শোনা যাক:

একটি ব্যর্থ লেখাকে নিয়ে এত কথা লিখবার প্রয়োজন হত না যদি সেই ব্যর্থতাকে আমি নিজের জন্য চরম বিপর্যয় বলে না ভাবতাম। ভেবেছিলাম ঐ কাব্যের পরে হয়তো লেখা থেকেই অবসর নেব। তা হয়নি। বরং সেস্থলে এসে দাঁড়াল নতুন লেখা নিমজ্জন।

নিমজ্জন কোনো একটি শহর, অঞ্চল বা জনপদকে নির্দিষ্ট করে লেখা নয়। সমস্ত সঙ্কটসঙ্কুল বিশ্বকে এ-কাব্যে নগররূপে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির কিছু অংশ যা সাপ্তাহিক ২০০০, ঈদসংখ্যা ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত; ওখানে তিনি বলেন, চাঁদপুর শহরে কোনো একবার ধূলিঝড় দেখে নিমজ্জন-র গল্পটা মাথায় আসে। মোটা দাগে নিমজ্জন-এ কোনো গল্প নেই; কিন্তু তার ভিতরেভিতর সোনামুখী সুঁইয়ের সূত্রে একটি অন্তর্লীন গল্পে বিস্তার দেখি। কলেজের এক অধ্যাপক এবং তাঁর বন্ধু নানা প্রসঙ্গে একের পর এক হত্যা, ধর্ষণ, কারফিউ, নিপীড়ন, যুদ্ধের বীভৎসতার যোগাযোগ গেঁথে গেঁথে একটি কাঠামো দাঁড় করায়, তাদের নামও জানানো হয়নি, ফলে এ-গল্প শিরোনামহীন গোত্র-কাঠামোর বাইরে কেবল তার অবয়ব দেখায়। সেলিম আল দীনকে তার আগে এত মেলায় হারিয়ে যাওয়া বালকের মতো আর লাগেনি। যে রাজনৈতিক দার্শনিক শক্তি থাকলে বিশ্বজোড়া গণহত্যা, অন্যায়, গ্লানি, পরাধীনতা, লজ্জা, মিথ্যা সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের বিপন্ন নগ্ন হিংস্রতা মোকাবেলা করা যায় তার কিছুই সেলিম আল দীনের আয়ত্তে নেই। গণহত্যা যে কুশ্রী, ধর্ষণে, অগ্নিপাতে দুনিয়ার বসন্ত উধাও এমন একটি শিশুসুলভ বয়ান পেশ করার দরকার পড়ে ক্যান! জাতিসংঘের মহাসচিব তাঁর নাম যা-ই হোক কফি আনান, কি বান কি মুন– দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খোজা– তারাই কি এসব ফালতু চিল্লাচিল্লি করার জন্য যথেষ্ট নন? একই কথা চিত্রকল্পসজ্জিত করে বলার দরকার কী!

এক্ষণে মনে হয় রুক্ষ্মবর্ণ নাম যে রচনাটি বাতিল করে দেওয়া হল সেটি নিশ্চয়ই এমন অকেজো ছিল না। বোধ করি কিছু দিক তিনি রুক্ষ্মবর্ণ-এ স্পর্শ করেছিলেন যা তাঁর অনুগত স্বস্তিকর শিল্পসূত্রের পরিচিত কাঠামোর সঙ্গে মেলেনি। তিনি দাঁড়াতে পারতেন ভৌগোলিক আকারে ছোট মাতৃজরায়ুসম বাংলার আত্মিক শক্তির সংবেদনশীল দৃঢ়তার ওপর। নিমজ্জন-এ প্রাচ্যের প্রকৃত শক্তি মেলে দেখাবার মোক্ষম সুযোগ ছিল।

সেলিম আল দীন যতবড় লেখক ততোধিক জনক। তাঁর চরিত্ররা সেটুকু ভাঙনের মুখে যায় যতদূর তিনি পিতা হিসেবে সইতে পারেন, তারা কখনো অত্যাচারে লিপ্ত হয় না, কারণ প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে তাঁর কোনো সমর্থন নেই; তিনি অতি সাবধানে পা ফেলেন যাতে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে কোনো আঁচড় না লাগে, তিনি চরিত্রদের বিজয়ীর বেশে দেখতে উৎকণ্ঠিত, তাঁর পুত্র-কন্যারা ক্ষেত্র-বিশেষে বিচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং মূল্যবোধের রাজটীকা মাথায় নিয়ে পতিত হয়, কেননা মৌলে তিনি ভাবেন, প্রাচ্যে ভাঙন নেই, স্বার্থসংশ্লিষ্টতা যা আছে তার সবই পশ্চিমে। সেলিম আল দীন তাঁদেরই সঙ্গে যাঁরা কখনো ভিলেনকে তার আত্মপক্ষ

সমর্থন করার সুযোগ দেন না। মীরজাফর ও মোহনলালের কথা আমরা কেউ কোনোদিন শুনিনি– তারা পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসঘাতক; পারিবারিক পীর-প্রথার বিপক্ষে সজ্ঞান এজিদের বিবেচনা তুলে ধরার গণতান্ত্রিক অধিকার সবাই হরণ করে নেয়। সেলিম আল দীন যদি দাবি করেন তিনি সবই একসঙ্গে লেখেন, উপন্যাসও তাঁর পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত সত্য, তাহলে সবার সামনে থেকে নিষেধের তর্জনী সরিয়ে নিতে হবে– চরিত্ররা জোয়ান বা বৃদ্ধ হবে তাদের নিজের কব্জির জোরে। মূল্যবোধের ওজন সরিয়ে নেবার প্রস্তুতি সেলিম আল দীনের আছে কি-না তার জোর সন্দেহ জাগে। পিটার ব্রুক-এর সহকর্মী জাঁ ক্লদ ক্যারিয়ে বেদব্যাস সম্পর্কে বলেন, মহাভারতে এমন অনেক চরিত্র ক্রিয়া করে যারা ব্যাসের রাখঢাকের বাইরে বড় হয়ে ওঠে, তার নিষেধ ও পরিকল্পনার তোয়াক্কা করে না, এক পর্যায়ে পরিস্থিতি সামলে নিতে ব্যাসকে নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটাতে হয়। ব্যাস পারেন, কারণ তিনি মূল্যবোধের ব্যূহের ভিতর ছিলেন না– সেলিম আল দীন বরং মূল্যবোধের ঘেরাটোপে আটক, তার বাইরে যাবার সাধ্য কী! প্রাচ্য-এ সয়ফর নিজের পছন্দ ও সিদ্ধান্তে বড় হয়ে ওঠেনি। তাকে বলা হয়েছে তুমি মহৎ হও– সয়ফর এক অপ্রতিরোধ্য নায়ক হিসেবে বেরিয়ে আসে সবার সামনে। কীভাবে সয়ফর বেহুলার সমকক্ষতা নিয়ে আবির্ভূত হয় তা' বোঝা দুরূহ কাজ। ঋগবেদের বৈবাহিক মন্ত্রে পুরুষের এই প্রার্থনা থাকে– তুমি আমারই কর্মভাবনা এবং ব্রতে তোমার হৃদয় আধ্যান করো, তোমার চিত্ত যেন আমার মনের অনুকূল হয়, কণ্ব মুনির শকুন্তলাকে দেওয়া উপদেশটুকু শোনা যাক– সপত্নী সতীনদের তুমি সখীর মতো দেখো; কুন্তীর বিবাহোত্তর কালে পাণ্ডু তাঁর নববধূর মঙ্গলপট্ট এতটুকু মলিন হবার আগেই মাদ্রীকে বিয়ে করতে পারেন; অন্যদিকে কুলসুমের অজস্র কান্না, নিবেদন ও আত্মত্যাগের ফলে তাঁর স্বামী বেলালের আড়াই দিনের আয়ু আল্লাহ বাড়িয়ে দেন আরো বহুগুণ, বাংলার নারী তার স্বামীকে তুলে নেন সিঁথির সিঁদুরে, ত্যাগে, ধ্যানে, অশ্রুজল ও দীর্ঘ নিঃসঙ্গ অগ্নির দহনে সব নারীর পক্ষে গাঙুরের জলে ভেলা ভাসায় বেহুলা; অন্যদিকে পুরুষ নারীকে অর্ধেক মানুষ হিসেবেও গ্রহণ করেনি, পুরুষ নারীকে অসম্মান করে ধর্মে, সংস্কার তাকে দেয় দানবী'র কলঙ্ক, পুরুষতন্ত্র তাকে ঠেলে তোলে সহমরণের চিতায়, যৈবতী কন্যার মন নাটকে ভবানীর আর্ত-চিৎকারে কাল বিদীর্ণ হয়; অথচ এই নিষ্ঠুরতা পৈশুন্য উল্টে দিয়ে এক কালোত্তীর্ণ নায়ক হিসেবে বেহুলার সমকক্ষতা নিয়ে সয়ফরকে এগিয়ে আসতে দেখি! এ-ও পুরুষতান্ত্রিক মানসের আর একটি মহৎ ঠাট্টা মাত্র। এ-কথা ঠিক, যা-কিছু প্রকল্পই তিনি গ্রহণ করুন সবকিছুর মূলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান প্রাচ্যের শক্তি। সমস্ত শক্তিই আসলে নাট্যিক– নতুন নতুন মিথষ্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তার প্রমাণ মেলাতে হয়, কোনো কাঠামোই স্থির অনড় ঋষিবাক্য নয়, তাকে একটি কম্পযাত্রার ভিতর দিয়ে না গেলে চলবে না। এক ঠাঁয় অনন্তকাল এক জায়গায় খাড়া প্রাচ্যের শক্তি বলে কিছু নেই। হ্যাইসনাম কানহাইলাল তাঁর রিচ্যুয়াল থিয়েটার নিবন্ধে বলেন, ট্রানজিশন– পরিবর্তমুখরতাই সংস্কৃতি; তিনি

বলেন ভারতে এই চলমানতার সূত্র তাঁরা শিখেছেন পূর্বসূরি স্তানিস্লাভস্কি, মায়্যারহোল্ড, ক্রেইগ, কোপেও, আর্টুড, ব্রেখ্শ্ট, গ্রোটওস্কি, বাদল সরকার এবং হাবিব তানভিরের কাছে। এই পরিবর্তনশীলতা গ্রাহ্য করে নিলেই থিয়েটারের মধ্যে নতুন শিক্ষা ও মূল্যবোধের সংযোগ ঘটবে। থিয়েটার কখনো আঙ্গিক নয়– সারমর্মের গতিশীল মিথষ্ক্রিয়া।

কিন্তু সেলিম আল দীন নাট্যিক মিথষ্ক্রিয়া গ্রহণ করে নেন না, কারণ পাশ্চাত্যে চরিত্রের সঙ্গে চরিত্র যে দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করে প্রাচ্যে তার প্রচলন নেই। তিনি পশ্চিমের রীতি গ্রহণ করবেন না বলেই প্রতিজ্ঞা করেন। পশ্চিমে চরিত্ররা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবার কারণ সবটুকু প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আঙ্গিকরীতির কারণে ঘটে বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। এগুলো আসলে ব্যক্তির বিকাশ এবং অবিকাশের ফল। পাশ্চাত্যে যে মাপে ট্র্যাজেডি নাটক হয়, পূর্বে তা' হয় না। তার কারণ যতটা নাট্যিক তার চেয়ে বেশি সামাজিক-রাজনৈতিক। পশ্চিমের ব্যক্তি হেলে পড়ে না, প্রাচ্যে ব্যক্তি সঙ্কটে, সংঘাতে প্রিয়জনের কাঁধে মাথা রাখে; ক্রান্তি আর দুঃসময় ভাগাভাগি করে নেয়– নতুন পথ বের করে ফেলে; ফলে ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না– প্রাচ্য জানে কীভাবে মৃত্যুর কঠিন মুখেও রঙিন বন্ধু-র আলো বসিয়ে দেওয়া যায়। মৃত্যুর সরোবরে সাঁতার কেটে নিতে সাগ্রহ অপেক্ষা করে এমন লোকের সংখ্যা প্রাচ্যে কম নয়। তারা জীবনকে মৃত্যুর ওপর শতায়ু দীর্ঘ করে নিতে জানে। পশ্চিমে ব্যক্তি নিদারুণ একা, হিমালয়ের চূড়া যেমন নৈঃসঙ্গে কাঁপে, পশ্চিমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সেই ভয়াল একাকিত্বের শৈত্য নেমে আসে। তারা কান্নাও ভাগাভাগি করে না। যৌনতা আর অশ্রুজল দুই-ই তাদের কাছে ব্যক্তিগত। যে-একাকিত্ব দেখি স্যামুয়েল বেকেট-এর গডোর প্রতীক্ষা-য়: ভ্লাদিমির যখন জিজ্ঞেস করে, বেশ এবার তাহলে যাওয়া যাক? এস্ট্রাগন বলে, তাই তো, চলো যাই; কিন্তু একজনের কথার কোনো কার্যকারিতা অন্যজনের ওপর থাকে না। তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকে। সেলিম আল দীনের যে শঙ্কা পাশ্চাত্যে নাটক মাত্র-ই দ্বন্দ্বের খাড়াখাড়া সামনাসামনি বোঝাপড়া– এখানে কিন্তু সে-রকম নেই। বের্টোল্ট ব্রেখ্শ্টের নাটকও কাহিনী-আকীর্ণ ঘটনা থাকে না, সারাক্ষণ জুড়ে চলে এক ধরনের তথ্যের খেলা।

আর্টেমিস একা– পুরুষের সঙ্গ বাতিল করে দেয় এক ঝটকায়, তার থেকে উর্বশী কামে-ঘামে অনেক বেশি নিকটবর্তী, আর জঙ্গম। প্রাচ্যে একাকিত্বে শোভা নয়, সুষমা তার সাহচর্যে। রাধা কৃষ্ণের মান ভাঙাতে তার সখীদের বলে, বারবার মিনতি করে; সইদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা আর দুঃখ দুই-ই ভাগ করে নেয়। রাধা অভিসারে যায় সখীপরিবৃত:

পদ দুই চারি সখী মেলি, ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি॥ ক্ষণে ক্ষণে চঙকি বাদ পালটায়, ক্ষণে কাতর দিঠে সখী মুখ চায়॥ সখীগণ পুনঃ পুনঃ করে আশোয়স, ঐছন কুঞ্জে মিলল হরি পাশ। দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥

অথবা এমনকি হতে পারে যে প্রাচ্যে নারীর গভীর গোপন বেদনা একার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, ফলে তার কিছুটা ওজন সখীর ধৈর্যের ওপর ছেড়ে দিতে হয়! বাংলায় নারীর পোড়া এতটাই দীর্ঘ-ব্যাপক যে সেলিম আল দীন একজন নারীর কথা বললে তার কিনারা হয় না– যৈবতী কন্যার মন-এ তাঁকে বলতে দেখি দুই নারীর কথা। বর্ণে মেঘনীলিম হে ছায়ানারী, এই যন্ত্রধ্বনির সোনার সিঁড়িতে তোমার পা রাখো। তুমি দুই নামে দুই কায়া কিন্তু একই যৈবতী কন্যা। পরলোকের ধূমঅগ্নি যদি ভেদ কর– তবে আইস! এখানে নারীর বস্তুজীবন স্বল্পায়ু। কিন্তু তার অমীমাংসিত তৃষ্ণা জীবনের অধিক, তা প্রলিপ্ত হয় উড্ডয়নশীল মেঘমালা থেকে সামান্য তরুপত্রের রঙে; ফলে সে মরে কিন্তু নিঃশেষ হয় না। কালিন্দী ধর্মবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে প্রণয়ের টানে, কিন্তু শক্ত অবিচল মাটির ওপর দাঁড়াতে পারে না; দ্বিতীয় খণ্ডে পরী– প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা নারী– শিল্পের ভিতর বেড়ে ওঠা এক আত্মবিনাশী কাঠামো যে শিল্প ও জীবনকে এক বিন্দুতে মেলাতে চায়।

একই নারীর দুই রূপ, অথবা সম্পূর্ণ দুই স্থিরচিত্র যারা কখনোই এক বিন্দুতে উত্তীর্ণ হয় না; জীবন থেকে তাদের তৃষ্ণা বড়, কোনোদিন সংসারপটে পা ছড়িয়ে বসতে পারে না– কেবলই আকুতির পিছনে হারায়। তাই একই নারীর জন্ম, লাঞ্ছনা, স্বপ্ন, মৃত্যু আর জন্মান্তরবাদী জীবন পরিধির গল্পে সমান্তরালে দেখতে পাই নিযামী– নিযামউদ্দিন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস ইবনে য়ুসুফকৃত সাত রাজকন্যা-র বহুবর্ণিল কাহিনী বর্ণনাকে হার মানায়। সেলিম আল দীন বলেন যৈবতী কন্যার মন রচনার প্রাক্কালে সাত রাজকন্যা-র কাহিনী বর্ণনা তাঁর মধ্যে কিছুটা প্রভাব ফেলে। সাত রাজকন্যা নিযামীর বর্ণনায় সাত রঙের যাত্রা যা শুরু হয় কৃষ্ণবর্ণে আর সমাপ্তি ঘটে শুক্লায়। কিন্তু যৈবতী কন্যা-য় কালিন্দী কিংবা পরী কখনো সাদার মুখ দেখেনি। সেলিম আল দীন হপ্ত পয়করে মুদ্রিত মিনিয়েচার চিত্রের উল্লেখ করে সে কাহিনীমালা অভিনয়রীতির একটি ইঙ্গিত দেন, কিন্তু তা' সঠিক হবার সম্ভাবনা কম; কেননা বাদশা বাহরাম শাসন করেন পঞ্চম শতকে, মিনিয়েচারগুলো তৈরি হয় পঞ্চম শতকেরই কোনো এক সময়ে, নিযামী সাত রাজকন্যা লেখেন দ্বাদশ শতকে। তবে কোনো না কোনোভাবে সেই কাহিনীগুলো অভিনীত হবার সম্ভাবনা থাকে, সে-কারণেই চেক প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ জেন রাইপকা বলেন– বাহরামের সপ্ত ভার্যা বর্ণিত কাহিনী ছন্দোময় এক বর্ণনাত্মক কাব্য এবং প্রতীকের বহুবর্ণিল চলমানতা মন কেড়ে নেয়।

সেলিম আল দীন তাঁর দীর্ঘ শিল্পজীবনে নারীর বেদনা ও অশ্রুপাতের গাথা লিখে যান বারবার, এবং বোধ করি তার কোনো প্রতিকার করতে না পেরে এক সাত্ত্বিক চৈতন্যে নিষ্পত্তি খোঁজেন। এবং কালক্রমে শিল্পও দৃশ্যকাঠামোর বাইরে কিছু প্রতীকের দিকে যাত্রা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যপথের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সেলিম আল দীনকে এক ছায়াপুত্র হিসেবে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার শুরু ১৮৮১ সনে বাল্মিকী প্রতিভা নামক এক গীতিনাট্যের ভিতর দিয়ে, যদিও নাটক নিয়ে কবিতার

বাইরে একক পরিকল্পনায় ১৮৮৯ সনে লেখা রাজা ও রাণী; এবং বিসর্জন। বাল্মিকী প্রতিভা ঠিক নাটক নয়, নাটকের আদলে লেখা কবিতা। প্রকৃত নাটক রাজা ও রাণী; এবং বিসর্জন। উপরোক্ত ওই দুটি নাটক লেখার সময় তাঁর মাথায় থাকে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিয়োগান্ত নাটক। রবীন্দ্রনাথ বলেই তিনি বিফল হননি, দুটো নাটকই সাফল্যের প্রোজ্জ্বল মুখ দ্যাখে। কিন্তু অচিরেই তিনি বোঝেন ইউরোপীয় প্রকল্প এবং ট্র্যাজেডি নাটক তাঁর মানস নয়। নাটকের কাঠামো মোক্ষম বিষয় নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পার্থক্য তাঁর ভারতীয় দার্শনিক ভিত্তি। তাঁর অভীষ্ট জীবন-দেবতার সৌন্দর্য খুঁজে বের করা, সেখানে দুঃখ অস্থিতিশীল, এবং জীবনে ইতিবাচকতা দুঃখের উপরে অবস্থিতি করে। তিনি নিজস্ব নাটগীতিরীতির শক্তি খুঁজে বের করার প্রকল্পে তাঁর নাট্য মনোযোগ প্রযুক্ত করেন; এবং রচনা করেন চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, সতী, গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, কর্ণকুন্তী সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

ইউরোপীয় নাট্যকাঠামো ভারতীয় নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস, লৌকিক উপস্থাপনাভঙ্গিমা, নাটগীতিরীতি সবকিছুর সংশ্লেষের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত স্থির করেন তাঁর স্বকীয় ভুবন যা-কিনা প্রতীকী নাটক বলে চিহ্নিত। শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা ও রক্তকরবী-র মধ্যে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাট্যের এক সামগ্রিক অবকাঠামো। ইউরোপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক তফাৎটি দাঁড় করান তা' বিকশিত হতে দেখি চরিত্রের অন্তর্কাঠামোর দৃশ্যমানতায়, জীবনের অদৃশ্যমান মর্মবস্তুর বাঙ্ময়তাই প্রধান। তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ কখনো শারীরিক-বাহ্যিক দ্বন্দ্বে চিত্রায়িত নয়, তাঁরা সবাই আত্মার মুক্তি সন্ধানে ব্যাকুল— রক্তকরবী-র নন্দিনী কখনো পাশ্চাত্যরীতির চাক্ষুষ চরিত্রের সঙ্গে মেলে না, ডাকঘর-এর অমল বস্তুগত লাভ-লোকসানের বাইরে, অচলায়তন-এর পঞ্চক দিগন্তের দিকে ডাকে, মুক্তধারা-র অভিজিৎ নিয়ে আসে দৃশ্যমানতার বাইরে এক অন্তর্বাস্তব।

একইভাবে দেখি, সেলিম আল দীন শুরু করেন সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচে, এবং রচনা করেন জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, সংবাদ কার্টুন, এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা ইত্যাদি নাটক। তারপর তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাত হদাই-এর ভিতর দিয়ে প্রবলভাবে মৌলে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথে অন্বেষা হয় নিজস্ব নাটগীতিরীতির উচ্চতর রূপ, সেলিম আল দীন আরো গভীরতার মধু তুলে আনায় ব্রত নিয়ে ডুব দেন মধ্যযুগের বাংলা নাট্যে। রবীন্দ্রনাথে যা জীবন-দেবতা; সেলিম আল দীনে এসে সেই প্রত্যয় এক ধ্রুবসত্য-র রূপ নেয়। যে-কোনো গভীর অন্বেষণের গন্তব্য অদৃশ্যমানতা— তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যযাত্রা শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা-য় এসে কায়াহীন রূপ পরিগ্রহ করে; সেলিম আল দীনও নিজেকে থিতিয়ে ঊষা উৎসব লেখেন; এবং মাটি খুঁড়ে জীবনের সত্য বের করে আনার সংকল্প থেকে একটি চাকমা লোককাহিনীর নৃত্যনাট্যরূপ বিধানের জানান দেন। মাঝখানে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন চিরকুমার সভা, সেলিম আল দীন রচনা করেন মিউজিক্যাল কমেডি মুনতাসির ফ্যান্টাসী।

কাল পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথ ও সেলিম আল দীন দুটি ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ নাটকের একটি দীর্ঘ যৌগ প্রক্রিয়ার মধ্যে থিয়েটার হিসেবে উপস্থাপিত হবার গতি ও দায় দেখে যেতে পারেননি। ধারণা করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি শম্ভু মিত্রকৃত রক্তকরবী-র মঞ্চায়ন দেখতে পারতেন তাহলে ভালো হোক কি মন্দ হোক তিনি নাটক রচনার কোনো কোনো দিক নিশ্চয়ই নতুন করে ভাবতেন! থিয়েটার এখন এক বিশেষ ধরনের সমবায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই এখন তাকে নানাদিকের ভারসাম্য মান্য করে চলতে হয়। বাদামতোলা পাতামনৌকার স্বভাবে নাট্যকার যেদিকে খুশি ঘুরে বেড়াবেন– সেই অধিকার তাঁর হাতে নেই মেলা দিন। নাট্যকারের সৌভাগ্য যে একজন নির্দেশক তাঁর রচনায় দ্বিতীয় জন্ম দেবার লক্ষ্যে প্রাণপাত করেন, আবার একই সঙ্গে অনেক সময় পা কেটে জুতার মাপে জুতসই করার প্রয়োজনীয় নির্মমতা তাঁর চোখের সামনে ঘটে। তারপর সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর নির্দেশনায় চাকা-র উপস্থাপনা দেখার পর এ-কথা মানতে একবিন্দু দ্বিধা থাকে না যে নির্দেশনা আর পাণ্ডুলিপির এক-রৈখিক অনুসরণের একঘেয়েমিতে আটকে নেই, নির্দেশনা এখন একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাত হদাই, প্রাচ্য, যৈবতী কন্যার মন, বনপাংশুল, কিংবা নিমজ্জন; নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের গ্যালিলিও, কি গডোর প্রতীক্ষা-য়, আরণ্যকের জয়জয়ন্তী অথবা রাঢ়াঙ; কিংবা আশীষ খন্দকারের টি.এস.সি-র ছাদে উপস্থাপিত কারখানা, কি চারুকলা ইনস্টিটিউট-এর পুকুরতলায় প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মেলানো মোহাম্মদ আমিন দেখার পর কার-না চৈতন্য নির্দেশনার যাদুর কাছে হার মানে! গিরীশ কারনাড আর ইব্রাহিম আল কাজির যৌথ সৃজনশীলতায় অসামান্য প্রযোজনা থিয়েটারে যুক্ত হয়; পিটার ব্রুক এবং জাঁ-ক্লদ ক্যারিয়ে-এর বছর বছর একান্নবর্তিতার ফল মহাভারত দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়, অন্যদিকে নির্দেশকের অতি-চাপাচাপির ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বিজয় তেণ্ডুলকার নাটক লেখায় ইস্তফা দেন।

সর্বাঙ্গ থিয়েটারের লোক হিসেবে সেলিম আল দীন নাটকের গানে সুরারোপ করেন, কোরিওগ্রাফিতেও তাঁর আগ্রহের কমতি নেই; সর্বোপরি দেখি নির্দেশনার কাজ। দেওয়ানা মদিনা-য় তিনি বেশি ভূমিসংলগ্ন– লোকনাট্যাভিনয়ের বেশি কাছাকাছি। ফলে দেওয়ানা মদিনা নিরাভরণ ও অনাকর্ষণীয়। একটি মারমা রূপকথা-ই তাঁর পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনার কাজ। মজার ব্যাপার হয়, যখন দেখি নাট্যকার হিসেবে পাশ্চাত্যের ঘোরতর বিরোধী কিন্তু নির্দেশনায় পশ্চিমের সঙ্গে বৈরিতার অনেকটাই কমে এসে প্রায় সৌহার্দ্যের পর্যায়ে পৌঁছে। একটি মারমা রূপকথা-য় ব্লকিং, কম্পোজিশন, সংলাপ, নাট্যমুহূর্ত, কোরিওগ্রাফি সবকিছুর মধ্যেই পাশ্চাত্য থিয়েটারের সহযাত্রী হবার

আকাঙ্ক্ষা অথবা অপরিহার্য অসাবধানতার ছাপ দেখি। সৈয়দ জামিল আহমেদ লোকনাট্যের এক আস্থাবান গ্রাহক হবার পরও চাকা, বিষাদ সিন্ধু, কিংবা বেহুলার ভাসান-এ লোকনাট্যের সঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের যোগসূত্র স্থাপন করতে ভোলেননি।

নাটককে থিয়েটারে প্রাণবন্ত রূপান্তরের বাস্তব সমস্যার কারণে সেলিম আল দীন এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফ জীবনদীর্ঘ শিল্পসঙ্গী হবার পরও একটি জায়গায় এসে ঠিক অভিন্ন থাকেননি। সেলিম আল দীন দীঘল পথ-পরিক্রমায় ধাবমান রচনার প্রাক্কালে বলেন তাঁর রচনায় পশ্চিমের একটি চিহ্নও আর থাকবে না। অন্যদিকে বনপাংশুল উপস্থাপনা বিষয়ে এক আলাপচারিতায় নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন– মঞ্চের কাব্যে তাঁর অভীষ্ট থাকে পূর্ব এবং পশ্চিমকে মেলানো।

কবির যে জন্মগত বিষণ্নতা সেলিম আল দীনে তা নিত্য সহচর। বিষণ্নতা নেই কিন্তু বড় কবি এমন কোনো উদাহরণ কি কোথাও পাওয়া যাবে!

তিনি কবিতা যেমন লেখেন, কিছু মৌলিক গান রচনার নমুনাও পাই। একই সঙ্গে লিরিকে সুরারোপনে রাগের উল্লেখ থেকে অনুধাবন করা যায় তাঁর মনোলোকে দুঃখ-সুখের আলো-ছায়াপাত। তিনি মৌলিক গানের সুরে বাছাই করেন মালকোষ আশাবরী– তাল দাদরা, ভীম পলশ্রী, তাল-খেমটা কাহারবা ও ত্রিতাল, রাগ বাগেশ্রী, রাগ ভৈরবী, রাগ জয়জয়ন্তী তাল কাহারবা, দাদরা। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকৃত রাগের সময় বিভাজন অনুযায়ী মালকোষ– রাত্রি তৃতীয় প্রহর, রাগেশ্রী– রাত্রি তৃতীয় প্রহর এবং জয়জয়ন্তী– রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ।

তিনি যা কিছুই করুন কবিতায় চিত্রকল্পের ছাপ রেখে যাওয়া, কালেভদ্রে দুই একটা বিদেশি কবিতা-ও বাংলায় অনুবাদ করে নেন, নাটকের গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনার টেবিলে দেখা যায় নিয়মিত, ক্লাসরুম ভরে যায় শিক্ষক ও পিতার সম্মিলিত অন্বয়ে, মহড়ার ফ্লোরে একটু-আধটু নেচে ফেলাতেও দ্বিধা নেই, উমা বসুর গানে বিস্ময়ে বুঁদ, উপন্যাস নাম উপাখ্যান লিখে ফেলেন একটা-দুইটা, টেলিভিশনের নাটকে আয়না– ভাঙনের শব্দ শুনি; লালমাটি কালো ধুঁয়া, গ্রন্থিকগণ কহে, অণৃত রাত্রি-র কথা কারো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, গ্রাম থিয়েটারের কাজে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর কোনোদিন আলস্য নেই– এসব যাবতীয়তার পরও সেলিম আল দীনের কেন্দ্রীয় পরিচয় এসে স্থির হয় নাটকে– নাট্যকারের অভিধা রাজটীকার শামিলে জ্বলে; যেমন করে জামদানির ওড়না, দোপাট্টা, গামছা সব কিছু ছাপিয়ে এসে জামদানি শাড়ি পান্না হাজার, দুবালি জাল, নীলাম্বরি, প্রজাপতি, চালতাপদ এবং শেষ পর্যন্ত সোনার জরিকাটা বিলওয়ারিতে এসে স্থিরতার আকার পায়। এবং নাটকে এসে তাঁর প্রাচ্যের সম্পর্ক ও শক্তি খুঁজে বের করার তৎপরতা কেন্দ্রীয় আভিমুখ্যে রূপ নেয়। কিন্তু এতবড় কর্মযজ্ঞে তাঁকে অতি আস্থাশীল, বিজয়ী এবং শিথিল মনে হয়। যে-কারণে তাঁর ভাষা বিবাহিত দম্পতির আচরণে নিরুত্তাপ, অভ্যস্ততায় সহনশীল– অস্বীকৃত প্রেমে হরিণশাবকের যে চঞ্চলতা সেই তরতাজা কম্পন তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত। কথানাট্যের বর্ণনায় যে নাট্যগুণ

থাকা আবশ্যক– তার দিকে সেলিম আল দীনের মনোযোগ নেই; সে-তুলনায় সংলাপ রচনার উজ্জ্বলতা বাংলা নাটকে আলো ছড়িয়ে দেয় বহুগুণ বেশি: করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা, মুনতাসির ফ্যান্টাসী, শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, হাত হদাই, কেরামতমঙ্গল, আতর আলীদের নীলাভ পাট, আয়না, একাত্তরের যীশু, গ্রন্থিকগণ কহে– এসব নাটক বা চিত্রনাট্যে আঞ্চলিক ভাষায়, কাব্যিক বিন্যাসে, সংলাপের প্রাণে কোনোদিন ম্লান হবার নয়।

তিনি যা বিশ্বাস করেন তা আবছা-আবছা– সেখানে আনুপূর্বিক নিষ্ঠা ও জিজ্ঞাসা দেখি না– কিন্তু আস্থা অবিচল। ফলে সেলিম আল দীনে কোনো সংশয় নেই– সংশয় ছাড়া একজন মৌলিক শিল্পীর বিকাশের পথ কী! প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটা সংক্ষিপ্ত আবর্তে ঘোরে। তিনি মনে করেন একটি ধ্রুবসত্য ছাড়া একজন শিল্পী বাঁচতে পারে না।

ধ্রুবসত্যের কাছাকাছি যেতে তিনি কেবল রাজহংসের পাখায় উড্ডয়নের ঘ্রাণ নিতে যান– বেমালুম ভুলে থাকেন জালালি কবুতরের কথা– যাদের পাখায় থাকতে পারে অমিত আগুনের দানা। তিনি ধরে নেন রবীন্দ্রনাথ আর গ্যাটে-ই পৃথিবীর শেষ কবি যাঁরা মর্ত্যের ধুলামালিন্যে আনেন নক্ষত্রের পিপাসা। সেলিম আল দীন যদি আশেপাশে খানিকটা নোঙর ফেলতেন, তাকিয়ে দেখতেন তাঁর বাহুর পাশে একান্ত সমকালে কী অসামান্য জ্যোতি নিয়ে জ্বলে থাকেন একজন শহীদুল জহির, কি কাজাও ইশিগুরি, কিংবা বলি মায়া অ্যাঞ্জালোর কথা– তাহলে তাঁর লেখায় আসতো আরো নানামুখী বাঁক। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত মোহরসদৃশ, একই সাথে এ-সত্য গ্রহণে দ্বিধা থাকে কেন যে সাহানা বাজপেয়ীর পরিবেশনা উদ্দাম হাওয়ার সামিল।

প্রকৃতি ও মানুষের জন্য এখন ধর্মের বিকল্প দরকার। সেই বিকল্প এনে দেবেন সেই শিল্পী যাঁর একটি লোকাল থাকবে বটে, কিন্তু কোনো দেশ লাগবে না। সেলিম আল দীনের জন্য সেই ঝুঁকির ওজন অনেক বেশি। তিনি বরং একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সংগঠকের প্রতি হামদ ও নাত পেশ করার মধ্য দিয়ে সাকুল্য আত্মসমর্পণ করেন।

আমরা প্রাচ্যের একটি গভীরে শক্তি অনুভব করতে পারি। পাশ্চাত্য কেঁপে ওঠে সামান্য দমকা বাতাসে, কেননা তারা ব্যক্তি ও তার আধ্যাত্মিকতার সবটুকু শক্তি তুলে নিয়ে বৈদ্যুতিক বাতি আর পরমাণু পরীক্ষায় সম্পূর্ণ আস্থা সমর্পণ করে, প্রাচ্য এক অপরিমিত বোধিমন্ত্রের ভারে ঝড়-জল-অগ্নির মুখে দাঁড়ায়!

ভিয়েতনাম যুদ্ধে, তিব্বত, মায়ানমারে দেখি বৌদ্ধ ভিক্ষু যুদ্ধের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়– আগুন জ্বলে দাউ দাউ– শ্রমণ তখনও স্থির বসে থাকেন! এই যে মন্ত্রবোধি তা' কেবল প্রাচ্যেই সম্ভব, পশ্চিমের সেই গভীরতা কোথায়! পূবে-ই লোকদার্শনিক প্রার্থনার ওপর প্রেমের আসর ধার্য করেন।

সেলিম আল দীন সহজে আত্মসমর্পণ করেন প্রথায়, কারণ পিতৃবাৎসল্য তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। কিন্তু যদি খনার শ্লোকধারায় পৃথিবীতে কল্যাণ নামে, সেলিম

আল দীন খুশি হবেন তুলনারহিত। মানুষের জন্য তাঁর অমিত কল্যাণ-প্রার্থনা আরেকবার দেখে নিই:

প্রিয় দর্শকমণ্ডলী এই নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কল্যাণ হোক। পুণ্য হোক। যে এই নাটক দেখে– সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায় অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানবজনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়।

সেলিম আল দীন মূলে, কামে, উৎকণ্ঠায় প্রাচ্যদেশীয়। তিনি মাতৃস্নেহের সংবেদনশীলতায় তাঁর চরিত্রদের নির্মাণ করেন। ফলে অনেক সময় শিল্পীর নির্মোহ দূরত্ব কার্যকর রাখতে পারেন না। তিনি অবিচল ভক্তি নিয়ে পূর্বপুরুষের বাড়ি-ঘর ও প্রত্নসামগ্রী খুঁজে বের করে আনার সংকল্পে একচক্ষু হরিণের সাদৃশ্যে ধাবিত হন। ফলে তিনি এক খণ্ডিতকে সামগ্রিকতার আয়তনে বাঁধেন। সঙ্গে তাঁর অমৃত শুভৈষা দিগন্তরেখা ডিঙিয়ে আদিগন্তে হারায়।

তাই দেখি, সেলিম আল দীন যদি কোথাও আটকে গিয়ে থাকেন– তা' কেবল তাঁর পিতৃঋণের কাছে ॥

[লেখক: বদরুজ্জামান আলমগীর: নাট্যকার]